যুগনায়ক বিবেকানন্দ

(তৃতীয় খণ্ড)

প্রবর্তন

স্বামী গম্ভীরানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রাগ্‌বাণী

নবযুগের বার্তাকে বাঙ্ময় রূপ দিবার পরে যুগনায়ক স্বামীজীর কর্তব্য ছিল উহার বিরাট কর্মময় সম্ভাবনার চাক্ষুষ আভাস প্রদান ও পন্থানির্দেশ। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "এবারে নূতন একটা পথ করে দিয়ে গেলুম। এতদিন লোকে জানত, ধ্যান, জপ, বিচার প্রভৃতি দ্বারা মুক্তি হয়। এবার এখানকার ছেলেমেয়েরা তাঁর কাজ করে জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে।" তাঁহার ধর্মের সংজ্ঞা এই : "মানুষের ভিতর যে দেবত্ব প্রথম হইতেই বর্তমান, তাহার প্রকাশসাধনকে ধর্ম বলে।" এই প্রকাশ ঘটিতে পারে বিচিত্ররূপে বিবিধ ক্ষেত্রে। স্বামীজীর নিজের জীবনই ইহার সাক্ষ্য দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, যেসব শক্তির একটি-মাত্রের বিকাশের ফলে মানুষ জগদ্বিখ্যাত হইতে পারে, "নরেন্দ্রের ভিতরে ঐরূপ আঠারটি শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।" অথচ ঐ শক্তিবিকাশ ধর্মবিরুদ্ধ হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না ; কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, "তাহার (নরেন্দ্রের) ভিতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হইয়া মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে।" এই জ্ঞান ও শক্তির, অন্তর্নিহিত ব্রহ্মানুভূতি ও তাহার বহিঃ-প্রসারের দিব্য সমন্বয়ের ভিত্তিতে যে আদর্শ বিরচিত হইল, তাহার পরিচয় পাই স্বামীজীরই এই উক্তিতে : "আমাদের আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতে পারে—মানুষের নিকট তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতি কার্যে সেই দেবত্ববিকাশের পন্থা নির্ধারণ।" মনুষ্যসমাজের কোন স্তরই তাঁহার পরিকল্পনার বাহিরে ছিল না : "বেদান্তের মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না ; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে, সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে।" সকলে আত্মার মহিমা শুনিয়া শক্তিলাভ করিবে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ করিয়া অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইবে। অতীতের ধর্মেতিহাস এই বিষয়ে তাঁহার সহায়ক ছিল, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা ইহার সমর্থক ছিল এবং স্বীয় দার্শনিক দৃষ্টিও ইহার পরিপোষক ছিল। "যে জ্ঞানে ভববন্ধন হইতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়" ; "আমি সেই ঈশ্বর বা সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না, যিনি বিধবার চোখের জল

মোছাতে বা অনাথের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেন না”—ইহাই ছিল তাঁহার দৃপ্ত ঘোষণা। জাগতিক উন্নতিসাধনকে অবহেলার চক্ষে না দেখিয়া তিনি উহাকে ঈশ্বরলাভের সোপানে পরিণত করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “খালি পেটে ধর্ম হয় না”; আর স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “কর্মতৎপরতাদ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি আগে আপনার ভিতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর্, তারপর ইতরসাধারণ সকলের ভিতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে প্রথমে অন্নসংস্থান পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা।”

মানবতার দৃষ্টি অবলম্বনে বর্তমান জগৎ চাহিয়াছে মানুষকে বহির্জগতের বিভেদ ভুলাইয়া সমসূত্রে গাঁথিতে; আর ব্রহ্মদৃষ্টি অবলম্বনে প্রাচীন ভারত চাহিয়াছে বিশ্ববাসীকে তাহাদের বাস্তব একত্ব অনুভব করাইতে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, এই উভয় দৃষ্টির সমন্বয়; তাঁহার আদর্শ মানবজীবন হইবে আকাশেরই ন্যায় বিস্তীর্ণ অথচ সমুদ্রের ন্যায় গভীর।

এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন, ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’ এক নবীন সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন, দেশ-বিদেশে স্থায়ী বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপন করিলেন, নবভাব প্রচারের জন্য গ্রন্থপ্রকাশ ও সাময়িক পত্রিকা পরিচালনার ব্যবস্থা করিলেন, মহামারী ও দুর্ভিক্ষাদির সময়ে জনসেবার আয়োজন করিলেন এবং উৎসাহ ও সাহায্য দিয়া বহু সেবাকেন্দ্রের সূত্রপাত করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে তাঁহার সাধনা ও সাফল্য অপর আচার্যদের ন্যায় ব্যক্তিগত উৎকর্ষ-লাভ বা শুভভাবরাশির প্রচারমাত্রের মধ্যে সীমিত থাকে নাই। তাঁহার ছিল সর্ববিষয়ে একটা সক্রিয় মনোবৃত্তি ও তদনুরূপ আচরণ। তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন বুদ্ধের হৃদয় ও শঙ্করের বুদ্ধির সম্মিলন। নিজ জীবনে তিনি তাহার প্রচুর প্রমাণ দিয়াছিলেন। উহারই সহিত আবার সম্মিলিত হইয়াছিল পাতঞ্জল যোগোক্ত ধ্যান এবং গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম, অথবা স্বামীজীর ভাষায়—বিরাটের পূজা। অন্তরে যাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন, বাহিরে তিনি দেখিতে চাহিতেন তাহারই বাস্তব রূপায়ণ। ভাবজগতে যাহা সত্য বাস্তব জগতেও তাহা হইবে প্রত্যক্ষলভ্য। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহার দিব্য জীবনে আদর্শ যেমন বাস্তবতার মধ্যে আত্মহারা হয় নাই, বাস্তবতাও তেমনি আদর্শের আকর্ষণে স্বীয়

জড়তামধ্যে সঙ্কুচিত থাকিতে পারে নাই। জগৎকে তিনি মায়িক বা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, উহাকে তিনি ভগবানের লীলানিকেতনে ও মানবের অধ্যাত্মসাধনক্ষেত্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন সভ্যতার অগ্রগতি হয় প্রতিপদে প্রকৃতির সহিত রফা করিয়া কিংবা পশুজগৎসুলভ সংঘর্ষকে বরণ করিয়া নহে, প্রত্যুত আত্মিক শক্তিকে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া। জগতে পাপ, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তমোগুণের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করা চলে না, বরং সাহস, বীর্য ও প্রেম অবলম্বনে ঐ সবকে অতিক্রম করিতে হইবে। পলায়নপর মনোবৃত্তি স্বামীজীকে পীড়িত করিত। তাঁহার ত্যাগ শুধু বর্জন নহে, পরন্তু সার্থক জনসেবায় আত্মনিয়োগ; তাঁহার অধ্যাত্মপ্রচেষ্টা নেতিমার্গে আত্মবলিদান নহে, প্রত্যুত ইতিমার্গে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ—আর এই প্রকাশেরই মধ্যে রহিয়াছে মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা, জনসমাজের উন্নতির অমোঘ বীজ। এই সর্বজনীন উন্নতির প্রচেষ্টায় তিনি আত্মমুক্তির কথাও ভুলিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এই দৃষ্টিভূমি হইতেই তিনি সমাজের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন এক নবীন আশা ও আকাঙ্ক্ষা: "এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা যখন 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' পুনরায় হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল ও ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না, যখন মানবসন্তান যোগবিভূতিতে বিভূষিত হইয়াই জন্ম-পরিগ্রহ করিবে, যখন চৈতন্যময়ী শক্তি জড়াশক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে, যখন রোগ-শোক আর মনুষ্যশরীরকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, পশুবল প্রয়োগ পুরাকালের স্বপ্নের ন্যায় লোকস্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে, যখন এই ভূমণ্ডলে প্রেমই একমাত্র সর্ব কার্যের প্রেরয়িতা হইবে—তখনই সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্রাহ্মণ্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে, তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে।"

বিশ্বমানবকে সক্রিয়ভাবে এই ব্রহ্মপ্রকাশের প্রতি প্রধাবিত করাই ছিল স্বামীজীর অন্তরের আকূতি—এই উদ্দেশ্যেই যুগনায়কের হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ, আত্মবিসর্জন। তাই বিবেকানন্দের আগমনে জগৎ আজ নবরূপ ধারণের পথে চলিয়াছে।

বেলুড় মঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭৩

নিবেদক
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

যুগপ্রবর্তন

কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর প্রাথমিক অভ্যর্থনাদির কার্য শেষ হইয়া গেলে স্বামীজীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল গুরুভ্রাতৃগণকে স্বমতে আনয়ন করা এবং শ্রীগুরুর বাণীকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রূপপ্রদানের জন্য তাঁহাদিগকে উদ্‌বুদ্ধ করা। কার্যটি খুব সহজ ছিল না। গৃহী ভক্তদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তপ্রমুখ বয়স্ক অনেকে মঠাদি স্থাপনের প্রয়োজন পূর্বে স্বীকার করেন নাই; এখনও ধর্মজীবনে স্বমুক্তির চেষ্টায় সর্বতোভাবে নিরত থাকাকেই তাঁহারা সর্বোত্তম আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন, এবং এই চেষ্টাও গতানুগতিক পথে পরিচালিত হওয়া উচিত বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা ছিল। অধিকন্তু তাঁহারা স্বামীজীর প্রচারিত 'কার্যে পরিণত বেদান্তবাদ'-এর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেন না। সন্ন্যাসীদের অনেকেও স্বামীজীর নবীন চিন্তাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। স্বামীজীর এই কর্মপ্রচেষ্টার সহিত বৈরাগ্যপ্রবণ, সমাজবিমুখ সন্ন্যাসের মিলন কোথায়—সংসার অস্বীকারকারী বেদান্তবাদের সম্বন্ধই বা কি? স্বামীজী কিন্তু কোন অসামঞ্জস্য দেখেন নাই; তিনি সোজা কথায় বলিলেন, "যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়।" তাঁহার স্মরণ ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, "খালি-পেটে ধর্ম হয় না", "কলিতে অন্নগত প্রাণ"। আর ইতিহাসবেত্তা তিনি জানিতেন, বৌদ্ধ-ধর্মের অবনতিকালে স্বানুভূতির প্রতি সমুচিত দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু বাহ্যিক ত্যাগের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে অনধিকারীরাও সন্ন্যাসকেই ধর্মলাভের একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহার ফলে কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত ও ভারতের অবনতি ক্রমবর্ধমান হইয়া বর্তমান চরম দুর্দশা ঘটিয়াছে। কথায় বলে, সাপের বিষ সাপই তুলিয়া লইতে পারে। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিকর্তৃক এই বিপথে পরিচালনের ফলে সমাজে যে অব্যবস্থা ঘটিয়াছে, হিন্দু-সন্ন্যাসীকে আজ তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; তাঁহাকে স্বীয় জীবন দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে কর্মও ভগবদুপাসনায় পরিণত হইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ জীব-কল্যাণার্থ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, এই যুগে শিবজ্ঞানে জীবসেবার বাণী তাঁহারই মুখে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, হাজরা মহাশয় তাঁহাকে ভক্তদের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া ধ্যান-সমাধি লইয়া থাকিবার

পরামর্শ দিলেও তিনি কলিকাতার লোকের দুরবস্থা ভাবিয়া তাহা করিতে পারেন নাই এবং দেওঘর ও রাণাঘাটে তিনি স্বহস্তে সেবাব্রতের বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন। বিরাট সমাজের জীবনে বেদান্তকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার উপায়রূপে তাই স্বামীজী সেবাব্রতকে স্বীয় সঙ্ঘের আবশ্যিক অঙ্গ বলিয়া বাছিয়া লইলেন। স্বদেশবাসীকে তিনি যেমন সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষের পূজায়[১] আহ্বান করিলেন, তমোগুণ ছাড়িয়া বীরপদক্ষেপে স্বদেশের সেবায় ব্রতী হইতে বলিলেন, সন্ন্যাসীদিগকেও তেমনি বুঝাইয়া দিলেন, নিঃস্বার্থভাব লইয়া জীবরূপী শিবের সেবায় অগ্রসর হইলে উহাই হইবে সর্বোত্তম ধর্মসাধন এবং উহাই ক্রমে হইবে মুক্তির কারণ। অতএব ভয় নাই ; সন্দেহও বৃথা। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ ? আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না ? আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি ; কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে ? প্রথম পুজা—বিরাটের পুজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পুজা। ইহাদের পুজা করিতে হইবে, সেবা নহে। সেবা বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, পুজা শব্দেই ঐ ভাব ঠিক প্রকাশ করা যায়।" স্বদেশপ্রেমিক দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবে কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ?—মহামায়ার শরীররূপী স্বদেশের সেবাদর্শ বরণ করিয়া। সমাজের প্রতিটি অঙ্গ অপরের সম্মুখে দাঁড়াইবে কোন সম্বন্ধ মানিয়া লইয়া ?—সমাজরূপী বিরাটের দেবদেহের সেবায় ব্রতী হইয়া। সন্ন্যাসী অধ্যাত্মমার্গে পা বাড়াইবেন কাহার আহ্বান স্বীকার করিয়া ?—সর্বব্যাপী ভগবানের পুজার উদ্দীপনা পাইয়া।

স্বামীজী এ যাবৎ সকলকে বুঝাইতেছিলেন যে, আত্মাভিমানজনিত বা যশোলিপ্সাপ্রসূত কার্য সব সময়েই হেয় ; কিন্তু অহঙ্কারবর্জিত ও সেবাভাব-প্রণোদিত কর্ম অতীব প্রশংসনীয় এবং উহা চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ বিশুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন সাধারণ লোক যতক্ষণ পর্যন্ত রজোগুণকে অতিক্রম করিয়া সত্ত্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হন, ততক্ষণ ধ্যান-ধারণা বা জ্ঞান-বিচারাদির পুর্ণ অধিকারী হইতে পারেন না। অনেকের বিশ্বাস, ভগবানলাভের

১। সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ —গীতা ১৩।১৪

পর তাঁহারই আদেশক্রমে—বা 'চাপরাশ পাইয়া'—লোককল্যাণে নিযুক্ত হওয়া উচিত, তৎপুর্বে নহে। কিন্তু এই কথা শুধু আচার্যদের পক্ষেই প্রযোজ্য; যাঁহারা অপরকে ভগবৎপথে চলিবার উপদেশ দিবেন, তাঁহাদের নিজেদের অনুভূতি থাকা একান্ত আবশ্যক। পরন্তু যাঁহারা ঈশ্বরলাভের উপায়রূপে তাঁহারই আরাধনা-জ্ঞানে ভক্তিভাবে সেবাব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে। আবার সাধনা হিসাবে এই পথকে অন্যান্য সুপরিচিত পথ অপেক্ষা নিম্নতর স্থান দেওয়াও চলে না—কারণ সেবার সহিত ভক্তি, বিচার, ত্যাগ, একাগ্রতা প্রভৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত।

স্বামীজী উপযুক্ত কর্মী প্রস্তুত করিবার জন্য এইভাবে সকলকে প্রোৎসাহিত করিতে থাকিলেও তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিল না যে, দেশের লোকের মানসিক সহানুভূতি পাইলেও ভারতবর্ষে কাজ গড়িয়া তোলার একটি প্রধান অন্তরায় অর্থাভাব। শ্রীযুক্তা ওলি বুল ও শ্রীমতী মার্গারেট নোবলকে (ভগিনী নিবেদিতাকে) লিখিত ৫ই মে (১৮৯৭) তারিখের দুইখানি পত্রে স্বামীজী এই অসুবিধার কথাই লিখিয়াছিলেন। প্রথম পত্রে আছে: "এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না—যদিও সমস্ত জাতটা একযোগে আমাকে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মতো হয়েছিল! কোন বিষয়ে কার্যকারিতার দিকটা ভারতবর্ষে আদৌ দেখতে পাবে না।...ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।" দ্বিতীয় পত্রে আছে অন্য প্রকারে ইহারই পুনরাবৃত্তি: "দুঃখ হয় এই জন্য যে, আমার আদর্শগুলি কার্যে পরিণত হবার কিছুমাত্র সুযোগ পেল না। আর তুমি তো জানই, অন্তরায় হচ্ছে অর্থাভাব। হিন্দুরা শোভাযাত্রা এবং আরও কত কিছু করছে; কিন্তু তারা টাকা দিতে পারে না।"

অর্থাভাবে স্বীয় আদর্শকে দ্রুত কার্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হইলেও স্বামীজী চুপ করিয়া থাকিলেন না। তিনি ঐ জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বনে তৎপর হইলেন। ভারতে অর্থ না থাকিলেও এখানে ত্যাগের মহিমা স্বীকৃত হয় এবং স্বল্পসংখ্যক হইলেও তখনও ঐ আদর্শে মানুষ উদ্বুদ্ধ হইত; আর স্বামীজী জানিতেন, টাকায় মানুষ গড়ে না, মানুষই টাকা তৈরী করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে উদ্বুদ্ধ কয়েকজন যুবক স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানকাল হইতেই মঠে যাতায়াত করিতেছিলেন এবং কেহ কেহ মঠে যোগদানও করিয়াছিলেন। তাঁহার

স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর কালীকৃষ্ণ, কানাই, সুশীল ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হইলেন ও তাঁহাদের নাম হইল যথাক্রমে বিরজানন্দ, নির্ভয়ানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নিত্যানন্দ।[২] ইহা সম্ভবতঃ মার্চ (১৮৯৭) মাসের কথা; কারণ মার্চ মাসে মাদ্রাজ চলিয়া যাইবার পূর্বে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই ঘটনাকালে আলমবাজার মঠে উপস্থিত ছিলেন ('বাণী ও রচনা', ৯।৫১ ; স্বামীজীর ২০।৩।৯৭-এর পত্র ; 'স্বামী অখণ্ডানন্দ', ১১৮ পৃঃ দ্রঃ)। এই চারি জনের মধ্যে "একজনকে যাহাতে সন্ন্যাস না দেওয়া হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বহু অনুরোধ করেন। স্বামীজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমরা যদি পাপী-তাপী দীনদুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তাহ'লে কে আর তাকে দেখবে? তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না'।" ('বাণী ও রচনা,' ৯।৪৭)। স্বামীজী আরও বলিলেন, "ও ব্যক্তি যখন মঠে আশ্রয় নিয়েছে তখন এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ওর মন বদলে গেছে। আর তোমরা যদি অসৎ ব্যক্তিদিগকে সংশোধন করতে পারবে না মনে কর তবে গেরুয়া ধারণ

২। বর্ণনার সুবিধার জন্য এই কয় বৎসর মধ্যে অপর যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কথাও এখানেই বলিয়া রাখি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান পূজ্যপাদ হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মঠে যোগ দেন ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্বক বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন। সুশীলের দাদা সুধীর চক্রবর্তী স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা ও ব্রহ্মচর্যদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দের নিকট সন্ন্যাস লইয়া (১৮৯৭) শুদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হন। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী নির্মলানন্দ ও সদানন্দের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। স্বামীজীর বাকি সন্ন্যাসী শিষ্যদের পূর্ব নাম, গৃহত্যাগ-কাল, সন্ন্যাসের কাল ও সন্ন্যাসের নাম এই :

পূর্ব নাম	গৃহত্যাগ-কাল	সন্ন্যাসের কাল	নূতন নাম
গোবিন্দচন্দ্র শুকুল	১৮৯৬	১৮৯৮-৯৯	আত্মানন্দ
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮৯৭	১৮৯৭	বিমলানন্দ
অজয়হরি ব্যানার্জি	১৮৯৭	২৯।৩।১৮৯৮	স্বরূপানন্দ
সুরেন্দ্রনাথ বসু	.	ঐ	সুরেশ্বরানন্দ
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	১৮৯৬	১৮৯৮	বোধানন্দ
মতিলাল মুখার্জি		১৮৯৯	সচ্চিদানন্দ (২)
	.	নভেম্বর, ১৮৯৯	ধীরানন্দ
কৃষ্ণমূর্তি নাইডু		মে, ১৮৯৯	সোমানন্দ
দক্ষিণারঞ্জন গুহ	১৮৯৮	জুন, ১৮৯৯ (?)	কল্যাণানন্দ
আশুতোষ মিত্র		মার্চ, ১৯০০	সত্যকামানন্দ
সুরজ রাও	১৯০১	১৯০১	নিশ্চয়ানন্দ
সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা	১৯০০	জানুয়ারি, ১৯০২	পরমানন্দ
কেদারনাথ মৌলিক	১৯০০	মে, ১৯০২	অচলানন্দ

করেছ কেন, আর আচার্য হতে যাচ্ছ কি বলে?" (বাঙ্গলা জীবনী, ৬৪৮)। স্বামীজীর ইচ্ছাই ফলবতী হইল, তিনি করুণাবিগলিত অন্তঃকরণে একটি মুমুক্ষু শরণার্থীকে ভবসাগর উত্তীর্ণ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই নীরব হইলেন।

দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুগণ পূর্বদিন মস্তকমুণ্ডনপূর্বক উত্তরীয় ধারণান্তে আত্মশ্রাদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র দুই দিন যাবৎ মঠেই ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "তুই তো ভটচায বামুন ; আগামী কাল তুইই তাদের শ্রাদ্ধ করিয়ে দিবি, পরদিন এদের সন্ন্যাস দেবো। আজ পাঁজি-পুঁথি সব পড়ে-শুনে দেখে নিস।" বেদমতে যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা সন্ন্যাসের পূর্বেই নিজে নিজের শ্রাদ্ধ সমাপন করেন, কারণ সন্ন্যাসের পর আর তাঁহাদের বৈদিক কর্মে অধিকার থাকে না এবং বংশ লুপ্ত হওয়ায় পরে পিণ্ডদানের সম্ভাবনাও থাকে না। শিষ্য স্বামীজীর আদেশ পালন করিয়াছিলেন। "শ্রাদ্ধান্তে যখন ব্রহ্মচারি-চতুষ্টয় নিজ নিজ পিণ্ড অর্পণপূর্বক পিণ্ডাদি লইয়া গঙ্গায় চলিলেন, তখন স্বামীজী শিষ্যের মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এসব দেখেশুনে তোর মনে ভয় হয়েছে—না রে?' শিষ্য নতমস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হল; কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—এরা ব্রহ্মবীর্যে প্রদীপ্ত হয়ে জলন্ত পাবকের মতো অবস্থান করবে। 'ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'।" কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারি-চতুষ্টয় এই অবসরে গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজীর পাদবন্দনা করিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয়েছ, ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।'

"সেইদিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী কেবল সন্ন্যাসধর্ম-বিষয়েই কথা কহিতে থাকিলেন। সন্ন্যাসব্রত-গ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হ'লে কেউ কখন ব্রহ্মজ্ঞও হ'তে পারে না—এ কথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা করছে। যারা বলে—এ সংসারও ক'রব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদপেই শুনবিনি। ওসব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে, এতটুকু

কামনা যার রয়েছে, ও কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয় হয়; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য ব'লে বেড়ায়—'একূল ওকূল দুকূল রেখে চলতে হবে'। ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্ত্রীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।"

এই ধারায়ই কথা চলিতে লাগিল। স্বামীজী সন্ন্যাসের মহিমা কীর্তন ও ব্রহ্মচারীদিগকে উৎসাহপ্রদানের উদ্দেশ্যে আবেগভরে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। শিষ্য শরৎবাবু মৃদুভাবে গৃহস্থজীবনের ভাল দিকটা দেখাইলেও তখন তাঁহার সেদিকে মন দিবার অবকাশ ছিল না—মন তখন সন্ন্যাসের উচ্চ পরদায় চড়িয়া আছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও সে রাত্রের আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। পরিশেষে স্বামীজী এই বলিয়া শেষ করিলেন: "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা এই উচ্চ লক্ষ্য ভুলে যায় 'বৃথৈব তস্য জীবনম্'। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"

আবার গুরুভ্রাতাদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন: "'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আমাদের জন্ম; কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ্—জাগ্, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্, নরজন্ম সার্থক ক'রে চলে যা। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।"

সন্ন্যাসগ্রহণের পুর্বে স্বামীজী ব্রহ্মচারীদিগকে বলিলেন, "খুব ভেবে-চিন্তে এপথে এগুবে; পুরাতন জীবনে ফিরে যাবার এখনও সময় আছে। তোমরা কি আমার আদেশ অম্লানবদনে মানতে পারবে? আমি যদি তোমাদের বাঘের সামনে বা বিষধর সাপের সামনে যেতে বলি, যদি বলি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমীর ধরে আন, যদি বাকি জীবন আসামের চা-বাগানে কুলী হিসাবে কাজ করার জন্য বেচে দিই, অথবা যদি না খেয়ে মরতে বলি বা তুষানলে পুড়ে মরতে বলি—এই ভেবে যে এতে তোমাদের মঙ্গল হবে—তবে তোমরা আমার কথা তখনি মানতে রাজী আছ কি?" ব্রহ্মচারীরা অবনতমস্তকে স্বীকৃতি জানাইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিলেন।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বামীজী বিদেশ হইতে ফিরিয়া শুধু সকলকে কাজে লাগাইবারই জন্য ব্যস্ত ছিলেন না ; উপদেশ, শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির সাহায্যে সকলের সাধুজীবন সুগঠিত করিতেও বিশেষ যত্নপর ছিলেন। তিনি কিরূপে ধ্যান শিক্ষা দিতেন, এই বিষয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিয়াছেন: "স্বামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া সাধনভজন শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'প্রথমে সকলে আসন ক'রে বস, আর ভাব্,—আমার আসন দৃঢ় হোক, এই আসন অচল অটল হোক, এর সাহায্যেই আমি ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবো।' এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন, 'এইরূপ ভাব্ যে, আমার নিকট হ'তে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর হতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে—সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক। এইরূপ ভাবনার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি ; অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের ইষ্ট-মূর্তির চিন্তা ও মন্ত্রজপ—এইটি আধঘণ্টা আন্দাজ করবি।' সকলেই স্বামীজীর উপদেশমত চিন্তাদির চেষ্টা করিতে লাগিল। এইভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশে নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া বহুকাল যাবৎ 'এইবার এইরূপ চিন্তা কর, তারপর এইরূপ কর' বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামীজী-প্রোক্ত সাধনপ্রণালী অভ্যাস করাইয়াছিলেন।" ('বাণী ও রচনা', ৯।৩৫০-৫১)।

স্বামীজী তখন নবাগত ব্রহ্মচারীদের জীবনগঠনের প্রতি কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন তাহা স্বামী শুদ্ধানন্দ-লিখিত একটি ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। বরাহনগরে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বামীজী একবার আমেরিকা হইতে ঐ আশ্রমের জন্য কিছু টাকাও পাঠাইয়াছিলেন। আলোচ্য সময়ে আলমবাজার মঠে দৈনিক একখানি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজ আসিত ; কিন্তু পিয়ন অতদূরে না আসিয়া কাগজখানি বিধবাশ্রমে রাখিয়া যাইত ও স্বামী নির্ভয়ানন্দ উহা লইয়া আসিতেন। তখন নির্ভয়ানন্দের অনেক কাজ ; তাই তিনি ভাবিলেন কাগজ আনার ভার ব্রঃ সুধীরের (শুদ্ধানন্দের) উপর দিলে বেশ হয়। সুধীরও রাজী হইলেন। জায়গাটা চিনিয়া লইবার জন্য যখন সুধীর অপরাহ্ণে নির্ভয়ানন্দের সঙ্গে ঐ দিকে যাইতেছিলেন, তখন স্বামীজী

তাঁহাকে দেখিয়া শাস্ত্রপাঠের জন্য ডাকিলেন, কিন্তু সুধীর বলিলেন, তিনি কাগজ রাখার জায়গা দেখিতে বিধবাশ্রমে যাইতেছেন ; এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু একজন ব্রহ্মচারী এভাবে শাস্ত্রপাঠ ফেলিয়া বিধবাশ্রমে কাগজ আনিতে যাইবে, ইহা স্বামীজীর মনঃপূত ছিল না, তাই অপরদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ইহাই যথেষ্ট ছিল। সুধীর ফিরিয়া আসিয়া যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন সেখানে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। (ঐ, ৯।৩৫২-৫৩)।

সর্বতোভাবে শিষ্যদের জীবনগঠনের প্রতি দৃষ্টি থাকিলেও স্বামীজীর মূল উদ্দেশ্য ঠিকই ছিল—জগদ্ধিতায় সাধুদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে হইবে ! কাজেই শিষ্যদের প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরুভ্রাতাদিগকেও কাজে নামাইতে যত্নপর হইলেন। গুরুভ্রাতারা সকলে স্বামীজীর এই নবীন উদ্যমের সহিত একমত না হইলেও এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ধারার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে কিনা এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ থাকিলেও ভালবাসার টানে অনেকেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিলেন। ইহার প্রথম ফল ফলিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাদ্রাজ গমনে। তিনি এতদিন বরাহনগর ও আলমবাজারের মঠে থাকিয়া একনিষ্ঠভাবে ঠাকুরের পূজাদি করিতেছিলেন। বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু নেতা যাই আদেশ করিলেন যে, তাঁহাকে প্রচারের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ যাইতে হইবে, অমনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি সেখানে চলিলেন (১৮৯৭ মার্চ মাসে)। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাকে নেতার আসনে বসাইয়াছেন, তাঁহার আদেশ মানিয়া চলাই তো অপরের কর্তব্য। স্বামীজী মাদ্রাজ ত্যাগের প্রাক্‌কালে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "আমি তোমাদের কাছে এমন একজনকে পাঠাইব, যে তোমাদের সবচেয়ে গোঁড়ার চেয়েও গোঁড়া এবং তোমাদের পণ্ডিতদের চেয়েও বেশী পণ্ডিত।" আজ তাঁহার সেই সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার সহকারী স্বামী সদানন্দের সহিত মাদ্রাজে পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত বিলিগিরির ভবন ক্যাসল কার্নানের একাংশে আশ্রয় পাইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শাস্ত্রপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। শীঘ্রই তিনি ট্রিপ্লিকেনে আইস হাউস রোডের উপর একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া আশ্রম স্থাপন করিলেন ও উহার নাম রাখিলেন 'রামকৃষ্ণ হোম'। তিন মাস পরে শ্রীযুক্ত বিলিগিরির আগ্রহে আশ্রমটি ক্যাসল কার্নানেই স্থানান্তরিত হইল। এই আশ্রম আলমবাজার মঠেরই নিয়মানুসারে পরিচালিত হইত।

এই কালে স্বামীজীর সেবাব্রতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া, তাঁহারই পরিকল্পনানুসারে এবং তাঁহারই অর্থানুকূল্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যে অবতীর্ণ হইলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বেই স্বামীজী আবু পর্বতের সন্নিকটে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, "আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমঘাট ঘুরিয়া আসিতেছি। কিন্তু হায়, স্বচক্ষে দেশবাসীর যে দুর্দশা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এখন আমি বেশ বুঝিতেছি যে, দেশের এই হীনতা ও দারিদ্র্য না ঘুচাইতে পারিলে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা। এই জন্যই অর্থাৎ ভারতের মুক্তির উপায়বিধানের জন্যই বর্তমানে আমি আমেরিকা যাত্রা স্থির করিয়াছি।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৬৪৬)। স্বামী অখণ্ডানন্দ যে উভয় গুরুভ্রাতার মুখে এই কথা শুনিয়াছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দেরই পরামর্শে রাজপুতানায় গিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর আদর্শানুসারে কাজে ব্রতী হইয়া সেখানে কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন—ইহা তিনি স্বীয় 'স্মৃতিকথা'য় স্বীকার করিয়াছেন। রাজপুতানায় অবস্থানকালে তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, তিনি গরীবদের শিক্ষার জন্য কিছু করেন এবং এই বিষয়ে আমেরিকায় স্বামীজীকে পত্র লিখিয়া ও উত্তরে তাঁহার উৎসাহ পাইয়া ঐ কার্যে ব্রতী হন। অধুনা মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি দেখিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিল এবং তিনি কিছু করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তখন স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে স্বামীজী মার্চ মাসের মাঝামাঝি দার্জিলিং গিয়াছিলেন; সেখান হইতে মঠে ফিরিয়া যখন স্বামী অখণ্ডানন্দের খোঁজ করিলেন তখন স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে জানাইলেন যে, মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দুঃখে বিষাদগ্রস্ত অথচ নিরুপায় হইয়া তিনি কোন উপায়ে তাহাদিগকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাহাদেরই মধ্যে দিন কাটাইতেছেন; প্রেমানন্দজী স্বামীজীকে অখণ্ডানন্দের তিনখানি পত্রও দেখাইলেন। স্বামীজী দুঃস্থদের দুঃখে বিচলিত ও অখণ্ডানন্দের সঙ্কল্পে হর্ষান্বিত হইয়া তখনই তাঁহাকে উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিলেন: "সাবাস বাহাদুর! ওয়া গুরুজীকী ফতে!! কাজ করে যাও, যত টাকা লাগে আমি দেবো।" স্বামীজী নিজ তহবিল হইতে দেড়শত টাকা দিলেন ও দুইজন সহকারীও পাঠাইলেন—সুরেন্দ্র (সুরেশ্বরানন্দ) ও নিত্যানন্দ। এইভাবেই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম প্রণালীবদ্ধ সেবাকার্য আরম্ভ হইল। ('স্মৃতিকথা', ২৪০-৪১ পৃঃ)।

ইহারই কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও ব্রহ্মচারী সুধীরের (স্বামী শুদ্ধানন্দের) মন্ত্রদীক্ষা হইল (১৯শে বৈশাখ, ১৩০৪ বা ১লা মে, ১৮৯৭)।[৩] সন্ন্যাসের পূর্বে স্বামীজী ব্রহ্মচারীদিগকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, দীক্ষাকালে শরচ্চন্দ্রকেও তেমনি বলিলেন, "আমি তোকে যখন যে কাজ করতে বলব, তখনি তা যথাসাধ্য করবি তো ? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তাহলে তাও নির্বিচারে করতে পারবি তো ? এখনও ভেবে দেখ্। নতুবা সহসা গুরু বলে গ্রহণ করতে এগোস নি। শিষ্য নতশিরে 'পারিব' বলিয়া উত্তর দিলেন ; তাঁহার দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষান্তে স্বামীজী গুরুদক্ষিণা চাহিলেন। শিষ্য বলিলেন, "কি দিব ?" স্বামীজী কহিলেন, "যা, ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়।" শরৎবাবু দশ-পনরটি লিচু আনিয়া স্বামীজীর হস্তে দিলেন। ইহার পর ব্রহ্মচারী সুধীর দীক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বামীজী তাঁহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।

অর্থাভাব না মিটিলেও কাজ কিছু কিছু আরম্ভ হইয়া গেল, লোকও প্রস্তুত হইতে থাকিল। এখন আবশ্যক হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যাহা প্রণালীবদ্ধরূপে কার্য পরিচালনা করিবে। কর্মব্যপদেশে কলিকাতায় থাকার প্রয়োজন ঘটিলে স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতারা ৺বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহে (৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রীট, বাগবাজার) উঠিতেন এবং ঐ ভক্তপরিবারের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। ঐ পরিবার অন্যত্র চলিয়া গেলেও গৃহদ্বার সর্বদা সাধুদের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। আলমবাজারে পূর্ববর্ণিত দীক্ষাকার্য সমাপনান্তে স্বামীজী ঐ বাটীতে আসেন এবং কিছুদিন সেখানেই থাকেন। ঐ সময়ে তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে

৩। 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ', পূর্বকাণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল, ১৮৯৬) ভুল বলিয়া মনে হয় ; কারণ তখন স্বামীজী বিদেশে ছিলেন। তাই ১৮৯৭ এর ১লা মে আলমবাজার মঠে দীক্ষা হইয়াছিল এবং ঐ দিনই বিকালে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য (১লা মে, ১৮৯৭) আলমবাজার হইতে বলরামবাবুর বাটীতে গিয়াছিলেন বলিতে হইবে। অথচ উক্ত গ্রন্থের বর্ণনাতে আছে, "স্বামীজী কয়েকদিন বাগবাজারের বলরামবাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।" এই কথার পরেই মিশন প্রতিষ্ঠার কথার (১লা মে) ও উহার কার্যাবলী স্থিরীকরণের কথার (৫ই মে) অবতারণা করা হইয়াছে। আমাদের ধারণা শরৎবাবু ঐ স্থলে প্রধানতঃ ৫ই মের ঘটনাবলী লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে ১লা মের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ না মানিলে সামঞ্জস্য পাওয়া দুষ্কর।

উক্ত প্রতিষ্ঠানটি রূপ পরিগ্রহ করে ; ঐ বাটীতেই ১লা মে (১৮৯৭) 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন'-এর সূত্রপাত হয়। ঐ দিন ৩টার পর বৈকালে বহু ভক্ত ঐ বাটীর দ্বিতলে সমবেত হইলেন। সকলে উপবেশন করিলে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন : "নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত্ কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। তবে আমাদের মতো দেশে প্রথম হ'তে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরী করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধা-জনক ব'লে মনে হয় না। ওসব দেশের (পাশ্চাত্ত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত —আমাদের মতো দ্বেষপরায়ণ নয়। তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। এই দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদরযত্ন করেছে! এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্র মতে সঙ্ঘের কাজ চালাতে পারবে। সেইজন্য এই সঙ্ঘে একজন ডিক্টেটর বা প্রধান একনায়ক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে।

"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ ক'রে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কাজে সহায় হোন।" ('বাণী ও রচনা', ৯।৬০-৬১)।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত সকলে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল, এবং পরবর্তী ৫ই মে তারিখের দ্বিতীয় সভায় কার্যপ্রণালী প্রভৃতি আলোচিত ও গৃহীত হইল। উহার নাম হইল 'রামকৃষ্ণ-প্রচার' সমিতি বা 'রামকৃষ্ণ মিশন' অ্যাসোসিয়েশন। স্থিরীকৃত কার্যপ্রণালী এই :

উদ্দেশ্য—মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রত—জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তরমাত্র-জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে—আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের

অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।

কার্যপ্রণালী—মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ বর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য—ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রতগ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রম স্থাপন, এবং যাহাতে তাঁহারা দেশদেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্যবিভাগ—ভারতবহির্ভূত প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি বর্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপন।

স্বামীজী স্বয়ং উক্ত 'প্রচার' সমিতির সাধারণ সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ যথাক্রমে কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি ও উপ-সভাপতি হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্নি মহোদয় হইলেন ইহার সেক্রেটারী এবং ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার হইলেন সহকারী সেক্রেটারী। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সাধারণ শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মও বিধিবদ্ধ হইল যে, বলরামবাবুর ঐ ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটের বাটীতেই প্রতি রবিবারে চারিটার পর উক্ত সমিতির অধিবেশন বসিবে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় বার বিদেশগমন পর্যন্ত স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে যথারীতি সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিতেন এবং উপদেশ দিয়া কিংবা কিন্নরকণ্ঠে গান শুনাইয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেন। এই সাপ্তাহিক সভার অধিবেশন কিছুকাল পর্যন্ত ঠিক ঠিক চলিয়াছিল। কিন্তু বেলুড় মঠ স্থাপনের কিছু পরে সমিতির কার্য বন্ধ হইয়া যায়, অনেক পরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আইনানুসারে (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ অ্যাক্ট) 'রামকৃষ্ণ মিশন'-নামে রেজেষ্ট্রী হইয়া পুনর্জীবন ও স্থায়িত্ব লাভ করে।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' উদ্ধৃত না হইলেও সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে আরও দুইটি অংশ সংযুক্ত ছিল :

"মিশনের লক্ষ্য ও আদর্শ যেহেতু কেবল আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক, অতএব রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।

"উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যগুলির সহিত যাঁহার সহানুভূতি আছে বা যিনি বিশ্বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতে কোন বিশেষ কার্যসাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি এই সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিবেন।" (ইংরেজী জীবনী, ৫০১-২ পৃঃ)।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ স্বামীজীর আদেশ পালনে তৎপর থাকিলেও সকলে তাঁহার ভাবধারা বা কার্যপ্রণালী সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতে পারিতেন না। ইহার প্রমাণ ঐ সমিতি-প্রতিষ্ঠার দিনেই পাওয়া গিয়াছিল। সভাভঙ্গের পর বাহিরের সভ্যেরা চলিয়া গেলে স্বামীজী স্বামী যোগানন্দকে বলিলেন, "এভাবে কাজ তো আরম্ভ করা গেল, এখন দেখ্ ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।" স্বামী যোগানন্দ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার এসব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরকম ছিল?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পুজা-পাঠ প্রবর্তন করতে কখনও উপদেশ দেন নি। তিনি সাধন-ভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যেসব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরী করে যেতে আমার জন্ম হয় নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।" স্বামীজী বিনা বাধায় আরও অনেক কিছু বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সব শুনিয়া যোগানন্দজী মন্তব্য করিলেন, "তুমি যা ইচ্ছে করবে তাই হবে। আমরা তো চিরদিনই তোমার আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এসব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জান, মধ্যে মধ্যে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কিনা; তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি না তো?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন, তিনি অনন্তভাবময়।...তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার

আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি করব—বল্?"

কিছু পরে স্বামীজী গিরিশবাবুর বাড়ীতে বেড়াইয়া আসিতে চলিলেন; সঙ্গে গেলেন যোগানন্দ ও শিষ্য শরচ্চন্দ্র। গিরিশবাবুকে তিনি বলিলেন, "জি. সি., মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা করি, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দিই, ইত্যাদি। আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়।…তুমি কি বল?" গিরিশবাবু বলিলেন, "আমি আর কি বলব? তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র, যা করাবেন তাই তোমাকে করতে হবে।"

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে'র উক্ত বিবরণানুসারে বাদ-বিসংবাদ সেদিন ঐখানেই থামিয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই—যোগানন্দজী শেষ পর্যন্ত সন্দেহমুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ মতভেদটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশি-বিষয়ে তত নহে, যত উহার কার্যকরী প্রয়োগ সম্বন্ধে। মতবাদ হিসাবে কেহ হয়তো সেবাব্রত-প্রচারের বিরোধিতা করিতেন না; কিন্তু সন্ন্যাসী ও শ্রীরামকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে ঐ কার্যে নামাইবার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল সরব ও সক্রিয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাদি হইতে সেবার ভাব স্বতই আসিয়া পড়ে এবং অদ্বৈত বেদান্ত মানিতে গেলে সামাজিক কৃত্রিম ভেদ অসমঞ্জস হইয়া পড়ে[৪] ইত্যাদি কথা বলিলেও প্রতিবাদে খুব বেশী মুখর বা সক্রিয় হইবার প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু কেহ যদি বলে, সেবাব্রতের দ্বারা মুক্তি হইবে ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের ঐ পথ অনুসরণ করা উচিত, তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ দাঁড়ায়। সুতরাং ইহা আশ্চর্য নহে যে, যোগানন্দজী তখনকার মতো চুপ করিয়া গেলেও তাঁহার দ্বিধা দূর হইল না এবং গুরুভ্রাতাদের অপর কেহ কেহ তখনও বিরোধ প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা পরবর্তী আর একটি ঘটনা হইতে পাই।

স্বামী যোগানন্দের সহিত আলোচনার পরে আর এক সন্ধ্যায় স্বামীজী বলরাম-ভবনেই বসিয়া গুরুভ্রাতাদিগের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন, এমন সময় ঐরূপ বিশ্রম্ভালাপসূত্রেই এক অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হইল।

৪। "শিবজ্ঞানে জীবসেবা", "ভক্তের জাতি নাই", "খালি-পেটে ধর্ম হয় না", "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর" ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী স্মরণীয়।

পরিবেশ ভিন্ন হইলেও অকস্মাৎ যে প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল তাহার বিষয়বস্তু ছিল পূর্বদিনেরই অনুরূপ। প্রথিতযশা স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্ববাসী যদিও পাইত গুরুগম্ভীর পরিবেশমধ্যে বক্তৃতাপরায়ণ বা কঠিন সমস্যাবলীর সমাধানে নিযুক্ত আচার্যরূপে, তথাপি স্বীয় বন্ধুগোষ্ঠীর, বিশেষতঃ গুরুভ্রাতাদের নিকট তিনি ছিলেন সদা কৌতুকপরায়ণ ব্যঙ্গপ্রিয় প্রীতিভাজন। তাঁহাদের সহিত আলাপ-কালে তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া যাইত—কোথাও কোন সঙ্কোচ বা আবরণ থাকিত না। তিনি হাসিতেন, অপরকে হাসাইতেন; ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন, অপরের ব্যঙ্গকৌতুকও খুশিমনে গ্রহণ করিতেন। সেসব গল্প-গুজব ও বাধাহীন আলোচনাকালে কেহ প্রতিটি কথা ওজন করিয়া বলিতেন না—অতিরঞ্জন বা অবহেলন প্রভৃতি স্বভাবতই হইয়া যাইত। সরস মনখোলা তর্কের কালে শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধেও অনেক ক্ষেত্রে এমন সব মন্তব্য উচ্চারিত হইয়া যাইত, যাহা অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বক্তার গভীর অশ্রদ্ধা, অহঙ্কার ইত্যাদি অর্থেই গৃহীত হইতে পারিত। এই সকল আলোচনা ইতরসাধারণের সম্মুখে হইত না, কারণ ইঁহাদের অন্তরের ভাবের সহিত অপরিচিত ব্যক্তিদের পক্ষে এইরূপ মন্তব্যাদির যথার্থ মর্ম গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না এবং তজ্জন্য কদর্থ করার অবকাশও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু গুরুভ্রাতারা সব বুঝিতেন; এবং জানিতেন যে, খোঁচা দেওয়া ও খাওয়ার মধ্যে যে আত্মীয়তাবোধ বিদ্যমান থাকে উহাই নরেন্দ্রনাথকে আনন্দিত করিত, যদিও বাহ্যতঃ তিনি কঠোরতর পালটা জবাব দিয়া প্রতিপক্ষীভূত গুরুভ্রাতাকে তখনকার মতো জব্দ করিতে পারিলে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে স্বামীজীকে চটাইয়া দিয়া সকলে আনন্দিত হইতেন, তাঁহার ক্রুদ্ধপ্রায় মূর্তি তাঁহাদিগকে হাসাইত, এবং তাঁহার কথাগুলি ইতরসাধারণের দৃষ্টিতে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীত হইলেও মর্মজ্ঞ গুরুভ্রাতারা কখনও ঐ শব্দরাশিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিতেন না।

সে সন্ধ্যায়ও ঐ ধারায়ই কথা চলিতেছিল। হঠাৎ এক গুরুভ্রাতা[৫] প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, স্বামীজী কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করিবার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ

৫। ইংরেজী জীবনীর মতে ইনি স্বামী যোগানন্দ (৫০৬ পৃঃ)। বাঙ্গলা জীবনীতে নাম নাই (৬৫৬ পৃঃ)। 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা'র মতে (৩১৪ পৃঃ) লাটু মহারাজ একদিন ঐরূপ আলোচনা আরম্ভ করেন, পরে অপরেরা যোগ দেন।

দেন না, আর তাঁহার প্রবর্তিত কার্যধারার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও জীবনের সামঞ্জস্যই বা কোথায়?- হাসি-ঠাট্টারই মধ্যে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল; সুতরাং তৎকালীন ভাবেরই পরিপোষক উত্তর দিতে গিয়া স্বামীজী প্রথমে বলিলেন, "তুই কি জানিস? তুই তো ঘোর মূর্খ! যেমন গুরু তাঁর তেমনি চেলা! প্রহ্লাদের মতো 'ক' দেখেই কেঁদে সারা। তোরা সব ভক্তের দল, অর্থাৎ কতকগুলো ভাবরোগগ্রস্ত উন্মাদ। তোরা ধর্মের কি জানিস? শুধু কচি খোকার মতো নাকে কাঁদতে পারিস, 'ওহে প্রভু, তোমার কি সুন্দর নাক, কিবা চোখ! কি যে সব, আহা মরি!' ইত্যাদি। মনে করেছিস এতেই তোদের মুক্তি হাতের ভেতর, আর শেষ দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে তোদের হাত ধরে একেবারে গোলোকে টেনে নিয়ে যাবেন। আর জ্ঞানের চর্চা, লোকশিক্ষা, আর্ত-অনাথের সেবা, এসব মায়া—কেননা পরমহংসদেব ওসব করেন নি! আর কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন, 'আগে ভগবান লাভ কর, তারপর আর সব। পরের উপকার করতে যাওয়া অনধিকারচর্চা'—যেন ভগবান-লাভ করা মুখের কথা! ভগবান একটা খেলনা কিনা যে খুঁজলেই মুঠোর মধ্যে পড়বে!"

বলিতে বলিতে এবং বার বার বাধা পাইয়া তিনি হঠাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন এবং উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দমন করিতে না পারিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "তোমরা মনে করেছ যে, তোমরাই তাঁকে বুঝতে পেরেছ, আর আমি কিছুই পারিনি! তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা শুষ্ক নীরস জিনিস; তার চর্চা করতে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে গলা টিপে মারতে হয়। তোমরা যাকে ভক্তি বলছ, সেটা যে একটা দারুণ আহাম্মকি কেবল মানুষকে দুর্বল করে মাত্র, তা বুঝছ না। যাও, কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি-মুক্তি চায়? কে দেখতে চায় তোমার শাস্ত্র কি বলছে? যদি আমি আমার দেশের লোককে তমঃকূপ থেকে তুলে মানুষ করে গড়তে পারি, যদি তাদের ভেতর কর্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে আমি হাসতে হাসতে সহস্র নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ-টামকৃষ্ণ কারুর কথা শুনতে চাইনে। যে আমার মতলব অনুসারে কাজ করতে চায়, তারই কথা শুনবো। আমি রামকৃষ্ণ কি কারুর দাস নই—শুধু যে নিজের ভক্তি-মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করতে প্রস্তুত, তারই দাস।" বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ আরক্তিম ও চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, স্বর রুদ্ধপ্রায় হইল এবং সমস্ত শরীর মুহুর্মুহুঃ কম্পিত

হইতে লাগিল। তিনি বিদ্যুদ্বেগে সেই ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং স্বীয় বিশ্রামাগারে প্রবেশপূর্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

উপস্থিত গুরুভ্রাতারা আলোচনার এই প্রকার অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখিয়া বড়ই দুঃখিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন, এবং সহসা কোন কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকজন সাহস অবলম্বনপূর্বক স্বামীজীর কক্ষাভি-মুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, স্বামীজী যোগাসনে নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট এবং তাঁহার মুদিত নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত হইতেছে। দেখিয়াই মনে হইল, তিনি ভাবরাজ্যে বিরাজমান। অতএব তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, স্বামীজীর ভাব ভঙ্গ করিতে সাহস পাইলেন না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্বামীজীর ভাব প্রশমিত হইলে তিনি মুখাদি প্রক্ষালনান্তর ধীরপদবিক্ষেপে অনুতপ্ত বন্ধুবর্গের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার মূর্তি তখন সৌম্য শান্ত ও গম্ভীর, দেখিলেই অনুমান হয়, তাঁহার হৃদয়মধ্যে এক প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ; কারণ তখনও স্নিগ্ধোজ্জ্বল ললাট ও জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল সদ্যঃপ্রশমিত ভাবাবেগের রক্তিম রাগ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ কাহারও বাক্যস্ফূর্তি হইল না। অবশেষে স্বামীজী নিজেই বলিলেন :

"মানুষের প্রাণ যখন ভক্তিতে ভরে ওঠে, তখন তার হৃদয় ও স্নায়ুসকল এত নরম হয় যে, তাতে ফুলের ঘা পর্যন্ত সহ্য হয় না। তোমরা কি জান যে, আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেমকাহিনী পর্যন্ত পড়তে পারি না? ঠাকুরের কথা খানিকক্ষণ বলতে বা ভাবতে গেলেই ভাবোদ্বেল না হয়ে থাকতে পারি না! সেই জন্য কেবলই এই ভক্তি-স্রোতটা চেপে যাবার চেষ্টা করি। আর জ্ঞানের শিকল দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই, কারণ এখনও মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্তব্য শেষ হয়নি। সেই জন্য যেই দেখি, উদ্দাম ভক্তিপ্রবাহে প্রাণটা ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে, অমনি তার মাথায় কঠিন জ্ঞানের অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত করতে থাকি। ওঃ, এখনও আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে! আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস ; তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন, যতদিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই। বাস্তবিক আমার ওপর তাঁর কি ভালবাসাই!…" স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি পুনর্বার তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আর কথা বলিতে দিলেন না, গ্রীষ্মের অছিলায় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলেন এবং তাঁহার মনের গতি অন্যদিকে ফিরাইতে যত্নপর হইলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক

হইলে স্বামীজী স্বাভাবিক ভূমিতে নামিয়া আসিলেন এবং সকলে বাসস্থানে ফিরিলেন।

গুরুভ্রাতারা জানিতেন ও অদ্যকার ঘটনায় চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলেন যে, স্বামীজী বাহ্যজীবনে কঠিন জ্ঞানচর্চায় ব্যাপৃত ও মানবকল্যাণপ্রদ বিবিধ প্রচেষ্টায় নিরত থাকিলেও কর্ম ও জ্ঞানের কঠিন উপলখণ্ডের নিম্নে তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সর্বদা ভক্তির এক ভাববহুল বিপুল ফল্গুধারা প্রবাহিত রহিয়াছে, অবকাশ পাইলেই উহা বাহিরের কঠিনাবরণ ভেদ করিয়া আপন শক্তিতে দুকূল ভাসাইয়া চলিবে ; তাই আরব্ধ কার্যের অনুরোধে স্বামীজী অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্ব বরণ করিয়াও সেই স্রোতোধারাকে অন্তরেই চাপিয়া রাখিতেন। তাঁহারা ইহাও জানিতেন, জগৎ-কল্যাণের জন্য ও স্বামীজীর মানবলীলাকে দীর্ঘায়িত করিবার জন্য তাঁহার ভক্তিভাবের নিরঙ্কুশ প্রকাশের পথ আপাততঃ রুদ্ধ রাখাই আবশ্যক ; নতুবা প্রেমভক্তির প্রবল উৎস ছুটিয়া বাহির হইলে তাঁহার রোগশীর্ণ পার্থিব দেহ সে বেগধারণে অক্ষম হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাই তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিমনা দেখিলে গুরুভ্রাতারা তাঁহার ভাবগতির মোড় ফিরাইতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন।

এই ঘটনাবলম্বনে আমরা স্বামীজীর দুর্বোধ্য আপাতবিরোধী অনেক বাণী ও উপদেশাবলীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাই—বুঝিতে পারি, কেন তিনি মাঝে মাঝে কর্ম বা জ্ঞানের উপর অতিমাত্র জোর দিতেন, এবং ঐ মার্গদ্বয়ের প্রশংসায় মাতিয়া গিয়া ভক্তিকে ঠাট্টা বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করিতেন, কেন তিনি নির্বিকল্প সমাধিবান পুরুষ হইয়াও নীরব ব্যক্তিগত সাধনাপেক্ষা জনগণের কল্যাণার্থ কর্মমার্গ অবলম্বনকেই উচ্চতর স্থান দিতেন, আর কেনই বা মন্দিরের পূজার তুলনায় বিরাটের পূজাকে ঊর্ধ্বতর আসন দিতেন। তিনি ছিলেন যুগাচার্য—বর্তমান যুগের মানবমাত্রের কল্যাণপথের নির্দেশক, স্বমুক্তি সাধনের চমৎকারিত্ব বা ব্যক্তিগত মুক্তিপ্রাপ্তির উৎকর্ষ প্রমাণ করা তো তাঁহার একমাত্র কর্তব্য ছিল না। যাহা হউক, সেদিনের ঘটনার এই স্থায়ী ফল হইল যে, গুরুভ্রাতারা স্বামীজীর আচরণাদি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হইলেন ; তারপর তাঁহারা এভাবে আর কখনও প্রতিবাদ করেন নাই, বরং সাধ্যমত তাঁহার কর্মের সহায়ক হইয়াছিলেন। সেদিন হইতে তাঁহাদের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছিল, উহাই শুভপথ—ঠাকুর সত্য সত্যই স্বামীজীর ভিতর দিয়া স্বকার্য সাধন করিতেছেন।

স্বামীজী ছিলেন যুগনায়ক, তাই যুগবাণী উদ্ঘোষিত হইয়াছিল তাঁহার

কম্বুকণ্ঠে, আর সে বাণী রূপায়িত হইয়াছিল তাঁহার সবল ব্যক্তিত্ব অবলম্বনে। তাঁহার বার্তা ও জীবনে প্রচারিত ও প্রকটিত হইয়াছিল নবযুগের সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য এবং প্রাচীন যুগের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মুক্তিপ্রয়াসের সহিত আধুনিক যুগের উদারতর সর্বমুক্তির অপূর্ব মিলন। লব্ধনির্বাণ বুদ্ধদেব সারনাথে ধর্মচক্র-প্রবর্তন-পূর্বক উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, "আইস, আমরা সকলে মিলিয়া এই চক্রকে গতিশীল করিয়া তুলি।" স্বামীজীও মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বার্তা পুনঃপ্রচারিত করিয়া উহার বিকাশের পন্থা নির্দেশের জন্য একটি যন্ত্র স্থাপিত করিলেন, আর সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা আমার কাজে সহায় হ।" রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন: "ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বিবেকানন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘটির প্রকৃতি ছিল ভগবৎপ্রেরণা-প্রসূত-সমাজসেবামূলক, নরনারীর সেবাভাব-প্রণোদিত ও বিশ্বজনীন। অধিকাংশ ধর্মে যুক্তি এবং আধুনিক জীবনের সমস্যাবলী ও প্রয়োজনের সহিত বিশ্বাসের যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, বিবেকানন্দের সঙ্ঘে তাহা না হইয়া উহাকে বরং বিজ্ঞানের সহিত হাত মিলাইয়া একেবারে সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে; জাগতিক ও অতিজাগতিক প্রগতির সহিত উহাকে সহযোগিতা করিতে হইবে এবং শিল্প ও কলাবিদ্যার প্রতি উৎসাহ দেখাইতে হইবে। কিন্তু ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে জনসমাজের কল্যাণ। উহা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনই উহার মতের সারকথা, কারণ এইরূপ সমন্বয়েরই মধ্যে সনাতন ধর্ম নিহিত।" ('লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ,' ১২১)

পর্বতরাজের ক্রোড়ে

স্বামীজী ২৮শে এপ্রিল (১৮৯৭) দার্জিলিং হইতে মেরীকে লিখিয়াছিলেন, "আমার চুল গোছা গোছা পাকতে আরম্ভ করেছে এবং আমার মুখের চামড়া অনেক কুঁচকে গেছে—দেহের এই মাংস কমে যাওয়াতে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে যাচ্ছি, তার কারণ আমাকে শুধু মাংস খেয়ে থাকতে হচ্ছে —রুটি নেই, ভাত নেই, আলু নেই, এমন কি আমার কফিতে একটু চিনিও নেই !!...আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি ; আর তা পেকে সাদা হ'তে আরম্ভ হয়েছে—এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং লোককে আমেরিকান কুৎসা-রটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে ! হে সাদা দাড়ি, তুমি কত জিনিসই না ঢেকে রাখতে পারো ! তোমারই জয় জয়কার।"

আবার ৫ই মে শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন, "ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য একমাস দার্জিলিং-এ ছিলাম। আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম-ফ্যারাম দার্জিলিং-এ একেবারেই পালিয়েছে। কাল আলমোড়া নামক আর একটা শৈলাবাসে যাচ্ছি,—স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পূর্ণ করবার জন্য।"

উভয় পত্র একসঙ্গে পড়িলে পাঠকের সহজেই বোধ হইবে, স্বামীজী যদিও রোগ সারিয়া যাইবার কথা লিখিয়াছিলেন, তথাপি প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। তাঁহার প্রকৃতিই এইরূপ ছিল যে, রোগ-শোক বিপদ-আপদকে তিনি তেমন গ্রাহ্যই করিতেন না ; অতএব মারাত্মক রোগকেও কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ ঐ বয়সেই চুল পাকিয়া যাওয়া এবং খাদ্য হইতে আটা, চাউল, আলু ও শর্করাজাতীয় সমস্ত জিনিস বাদ দেওয়া স্বাস্থ্যের সুলক্ষণ নহে। অতএব তিনি যদিও দার্জিলিং-এ রোগমুক্ত হওয়া ও আলমোড়ায় স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পূর্ণ করার কথা লিখিয়াছিলেন, তথাপি চিকিৎসকদের ভিন্ন মত থাকার যথেষ্ট হেতু ছিল। তাঁহারা তাঁহাকে সমতলে না থাকিয়া গ্রীষ্মকালটা পাহাড়ে কাটাইতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে তিনি ৬ই মে আলমোড়া যাত্রা করিলেন।[১] শ্রীমতী মূলার পূর্বেই ভারতে আসিয়াছিলেন।

১। ইংরেজী জীবনীর মতে যাত্রার তারিখ ১১ই মে (৫১০ পৃঃ), বাঙ্গলা জীবনী (৬৬৭ পৃঃ) ও উদ্ধৃত ৫ই মের পত্র অনুসারে উহা ৬ই মে। তিনি সম্ভবতঃ ১১ই মে আলমোড়ায় পৌছিয়াছিলেন।

তিনি স্বামীজীর যাত্রার পূর্বেই গুডউইনের সহিত আলমোড়ায় গিয়াছিলেন। আলমোড়াবাসীরা স্বামীজীর তথায় আগমনের সম্ভাবনা জানিয়া বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিল এবং স্বামীজীকে সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল। ইহাতে স্বামীজীরও তথায় যাওয়ার আগ্রহ বিশেষ বর্ধিত হইয়াছিল।

আলমোড়া যাইবার পথে লক্ষ্ণৌ নগরে তাঁহার অনুরাগী বন্ধু ও ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তিনিও সেখানে একদিন বিশ্রাম উপভোগ করিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে ট্রেনে হিমালয়-পাদবর্তী কাঠগোদাম স্টেশনে পৌছাইলে দেখা গেল, তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য গুডউইন আলমোড়া হইতে সেখানে আসিয়াছেন। স্বামী যোগানন্দ আলমবাজার হইতে স্বামীজীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কাঠগোদাম হইতে তিনি, গুডউইন এবং আরও কয়েকজন ভক্ত স্বামীজীর সঙ্গে আলমোড়ায় চলিলেন। আলমোড়ার সন্নিকটে লোদিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলে এক বিপুল জনসঙ্ঘ স্বামীজীকে জয়ধ্বনি সহ আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাইল। ইহারা স্বামীজীর জন্য একটি সুসজ্জিত অশ্ব লইয়া আসিয়াছিল; তাঁহাকে উহারই পৃষ্ঠে বসাইয়া সেই জনসমষ্টি শোভাযাত্রা সহকারে ও অবিরাম জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে নগরে লইয়া চলিল। নগরের গৃহদ্বারগুলি তখন দীপমালায় উদ্ভাসিত ও রাজপথ মাল্য-পতাকাদিতে সুশোভিত ছিল। বাজারের একাংশে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সুদৃশ্য চন্দ্রাতপবিমণ্ডিত একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ বিনির্মিত হইয়াছিল। ঐ মণ্ডপে যাইবার পথে শত শত পুরললনা তাঁহার মস্তকে পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখা গেল, প্রায় পাঁচ সহস্র ব্যক্তি সেখানে সমবেত হইয়াছেন। স্বামীজী নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে পণ্ডিত জ্বালাদত্ত যোশী হিন্দীতে একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। পরে লালা বদ্রী-শার পক্ষ হইতে পণ্ডিত হরিরাম পাণ্ডে আর একখানি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। তারপর তৃতীয় আর একজন পণ্ডিত সংস্কৃতে এক অভিনন্দন পাঠ করিলেন।[২]

ঋষিমুনিদের বাসভূমি, অধ্যাত্মসম্পদ ও ভাবরাশিতে পরিপূর্ণ গিরিরাজ

২। স্বামীজীর প্রাণরক্ষক ফকিরের কথা ১ম খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠায় আছে। ফকিরকে সভাস্থলে উপস্থিত দেখিয়া স্বামীজী তাহাকে কাছে ডাকিয়া সকলের নিকট পূর্ববৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের 'স্মৃতিকথা'র মতে স্বামীজী বদ্রী-শার বাড়ীতে থাকাকালে ঐ ফকিরকে রাস্তায় দেখিতে পান এবং ছুটিয়া গিয়া তাহাকে দুইটি টাকা দেন (৩১৭ পৃঃ)।

হিমালয়ের সহিত স্বামীজীর একটা আবাল্য নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং অভিনন্দনের উত্তর দিতে গিয়া তিনি হিমালয়েরই গুণকীর্তন করিলেন এবং সেখানে আশ্রমস্থাপনের একান্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন: "আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে-স্বপনে যে ভূমির বিষয় ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্বতীদেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি যেখানে ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু ব্যক্তি জীবন-সন্ধ্যায় আসিয়া শেষ অধ্যায় সমাপ্ত করিতে অভিলাষী হয়। ·· ইহাই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি। ···আমার মাথায় এখন হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে; আর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটি এই সার্বভৌম ধর্মশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে কেন নির্বাচিত করিয়াছি, তাহাও সম্ভবতঃ তোমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ইতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র চাইই চাই। এই কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিস্তব্ধতা, শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে; আর আমি আশা করি, একদিন না একদিন আমি ইহা কার্যে'পরিণত করিতে পারিব।"

ঐ সময় স্বামী শিবানন্দ আলমোড়ায় তপস্যায় নিরত ছিলেন; তিনিও স্বামীজীর সহিত মিলিত হইলেন। স্বামীজীর সহিত আর যেসকল গুরুভ্রাতা বা শিষ্য আলমোড়ায় আসিয়াছিলেন, কিংবা পরে তথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, অথবা কিয়দ্দিবস পরে উত্তরভারত-ভ্রমণকালে তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম: স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—ইঁহারা সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য; আর ছিলেন স্বামী সদানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ (বুড়ো), স্বামী শুদ্ধানন্দ, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল ও শ্রীযুক্ত জে. জে. গুডউইন—ইঁহারা স্বামীজীর বা তাঁহার গুরুভ্রাতাদের শিষ্য। আর্যসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক স্বামী অচ্যুতানন্দও এককালে স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন; ইনি পূর্বোক্ত কোন দলেরই ছিলেন না, শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘভুক্তও ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে যখন যাঁহারা আলমোড়ায় থাকিতেন স্বামীজী তাঁহাদের লইয়া হাসি-খুশির মধ্যে দিন কাটাইতেন। ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে ও নষ্ট স্বাস্থ্য পুনর্লাভের আশায় তিনি দীর্ঘপথ অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন। ২৯শে

যে তিনি তাঁহার কলিকাতার চিকিৎসক ডাঃ শশিভূষণ ঘোষকে লিখিয়াছিলেন, "আমি সকাল-বিকালে ঘোড়ায় চড়ে যথেষ্ট ব্যায়াম করতে শুরু করেছি এবং তার ফলে সত্যই অনেকটা ভাল বোধ করছি।" আলমোড়ায় পৌছিয়া কিছুদিন শহরে কাটাইবার পর তিনি সেখানে গরম বোধ করিয়া বিশ মাইল দূরবর্তী অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গা দেউলধার (বা দেওধার)[৩] নামক স্থানে লালা চিরঞ্জীলাল-শার একটি বাগানে চলিয়া যান। সেখানে প্রচুর ফল, বিশেষতঃ খোবানি থাকায় তিনি ঐগুলি খাইতেন এবং নৈনিতাল হইতেও অন্যজাতীয় ফল আনাইতেন। এই সব সংবাদ দিয়া তিনি ডাক্তারবাবুকে সর্বশেষে লিখিলেন: "বর্তমানে আমি নিজেকে খুবই বলবান বোধ করছি! ডাক্তার, আমি যখন আজকাল তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের সম্মুখে ধ্যানে বসে উপনিষদ্ থেকে আবৃত্তি করি—'ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ, প্রাপ্তস্য হি যোগাগ্নিময়ং শরীরম্'[৪]—সেই সময় যদি তুমি আমায় দেখতে! রামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতার সভাগুলি বেশ সাফল্য লাভ করছে জেনে খুব সুখী হয়েছি; এই মহৎ কার্যের সহায়ক যাঁরা, তাঁদের সর্বপ্রকার কল্যাণ হোক!"

বস্তুতঃ শরীরের অপটুতার জন্য বাধ্য হইয়া হিমালয়-শৃঙ্গে বিজন ফলোদ্যানে দিন কাটাইলেও তিনি আরব্ধ কার্যের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করেন নাই; সেখানে বসিয়াও ঐ সব বিষয়ে ভাবিতেন ও অপরকে পরামর্শ দিতেন। ২০শে মে তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত পত্রে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। দেখা যায়, তখন তিনি কলিকাতার সন্নিকটে স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কথা ভাবিতেছেন; মুর্শিদাবাদ জেলায় পরিচালিত দুর্ভিক্ষ-সেবার কার্যধারা সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেছেন; মাদ্রাজে আরব্ধ কার্যের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহায়কের কথা চিন্তা করিতেছেন ও এইরূপ বহু ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। পূর্বোক্ত উদ্যানে তখন তিনি সেবকগণসহ অনেকটা নির্জনবাস করিতেন এবং অপর সঙ্গীরা শহরে থাকিতেন বলিয়াই মনে হয়; অন্ততঃ ১লা জুন তারিখের পত্রে ইহাই পাওয়া যায়। তবে মিস মূলার সম্ভবতঃ কিছুদিন ঐ নির্জন উদ্যানে ছিলেন। মেরীকে লিখিত স্বামীজীর ২রা জুনের পত্রে আছে:

৩। আলমোড়া হইতে বাগেশ্বর যাইবার রাস্তায় উহা মোটর রোডে ৩০ মাইল দূরে; হাঁটা-পথে আরও কাছে। বিন্‌সার ছাড়াইয়া যাইতে হয়।

৪। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২।১২

"আলমোড়ার কোন ব্যবসায়ীর একটি চমৎকার বাগানে আছি···। পরশু রাত্রে একটি চিতাবাঘ এই বাগানে এসে পাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেছে। ···মিস মূলারকে তোমার মনে পড়ে কি? কয়েক দিন থাকবার জন্য তিনি এখানে এসেছেন, কিন্তু চিতাবাঘের বৃত্তান্তটি শুনে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন।"

দেউলধারের বাগানে কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া তিনি ১৯শে জুন আলমোড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিজের মতে তিনি তখন বেশ সুস্থ বোধ করিতে-ছিলেন, যদিও সঙ্গীরা ঠিক ততটা মনে করিতেন না। আলমোড়ায় থাকা-কালে তিনি স্থানীয় ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন, এবং দেশী ও বিদেশী বহু বন্ধুকে পত্র লিখিয়া বিভিন্ন প্রকারে ভাবী কার্য সম্প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেন। অবশ্য তখন তিনি ভারতে ছিলেন বলিয়া ভারতীয় কার্যের কথাই প্রধানতঃ মনে আসিত; আর এই বিষয়ে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ছিল: "ভারতে বক্তৃতা ও অধ্যাপনায় বেশী কাজ হবে না; প্রয়োজন সক্রিয় ধর্মের।" (৪ঠা জুলাই-এর পত্র)। এই হিসাবেই তিনি ১৫ই জুন দুর্ভিক্ষ-সেবানিরত স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "কর্ম, কর্ম, কর্ম—হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গ্‌তে হেঁ।···হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে—মস্তিষ্ক নয়। পুঁথিপাতড়া, বিদ্যেসিদ্যে, যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান—প্রেমেই অনিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো—নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা-কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে'।[৫] এই তো আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ—পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না?"

স্বামীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে আলমোড়ায় আসিয়াছিলেন; এই জন্য শীতল আবহাওয়ার যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি আবশ্যক ছিল মানসিক শান্তির। নগাধিরাজ হিমালয়ের কল্যাণে প্রথমটি তাঁহার পক্ষে সুলভ হইলেও স্বদেশ ও বিদেশে একদল লোক দ্বিতীয়টি দিতে নারাজ ছিলেন, এবং তজ্জন্য প্রকাশ্যে না হইলেও ব্যক্তিগতভাবে স্বামীজীকে এই বিষয়ে একটু মনোযোগ দিতে হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডে 'জাতের বড়াই' অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি; সুতরাং পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঐ সময়ে মেরীকে লিখিত এক পত্র মধ্যে (৯ই জুলাই) তাঁহার নবযুগের বাণী বাহিরের আঘাতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে: "আমি বুঝতে পারছি—আমার কাজ শেষ

৫। কেনোপনিষদ্, ১।৫

হয়েছে। জোর তিন-চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের প্রার্থনা কখনও করিনি। আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ প্রবলভাবে চালু হয়ে গেছে; আর এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমবো। আর নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান, এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পুজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য, পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ। এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।" আলমোড়ায় এই ভাবে দিন কয়েক কাটাইয়া তিনি পুনর্বার ১১ই জুলাই দেউলধারে গমন করিলেন। সেভিয়ার-দম্পতি তখন সিমলায়, মিস মুলার আলমোড়ায় ও গুডউইন মাদ্রাজে।

স্বামীজীর সমসাময়িক একখানি পত্রে তাঁহার স্বভাবসুলভ নির্ভীক নিরাবরণ সত্যবাদিতার পরিচয় পাই। শ্রীমতী ম্যাকলাউড ভারতে আসিতে চাহিয়াছিলেন; স্বামীজী তাঁহাকে এই জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেও ভারতীয় অবস্থা ও উহার সহিত পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রার মানের সম্পূর্ণ পার্থক্য সম্বন্ধে ১০ই জুলাই-এর পত্রে এমন নিখুঁত নিরাবরণ একখানি চিত্র দিলেন, যাহা শুধু স্বামীজীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। অনুরাগী ভক্ত তিনি চাহিতেন, কিন্তু মিথ্যা আশার ছলনায় নহে: "যেমন করেই হোক, তুমি এসে পড়; শুধু এইটুকু মনে রেখো – ইওরোপীয়দের ও হিন্দুদের বসবাসের ব্যবস্থা যেন তেল-জলের মতো; নেটিভদের সঙ্গে মেলামেশা করা ইওরোপীয়দের পক্ষে সর্বনেশে ব্যাপার।...সর্বত্রই ময়লা ও নোংরা— আর সব 'কালা আদমী'। কিন্তু তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করবার মতো লোক ঢের পাবে।" নিবেদিতার ভারতাগমনের পূর্বে তিনি তাঁহাকেও ঠিক এইভাবেই বা স্পষ্টতররূপে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। বলা বাহুল্য, এইরূপ জানিয়া-শুনিয়াও এই মহাপ্রাণা মহিলাদ্বয় ভারতে আসিয়া ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এই সময়ের আর একটি ঘটনায় স্বামীজীর উদার সেবাপ্রবণতার পরিচয় পাই। মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলা গ্রামে তখন রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে যে দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য চলিতেছিল, উহার প্রথমাবস্থায় মিশনের হস্তে আবশ্যক অর্থ না

থাকায় কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হইতে কিছু (১৫০৲) অর্থসাহায্য করা হয়। পরে সোসাইটি দাবী করেন যে, এই কার্য সোসাইটির নামে পরিচালিত হওয়া উচিত। এই বিষয়ে উভয় সংস্থার মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং বিষয়টি স্বামীজীকে জানানো হয়। তখন উহার সমাধানকল্পে স্বামীজী লিখিয়া পাঠান : "হুজুরদের নামের জ্বালায় কি গরীবগুলো শুকিয়ে মরবে? সব নাম 'মহাবোধি' নেয় তো নিক, গরীবদের উপকার হোক। কাজ বেশ চলছে—উত্তম কথা।" (১৩ই জুলাই-এর পত্র)। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মহাবোধির নাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নাই। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও দক্ষিণদেশীয় ভক্তেরা যথেষ্ট টাকা তুলিয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং অন্যান্য স্থান হইতেও টাকা আসিল ; তাই রামকৃষ্ণ মিশনের নামেই কার্য পরিচালিত হইল।

ঐ চিঠিতে স্বামীজী কাশীপুরের উদ্যানবাটীটি ক্রয় করিয়া উহাতে মঠস্থাপনের আগ্রহও প্রকাশ করিয়াছিলেন : "ও বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত স্মৃতি জড়িত ; বাস্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ।" এখানেই ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় লীলার শেষ দিনগুলি কাটাইয়াছিলেন এবং এখানেই লীলাসংবরণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সে অভিলাষ তখনই পূর্ণ না হইলেও দীর্ঘকাল পরে পূর্ণ হইয়াছিল।

ক্রমে তাঁহার আলমোড়া-ত্যাগের দিন ঘনাইয়া আসিল। তাঁহার বিদায় আসন্নপ্রায় জানিয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ তাঁহার বক্তৃতাশ্রবণের আগ্রহ জানাইলেন। এদিকে আলমোড়া-প্রবাসী ইংরেজরাও নিজেদের ইংলিশ-ক্লাবে তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্বল্পায়তন ক্লাব-ভবনে একশতের অধিক শ্রোতার স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব জানিয়া স্থির হইল যে, স্থানীয় মধ্য (ইণ্টার) মহাবিদ্যালয়ে হিন্দীতে একটি ভাষণ ও ক্লাবে ইংরেজীতে আর একটি ভাষণ হইবে।

হিন্দী বক্তৃতা শ্রবণের জন্য শহরের গণ্যমান্য ও সুশিক্ষিত প্রায় চারিশত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী হিন্দীভাষায় বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত ছিলেন না ; এবং এরূপ সন্দেহও উপস্থিত হইয়াছিল যে, সাধারণতঃ তিনি যেসব গভীর তত্ত্ব লইয়া আবেগভরে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়া থাকেন, হিন্দীভাষার মাধ্যমে ঐরূপ করা সম্ভব হইবে কিনা। কিন্তু স্বামীজী প্রথমে মন্থরগতিতে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই বিষয়ের গুরুত্বের আকর্ষণে ভাষার দৈন্যগত অপটুতা

অতিক্রম করিয়া উঠিলেন ও সুললিত ওজস্বিনী ভাষায় অবলীলাক্রমে বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন, ভাষাটি যেন তাঁহার হস্তে এক প্রাণচঞ্চল যন্ত্ররূপে যথেচ্ছ পরিচালিত হইয়া স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে। স্থানে স্থানে তিনি নূতন শব্দ প্রণয়নপূর্বক স্বীয় ভাবের ব্যঞ্জনা ও পুষ্টিসাধন করিতেছিলেন। যাঁহাদের ধারণা ছিল, স্বামীজী এই নবীন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন না, তাঁহারাও তাঁহার প্রাঞ্জল ও অনর্গল বক্তৃতা শুনিয়া স্বীকার করিলেন যে, শক্তিমান পুরুষের পক্ষে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে; এমনকি, যাঁহাদের মনে এরূপ সন্দেহ ছিল যে, হিন্দীভাষা গুরুতর বিষয়ের ব্যাখ্যাকল্পে তখনও ব্যবহৃত হইবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই, তাঁহাদেরও সংশয় দূরীভূত হইল। শুধু তাহাই নহে, কেহ কেহ এমনও বলিলেন, "তিনি তাঁহার বক্তৃতাদ্বারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দীভাষার মধ্যে এমন যথেষ্ট উপাদান আছে, যদবলম্বনে ঐ ভাষার অচিন্তিতপূর্ব উন্নতিসাধন করিয়া তাহাকে ওজস্বিনী বক্তৃতার উপযোগী করা যাইতে পারে।"

ইংলিশ-ক্লাবের বক্তৃতায় স্থানীয় সকল ইংরেজই উপস্থিত ছিলেন। গোর্খা রেজিমেণ্টের অধিনায়ক কর্নেল পুলি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ডাঃ হ্যামিল্টন, ডেপুটি কমিশনার মিঃ গ্রেসী ও তাঁহার পত্নী, কর্নেল হ্যারিসনের পত্নী, মিঃ ও মিসেস হুইশ লার্কিন ও ম্যাকফার্লন, মিঃ স্প্রাই, লালা বদ্রী-শা, লালা চিরঞ্জীলাল-শা, জ্বালাদত্ত যোশী, স্বামীজীর অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রবীণ প্রধান নাগরিকগণ সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক'। স্বামীজী প্রথমে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে উপজাতীয় দেবোপাসনার উৎপত্তি ও ঐসব দেবতার নামে দিগ্বিজয়ের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া বেদের সংঘর্ষ-বিহীন দেবোপাসনায় আসিয়া পড়িলেন। অতঃপর বেদে কি আছে, বেদের উপদেশ কি, ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদানান্তে আত্মতত্ত্ব-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর পাশ্চাত্ত্য জগৎ কিরূপে বাহ্য-জগতের বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণাদির সাহায্যে জীবনের সর্বপ্রকার গুরুতর সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়, এবং প্রাচ্য জগৎ বহির্জগতে অন্তর্জগতের সমস্যারাশির সমাধান না পাইয়া অন্তর্জগতেই উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়—এই বিষয়টি তুলনার দৃষ্টিতে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—হিন্দুজাতিই এই অন্তর্জগৎ-অনুসন্ধান-প্রণালীর আবিষ্কর্তা; ইহাই এই জাতির বিশেষ সম্পত্তি, আর একমাত্র ঐ

প্রণালীর সহায়তাতেই তাহারা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতারূপ মহারত্ন আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগৎকে উহা প্রদান করিয়াছে। আরও অগ্রসর হইয়া স্বামীজী আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ ও উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী হেনরিয়েটা মূলার ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য বোধ হইল, যেন আচার্য, তাঁহার বাণী, শ্রোতৃবৃন্দ ও সকলের মধ্যে অনুস্যূত ভাবরাশি সব এক হইয়া গিয়াছে—যেন 'আমি', 'তুমি', 'উহা', 'ইহা' এই ভেদবোধ আর নাই। যেসকল বিভিন্ন ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন সেই কয়েক মুহূর্ত আচার্যবরের দেহনিঃসৃত আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃপ্রবাহে আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। যাঁহারা স্বামীজীর বক্তৃতা অনেকবার শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ অনুভূতি তাঁহাদের নিকট নূতন নহে। তাঁহারা জানেন, মধ্যে মধ্যে এমন দুই-একটা মুহূর্ত আসে, যখন আর এমন বোধ থাকে না যে, তিনি অবহিতচিত্ত দোষগুণ-সমালোচক শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতাকারী স্বামী বিবেকানন্দ; সে সময়ে সব ভেদবুদ্ধি ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ক্ষণকালের জন্য তিরোহিত হয়, নামরূপ উড়িয়া যায়, কেবল থাকে একমাত্র চৈতন্য সত্তা—যাহাতে বক্তা বাক্য ও শ্রোতা এক হইয়া মিশিয়া যায়।"

দার্জিলিং ও আলমোড়ার স্বাভাবিক জলবায়ুর গুণে, বন্ধুবান্ধবের যত্নে ও বিশ্রামের ফলে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হইল। হয়তো আরও বিশ্রাম উপভোগ করিলে স্থায়ী ফললাভ হইত; কিন্তু যে স্বামীজী লোককল্যাণসাধনকে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে দীর্ঘ কাল চুপ করিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। আলমোড়া হইতে নামিবার অনেক আগেই ১৫ই জুন তারিখে তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "আমি শীঘ্রই সমতলে নাবছি। বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব; এখানে মেয়ে-মানুষের মতো বসে থাকা কি আমার সাজে?"

অবশ্য একেবারে চুপ করিয়া থাকা কোন কালেই তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা দেখিয়াছি, এই সময়েও তিনি সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত কর্মকেন্দ্রগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন। ঐ সময়ে কি কি কার্য চলিতেছিল, তাহার আভাস দিতে গিয়া তিনি মিস নোবলকে (ভগিনী নিবেদিতাকে) ২৩শে জুলাই লিখিয়াছিলেন, "কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্তমানে দুর্ভিক্ষ-নিবারণই আমাদের কাছে প্রধান কর্তব্য। কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং কাজ চলছে—দুর্ভিক্ষ-

সেবা, প্রচার ও সামান্য শিক্ষাদান। এখন পর্যন্ত অবশ্য খুব সামান্যভাবেই চলছে; যেসব ছেলেরা শিক্ষাধীন তাদের সুবিধামত কাজে লাগানো হচ্ছে। বর্তমানে মাদ্রাজ ও কোলকাতাই আমাদের কাজের জায়গা।...কলম্বোতেও একজন গেছে।" এই কলম্বোর কাজের সংবাদটি নূতন। ঐ কালে স্বামীজীর অনুরোধে স্বামী শিবানন্দ কলম্বোয় গিয়া বেদান্ত-প্রচারে নিরত হন এবং ছয় মাস কাল সেখানে ঐ কার্যে নিযুক্ত থাকেন।

এদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আহ্বান আসিতে লাগিল, স্বামীজী যাহাতে সেসব অঞ্চলে গিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি নিজেও তাহাই চাহিতেছিলেন; কিন্তু সম্ভবতঃ বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে বর্ষারম্ভে সমতলভূমি একটু শীতল না হওয়া পর্যন্ত নামা সম্ভব হইতেছিল না। তিনি হয়তো ২৩শে জুলাই-এর পূর্বেই দেউলধার হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ তারিখের পত্রে আছে: "আমি এখন পাহাড় থেকে সমতলের দিকে চলেছি।" পত্রখানির ঠিকানা আলমোড়া। আলমোড়া ছাড়িতে আরও কয়েক দিন বিলম্ব হইয়াছিল। সেখান হইতে লিখিত ২৫শে জুলাই-এর পত্রে আছে: "কয়েক দিন বাদেই আমি সমতলে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে যাব—এই পর্বতের পশ্চিম খণ্ডে। সমভূমিতে যখন একটু ঠাণ্ডা পড়বে, তখন দেশময় একবার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াব—দেখব কি পরিমাণ কাজ করা যায়।" স্বয়ং প্রচারে ব্যস্ত থাকিলেও, সঙ্গে সঙ্গে গঠনমূলক কার্যও চলিতে থাকুক, ইহা তিনি চাহিতেন; তাই আলমোড়া হইতে ৩০শে জুলাই তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিয়াছিলেন, তিনি যাহাতে অনাথ বালকদের সেবায় ব্রতী হন। ঐ পত্রে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, পরবর্তী সোমবারে (?) (২রা আগস্ট) তিনি আলমোড়া ত্যাগ করিবেন। আলমোড়ার বক্তৃতা দুইটি এই সময় মধ্যেই হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা চলে; কারণ ঐ পত্রেই আছে: "এখানে একটি—সাহেবমহলে—বক্তৃতা হয়েছিল, ও একটি দেশী লোকদিগকে হিন্দীতে। হিন্দীতে আমার এই প্রথম, কিন্তু সকলের তো খুব ভাল লাগল। আগামী শনিবার (৩১শে জুলাই) আর একটি বক্তৃতা ইংরেজীতে—দেশী লোকের জন্য।" জীবনীগুলিতে যদিও দুইটি বক্তৃতার কথা আছে, তবু এই পত্রাংশ হইতে মনে হয়, স্বামীজী তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পত্রে আর একটি সংবাদ আছে: "এখানে একটি বৃহৎ সভা স্থাপন করা গেল—ভবিষ্যতে কতদূর কার্য হয় দেখা যাক। সভার উদ্দেশ্য বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া।"

সর্বশেষে নিজের ভ্রমণধারা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন: "সোমবার বেরিলী-যাত্রা, তারপর সাহারাণপুর, তারপর আম্বালা, সেখান হইতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের সঙ্গে বোধ হয় মস্থরী, আর একটু ঠাণ্ডা পড়লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদি।"

দেউলধার ও আলমোড়ার নিকট বিদায় গ্রহণের পূর্বে আরও দুইটি ঘটনা বলা আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রথমে স্বামীজীর স্বমুখ-কথিত একটি ভৌতিক বা দেবাবেশের ঘটনার বিবরণ দিতেছি। উহার স্থান-কাল জানা না থাকিলেও, অনুমান করা যায়, উহা দেউলধারের নিকটে সংঘটিত হয়। বিবরণটি এই: স্বামীজী হিমালয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে একবার কোন পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পরে মাদলের খুব বাজনা শুনিয়া তিনি বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, গ্রামের কোন লোকের উপর 'দেবতার ভর' হইয়াছে। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, একখানি কুঠার আগুনে লাল করিয়া উপদেবতাবিষ্ট ঐ ব্যক্তির গায়ে স্থানে স্থানে ছ্যাঁকা দেওয়া হইতেছে, চুলেও লাগানো হইতেছে অথচ গা বা চুল পুড়িতেছে না, তাহার মুখেও কোন কষ্টের চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। এমন সময় গাঁয়ের মোড়ল (প্রধান) স্বামীজীর নিকট আসিয়া করজোড়ে বলিল, "মহারাজ, আপনি দয়া করে এর ভূতাবেশ ছাড়িয়ে দিন।" দশজনের অনুরোধে স্বামীজীকে অগত্যা ঐ ভূতাবিষ্ট লোকটির কাছে যাইতে হইল; গিয়াই মনে হইল, একবার কুঠারখানি পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল। কুঠারখানি তখন কালো হইয়া গিয়াছে; তবু স্বামীজী যাই হাতে ধরিয়া পরীক্ষা করিতে গেলেন, অমনি হাত পুড়িয়া গিয়া দারুণ যন্ত্রণা হইতে থাকিল। 'থিওরি-মিওরি' তখন সব উড়িয়া গেল; ঐ যন্ত্রণা লইয়াই লোকটির মাথায় হাত রাখিয়া তিনি খানিকক্ষণ জপ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ঐরূপ করার দশ-বার মিনিটের মধ্যেই লোকটি সুস্থ হইয়া গেল, আর উপস্থিত সকলের মন স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। স্বামীজী নিজে কিন্তু ব্যাপারখানা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আশ্রয়দাতার সহিত বাসস্থানে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি বারটায় শয্যাগ্রহণ করিলেন। কিন্তু হাতের জ্বালায় ও ঐ অদ্ভুত ঘটনার কোন কুল-কিনারা করিতে পারিলেন না ভাবিয়া সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। ('বাণী ও রচনা', ৯।৮৫-৮৬)।

আলমোড়ার একটি প্রধান ঘটনা দেশপ্রেমিক নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তের সহিত সাক্ষাৎকার। বহুপুর্বে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে অশ্বিনীবাবু শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে ঠাকুরেরই উপস্থিতিতে নরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন নরেন্দ্রের শিরঃপীড়ার জন্য আলাপ হয় নাই। অশ্বিনীবাবু তখন বলিয়াছিলেন, "থাক, আর একদিন আলাপ হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ছিল, ইঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; উহা পুর্ণ হইল বার বৎসর পরে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে কি জুন মাসে আলমোড়ায় ('কথামৃত', ১ম ভাগ, পরিশিষ্ট)। অশ্বিনীবাবু লিখিয়াছিলেন: "ঠাকুরের ইচ্ছা তো পুর্ণ হতেই হবে, তাই বার বচ্ছর পরে পুর্ণ হইল। আহা! সেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ায় কটা দিন কত আনন্দেই কাটাইয়াছিলাম! কখনও তাঁর বাড়ীতে, কখনও আমার বাড়ীতে, আর একদিন নির্জনে তাঁকে নিয়ে একটি পর্বতশৃঙ্গে। আর তাঁর সঙ্গে পরে দেখা হয় নাই।" (ঐ)।

ইংরেজী জীবনীতে এই সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ আছে (৫৭৪-৭৭ পৃঃ)। অশ্বিনীবাবু তখন আলমোড়ায় ছিলেন এবং খবরের কাগজে পড়িয়াছিলেন যে, স্বামীজীও সেখানে আছেন। কিন্তু বাড়ীর ঠিকানা কেহ জানিত না। অশ্বিনীবাবুর পাচক শুধু এইটুকু বলিল যে, শহরে এক অদ্ভুত সাধু আছেন, যিনি ইংরেজী জানেন ও ঘোড়ায় চড়েন। অশ্বিনীবাবুকে আর বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল না যে, ইনিই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। অতএব তিনি তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। তবে বাড়ীর কাছে আসিয়াও ঠিক কোন বাড়ী বুঝিতে পারিলেন না, এবং অপরদের নানাভাবে প্রশ্ন করিয়াও সমুচিত উত্তর পাইলেন না। অবশেষে বাঙ্গালী সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে একজন পথচারী বলিল, "আপনি ঘোড়সওয়ার সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করছেন? ঐ তিনি ঘোড়ায় চড়ে আসছেন, তাঁর বাড়ী ঐখানে।" অশ্বিনীবাবু দূর হইতে দেখিলেন, গৈরিক-পরিহিত সন্ন্যাসী গেটে উপস্থিত হইলে একজন ইংরেজ[৬] গেট খুলিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং স্বামীজী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন।

একটু পরেই অশ্বিনীবাবু সেখানে আসিয়া একজন যুবক সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন্দ্রনাথ দত্ত আছেন? দেখা করব।" যুবক উত্তেজিত স্বরে

৬। ঐ জীবনীর মতে ঘটনাস্থল সেভিয়ারদের ভাড়া-বাড়ী; কিন্তু সেভিয়ার তখন (১৮৯৭-জুন) আলমোড়ায় ছিলেন না। অশ্বিনীবাবুর বিবরণে যে ইংরেজের উল্লেখ আছে, তিনি গুডউইন।

বলিলেন, "নরেন্দ্রনাথ এখানে কেউ নেই।" অশ্বিনীবাবু পরমহংসদেবের নরেন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছেন ইহা যুবকের পক্ষে জানার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সমঝদার স্বামীজী কৌতূহলী হইয়া ভিতর হইতে তারস্বরে ডাকিলেন, "আছেন, আসুন।" অশ্বিনীবাবু নিজের নাম বলিলেন, অমনি গাঢ় আলিঙ্গন হইল। ততক্ষণ একজন শিষ্য হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্বামীজীর পায়ের বুট খুলিয়া দিতেছিলেন। আলাপ আরম্ভ হইলে দেখা গেল, ঠাকুর যে পূর্বে কথা বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাথাধরার জন্য তাহা হয় নাই, সেই কথাটিও স্বামীজীর মনে আছে। অশ্বিনীবাবু তাঁহাকে স্বামীজী বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "সে কি, আপনার কাছে কখন আবার স্বামী হয়ে উঠলুম? আমি এখনও সেই একই নরেন্দ্র। ঠাকুর যে নামে আমাকে ডাকতেন, তা আমার কাছে পরম সম্পদ ; ঐ নামেই ডাকবেন।

অশ্বিনীবাবু—"আপনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে লক্ষ লক্ষ প্রাণে আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগিয়েছেন। আমায় বলতে পারেন, ভারতের মুক্তি হবে কোন্ পথে?"

স্বামীজী—"ঠাকুরের কাছে আপনি যা শুনেছেন, তার বেশী আমার কিছু বলবার নেই—ধর্ম আমাদের জীবনের খাঁটি মর্ম কথা, জনগণ সকাশে কোন সমাজ-সংস্কার গ্রহণীয় হতে হলে তাকে ধর্মের ভেতর দিয়ে আসতে হবে। উলটো কিছু করার মানে গঙ্গাকে ঠেলে হিমালয়ে ফিরিয়ে নেওয়া ও আবার নূতন খাতে প্রবাহিত করা।"

অশ্বিনীবাবু—"কিন্তু কংগ্রেস যা করছে তাতে কি আপনার আস্থা নেই?"

স্বামীজী—"না, তা নেই ; তবে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। তা ছাড়া ঘুমন্ত জাতিকে জাগাবার জন্য সব দিক থেকে ঠেলা দেওয়া ভাল। আপনি আমায় বলতে পারেন, কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য এ পর্যন্ত কি করেছে?[৭] আপনি কি মনে করেন যে, গোটা কয়েক প্রস্তাব করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে? ওতে আমার আস্থা নেই। আগে তারা পেটভরে খেতে পাক, তারপর নিজেরাই নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নেবে। কংগ্রেস যদি তাদের জন্য কিছু করে তবেই কংগ্রেস আমার সহানুভূতি পাবে। সেই সঙ্গে ইংরেজদের গুণগুলিও আমাদের আপনার করে নিতে হবে।"

৭। গণজাগরণের কথা তখনও কংগ্রেসের নেতাগণ এমনভাবে ভাবেন নাই ; আর গঠনমূলক কাজও তখন আরম্ভ হয় নাই।

অশ্বিনীবাবু—"ধর্ম বলতে কি আপনি কোন মতবিশেষকে বোঝাতে চান?"

স্বামীজী—"ঠাকুর কি কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার করেছিলেন? তবে তিনি সর্বাত্মক সমন্বয়ের ধর্মরূপে বেদান্তের কথা বলেছিলেন; তাই আমিও তাই প্রচার করি। তবে আমার ধর্মের সার কথা শক্তি। যে ধর্ম প্রাণে শক্তিসঞ্চার করে না, তা আমার কাছে ধর্মই নয়—তা উপনিষদের, গীতার বা ভাগবতের যারই হোক। শক্তিই ধর্ম, শক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই।"

অশ্বিনীবাবু—"আমার কি করা উচিত বলুন।"

স্বামীজী—"শুনছি, আপনি কি একটা শিক্ষার কাজ নিয়ে আছেন; ঐ হল আসল কাজ। আপনার মধ্যে একটা বিরাট শক্তি কাজ করছে, আর জ্ঞানদান হচ্ছে একটা মস্ত কাজ। কিন্তু দেখবেন, জনসাধারণের মধ্যে যেন মানুষ-গড়ার শিক্ষা বিস্তার পায়। তার পরের কাজ হল চরিত্র গড়ে তোলা। আপনার ছাত্রদের চরিত্র বজ্রদৃঢ় করে তুলুন। বাঙ্গালী যুবকদের হাড় থেকেই তৈরী হবে সে বজ্র, যা ভারতের দাসত্বকে চূর্ণ করবে। জনকয়েক তৈরী ছেলে আপনি আমায় দিতে পারেন? তাহলে পৃথিবীটাকে বেশ একটা নাড়া দিয়ে যেতে পারি।

"আর যেখানেই শুনবেন রাধাকৃষ্ণের কীর্তন চলছে, সেখানে ডাইনে বামে চাবকাবেন। সারা জাতটা পচে ধ্বসে যাচ্ছে। যাদের এতটুকু আত্মসংযম নেই তারা কিনা এসব গানে মাতে! এতটুকু অপবিত্রতা থাকলেও এসবের মধ্যে যে উচ্চ আদর্শ আছে, তার ধারণা করতে পারা যায় না। ছেলেমি নাকি? আমরা তো অনেক নেচেছি কুঁদেছি, এখন একটু বিরাম দিলেও ক্ষতি নেই। এই ফাঁকে জাতিটা একটু শক্তিশালী হয়ে নিক।

"আর অচ্ছুত, মুচি, মেথর ও তাদের মতো সকলের কাছে গিয়ে বলুন, 'তোমরাই তো জাতের প্রাণ, তোমাদের মধ্যে এমন অসীম শক্তি আছে যে তা দুনিয়াকে উলটে দিতে পারে। ওঠ, বাঁধন ঝেড়ে ফেল—দেখবে, সারা দুনিয়া তোমাদের দেখে অবাক্ হয়ে যাবে।' তাদের মধ্যে স্কুল বসান, আর তাদের গলায় পৈতে ঝুলিয়ে দিন।"

স্বামীজীর প্রাতরাশের সময় উপস্থিত দেখিয়া অশ্বিনীবাবু বিদায় লইতে উঠিয়া বলিলেন, "একথা কি সত্যি যে, মাদ্রাজের ব্রাহ্মণরা যখন বলেছিলেন যে আপনি শূদ্র, আপনার বেদপ্রচারে অধিকার নেই, তখন আপনি বলেছিলেন,

'আমি যদি শূদ্র হই, তবে হে মাদ্রাজবাসী ব্রাহ্মণগণ, আপনারা পারিয়ারও অধম'?"

স্বামীজী—"হাঁ।"

অশ্বিনীবাবু—"আপনার মতো একজন ধর্মপ্রচারক ও সংযমী পুরুষের পক্ষে এরূপ বলা কি ঠিক হয়েছিল?"

স্বামীজী—"কে তা বলছে? আমি তো কখন বলিনি যে আমি ঠিক করেছিলাম। এসব লোকের অভদ্রতা দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই অমন কথা বেরিয়ে পড়েছিল। এ ছাড়া কিই বা করতে পারতাম; কিন্তু আমি নিজের পক্ষ সমর্থন করছি না।"

শুনিয়া অশ্বিনীবাবু স্বামীজীকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, "আজ আমার কাছে আপনার মান সব চেয়ে বেড়ে গেল। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি কেন বিশ্ববিজয়ী আর ঠাকুর কেন আপনাকে এত ভালবাসতেন।"

স্বামীজী আলমোড়া হইতে ৯ই আগস্ট বেরিলীতে পৌঁছাইয়া সেখানে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথবাবুর বাঙ্গলোতে আশ্রয় লইলেন।[৮] এখান হইতে আরম্ভ করিয়া সমভূমির কয়েকটি স্থলে তিনি যেসব আলাপ-আলোচনা বা বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন, তাহা প্রধানতঃ হিন্দীভাষায়। উহাদের শ্রুতিলিপি রক্ষিত না হওয়ায় বক্তব্য বিষয়গুলি জানা সম্ভবপর নহে। এইসব স্থলে তিনি সমাগত ভদ্রলোকদের সহিত তো আলাপ করিতেনই; সেই সঙ্গে তিনি স্থানীয় যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিতে সচেষ্ট থাকিতেন। ১০ই হইতে ১২ই তারিখ পর্যন্ত জ্বরে অতিশয় কষ্ট পাইতে থাকিলেও বেরিলীতে চারিদিন থাকার সুযোগে তিনি আর্যসমাজ-প্রতিষ্ঠিত অনাথালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন ও লোকদিগকে সনাতন ধর্মের উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনাইয়াছিলেন। এখানে আর্যসমাজের প্রাক্তন প্রচারক স্বামী অচ্যুতানন্দকে তিনি ১১ই আগস্ট তারিখে বলিয়াছিলেন, তিনি আর পাঁচ-ছয় বৎসরের অধিক মরজগতে থাকিবেন না। পূর্বেও লীলাসংবরণ সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ স্বামীজী জানিতেন এবং শরীরের অবস্থা দেখিয়াও বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি অল্পায়ু, রোগ

৮। 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী অচ্যুতানন্দের ১০ই আগস্ট হইতে ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত যে দিনলিপি মুদ্রিত আছে (৪৪৩-৫৯ পৃঃ), উহাতে বেরিলীর কথা আরম্ভ হইয়াছে ১০ই আগস্ট হইতে।

তাঁহার সম্পূর্ণরূপে সারিবে না, এবং এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তাঁহার আরব্ধ কার্য সমাপন করিতে হইবে—ভারত তথা নিখিল জগৎকে নবযুগের বাণী শুনাইতে হইবে ও উহাকে যথাসম্ভব বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইবে—অন্ততঃ রূপায়ণের উপযুক্ত পরিবেষ্টন প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং তাঁহার পরিশ্রম ও কষ্টের অবধি ছিল না। আর সে ভবিষ্যদ্বাণীও কতই না সত্য—১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তিনি মরদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বেরিলীর কার্য শেষ করিয়া তিনি ১২ই আগস্ট রাত্রি ১১টার ট্রেনে আম্বালায় গমন করিলেন। এখানে এক সপ্তাহ অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত সেভিয়ার পত্নীসহ সিমলা হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। এই সময়ে শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল থাকায় বন্ধুবান্ধবরা হর্ষান্বিত ছিলেন, আর তিনিও সমাগত সম্ভ্রান্ত নগরবাসীদের সহিত সানন্দে বিবিধ বিষয়ে আলাপ করিতেন। আগন্তুকদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের লোক থাকিতেন এবং আলাপও হইত অধ্যাত্ম তত্ত্ব, সামাজিক সমস্যা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতিক তুলনা, স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির উপায়, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে। স্বামীজীর জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা, তাঁহার উদার মত ও চিন্তার মৌলিকতা এবং সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি প্রসারিত যুক্তিভিত্তিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া সকলে প্রীত ও চমৎকৃত হইতেন। আর্যসমাজীদের সহিত আলোচনাকালে শাস্ত্র বিষয়ে বহু কূটতর্কেরও অবতারণা হইত ; স্বামীজী যথাযথ উত্তরদানে ইঁহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। এইরূপ বৈঠকী আলোচনায় তিনি নিজেও এত উৎসাহ পাইতেন যে, ১৭ই আগস্ট দ্বিপ্রহরে ভোজনের পর হইতে উদরে বেদনা অনুভব হইতে থাকিলেও সন্ধ্যার পর এক ক্ষুদ্র সভায় উপস্থিত হইয়া দেড় ঘণ্টা যাবৎ হৃদয়গ্রাহী ধর্মোপদেশ দিলেন। পরে রাত্রে অনাহারে কাটাইলেন। ১৬ই আগস্ট লাহোর কলেজের জনৈক অধ্যাপক এক ফনোগ্রাফ যন্ত্র আনিয়া স্বামীজীকে উহাতে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলে তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ১৯শে আগস্ট সকালে হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের প্রতীকস্বরূপ হিন্দু-মহমেডান স্কুল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। অতঃপর ভোজনান্তে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভদ্রলোকদের সহিত ও সন্ধ্যার পরে আর্যসমাজী উকিল দ্বারকানাথের সহিত আলাপ করেন। মোটের উপর আম্বালার দিনগুলি বেশ আনন্দপূর্ণ ও কর্মচঞ্চল ছিল। সেখান হইতে শেষ দিনে (১৯শে) তিনি

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছিলেন : "আমি এক্ষণে ধর্মশালার পাহাড়ে যাইতেছি। নিরঞ্জন, দীনু, কৃষ্ণলাল, লাটু ও অচ্যুত অমৃতসরে থাকিবে।" শ্রীযুক্তা ওলি বুল ভারতে আসিতে চাহেন জানিয়া স্বামীজী ঐ তারিখেই তাঁহাকে একখানি পত্র লিখেন। শ্রীমতী ম্যাকলাউডের সম্মুখে ভারতীয় জীবনের প্রকৃত চিত্র তুলিয়া ধরিয়া তিনি যেমন তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, অথচ আগমনের জন্যও সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, এই ক্ষেত্রেও তাহাই করিলেন : "ভাববেন যে, আপনারা যেন আফ্রিকার অভ্যন্তরে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছেন, তারপর যদি দৈবাৎ উৎকৃষ্ট কিছু পান তো সেটা আশাতিরিক্ত।"

২০শে আগস্ট পূর্বাহ্নে ধর্মশালাভিমুখে সেভিয়ার-দম্পতির সহিত যাত্রা করিয়া পথে অমৃতসরে মাত্র চারি-পাঁচ ঘণ্টার জন্য তোডরমল নামক জনৈক ব্যারিস্টারের গৃহে বিশ্রাম উপভোগ করিলেন। ধর্মশালায় তিনি সেভিয়ারদের সঙ্গে মাত্র সাত-আট দিন ছিলেন।[৯] পরে সেখান হইতে অমৃতসরে পুনরাবর্তন করিয়া ঐ নগরে দুই দিন থাকেন ও ৩১শে আগস্ট মেল ট্রেনে রাওলপিণ্ডি যাত্রা করেন। অমৃতসরে দুই দিন থাকার অবসরে তিনি শিখদের মন্দিরাদি দর্শন করেন ও মূলরাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান আর্যসমাজী নেতাদের সহিত বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন। রাওলপিণ্ডি স্টেশনে ডাক্তার ভক্তরামের ভ্রাতা বগি-গাড়ী প্রভৃতি লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু রাওলপিণ্ডিতে তাঁহার থাকা হইল না। শরীরের অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সেভিয়ার-দম্পতির সহিত তৎক্ষণাৎ টাঙ্গা-গাড়ীতে মারী স্বাস্থ্যাবাসাভিমুখে চলিয়া গেলেন। অপর সঙ্গীরা যথাকালে এক্কা-গাড়ীতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সকলে উকিল হংসরাজের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। এই স্থানের বাঙ্গালী অধিবাসীরা একদিন তাঁহাকে ভোজের জন্য আমন্ত্রণ করিলে তিনি উহা স্বীকার-পূর্বক তাঁহাদের গৃহে গেলেন এবং ধর্মসঙ্গীত শুনাইয়া ও উপদেশ দিয়া সকলকে কৃতার্থ করিলেন। মারীতে তিনি আসিয়াছিলেন সম্ভবতঃ ২রা সেপ্টেম্বর।

মারী হইতে স্বামীজী সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে ৬ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীর যাত্রা

৯। 'ভারতে বিবেকানন্দ'-এর ৪৪৫ পৃষ্ঠায় পনর দিন থাকার উল্লেখ থাকিলেও অত দিন হিসাবে পাওয়া যায় না। কারণ তিনি ২০শে আগষ্ট ধর্মশালায় যান ; ফিরিয়া দুই দিন অমৃতসরে থাকেন ও ৩১শে আগষ্ট রাওলপিণ্ডি যান।

করিলেন। সেভিয়ারদেরও ঐ সঙ্গে যাইবার কথা ছিল ; কিন্তু শ্রীযুক্ত[১০] সেভিয়ার অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাদের যাওয়া হইল না। তথাপি সুবিবেচক সেভিয়ার মহাশয় একখানি পত্রমধ্যে স্বামীজীকে ৮০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা। টাকা হাতে পাইয়া স্বামীজী চিন্তান্বিতভাবে পার্শ্ববর্তী এক বন্ধুকে বলিলেন, "আমরা ফকির ; এত টাকা লইয়া কি করিব, যোগেশ ? থাকিলেই খরচ হইয়া যাইবে। তার চেয়ে অর্ধেক লওয়া হউক, আর বাকি ফেরত দিই। ইহাতেই আমার ও আমার সঙ্গীদের ভ্রমণব্যয় নির্বাহ হইবে।" এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত সেভিয়ারের সহিত দেখা করিলেন ও অর্ধেক টাকা ফিরাইয়া দিলেন।

মারী হইতে টাঙ্গাযোগে ৮ই সেপ্টেম্বর বারামুল্লায় পৌছিয়া তাঁহারা টাঙ্গা ছাড়িয়া দিলেন এবং তখনই শ্রীনগরে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন। এই নৌভ্রমণটি নানা দিক হইতে খুবই আনন্দপ্রদ ছিল। ১০ই সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে পৌছিয়া তাঁহারা কাশ্মীর-রাজ্যের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় স্বভাবসুলভ অতিথিপরায়ণতার সহিত স্বামীজীর সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই সুযোগে নগরবাসীরাও তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ, প্রাণস্পর্শী, উদার ও সরল বাক্যালাপে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজ-প্রাসাদ দর্শনে উপস্থিত হইলে দুই জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁহাকে সাদর সংবর্ধনা জানাইলেন এবং তাঁহাদের একজন—ডাক্তার মিত্র—বলিলেন যে, রাজ-ভ্রাতা ও সেনাপতি রাজা রাম সিংহ পরদিবস তাঁহার দর্শন পাইতে উৎসুক হইয়াছেন। তদনুসারে তিনি পরদিবস মহারাজের ভ্রাতা রাম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; মহারাজ তখন জম্মুতে ছিলেন। রাম সিংহ স্বামীজীর প্রতি সমুচিত সম্মান-প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া স্বয়ং পাত্রমিত্রসহ নিম্নে উপবেশন করিলেন। সেখানে ধর্ম, হিন্দুদিগের বিবিধ সমস্যা ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ চিত্তাকর্ষক দুই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া রাম সিংহ বলিলেন, তিনি স্বামীজীর পরিকল্পনার রূপায়ণে যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন।

শ্রীনগরে বহু সাধু, পণ্ডিত, বিদ্যার্থী, রাজকর্মচারী ও সাধারণ জিজ্ঞাসু স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বাসভবনে আসিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রায়ই ধর্মালোচনা ও পরে সঙ্গীতাদি হইত। আলোচনা হইত হিন্দী বা ইংরেজীতে ;

১০। বাঙ্গলা জীবনীর মতে শ্রীযুক্তা (৬৮৮ পৃঃ) ; কিন্তু স্বামীজীর ১৩ই সেপ্টেম্বরের পত্র দ্রঃ।

কারণ সংশয়নিরসনার্থ যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা ছিলেন কাশ্মীরী বা পাঞ্জাবী। আগন্তুক সকলেই তাঁহার আলাপে সংশয়মুক্ত ও আনন্দিত হইতেন। একবার আসিয়া কাহারও সাধ মিটিত না ; জিজ্ঞাস্য না থাকিলেও শুধু তাঁহার শ্রীমূর্তিদর্শন ও মধুর আলাপ ও সঙ্গীত শ্রবণের জন্যও তাঁহাদের পুনঃপুনঃ আগমন হইত। স্বামীজীও ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এই সুন্দর নগরীতে প্রাকৃতিক চারু পরিবেশ ও সুশীতল আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া বেশ আনন্দ পাইতেন। ক্রমে রাজা অমর সিংহের উজীর তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন ও রাজাদেশে তাঁহার জন্য একখানি হাউস বোট ঠিক করিয়া দিলেন। স্বামীজী অতঃপর অবসর পাইলেই উহাতে আশ্রয় লইতেন এবং ইহাতে তাঁহার আনন্দ আরও বর্ধিত হইত। নৈসর্গিক সৌন্দর্যনিলয় কাশ্মীরের হ্রদবক্ষে নৌকায় বাস ও ভ্রমণ করার মধ্যে সত্যই একটা মাধুর্য ছিল। মধ্যে মধ্যে স্বামীজী নৌকারোহণে নিকটবর্তী স্থানগুলি দেখিতে যাইতেন, অথবা বাজারে বেড়াইতেন কিংবা যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। এইভাবেই ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি পানপুর নামক স্থানে গিয়া সেখানে কেশর-ক্ষেত দেখেন ও রাত্রিযাপন করেন। ২২শে তারিখে তিনি সুপ্রসিদ্ধ অনন্তনাগ নামক স্থানেও যান ও বিজবেহার মন্দির দেখিয়া আসেন। পরদিবস পদব্রজে মার্তণ্ড নামক স্থানে গমনপূর্বক স্থানীয় পণ্ডিতদের সহিত ধর্মালোচনা করেন। সে রাত্রি স্থানীয় বিশ্রামাগারে কাটাইয়া পরে ২৪শে সেপ্টেম্বর অচ্ছাবল (অক্ষয়বল) নামক স্থানাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে সাগ্রহে 'পাণ্ডবের মন্দির' নামে খ্যাত একটি সুপ্রাচীন মন্দির দেখাইয়া দিল। জনশ্রুতি এই যে, মন্দিরটি পাণ্ডবদিগের সমসাময়িক। স্বামীজী উহার অত্যাশ্চর্য নির্মাণকৌশল ও ভাস্কর্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন, উহা অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়া থাকিবে এবং এমন উত্তম মন্দিরও দুর্লভ। কথিত আছে, স্বামীজীর এইরূপ মন্তব্য শুনিয়া সঙ্গী স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু) জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার এইরূপ বলার ভিত্তি কি। স্বামীজী তাহাতে যখন উত্তর দিলেন যে, লাটু মহারাজের মতো বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে এইরূপ তথ্য বুঝানো অসম্ভব, তখন লাটু মহারাজ বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, "তুমি এমনি বিদ্বান যে, আমার মতো একটা মূর্খকেও বুঝাইতে পার না।" অচ্ছাবল হইতে তাঁহারা শ্রীনগরে ফিরিলেন।

ঐ কালের আরও দুইটি ঘটনায় লাটু মহারাজ ও স্বামীজীর মধ্যে প্রীতি ও

শ্রদ্ধার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। হাউস বোট ভাড়া হইলে লাটু মহারাজ দেখিলেন, মাঝি উহাতে স্ত্রীপুত্রসহ বাস করে। তাই "মেইয়া মানুষের সঙ্গে" থাকা চলিবে না বলিয়া তিনি উহাতে প্রবেশ করিতে অসম্মত হন। তখন স্বামীজী ভরসা দিলেন, "আমি আছি, তোর ভয় কিসের? আমি থাকতে তোর কিছু হবে না।" শুনিয়া তিনি রাজী হইলেন। আর একবার স্বামীজী তাঁহার জন্য আমিষ খাদ্য ও ভাত কিনিয়া আনিতে বলিলে লাটু মহারাজ বলিলেন, তিনি খাদ্য আনিবেন বটে, কিন্তু নিজে খাইবেন না; কারণ তিনি তখন নিরামিষাশী। শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "থাক্, তোকে আর যেতে হবে না।" লাটু মহারাজ কিন্তু গেলেন ঠিক, খাদ্যও আনিয়া স্বামীজীকে দিলেন; অথচ নিজে খাইলেন না। ('শ্রীশ্রী লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা', ৩১৮-১৯)।

এই সকল তথ্য ছাড়াও স্বামীজীর স্বলিখিত লিপিগুলি হইতে কাশ্মীর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। তাঁহার ১৩ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বরের এবং তারিখহীন আর একখানি পত্রে শ্রীনগর ও কাশ্মীরীদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "এদেশের যে প্রশংসা শুনিয়াছি, তাহা সত্য; এমন সুন্দর দেশ আর নাই, আর লোকগুলিও সুন্দর, তবে ভাল চক্ষু হয় না।" "এ জায়গার সব সৌন্দর্যের কথা তোমায় লিখে আর কি হবে? আমার মতে এই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যা যোগীদের অনুকূল।" "আমি অনেক পর্যটন করিয়াছি; কিন্তু এমন দেশ তো আর দেখি নাই।" সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইলেও স্বামীজী লিখিতে ভুলেন নাই যে, কাশ্মীরের লোকদের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন; অবশ্য গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও একই কথা। পত্রে লিখিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথাগুলি এই যে, স্বামীজী কাশ্মীরে "দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার জন্য এবং শারীরিক শক্তিলাভের জন্য একমাস জলে জলে ঘুরিয়া বেড়াইবার" সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কাশ্মীরে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন "সদানন্দ, কৃষ্ণলাল" এবং "লাটু, নিরঞ্জন, দীনু ও খোকা"। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, কাশ্মীর হইতে নামিয়াই দ্বিতীয় দলের চারি জনকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন; কারণ "উহাদের এখানে আর কোনও কার্য সম্ভব নয়।" প্রত্যুত কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে শুদ্ধানন্দ, সুশীল ও হরিপ্রসন্নকে আম্বালায় পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে কে কে ছিলেন, জানা নাই। ১৩ই তারিখের পত্রে 'রাজযোগে'র বঙ্গানুবাদ ছাপাইবার কথা আছে, আর আছে, "এখানে রাজা এখন নাই। তাঁহার মেজ ভাই সেনাপতি আছেন। তাঁহার

সম্পাদকতায় একটা বক্তৃতা হইবার উদ্যোগ হইতেছে। যাহা হয় পরে লিখিব। দু-এক দিনের মধ্যে যদি হয় তো থাকিব ; নহিলে আমি বেড়াইতে চলিলাম। সেভিয়ার মারীতেই রহিল। তাহার শরীর বড়ই অসুস্থ—টাঙ্গার ঝটকায়। মারীর বাঙ্গালী বাবুরা বড়ই ভাল এবং ভদ্র।" ঐ বক্তৃতা হইয়াছিল কিনা জানা নাই। সম্ভবতঃ হয় নাই।

১৫ই তারিখের পত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই : "কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট আমাকে তাঁদের একখানি বজরা ব্যবহার করতে দিয়েছেন, বজরাটি বেশ সুন্দর, আরামপ্রদ। তাঁরা জেলার তহশিলদারদের উপরও আদেশ জারি করেছেন। এদেশের লোকেরা আমাদের দেখবার জন্য দল বেঁধে আসছে, আমাদের সুখে রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই করছে।"

শ্রীনগরে প্রত্যাবৃত্ত স্বামীজীর আবার জনসাধারণের সহিত মেলামেশা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সদালাপাদি চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইতেন। ঐরূপ ক্ষেত্রে গৃহস্বামীরা প্রাচীন রীতিতে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেন ও যত্নের সহিত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতেন। একবার এক অভিজাত-পরিবারে নিমন্ত্রণ পাইয়া উপস্থিত হইলে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া ও মাল্যবিভূষিত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং ভোজনান্তে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বাসস্থান পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। এই জাতীয় ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, স্বামীজী দেশবাসীর কিরূপ হার্দিক শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এই ঘটনার সহিত পূর্ববর্ণিত দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির হইতে তথাকথিত বহিষ্করণের ব্যাপারটি তুলনা করিলে মনে হয়, অবশ্যম্ভাবী প্রগতির বেগ রুদ্ধ করিবার মতো দুর্বুদ্ধি যাহাদের মস্তকে প্রবেশ করে, তাহারা স্বকার্য সাধনের জন্য উন্মত্তপ্রায় কত প্রকার দুর্ব্যবহারেই না লিপ্ত হয়।

ক্রমে কাশ্মীর ত্যাগের সময় আসিয়া পড়িল। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই তিনি নৌকাযোগে শ্রীনগর হইতে যাত্রা করিলেন এবং উহ্লার হ্রদবক্ষ বাহিয়া বারামুল্লায় উপস্থিত হইলেন ও তথা হইতে টাঙ্গা-যোগে ৮ই অক্টোবর সন্ধ্যায় মারীতে আসিলেন। এখানে তাঁহার পূর্বপরিচিত পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী অনুরাগীদের সহিত পুনর্মিলন ঘটিল। সেভিয়াররা তখনও সেখানেই ছিলেন ; তাঁহাদেরও সহিত সাক্ষাৎ হইল। ১৪ই অক্টোবর রাত্রে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে একটি অভিনন্দন দিলেন এবং উহার উত্তরে তিনিও একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন।

তিনি তখন নিবারণবাবুর বাড়ীতে ছিলেন; সভা সম্ভবতঃ সেখানেই হইয়াছিল।

মারী হইতে তিনি ১০ই অক্টোবর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে জানাইয়াছিলেন, তিনি যেন ব্রঃ হরিপ্রসন্নকে (পরবর্তী কালের স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে) আম্বালায় পাঠাইয়া দেন, কারণ সেভিয়ার যথাসম্ভব শীঘ্র পূর্বপরিকল্পিত হিমালয়ের আশ্রমটি স্থাপন করিতে উদগ্রীব হইয়াছিলেন, এবং জমি পছন্দ করা প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারে হরিপ্রসন্ন মহারাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল—তিনি পূর্বে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ঐ পত্রেই শ্রীমাকে দুই শত টাকা পাঠাইবার সংবাদও আছে। ঐ তারিখের অপর একখানি পত্রে তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে একটি অনাথাশ্রম স্থাপনের জন্য উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন: "মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না।...হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে, অর্থাৎ তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ হয়; আর ধর্মের যে সর্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে।"

স্বামীজীর মনে ঐ কালে কাশ্মীরে একটি কেন্দ্র স্থাপনের অভিপ্রায়ও ছিল। শ্রীনগর হইতে মার্গারেট নোবলকে লিখিত ১লা অক্টোবরের পত্রে পাই: "তোমার কাছে কাশ্মীরের বর্ণনা দেবার চেষ্টাও ক'রব না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই ভূস্বর্গ ছাড়া অন্য কোন দেশ ছেড়ে আসতে আমার কখনও মন খারাপ হয় নি। সম্ভব হ'লে, রাজাকে রাজী করিয়ে এখানে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।" জম্মুতে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকারকালে হয়তো তিনি এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হয় নাই।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য স্থানেও কেন্দ্র স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার ছিল এবং ঐজন্য আলমবাজার মঠ হইতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের পাঞ্জাবে ও রাজপুতানায় আনাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার লীলাকালে কোথাও কেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই—যদিও যে বীজ তিনি প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহা অমর ছিল এবং পরে অঙ্কুরিত ও ফলপুষ্পসমন্বিত হইয়াছিল ও হইতেছে। সে যাহা হউক, তিনি আপাততঃ ১৬ই অক্টোবর[১১] সকালে নয়টায় টাঙ্গা-যোগে মারী ছাড়িয়া বিকালে পাঁচটায় রাওলপিণ্ডিতে উপনীত হইলেন।

১১। ইংরেজী জীবনী (৫২৫) ও বাঙ্গলা জীবনী (৬৯০) হইতে মনে হয় তিনি ১৫ই তারিখে রাওলপিণ্ডিতে যান, কিন্তু 'ভারতে বিবেকানন্দ' ৪৫১ পৃষ্ঠায় ১৬ই তারিখের উল্লেখ আছে।

পঞ্চনদীর তীরে

রাওলপিণ্ডিতে ১৬ই অক্টোবর পৌছাইলে তত্রত্য উকিল শ্রীযুক্ত লালা হংসরাজ সাহানী তাঁহাকে স্বগৃহে সাদরে সংবর্ধনা জানাইলেন। তখন তাঁহার সঙ্গী ছিলেন শুধু স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ) ও স্বামী অচ্যুতানন্দ; কারণ পূর্বেই তিনি নিরঞ্জনানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, সচ্চিদানন্দ (দীনু) ও কৃষ্ণলালের জয়পুর গমনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ('বাণী ও রচনা', ৮।৫, ও ৮।১১ পৃঃ)[১]। উকিল মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী আর্যসমাজের স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীত হন। ঐ সময়ে বিচারপতি নারায়ণ দাস, ভকতরাম[২] ও আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

এখানেই তাঁহার জনসাধারণের সমক্ষে বক্তৃতাবলম্বনে প্রচারপর্বের পুনরারম্ভ হইল। রাওলপিণ্ডিতে দিবসদ্বয় অতিবাহিত হইতে না হইতে তিনি ১৭ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত সুজনসিংহের মনোরম উদ্যানে বেলা পাঁচটায় বক্তৃতা দিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। বিচারপতি নারায়ণ দাসের প্রস্তাবক্রমে ও হংসরাজের অনুমোদনে সুজনসিংহ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। সভায় শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় চারিশত এবং স্বামীজী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা ধরিয়া একটি দীর্ঘ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ও প্রেরণাময় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি ইংরেজীতে প্রদত্ত হইলেও সাঙ্কেতিক লেখক না থাকায় উহা সংরক্ষিত হয় নাই। স্বামীজী স্বীয় বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সমর্থনকল্পে বেদাদি শাস্ত্র হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিলেন এবং "কখনও বীরদর্পে আত্মার অনন্ত মহিমা ও সর্বশক্তিমত্তার উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দের হৃদয়ে মহা তেজ ও শক্তির সঞ্চার করিলেন, কখনও বা সামাজিক কপটা-চারের বিরুদ্ধে কঠোর শ্লেষপ্রয়োগে তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্যরসের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৬৯১)। সভায় উপস্থিত একজন ইংরেজ ভক্ত পরে বলিয়াছিলেন : "মস্তকে পুষ্পমাল্য শোভিত ও গলদেশে পুষ্পমাল্য

১। দ্বিতীয় পত্রে মাত্র তিন জনের উল্লেখ আছে, এবং বলা হইয়াছে যে, উহাদের মধ্যে একজন স্বামীজীর গুরুভ্রাতা। সম্ভবতঃ তিনি স্বামী অদ্ভুতানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ অন্যত্র চলিয়া গিয়া থাকিবেন।

২। ইঁহার ভ্রাতা ছিলেন ব্যারিস্টার 'ভারতে বিবেকানন্দ' (৭ম সংস্করণ, ৪৫২ পৃঃ)। বাঙ্গলা জীবনীতে ভকতরাম বা ভক্তরামকে ব্যারিষ্টার বলা হইয়াছে (৬৯০)।

বিলম্বিত স্বামীজী যখন অভ্যাসবশতঃ কখনও মঞ্চোপরি পদচারণ করিতে করিতে কিংবা পত্রপুষ্প ও মাল্যে মণ্ডিত স্তম্ভে হেলান দিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন গেরুয়া আলখাল্লা ও কোমরবন্ধে ভূষিত তাঁহাকে যেন কোন গ্রীসদেশীয় দেবমূর্তির ন্যায় দেখাইতেছিল। আর উষ্ণীষ-বিমণ্ডিত শ্রোতাদের অধিকাংশ আসন করিয়া ভূমিতে উপবিষ্ট থাকায় এবং দূরে সূর্য অস্ত গমনোদ্যত হওয়ায় যে অপূর্ব দৃশ্য বিরচিত হইয়াছিল তাহাও ছিল অত্যন্ত সৌন্দর্যময়।"

ঐ সময়ে স্বামীজী প্রচারকার্যে কিরূপ ব্যস্ত ছিলেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ অচ্যুতানন্দের দিনলিপি ('ভারতে বিবেকানন্দ', ৪৫২-৫৩) হইতে এই উদ্ধৃতি দিলাম: "১৭ই অক্টোবর হংসরাজের বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত ভদ্রলোকগণের সহিত চর্চা। পরে ভোজনার্থ ছাউনিতে নিমাইয়ের বাড়ী গমন। তথায় বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্তা। প্রায় তিনটার সময় তথা হইতে প্রত্যাবর্তন। একটু বিশ্রাম করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য সুজনসিংহের বাগানে গমন।...বক্তৃতান্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া জনৈক ব্যক্তিকে সাধনরহস্য-উপদেশ দিলেন। রাত্রে ভক্ত-রামের কুঠিতে নিমন্ত্রণ। সঙ্গে জজ, প্রকাশানন্দ, হংসরাজ প্রভৃতিও গেলেন এবং ভোজনাদি করিলেন। তথা হইতে রাত্রি দশটার সময় স্বস্থানে আগমন। প্রকাশানন্দের সহিত রাত্রি তিনটা পর্যন্ত চর্চা।"

১৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালেও রায় নারায়ণ দাস, বাবা ক্ষেমসিংহের পুত্র ও প্রকাশানন্দের সহিত চর্চা ও কথাবার্তা হইল। আহারান্তে বিশ্রামের পর তিনি জানাইলেন—পূর্বদিন হইতে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া তখন অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি হাসিমুখেই কথা বলিতে লাগিলেন, বাহিরের লোক কিছুই বুঝিতে পারিল না। সন্ধ্যার পূর্বে তিনি জজ সাহেব ও ক্ষেমসিংহের পুত্রের দ্বারা আনীত বগিতে ভ্রমণ করিলেন। রাত্রে তাঁহাদের সহিত একত্র ভোজন করিলেন এবং আর্যসমাজ ও মুসলমানদের সম্বন্ধে অনেক সংশয়ের সমাধান করিলেন। বাসস্থানে ফিরিলেন রাত্রি এগারটায়।

১৯শে অক্টোবর প্রাতঃকালে তিনি সেভিয়ারদের বাসস্থানে গিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন। পরে প্রকাশানন্দের সহিত স্থানীয় বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে গিয়া সেখানে প্রসাদধারণ করিলেন এবং ভোজনান্তে একজন শিখের সহিত ধর্মবিষয়ে অনেক চর্চা করিলেন। এই আলোচনাকালে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর ঐ কালীবাড়ীতেই

স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের একটি ক্ষুদ্র সভায় স্বামীজী স্বদেশের কল্যাণসাধনের উপায় সম্বন্ধে বহু সুমনোহর উপদেশ দিলেন।

রাওলপিণ্ডিতে তাঁহার এই অবস্থানের সুযোগে অনেকে হংসরাজের বাটীতে বা সেভিয়ারদের আবাসস্থানে মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত সদালাপ করিতেন কিংবা তাঁহার উপদেশশ্রবণে কৃতার্থ হইতেন। এই সব বিষয়ে স্বামীজীর সময়-বোধ থাকিত না, অপরেরাও আর সব ভুলিয়া তাঁহারই বাক্যসুধা মুগ্ধচিত্তে পান করিতেন; তাই প্রসঙ্গগুলি খুবই দীর্ঘ হইত। ইহার মধ্যে আবার ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের অযৌক্তিক ব্যবহারও যথেষ্ট ছিল। রাওলপিণ্ডি ত্যাগের দিন (২০শে অক্টোবর) মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তিনি জনকয়েক জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ও বন্ধুর সহিত আলাপে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অনুরোধে স্বামীজীর এক গুরুভ্রাতা একখানি ফিটনগাড়ী লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন যে, ঐ ভদ্রলোক পীড়িত ও স্বামীজীকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক। নিরলস স্বামীজী তখনই উঠিলেন; প্রকাশানন্দ এবং আরও কেহ কেহ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। স্বগৃহে সমাগত স্বামীজীকে ভদ্রলোক পাঁচটি প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, এইগুলির সমাধান না পাইলে নাস্তিক হওয়া ব্যতীত তাঁহার উপায়ান্তর নাই। স্বামীজীও পর পর সবগুলি প্রশ্নেরই যুক্তিপূর্ণ সরল সমাধান করিয়া দিলে ভদ্রলোকের সন্দেহ অপসৃত হইল ও তিনি কৃতার্থ হইলেন। অতঃপর তিনি স্বামীজী প্রভৃতিকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে রাত্রি সাড়ে আটটায় বিদায় দিলেন। তারপর স্বামীজী হংসরাজের গৃহে নৈশভোজন-সমাপনান্তে কালীবাড়ীতে গেলেন ও কাশ্মীরের মহারাজের আমন্ত্রণক্রমে জম্মু যাইবার জন্য রাত্রি বারটায় ট্রেনে উঠিলেন।

জম্মু স্টেশনে ২১শে অক্টোবর বেলা বারটায় যখন ট্রেন হইতে নামিলেন, তখন তাঁহাকে রাজ-অতিথির উপযুক্ত স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হইল এবং রাজ্যের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য পুত্রগণ-সহ তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। পরদিবস স্বামীজী রাজকীয় পুস্তকালয় দর্শন করিলেন এবং পরে মহেশবাবুর গুরু স্বামী কৈলাসানন্দ প্রভৃতি বহুসংখ্যক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সহিত ধর্মালোচনা করিলেন। মহেশবাবুর সহিত কাশ্মীরে একটি মঠস্থাপন বিষয়েও আলোচনা হইল।

২২শে অক্টোবর বেলা ১১টার সময় তিনি রাজকীয় বগি-গাড়ীতে চড়িয়া

রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন ও মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাৎকালে মহারাজের দুই ভ্রাতা ও রাজ্যের প্রধান প্রধান কয়েকজন কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে মহারাজ আলাপ আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাসের কথা তুলিলেন ও স্বামীজী ঐ বিষয়ে সমুচিত উত্তর দিলেন। ক্রমে ভাবহীন বাহ্যিক আচার ও অর্থহীন অনুষ্ঠানাদির কথা আসিয়া পড়িল এবং স্বামীজী অকাট্য যুক্তি অবলম্বনে দেখাইয়া দিলেন—কেমন করিয়া ধর্মের মূল তত্ত্বের প্রতি অনবহিত ও বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়াকলাপ মাত্রে অতিমাত্র আসক্ত থাকিয়া ভারতবাসীরা ক্রমে ক্রমে বল বীর্য ও স্বাধীনতা হারাইয়াছে এবং অন্ধপরম্পরায় কুসংস্কারকে ধর্মের আসনে বসাইয়া শত শত বৎসর অপরের দাসত্ব বরণ করিয়াছে ও নিষ্পেষিত হইতেছে। এবম্প্রকার অযৌক্তিকতা কিরূপ বিকট আকার ধারণ করিতে পারে তাহার প্রমাণ স্বরূপে তিনি বলিলেন, "আজকাল ব্যভিচারাদি প্রকৃত পাপাচরণে কেহ সমাজচ্যুত হয় না; কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিলেই যেন সমাজের ঘোরতর সর্বনাশ উপস্থিত হয়!" জাতি ও আহার সম্বন্ধীয় অত্যাচার ও আহাম্মকির পর সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি উহা সমর্থনপূর্বক স্বীয় মতের পরিপুষ্টির জন্য শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কায় গমনের দৃষ্টান্ত দিলেন এবং প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, তখনও বর্মা সিংহল প্রভৃতি দেশে বহু হিন্দু বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, দেশভ্রমণ না করিলে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। পরিশেষে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বেদান্ত প্রচারের সার্থকতা ও সাফল্যের কথা বুঝাইয়া দিয়া স্বীয় কার্যের ধারা ও উদ্দেশ্যাদি বর্ণনা-প্রসঙ্গে সকলকে জানাইলেন যে, দেশের হিতসাধনার্থ তিনি স্বমুক্তির অভিলাষ বর্জনপূর্বক নিরয়গামী হইতেও বরং প্রস্তুত, তথাপি কোনপ্রকার বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। প্রায় তিনটার সময় এই কথাবার্তা শেষ হইল। বলা বাহুল্য, মহারাজ স্বামীজীর তেজ, সাহস, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, ভাবী অপূর্ব পরিকল্পনা, স্বধর্ম ও স্বদেশের প্রতি মমতা, উদার দৃষ্টি, অদ্ভুত বাগ্মিতা ইত্যাদির পরিচয় পাইয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন। ঐ দিনই স্বামীজী বগি-গাড়ী করিয়া ছোট রাজার নূতন বাসভবনে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে সাদর সংবর্ধনা জানাইলেন এবং কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার উপদেশামৃত পান করিলেন।

পরদিন শিয়ালকোট হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে স্বামীজী সম্মত হইলেন। ঐ দিন জম্মুর জনসাধারণের সম্মুখে অপরাহ্নে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তাহাতে মহারাজ এত প্রীত হইলেন যে, তিনি স্বামীজীকে পরদিনও আর একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও অনুরোধ জানাইলেন, স্বামীজী যেন দশ-বার দিন জম্মুতে থাকিয়া জনগণের কল্যাণার্থ একদিন অন্তর একটি করিয়া ভাষণ দেন। এই কালের বক্তৃতাগুলি প্রায়শঃ হিন্দীভাষায় প্রদত্ত হওয়ায় এবং ঐগুলি রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকায় বক্তৃতার দিন, বিষয় বা স্বামীজীর বক্তব্য প্রভৃতি কিছুই এখন জানিবার উপায় নাই। সমসাময়িক ব্যক্তিদের বিবরণ অবলম্বনে প্রাচীন জীবনীতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, বক্তৃতাগুলি ভাব ও ভাষায় খুবই হৃদয়রঞ্জক ও উদ্দীপনাময় ছিল, এবং হিন্দীভাষাকে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশের জন্য স্বামীজী এমন সুন্দরভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, গুণগ্রাহী মহারাজ ঐ ভাষায় কয়েকটি প্রবন্ধরচনার জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীও ঐরূপ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধগুলি পড়িয়া মহারাজ স্বামীজীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

২৪শে অক্টোবর[৩] প্রাতঃকালে স্বামীজী পদব্রজে নদীতীরে বেড়াইতে গেলেন ও মিউনিসিপালিটির জলের কল দেখিয়া আসিলেন। স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনান্তে সদালাপ ও সঙ্গীত হইল। সন্ধ্যায় তিনি বগি-গাড়ীতে চড়িয়া শহরের দীপমালা দেখিলেন এবং আবাসস্থলে ফিরিয়া অচ্যুতানন্দকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আর্যসমাজের ভাবধারা ত্রুটিমুক্ত নহে। শিক্ষাক্ষেত্রে তখনকার দিনে পাঞ্জাবে যে ন্যূনতা লক্ষিত হইত, ঐ বিষয়েও তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ঐ দিন বিকালে যে জনসভা হইয়াছিল, তাহাতে মহারাজের আসার কথা থাকিলেও তিনি আসিতে পারেন নাই। স্বামীজী সাড়ে পাঁচটায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া প্রথমে শাস্ত্রীয় বিষয়ের চর্চা করেন ও পরে ভক্তি সম্বন্ধে হাস্যরসমিশ্রিত সুমনোহর ভাষণ দেন।

তিনি ২৫শে অক্টোবর প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং ঐদিনই রাজকীয়

৩। ইংরেজী জীবনীর মতে ২৫শে অক্টোবর (৫২৭ পৃঃ), বাঙ্গলা জীবনীর মতে (৬৯৪ পৃঃ) ও 'ভারতে বিবেকানন্দে'র মতে ২৪শে (৪৫৭ পৃঃ)।

পশুশালা দেখিয়া আসিলেন। পরদিবস সঙ্গীদের সহিত বনভ্রমণকালে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিশদ আলোচনা করিলেন।

২৮শে অক্টোবর প্রাতভ্র্মণান্তে বাসস্থানে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সমাজনীতি বিষয়ক আলোচনাপ্রসঙ্গে অনেক গূঢ় তত্ত্বের অবতারণ করিলেন। উহার মর্ম এই যে, সকলের ভোগ তুল্য হওয়া উচিত; বংশগত বা গুণগত জাতিভেদ অনুসারে ভোগ বা অধিকারের যে তারতম্য আছে, উহা উঠিয়া যাওয়া উচিত। তবে বংশগত জাতিভেদের যথেষ্ট দোষ থাকিলেও কতকগুলি গুণও আছে। যেমন, কোন ব্যক্তি যতই গুণবান বা ধনবান হউক না কেন, বংশগত জাতি মানিয়া সে স্বজাতিকে পরিত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং তাহার জাতি, তাহার গুণ ও ধনের কিছু না কিছু অংশভাগী হইয়া থাকে। গুণগত জাতিতে তাহা হইতে পারে না। তারপর বেকনের অনুমোদিত নীতিতত্ত্বের কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিলেন, "মানযশের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য করাই মহাপুরুষের লক্ষণ—আমাকে লোকে মানুক বা না মানুক, যাহা কর্তব্য বুঝিয়াছি তাহা করিয়া যাইব।" তিনি নিজের বাল্যকালের উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন যে, তিনি ডোম-পাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিতেন। (বাঙ্গলা জীবনী, ৬৯৪-৯৫ পৃঃ)। এই প্রকার কথা অবশ্য স্বামীজী সর্বসমক্ষে বলিতেন না, অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের মজলিশেই কখন কখন বলিয়া ফেলিতেন।

২৯শে অক্টোবর তিনি রাজা রামসিংহের নিকট বিদায় লইতে গেলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে, শিয়ালকোটের বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে সেখানে অবশ্যই যাইতে হইবে—এই বিষয়ে আর দেরী করা চলে না। রামসিংহ এই সংবাদে বিষণ্ণ হইলেও বিদায় দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তিনি যখনই জম্মু বা কাশ্মীরে আসিবেন, তিনি যেন কাশ্মীররাজের আতিথ্য স্বীকার করেন।

ইহার পরবর্তী কয়েক দিনের ঘটনা স্বামীজীর শিষ্য শ্রীযুক্ত জে. জে. গুডউইন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইনি স্বামীজীর জম্মু অবস্থানকালে মাদ্রাজ হইতে আসিয়াছিলেন এবং কিছুদিন তাঁহারই সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার বক্তব্য এই: "যদিও স্বামী বিবেকানন্দের ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হইয়াছে, একথা মোটেই বলা চলে না; তথাপি তিনি পুনরায় কর্মব্যাপৃত হইয়াছেন—এবারে কর্মক্ষেত্র উত্তর-পশ্চিমে। কাশ্মীরে তিনি কয়েক সপ্তাহ ছিলেন এবং তত্রত্য মহামান্য মহারাজ

স্বামীজীর বক্তব্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বিষয়ে কথা দিয়াছিলেন যে, স্বামীজী যদি ঐ রাজ্যে কোন কার্যকরী যোজনার রূপায়ণে তৎপর হন, তবে তিনি মহারাজের সাহায্য পাইবেন। ইহার পরে তিনি জম্মুতে অল্প কিছুদিন থাকিয়া বিশেষ গুণগ্রাহী শ্রোতাদের নিকট হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জম্মু হইতে তিনি শিয়ালকোটে যাইয়া লালা মূলচাঁদ, এম. এ., এল-এল.বি. মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এখানে তাঁহার দুইটি ভাষণের আয়োজন হইয়াছিল —একটি ইংরেজীতে ও অপরটি হিন্দীতে। এই উভয় বক্তৃতার—এমনকি এই সময়ের সকল বক্তৃতার মধ্যেই একটা সাধারণ বক্তব্য বিষয় এই ছিল যে, ধর্মকে ধর্মনামে পরিচিত হইতে হইলে উহাকে কার্যে পরিণত রূপ গ্রহণ করিতে হইবে। আমার বোধহয় স্বামীজী যেন এই দিকটার উপর নিত্যই অধিকাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন এবং তিনি যেসকল স্থানে যাইতেছেন ঐ সকল স্থানের প্রয়োজনানুসারে ও তত্তদ্দেশবাসীর চরিত্রানুসারে বিবিধ প্রকারের সংস্থা স্থাপন-পূর্বক স্বীয় মতকে রূপ প্রদান করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, তিনি শিয়ালকোটে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার দুই দিন অবস্থানের ফলে ঐ প্রস্তাবটিকে বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে লালা মূলচাঁদকে সেক্রেটারী করিয়া শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল।"

বাঙ্গলা জীবনীর মতে ইংরেজী বক্তৃতাতে ভারতীয় জাতিসমূহের ধর্মবিষয়ক ঐক্য ও হিন্দী বক্তৃতায় ভক্তিবাদ ব্যাখ্যাত হয়। হিন্দী বক্তৃতার অনুবাদ রক্ষিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। ('ভারতে বিবেকানন্দ' দ্রষ্টব্য)। শিয়ালকোটে তাঁহার নিকট যেসব বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে একদিন দুই জন পার্বত্যপ্রদেশবাসিনী সন্ন্যাসিনী ছিলেন। ইঁহাদিগের দর্শন এবং ইঁহাদের সহিত আলাপের ফলেই তিনি পূর্বোক্ত বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন।

৫ই নভেম্বর তিনি শিয়ালকোট ত্যাগ করিয়া সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটায় লাহোরে উপস্থিত হইলেন। এখানে আমরা আবার শ্রীযুক্ত গুডউইনের লিপির সাহায্য গ্রহণ করি: "তাঁহার পরবর্তী গমনস্থান ছিল লাহোর। রেল স্টেশনে এক বিপুল জনসমষ্টি তাঁহাকে সংবর্ধনা করিল। ইঁহাদের মধ্যে সনাতন ধর্মসমাজের অনেক সভ্য ছিলেন এবং এই সমাজের হস্তেই স্বামীজীর অভ্যর্থনার ভার অর্পিত ছিল। লাহোরের সুচারু রাজপথ অবলম্বনে তাঁহাকে

গাড়ী করিয়া রাজা ধ্যান সিংহের ভবনে (হাবেলিতে) লইয়া যাওয়া হইল; পরে লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি পুরাতন প্রাসাদের প্রাঙ্গণে 'আমাদের সমস্যাবলী' সম্বন্ধে এক ভাষণ দিলেন। লোকসমাবেশ হইয়াছিল প্রচুর; যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের সকলের স্থানসঙ্কুলান হওয়ার মতো ঐ প্রাঙ্গণটি যথেষ্ট বড় ছিল না; এবং এক সময়ে মনে হইয়াছিল যে, এত লোককে নিরাশ করিতে গিয়া সভার অনুষ্ঠানই হয়তো অসম্ভব হইবে। অন্ততঃ দুই সহস্র ব্যক্তিকে ফিরাইয়া দিবার পরও পূর্ণ চারি সহস্র শ্রোতা একটি অতি মনোজ্ঞ বক্তৃতা শুনিতে পাইয়াছিল। পরদিন মঙ্গলবারে প্রফেসার বোসের বেঙ্গল সার্কাসের তাঁবুতে আর একটি সুবৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলী ভক্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর ভাষণ শুনিতে সমবেত হইয়াছিল।

"পরবর্তী শুক্রবারে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতাটি বিপুল সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। এইবারের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছিল লাহোরের চারিটি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ এবং উহা সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। শ্রোতৃসংখ্যা অসুবিধা সৃষ্টি করার মতো অত্যধিক ছিল না, অথচ সব দিক হইতেই ইঁহারা ছিলেন লাহোরের সর্ব-স্তরের বাছা বাছা ব্যক্তি। সে সন্ধ্যায় বক্তব্য বিষয় ছিল: 'বেদান্ত'। স্বামীজী দুই ঘণ্টারও অধিককাল যাবৎ অদ্বৈতবাদ ও ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে এমন একটি ভাষণ দিয়াছিলেন যাহা তাঁহার নিজের দিক হইতেও ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। তিনি প্রারম্ভেই যে প্রক্রিয়াবলম্বনে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূত মনস্তত্ত্ব ও সৃষ্টি-তত্ত্বের ভাবধারাগুলির বিকাশপরম্পরা দেখাইয়া দিলেন তাহা ছিল অত্যাশ্চর্য-রূপে পরিষ্কার এবং তিনি যখন দৃঢ়তাসহকারে ঘোষণা করিলেন যে, কেবল বিজ্ঞানই নহে, প্রত্যুত বৌদ্ধদর্শন ও অজ্ঞেয়বাদও আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে ও অতিলৌকিক তথ্যের বিপক্ষে যে আক্রমণ চালাইয়া থাকে, একমাত্র অদ্বৈতবাদই উহার প্রতিরোধে সমর্থ, তখন সে ঘোষণা সুস্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত হইয়াছিল এবং অপরের হৃদয়ে বিশ্বাসোৎপাদনের পূর্ণশক্তিও উহাতে ছিল। ভাষণটিতে আগাগোড়াই বীর্যের কথা বলা হইয়াছিল—বলা হইয়াছিল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার কথা, যাহা হইতে ভগবদ্‌বিশ্বাসেরও উদয় হইতে পারে, এবং এযাবৎ স্বামীজী ভারতে যত বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্বোত্তম এই বক্তৃতাটির প্রত্যেকটি শব্দ ছিল তেজোময়। এই বক্তৃতার ফলে প্রচুর উৎসাহ সৃষ্টি হইয়াছিল,

অতএব লাহোরে যেসব ছাত্র সর্বদা স্বামীজীর সেবায় নিযুক্ত ছিল তাহাদিগের মধ্যে ঐ কথাগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত উদ্দীপনা জাগাইতে স্বামীজীকে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। প্রকৃত ঘটনা এইরূপ দাঁড়াইল যে, তিনি ছাত্রদের একটি সভার আয়োজন করাইলেন এবং উহাতে তাঁহার বক্তব্য শ্রবণের পর একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সমিতি গঠিত হইল ও আলোচনাক্রমে স্থির হইল যে, উহার কর্তব্য হইবে দরিদ্রদিগের সেবা—প্রতি পল্লীতে সন্ধান করিয়া তাহাদের বাহির করিতে হইবে ও দরিদ্র আর্তদিগের শুশ্রূষার ও দরিদ্র অজ্ঞদিগের নৈশবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

"দুই দিন পরে স্বামীজী কার্যব্যপদেশে দেরাদুন যাত্রা করিলেন।" (ইংরেজী জীবনী, ৫২৭-২৯ পৃঃ)।

আমরা পূর্বে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা স্বামীজীর অভ্যর্থনার কথা বলিয়া আসিলেও এইরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে যে, লাহোরবাসী আর্যসমাজীরা তাঁহার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারাও সাধ্যমত আদর-আপ্যায়নে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। দয়ানন্দ অ্যাঙ্গলো-বৈদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রমুখ ঐ সমাজভুক্ত অনেকেই তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিতে আসিতেন। অবশ্য দুই-চারিটি মৌলিক বিষয়ে ইঁহাদের সহিত স্বামীজীর মতানৈক্য ছিল; ইঁহারা সাধারণতঃ আর্যসমাজের দ্বারা স্বীকৃত সঙ্কীর্ণ মতবাদের সমর্থন করিতেন, আর স্বামীজীর মত ছিল আকাশের ন্যায় উদার অথচ সমুদ্রের ন্যায় গভীর। আর্যসমাজীরা বেদের উপনিষদ্‌ভাগের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া কেবল সংহিতা-ভাগকে শ্রুতির মর্যাদা দিতেন এবং উহারই প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন; অধিকন্তু তাঁহাদের মতে শ্রুতিবাক্যের শুধু একপ্রকার অর্থই হইতে পারে। স্বামীজীর মতে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে উপনিষদ্‌বাক্যেরই প্রামাণ্য প্রবলতর, যদিও উহার ব্যাখ্যা অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি মতানুসারে বিভিন্ন হইতে পারে। অনুভূতির তারতম্য ও গভীরতা অনুযায়ী একই বাক্যের এই প্রকার বিভিন্ন অর্থবোধ অসম্ভব নহে। সাধকের জীবনে এই ক্রমিক উন্নতি স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়; নতুবা অধিকারীর তারতম্য অস্বীকারপূর্বক সকল মুক্তিকামীকে একই স্তরে বা একই প্রকার সাধনামধ্যে আবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস করিলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। মানুষের মনকে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ধাপে ধাপে উঠিতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

ভগবান সম্বন্ধে আর্যসমাজীদের ধারণা এই যে, তিনি নিরাকার, সর্বজ্ঞ, সর্ব-

শক্তিমান, কৃপালু, প্রেমপূর্ণ ও আনন্দময়। অদ্বৈতবাদীর নিগুর্ণ ব্রহ্ম বা সাকার-বাদীর প্রতিমাদিতে তাঁহাদের আস্থা নাই। এই উভয় মতের তাঁহারা ঘোর বিরোধী। স্বামীজী ইঁহাদিগকে মূর্তিপূজা ও অদ্বৈতবাদের সার্থকতা ও প্রামাণ্য বুঝাইয়া দিতেন, এবং যুক্তি অবলম্বনে দেখাইয়া দিতেন যে, সমস্ত নীতিবাদ এবং ধার্মিক আচার-বিচার ও বিশ্বাস একমাত্র অদ্বৈত-ভিত্তি অবলম্বনেই আধুনিক বিজ্ঞানাদির প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারে অদ্বৈতকে বাদ দিয়া কোন ধর্মই বিচার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে টিকিতে পারে না। তিনি আরও দেখাইতেন যে, সগুণ নিরাকার ভগবানের কথা ভাবিতে গেলে কল্পনার সাহায্য লইতে হয়; সুতরাং কল্পনাকে যদি জীবন হইতে বাদ দেওয়া অসম্ভবই হয় আর কল্পনাসহায়েই যদি ঈশ্বরের চিন্তা করিতে হয়, তবে ঐ চিন্তার সহায়করূপে কল্পনাশ্রিত মূর্তিপূজাই বা নিম্নাধিকারীর পক্ষে অযৌক্তিক হইবে কেন? অধিকন্তু যুক্তির খাতিরে যদিই বা মানিয়া লই যে, মূর্তিপূজকমাত্রই আর্যসমাজী যেকোন ব্যক্তি অপেক্ষা নিম্নাধিকারী, তথাপি ধার্মিকের পক্ষে নিম্নাধিকারীর নিন্দা করা অধর্মেরই সামিল; বরং পশ্চাৎপদ ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক ও অন্য প্রকার সাহায্যপ্রদানপূর্বক তাহার গতিপথ সহজ সরল সুগম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আবার স্বীয় জ্ঞানবিচারের গরিমা খ্যাপন করিলেও আর্যসমাজীদের ভুলিলে চলিবে না যে, ঐ মার্গেও তাঁহারা সর্বাগ্রণী নহেন, কেননা, অদ্বৈতবাদীরা জ্ঞানবিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। এইভাবে স্বামীজী আর্যসমাজ হইতে গোঁড়ামি সরাইবার চেষ্টা করিতেন।

লাহোরে জিজ্ঞাসুদের পিপাসা যেমন ছিল প্রবল, স্বামীজীর কর্মোদ্যমও ছিল যেন তেমনি অফুরন্ত। তাই ধ্যান সিংহের হাবেলিতে প্রতিদিন প্রাতে দুই ঘণ্টা ও অপরাহ্নে দেড় ঘণ্টা এই জাতীয় আলোচনা চলিত। শ্রোতাদের মধ্যে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী দুইই থাকিতেন। তাছাড়া স্বামীজীর আবাসস্থল নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেও প্রচুর লোক-সমাগম ও কথাবার্তা হইত। ঐ বাটীতে একদিন আর্য-সমাজের নেতা লালা হংসরাজের সহিত স্বামীজীর যে আলোচনা হয়, তাহাতে পূর্বোক্তরূপ বিচারধারাই চলিতেছিল। অবশেষে স্বামীজী বাধ্য হইয়া বলিলেন: "লালাজী, আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমি গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতিসাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে, তাহাও আমি জানি। আবার শাস্ত্রের গোঁড়ামি

অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া গোঁড়ামির (অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলা ও তাঁহার আশ্রয় লইলেই মুক্তি হয়—এইরূপ প্রচারের) দ্বারা আরও আশ্চর্যরূপে ও অতি দ্রুত সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে, আর আমার হস্তে সে শক্তিও আছে। আমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতার-রূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভ্রাতারা সকলেই বদ্ধপরিকর, কেবল আমিই ঐ প্রকার প্রচারের বিরোধী। কারণ আমার দৃঢ় ধারণা—মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ভাব অনুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে যদিও এই অগ্রগতি অতীব মন্থর হয়, তথাপি উহা পাকা হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমি অন্ততঃ চারি বৎসর এইরূপ উদার ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রচার চালাইব। যদি উহাতে কোন ফল না হয়—(অবশ্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উহাতে নিশ্চয় ফল হইবে)—তবে আমি গোঁড়ামি প্রচার করিব।"

লাহোরে স্বামীজীর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এমনই সুদৃঢ় ছিল যে, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে আর্যসমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলেও তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তথাপি প্রয়োজনস্থলে স্বীয় মত সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। আর্যসমাজীদের দ্বারা অস্বীকৃত ও ব্যর্থ বলিয়া অবজ্ঞাত শ্রাদ্ধপ্রথাতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন; তাই তিনি একটি ঘরোয়া বৈঠকে সনাতনধর্মী ও আর্যসমাজী উভয় সম্প্রদায়ের সমক্ষে ঐ বিষয়ে স্বীয় সমর্থন জানাইয়াছিলেন। আলোচনাকালে এই প্রাচীন প্রথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিলেও তিনি সনাতনধর্মীদের অভিপ্রায় জানিয়াও বিরোধী পক্ষকে কোন আক্রমণ করেন নাই। সনাতনধর্মীরা প্রথমে চাহিয়াছিলেন যে, এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা হইবে; কিন্তু স্বামীজী একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া তাহা হইতে না দিয়া কৌশলে উভয়পক্ষের নেতৃগণের উপস্থিতিতে ঐরূপে স্বীয় অভিমত বলিয়া গেলেন। এই সুপ্রাচীন অনুষ্ঠানের উৎপত্তি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে বস্তু অর্পণ বা তাঁহাদের পূজা হইতেই হিন্দুধর্মের আরম্ভ। আদিকালে কোন ব্যক্তি-বিশেষের দেহে মৃত আত্মীয়ের আত্মাকে আহ্বানপূর্বক তদুদ্দেশে পূজা ও উপহারাদি প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পরে দেখা গেল যে, যাহাদের দেহে প্রেতাত্মার আবেশ হয়, তাহারা বড়ই শারীরিক দৌর্বল্য অনুভব করে; সুতরাং এই প্রথার পরিবর্তে কুশপুত্তলিকায় প্রেতানয়নের প্রথা প্রবর্তিত হইল এবং

তাহারই উদ্দেশে পিণ্ড ও বলি প্রদত্ত হইতে লাগিল। বৈদিক যুগে যে দেবতাদির আহ্বান, উপাসনা ও তদর্থে যজ্ঞাদি হইত তাহাও এই প্রেতাত্মার পুজারই পরিণতি।

এইরূপে ঐ কালে সনাতন ধর্মাবলম্বী ও আর্যসমাজীদের সহিত প্রীতিপূর্ণ সমব্যবহারের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুর্বের সংঘর্ষের ভাব অনেকটা তিরোহিত হইয়া তৎস্থলে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে তিনি কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা তৎপ্রতি উভয়পক্ষের সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে প্রতিযোগিতা হইতে এবং উপদেশ গ্রহণ ও বিবিধ বিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় পক্ষের দলে দলে আগমন হইতেই প্রমাণিত হইয়া থাকে। আর্যসমাজীদের প্রতি তাঁহার সদয় ব্যবহার ও তাঁহার প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য দর্শনে লোকমুখে এইরূপ একটি কথাও প্রচারিত হইয়াছিল যে, ঐ সমাজ স্বামীজীকে তাঁহাদের নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ফলতঃ ঐ লোকপ্রবাদ স্বামীজীর অসাম্প্রদায়িকতা ও জনপ্রিয়তারই সাক্ষ্য দিয়াছিল।

পুর্বে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া স্বামীজী কৌশলে শ্রাদ্ধবিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা বন্ধ রাখিয়া ঘরোয়া বৈঠকে ঐ বিষয়ে আলোচনা করেন। ঘটনাটি এইরূপ। লাহোরবাসীরা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, স্বামীজীকে তাঞ্জামে চড়াইয়া নগরকীর্তন করা হইবে। স্বামীজী তাঞ্জামে চড়িতে সম্মত না হইলেও সঙ্কীর্তনসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে উৎসাহী ছিলেন। অন্তরঙ্গ মহলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঐ অঞ্চলে শুষ্ক জ্ঞানের চর্চাই অধিক হয়; অতএব সঙ্কীর্তনের সাহায্যে লোকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভক্তি-রসের সঞ্চার হইলে ভালই হইবে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া তিনি ঐরূপ কর্মের সহিত সুপরিচিত বাঙ্গালীদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন নিশান ও খোল করতালাদি ভালভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি সঙ্গিগণসহ স্থানীয় মিউজিয়ম দর্শনান্তে যথাকালে ধ্যান সিংহের হাবেলিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিস্তর লোক-সমাগম হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্কীর্তনের উদ্যোক্তাদের দেখা নাই। লোকপরম্পরায় শোনা গেল, শহরে একখানি মাত্র খোল ছিল, তাহাও অতি পুরাতন ও অব্যবহার্য; উহা এতই খারাপ ছিল যে, চাঁটি দিবামাত্রই উহা ফাঁসিয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্তন না হওয়াতে স্বামীজী কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপুর্বক ঘোষণা করিলেন, শ্রাদ্ধবিষয়ক বক্তৃতাও হইবে না। জনমণ্ডলী

উহা শুনিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। সনাতনী ও আর্যসমাজীদের মধ্যে প্রকাণ্ড বিরোধের ভয়ও কাটিয়া গেল।

এই কালের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে স্বামীজীর সরল সহজ অমায়িক ও হৃদ্যতাপূর্ণ লোকব্যবহারের এবং নৈর্ব্যক্তিক উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন "স্বামীজী তাঁহার জনৈক সঙ্গীর নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সঙ্গী বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু স্বামীজী, সে ব্যক্তি আপনাকে মানে না।' স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'ভাল লোক হতে গেলে যে আমাকে মানতে হবে, এর মানে কি?' সঙ্গীটি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

"এই সময়ে লাহোরে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস[৪] আসিয়াছে। একদিন কোন কার্যোপলক্ষে উহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী বাবু মতিলাল বসু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাড়ীতে আসিয়াছেন। স্বামীজী দেখিয়াই চিনিলেন—তাঁহার বাল্যবন্ধু। অমনি তিনি নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ইঁহারা এক আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। মতিবাবু তাঁহার বাল্যসঙ্গীর অপূর্ব তেজ, প্রতিভা ও শক্তিপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যেন ঝলসিয়া গেলেন; স্বামীজী যতই তাঁহার সহিত আপনার মতো ব্যবহার ও তদনুরূপ কথাবার্তা কহিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও যেন ততই সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া মতিবাবু স্বামীজীকে সম্বোধন করিয়া অতি দীনস্বরে বলিলেন, 'ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাকব?' স্বামীজী অতিশয় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'হাঁরে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, আর তুইও সেই মতি।' স্বামীজী এরূপভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, মতিবাবুর সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৬৯৯ পৃঃ)।

স্বামীজীর সহিত একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সমধিক উল্লেখযোগ্য। লাহোরের এফ. সি. কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তীর্থরাম গোস্বামী স্বামীজীর সাক্ষাৎকারলাভে খুবই উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইনি পরে সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্বক সাধারণের নিকট স্বামী রামতীর্থ নামে পরিচিত হন ও স্বামীজীর

৪। গুডউইন-এর মতে ইহার নাম 'বেঙ্গল সার্কাস'।

পদাঙ্কানুসরণে আমেরিকায় ও স্বদেশে বেদান্তপ্রচারে লিপ্ত হন। ইনি অনেক ভক্ত ও শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার বক্তৃতাবলী মুদ্রিত হইয়া উত্তর ভারতের হিন্দীভাষা-ভাষী হিন্দুদের নিকট তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়াছিল। ইঁহারই নেতৃত্বাধীনে লাহোরের ছাত্রগণ স্বামীজীর বক্তৃতাদির আয়োজন করিয়াছিল। স্বামীজীকে ইনি অশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং একদিন তাঁহাকে নিজালয়ে সঙ্গিগণসহ নিমন্ত্রণপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন ; এই ভোজে শ্রীযুক্ত গুডউইনও উপস্থিত ছিলেন। ভোজশেষে স্বামীজী একটি গান গাহিয়াছিলেন : জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহিঁ, জহাঁ কাম নহিঁ রাম। তুলসী কবহূঁ হোত নহিঁ, রবি রজনী ইক ঠাম॥ তীর্থরাম এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে সঙ্গীতের অর্থবোধ আনিয়া শিহরণ জাগাইতে থাকিল।" স্বামীজী যাহাতে স্বীয় ইচ্ছানুসারে যে কোন গ্রন্থ লইতে পারেন এই জন্য তীর্থরাম আপনার পুস্তকালয় খুলিয়া দিলে, স্বামীজী সেই গ্রন্থরাজি হইতে আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'লীভ্স অব গ্রাস' (তৃণপুঞ্জ) নামক কাব্যগ্রন্থখানি তুলিয়া লইলেন। এই কবিকে স্বামীজী আমেরিকার সন্ন্যাসী নামে অভিহিত করেন।

এক সন্ধ্যায় স্বামীজী, তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসিগণ এবং কয়েকজন যুবক এক রাজপথ ধরিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়া ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন ও প্রতিটি দল পৃথক্ পৃথক্ আলোচনায় মগ্ন হইলেন। তীর্থরামও উহাদের শেষের দলে ছিলেন। অনেক কাল পরে দার্জিলিং হইতে তাঁহার লিখিত একখানি পত্রে তিনি ঐ দিনের একটি আলোচনার বিবরণ এইরূপ দিয়াছিলেন : "আমি সর্বশেষ দলের মধ্যে ছিলাম, জনৈকের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতেছিলাম যে, 'আদর্শ মহাত্মা বলিতে তাঁহাকেই বুঝায় যিনি সর্বপ্রকার পৃথক্ ব্যক্তিত্ববোধ ত্যাগ করিয়া সর্বাত্মারূপে বিরাজ করেন। কোন জায়গায় বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণ সূর্যোত্তাপ সঞ্চিত হইলে ঐ বায়ু সূক্ষ্মতা লাভ করিয়া ঊর্ধ্বগামী হয়। তখন চারিদিকের বায়ু দ্রুত প্রবাহিত হইয়া ঐ শূন্যস্থান পূর্ণ করে, এবং এই কারণে সমগ্র বায়ুমণ্ডলে আলোড়ন উপস্থিত হয়। তেমনিভাবে মহাত্মা আত্মোৎকর্ষের সাহায্যে একটি সমগ্র জাতির মধ্যে অত্যাশ্চর্যরূপে প্রাণশক্তি ও বীর্য সঞ্চারিত করেন।' স্বামীজীর দলে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা ঐ কালে চুপ করিয়া ছিলেন বলিয়া স্বামীজী আমার ঐ কথাগুলি শুনিতে পাইলেন ও অকস্মাৎ থামিয়া

গিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'হাঁ। আমার গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এইরূপই ছিলেন'।"

লাহোরে স্বামীজী দশ-এগার দিন ছিলেন। বক্তৃতাগুলির বিবরণ আমরা গুডউইনের লেখা হইতে খানিকটা পাইয়াছি। আরও জানা যায় যে, প্রথম দিনে রাজা ধ্যান সিংহের হাবেলিতে 'আমাদের বর্তমান সমস্যাসমূহ' বিষয়ে বক্তৃতাকালে বক্তৃতাস্থলে তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় সেদিন এতই কলরব হইতেছিল যে, স্বামীজী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সেই উচ্চধ্বনির ঊর্ধ্বে স্বীয় কণ্ঠস্বর উঠাইতে পারিলেন না এবং গোলমালও সম্পূর্ণ থামিল না। অতএব তিনি কোন প্রকারে দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া বক্তব্য বিষয়টি অসম্পূর্ণ রাখিয়াই আসন গ্রহণ করিলেন। এই বক্তৃতা পরে 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি' নামে প্রকাশিত হয়। ('বাণী ও রচনা', ৫।২৬৭ পৃঃ)

তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা হয় ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের তাঁবুতে। লালা বালমুকুন্দ সভাপতি ছিলেন এবং উহার সারাংশ লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল ভক্তি। সার্কাসের ক্রীড়াভূমিতে বক্তৃতা হইতেছিল ; এদিকে রাত্রি আটটার পরেই সার্কাস আরম্ভ হইবে। মতিবাবু বলিয়া রাখিয়াছিলেন, আটটার আগেই যেন সভা শেষ হয়। বক্তৃতা চলিতেছে, এমন সময় স্বামীজী লক্ষ্য করিলেন মতিবাবু ঘড়ি দেখিতেছেন। স্বামীজী ভাবিলেন, মতিবাবু সঙ্কেত করিতেছেন যে, বক্তৃতা বন্ধ করার সময় হইয়াছে ; সুতরাং তিনি বক্তব্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই ভাষণ শেষ করিলেন। ফলতঃ বক্তা বা শ্রোতা কাহারও তৃপ্তি হইল না।

লাহোরবাসীদের আশা মিটিল না ; অতএব ধ্যান সিংহের হাবেলিতে তৃতীয় আর একটি বক্তৃতার আয়োজন হইল। ঐ বক্তৃতার তারিখ ছিল ১২ই নভেম্বর। সেদিন সর্বপ্রকার বন্দোবস্তের ভার ছিল কলেজের ছাত্রদের উপর। সভায় যাহাতে গোলমাল না হয়, এবং অতিরিক্ত লোকসমাগমবশতঃ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব না হয়, সেজন্য সেদিন বিনা মূল্যে টিকিট বিতরিত হইয়াছিল এবং শ্রোতাদের বসিবার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উপযুক্ত সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের সমাবেশ দেখিয়া স্বামীজীর বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্য সেদিন পূর্ণ শক্তিতে প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রোতাদের উপর ইহার প্রভাবও হইয়াছিল অদ্ভুত—সকলেই

আড়াই ঘণ্টাব্যাপী এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা নীরবে বসিয়া মনোযোগসহকারে শুনিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি বন্ধুবান্ধবকে বলিয়াছিলেন, "হাঁ, এই বক্তৃতায় 'মাল' আছে।" মনে হয় ইহাই স্বামীজীর ভারতে প্রদত্ত ভাষণগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

বক্তৃতাগুলি সম্বন্ধে ও স্বামীজীর ব্যক্তিগত প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক তীর্থরাম ১৬ই নভেম্বর (১৮৯৭) পণ্ডিত দীনদয়াল শর্মা, ব্যাখ্যান-বাচস্পতিকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ; আমরা নিম্নে উহার অনুবাদ দিলাম। তীর্থরাম নিজে বেদান্তবাদী ছিলেন বলিয়া স্বভাবতই ভক্তিবাদের প্রতি তাঁহার তেমন আকর্ষণ ছিল না ; আর স্বামীজীর ঐ বিষয়ক বক্তৃতাটি অকস্মাৎ থামিয়া যাওয়ায় উপযুক্ত প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে নাই ; তাই তীর্থরামের পত্রে ঐ বিষয়ে একটু অতৃপ্তির স্পর্শ থাকিলেও শেষ বক্তৃতাটির তিনি উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ পত্রেই স্বামীজীর আমিষাহারের কথাও আছে। মনে হয় স্বামীজী খোলাখুলি-ভাবেই তীর্থরামকে উহা বলিয়াছিলেন—রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলার তো তাঁহার অভ্যাস ছিল না! পত্রখানি এই :

"প্রণাম। দশ দিন এখানে থাকার পর স্বামী বিবেকানন্দজী কাল দেরাদুন অভিমুখে যাত্রা করিলেন (সোমবার, ১৫ই নভেম্বর)। তিনি এখানে ইংরেজীতে তিনটি বক্তৃতা দেন। স্বামীজী সনাতন ধর্মসভার অতিথিরূপে ছিলেন ; তিনি রাজা ধ্যান সিংহের হাবেলিতে বাস করিয়াছিলেন। ঐ স্থানেই প্রথম ও তৃতীয় বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়। আজকাল তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে এবং চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে মাংস ও শাকসব্জী আহার করিতে হয়। তিনি হুঁকাতে তামাকও খান। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন (বঙ্গদেশাগত) তিন জন সন্ন্যাসী ও একজন ইংরেজ মহিলাসহ তিনজন ইংলণ্ডনিবাসী। এই ইংরেজদের মধ্যে একজন ছিলেন সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ; ইনি বক্তৃতাদানকালে স্বামীজীর ভাষণ লিখিয়া লইতেন এবং 'ব্রহ্মবাদিন' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদিগকে উহা পাঠাইতেন। এই ইংরেজ ভদ্রলোকটি বেশ কার্যপারদর্শী ও স্বামীজীর প্রতি অশেষ ভক্তিপরায়ণ। অপর দুইজন ইংলণ্ডনিবাসী খুব ধনী এবং স্বামীজীর ব্যয়ভার সাধারণতঃ ইহারাই বহন করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তৃতাদ্বয় ইত্যবসরে 'ট্রিবিউনে' প্রকাশিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তৃতীয় বক্তৃতাও ঐ পত্রিকায় মুদ্রিত

হইবে। প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ'। বক্তৃতাটি মোটের উপর বেশ ভালই হইয়াছিল; এমন কি, অনেকের দৃষ্টিতে উহাকে অত্যুত্তমও বলা চলে।

"দ্বিতীয় বক্তৃতাটি ছিল 'ভক্তি' বিষয়ে। ইহা হৃদয়গ্রাহী হয় নাই, অনেকে নিরাশ হইয়াছিলেন। তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বেদান্ত'; ইহা পূর্ণ সার্ধ দুই ঘণ্টা ধরিয়া চলিয়াছিল। শ্রোতারা ইহাতে এত মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন এবং উহাতে এমন এক পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল যে, স্থান ও কালের বোধ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে বোধ হইতেছিল যেন বিশ্বাত্মার সহিত নিজের সম্পূর্ণ অভেদানুভূতি জাগিতেছে। ইহা পৃথক ব্যক্তিত্ববোধ ও অহঙ্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহা এতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল যে, এইরূপ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। শ্রোতাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর; আর তাঁহারা ইংরেজ, মুসলমান, আর্যসমাজী, ব্রাহ্মসমাজী বা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, সকলেরই নিকট উহা এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গী খুলিয়া দিয়াছিল। মিশনারীদের কলেজের অধ্যক্ষ এবং ইওরোপীয় অধ্যাপকরাও ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

"প্রকাশ্য বক্তৃতা হইয়াছিল ঠিকই; তবে বৈঠকী আলোচনায় তাঁহার জ্ঞানরাশির স্ফুরণের যেমন অবকাশ ঘটে বক্তৃতায় তেমন হয় না। কথাবার্তায়ই তাঁহার সর্বাধিক উৎকর্ষ। ঘরোয়াভাবে তিনি আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের সহিত যে আলোচনা করিয়াছিলেন, আমি তাহাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাঁহাদের প্রশ্নগুলির এমন সব সাংঘাতিক উত্তর দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনুসৃত মতগুলির এমন একটি ছবি তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যে, তাঁহারা একেবারে খেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অথচ মজার বিষয় এই যে, তিনি এমন একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নাই, যাহাতে তাঁহাদের মনে আঘাত লাগিতে পারে। ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি তাঁহাদের স্বমুখে স্বীকার করাইয়া ছাড়িলেন যে, তাঁহাদের মতগুলি অসার। আর্যসমাজের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। স্বামীজী প্রকাশ্য সভায় পুরাণগুলি, শ্রাদ্ধ ও মূর্তিপূজার সমর্থন করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যও তাঁহার যথেষ্ট আছে। অনেকগুলি শ্রুতিবাক্য তাঁহার মুখস্থ। তিনি 'শারীরক-সূত্রে'র শঙ্করভাষ্য, রামানুজভাষ্য ও মধ্বভাষ্য অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বল্লভাচার্যের অনুভাষ্যও পড়িয়া থাকিবেন। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত।

ভগবদ্‌গীতার তিনি অপূর্ব ব্যাখ্যাকার। আর তাঁহার গান বড়ই সুমিষ্ট।… স্বামীজীর আগমনে সমগ্র নগরটি উপকৃত হইয়াছে।…আমার প্রতি স্বামীজী খুবই সদয় ও স্নেহপূর্ণ ছিলেন।…

এফ. সি. কলেজ ভবদীয় দাস
১৬ই নভেম্বর, ১৮৯৭ রাম।"

তীর্থরাম সম্বন্ধে আর একটি চমৎকার ঘটনা জানা যায়। সৌহৃদ্যের পরিচয়-স্বরূপে তীর্থরাম স্বামীজীকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন। স্বামীজী উহা সাদরে স্বহস্তে গ্রহণপুরঃসর তৎক্ষণাৎ তীর্থরামের পকেটে পুনঃ স্থাপনপূর্বক বলেন, "বেশ তো বন্ধু, আমি উহা এই পকেটেই পরিব"—বলিয়া তিনি তীর্থরামের দিকে তাকাইয়া বেশ অর্থপূর্ণভাবে একটু মুচকি হাসিলেন। স্বামীজী অদ্বৈতবাদী, তীর্থরামও তাই—উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মসত্তার কোন ভেদ তো স্বীকার করা চলে না!

লাহোরে যেসব অপূর্ব বৈঠকী আলোচনার কথা শ্রীযুক্ত তীর্থরাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়া আসিয়াছি। আরও জানা যায়, একদিন লাহোরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের লইয়া একটি সান্ধ্য সম্মেলনের আয়োজন হয় এবং উহাতে স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেক গণ্যমান্য নাগরিক তাঁহাকে স্ব স্ব গৃহে নিমন্ত্রণপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। এই সকল স্থলেই ভোজন একটি উপলক্ষ মাত্র ছিল; সর্বত্রই স্বামীজীকে গভীর আলোচনাদিতে লিপ্ত হইতে হইত। আবার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অপরের অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সাধনপ্রণালী শিখিয়া লইতেন বা তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিতেন। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক কমিসারিয়েটের কার্যোপলক্ষে লাহোরের নিকটবর্তী মিয়ানমীরে বাস করিতেন। ইঁহারা একদিন স্বামীজীকে তাঁহার সঙ্গীদের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া ফলমূল ও মিষ্টান্নাদির দ্বারা জলযোগ করাইলেন এবং তাঁহার মধুর অথচ শিক্ষাপ্রদ উপদেশ শুনিয়া জীবন ধন্য করিলেন।

লাহোরে শিখসম্প্রদায়ের শুদ্ধিসভা নামে একটি সংস্থা ছিল। কোন শিখ মোহবশতঃ মুসলমান ধর্ম গ্রহণের পর অনুতপ্ত হইয়া শিখসম্প্রদায়ে পুনঃপ্রবেশের

প্রার্থী হইলে এবং সে ভ্রমবশতই ঐরূপ করিয়াছিল ও ভবিষ্যতে 'সদ্ধর্মে' থাকিয়া উৎকৃষ্ট জীবনযাপন করিতে সত্যই আগ্রহান্বিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে ঐ শুদ্ধিসভা তাহাকে শিখ করিয়া লইত। সভার নিমন্ত্রণক্রমে স্বামীজী একদিন সদলবলে ঐরূপ এক অনুষ্ঠানকালে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, একটি বৃহৎ কড়ায় 'কড়া-প্রসাদ' (হালুয়া) প্রস্তুত হইতেছে। একটু পরেই দুইজন আবেদনকারীর শুদ্ধির জন্য সভার কার্য আরম্ভ হইল। প্রথমে সভার সম্পাদক তাহাদের শিখধর্মত্যাগের ঘটনাপরম্পরা বুঝাইয়া দিলেন। পরে প্রার্থিদ্বয় সভাসমক্ষে অনুতাপ প্রকাশপূর্বক শিখসম্প্রদায়ে পুনগ্র্হণের জন্য অনুনয় জানাইল। অতঃপর গুরুগোবিন্দ সিংহের নামোচ্চারণ, গ্রন্থসাহেব হইতে পবিত্র মন্ত্রপাঠ ও তীর্থবারিসেচনে উহাদিগকে শুদ্ধ করা হইল। পরিশেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে 'কড়া-প্রসাদ' বিতরিত হইল। শুদ্ধিবিষয়ে শিখদিগের এই উদার ভাব দেখিয়া স্বামীজী বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। জীবন্তসম্প্রদায় এমনিভাবেই আত্মরক্ষা ও আত্মসম্প্রসারণ করে—কেহ কোন কারণে ধর্মচ্যুত হইলে তাহাকে চিরকালের জন্য বিসর্জন দেয় না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিকথা হইতে লাহোরের দুই-একটি ক্ষুদ্র অথচ মনোজ্ঞ ঘটনা জানিতে পারা যায়। স্বামীজী ও নগেন্দ্রবাবু একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীযুক্ত বক্সী জয়শী রামের গৃহে গিয়াছিলেন। জয়শী রাম পূর্বে স্বামীজীকে ধরমশালায় দেখিয়াছিলেন। ঐ গৃহে উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী ধূমপানের জন্য স্বামীজীকে একটি নূতন সুন্দর হুঁকা দিলেন। কিন্তু হুঁকা ব্যবহারের পূর্বেই স্বামীজী গৃহকর্তাকে সাবধান করিয়া দিলেন, "জাতিভেদ সম্বন্ধে আপনার কোন দৃঢ় সংস্কার থাকলে আমায় আপনার হুঁকো দেবেন না, কারণ কাল যদি কোন অচ্ছুত আমাকে ধূমপানের জন্য তার হুঁকো দেয়, আমি সানন্দে উহাতে পান করব, কেন না আমি জাতের গণ্ডির বাইরে চলে গেছি।" গৃহকর্তা সবিনয়ে বলিলেন যে, স্বামীজী ধূমপান করিলে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন।

স্বামীজী তাঁহার দুইজন সঙ্গীর সহিত নগেন্দ্রবাবুর গৃহেই বাস করিয়াছিলেন, যদিও লাহোরের অভ্যর্থনাকারীরা তাঁহার জন্য একটি বড় বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সুযোগে স্বামীজীর সহিত নগেন্দ্রবাবুর অনেক ঘনিষ্ঠ আলোচনা হইত। একদিন স্বামীজী বলিলেন, "ভারতের মধ্যবিত্তরা বীর্যহীন

হয়ে গেছে ; দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কোন কাজে দীর্ঘকাল লেগে থাকার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছে ; ভারতের ভবিষ্যৎ এখন জনসাধারণের হস্তে।"

এক সন্ধ্যায় তিনি চিন্তাকুলচিত্তে নগেন্দ্রবাবুর নিকট আসিয়া বলিলেন, "এতে করে যদি দেশের কোন কল্যাণ হয় তো আমি হাসিমুখে জেলে যেতে রাজী আছি।" সত্ত বিজয়গৌরবমণ্ডিত স্বামীজী দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সেই গৌরব উপভোগের কথা ভুলিয়া গিয়া তখন প্রয়োজন হইলে এবং ফলপ্রসূ হইলে আত্মবলিদানপূর্বক দেশের মঙ্গলসাধনের কথাই ভাবিতেছিলেন ; আর ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে দেশবরেণ্য অনেক দেশপ্রেমিককে কারাবরণ করিতে হইতেছে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত তখন খুবই দুঃখভারাক্রান্ত ছিল।[৫]

ঐ কালে তিনি জাপানের ও জাপানীদের দেশপ্রীতির খুব প্রশংসা করিয়া বলিতেন : "তাহাদের নিকট তাহাদের স্বদেশই ধর্ম ! 'মহামহিম জাপান দীর্ঘজীবী হউক'—ইহাই তাহাদের জাতীয় জয়ধ্বনি। সর্বাগ্রে ও সর্বোপরি স্বদেশ। স্বদেশের সম্মান ও অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য কোনরূপ স্বার্থত্যাগই অসম্ভব নহে।" ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ১৭)।

৫। জুলাই মাসের ২৭ তারিখে (১৮৯৭) বাল গঙ্গাধর তিলক রাজবিদ্রোহের অপরাধে বোম্বে সরকার কর্তৃক ধৃত হন এবং আদালতের বিচারে তিনি দেড় বৎসর কারাবাসের দণ্ডপ্রাপ্ত হন।

ভারতীয় প্রচারের শেষ পর্যায়

স্বামীজীর খুবই ইচ্ছা ছিল পাঞ্জাব হইতে সিন্ধুদেশে যান ; সেখানে তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবারও অভিলাষ ছিল। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার যাওয়া হইল না, তিনি লাহোর হইতে দেরাদুন যাত্রা করিলেন। ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত তাঁহার ১৫ই নভেম্বরের পত্রে কারণগুলি এইরূপ দেখানো হইয়াছে : "প্রথমতঃ ক্যাপ্টেন এবং মিসেস সেভিয়ার নামক যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমার সহিত আজ প্রায় নয়মাস ফিরিতেছেন, তাঁহারা দেরাদুনে জমি খরিদ করিয়া একটি অনাথালয় করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র।…দ্বিতীয়তঃ আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এক্ষণেও আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটি মঠ হয়—তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অপিচ দেশের লোক বরং পূর্বে আমাদের মঠে যে সাহায্য করিত, তাহাও বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে, আমি ইংলণ্ড হইতে অনেক অর্থ আনিয়াছি !! তাহার উপর এবার মহোৎসব হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব ; কারণ রাসমণির (বাগানের) মালিক বিলাতফেরত বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দেবেন না !! অতএব আমার প্রথম কর্তব্য এই যে, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে দুই-চারিটি বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় একটি স্থান করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা।… কলিকাতায় এক মঠ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এত যে সারা জীবন দুঃখে-কষ্টে কাজ করিলাম, সেটা আমার শরীর যাওয়ার পর নির্বাণ যে হইবে না, সে ভরসা হয়। আজই দেরাদুনে চলিলাম।"

স্বামীজী দিন সাতেক দেরাদুনে থাকার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ; কিন্তু কার্যতঃ দশ দিন ছিলেন, ইহা স্বামী প্রেমানন্দকে লিখিত ২৪শে নভেম্বরের পত্রে জানা যায়। দেরাদুনে তিনি কোথায় ছিলেন, জানা নাই—পত্রে তিনি সেখানের ঠিকানা দিয়াছেন "কেয়ার অব পোস্ট-মাস্টার"। তথায় তাঁহার পূর্বপরিচিত টিহিরির দেওয়ান শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত পুনর্মিলন ঘটিয়াছিল। ভট্টাচার্য মহাশয় তখন ঘাড়ের ব্যথায় ভুগিতেছিলেন, স্বামীজীরও অনুরূপ রোগ ছিল ; তাই তিনি উক্ত পত্রে স্বামী প্রেমানন্দের নিকট কিঞ্চিৎ পুরাতন ঘৃত চাহিয়াছিলেন।

দেরাদুনে কোন বক্তৃতা বা জনসাধারণের মধ্যে অন্য কোন প্রকার প্রচারকার্য হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই। তথাপি অক্লান্তকর্মী স্বামীজীর বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। তিনি এখানে পূর্ণোৎসাহে সঙ্গীদিগকে ব্রহ্মসূত্রের রামানুজভাষ্য পড়াইতে লাগিয়া গেলেন। এই অধ্যাপনাকর্মে তিনি প্রায়ই এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সেভিয়ার-দম্পতি তাঁহাকে সান্ধ্যভ্রমণে লইয়া যাইবার জন্য পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেও খেয়াল হইত না। এখানে যে অধ্যাপনা আরম্ভ হয়, তাহা পরবর্তী ভ্রমণকালেও যথারীতি চলিতে থাকে—একদিনও বাদ পড়ে নাই। ব্রহ্মসূত্রের সহিত ঐ সময়ে সাংখ্যদর্শনপাঠও চলিতেছিল। উহা পড়াইতেন স্বামী অচ্যুতানন্দ ; কিন্তু স্বামীজী প্রায়ই পাঠকালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। অচ্যুতানন্দ সংস্কৃতভাষায় পারদর্শী হইলেও মাঝে মাঝে শাস্ত্রের মর্মার্থ ব্যাখ্যায় তাঁহার অসুবিধা হইত, অমনি তিনি স্বামীজীর সাহায্য চাহিতেন, আর স্বামীজী অবলীলাক্রমে ঐসব দুরূহ স্থল সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিতেন। ইহাতে উপস্থিত সকলে খুবই বিস্মিত হইতেন।

দেরাদুন হইতে স্বামীজী রাজপুতানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার গন্তব্য স্থান ছিল খেতড়ী। রাজা অজিত সিংহ তখন ইংলণ্ডের রাজদরবার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বোম্বেতে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে স্বামীজীর নির্দেশ মত রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ হইতে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানানো হইয়াছিল। সম্প্রতি রাজা গুরুপাদদর্শনে ব্যাকুল ছিলেন, আচার্যপ্রবরও উপযুক্ত শিষ্যকে দর্শন দিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। অতএব তিনি সাহারাণপুর, দিল্লী, আলোয়ার ও জয়পুরের পথে খেতড়ীতে চলিলেন। দিল্লীতে তিনি মাত্র চারি-পাঁচ দিন অবস্থান করেন। এখানে কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে না উঠিয়া তিনি নটকৃষ্ণ নামক এক গরীব শিষ্যের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। আমেরিকায় যাইবার বহু পূর্বে হাতরাস স্টেশনে এই ভদ্রলোকের সহিত স্বামীজীর আলাপ হয় এবং সেই সূত্রে উক্ত ভক্তের জীবনে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। ভদ্রলোক বরাবরই সরলপ্রকৃতি ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন এবং স্বামীজীকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দজী (সুধীর মহারাজ) বলিয়াছিলেন, "আমেরিকা যাইবার পূর্বে এক সময়ে স্বামীজী রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কষ্টে অতিশয় অস্থির হইয়া ইঁহার নিকট একখানি মধ্যম (ইণ্টার) শ্রেণীর টিকেট প্রার্থনা করায় ইনি বলিয়াছিলেন, 'কি গুরুজী, বিলাস ঢুকছে নাকি'?" বিদেশপ্রত্যাগত

স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব এখন বিশালতর এবং সকলেই তাঁহাকে অধিকতর সম্ভ্রম করিয়া চলিলেও নটকৃষ্ণবাবু অপরিবর্তিত ছিলেন এবং পূর্ববৎ অবাধ ও অকপট ভাবেই গুরুজীর সহিত কথাবার্তা চালাইতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "গুরুজী, প্রায় পাঁচ-ছয় মাস যাবৎ সন্ধ্যে আহ্নিক কচ্ছি, কিন্তু কিছু পাচ্ছি নে।" স্বামীজী বলিলেন, "ভাষায় ভগবানকে ডাক দেখি" (অর্থাৎ দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সহজবোধ্য মাতৃভাষা ব্যবহার কর)। এই বলিয়া তিনি গায়ত্রীর অর্থটি বেশ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। নটুবাবু আর একদিন স্বামীজীর জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্যের শিখা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এটি আবার কি?" ব্রহ্মচারী উত্তর প্রদানে ইতস্তত: করিতে থাকিলে স্বামীজী বলিলেন, "ও ব্রহ্মচারী কিনা তাই শিখা রেখেছে।" নটুবাবু অমনি চক্ষু টিপিয়া টিপ্পনী কাটিলেন, "আর আপনি বুঝি পরমহংস হয়েছেন?" এই শিষ্যের সহিত স্বামীজীর ভাববিনিময় এইরূপ স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন ধারাবলম্বনেই চলিত। উভয়ের মধ্যে স্নেহপ্রীতিও ছিল ভরপুর আর নটুবাবু স্বামীজীর সেবা করিতেন প্রাণপণে; স্বামীজীর শিষ্যবৃন্দও তাঁহার যথেষ্ট আদরযত্নের অধিকারী ছিলেন।

দিল্লীর মহাবিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ঘন ঘন স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। ইঁহার উৎসাহ ও উদ্যোগে স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক একটি ক্ষুদ্র আসরে সমবেত হইয়া স্বামীজীকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। স্বামীজী প্রত্যেক প্রশ্নেরই সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং ইহাতে উপস্থিত সকলেই বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। স্বামীজী পূর্বে দিল্লী দেখিয়া থাকিলেও আবার সকলের সহিত লাল কেল্লা, কুতব মিনার ও অন্যান্য প্রাচীন স্থাপত্যনিদর্শনাদি দেখিয়া লইলেন, ঐসকল দর্শনকালে তিনি সঙ্গীদিগকে ইতিহাস অবলম্বনে উহাদের সহিত জড়িত ঘটনাবলী চিত্তাকর্ষক গল্পাকারে বলিয়া যাইতেন। সঙ্গীদের একজন পরে বলিয়াছিলেন, "তিনি অতীতকে জীবন্ত আকারে আমাদের সামনে তুলে ধরতেন। সত্য বলতে কি, আমরা অতীতের মধ্যে বর্তমানকে হারিয়ে ফেলতাম ও প্রাচীনকালের মৃত সম্রাটগণ ও শক্তিশালী রাজাদের সান্নিধ্য উপভোগ করতাম।" এই পর্যন্ত সেভিয়ার-দম্পতিও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

দিল্লী হইতে স্বামীজী ১লা ডিসেম্বর ট্রেনে আলোয়ারে চলিলেন। চারিদিকে বালির পাহাড়ের মধ্য দিয়া ট্রেন ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে যখন রেওয়াড়ি স্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন দেখা গেল, খেতড়ীর রাজার লোক স্বামীজীকে লইয়া

যাইবার জন্য পালকি, উট, ঘোড়া প্রভৃতি বিবিধ যানবাহনসহ তথায় উপস্থিত। খেতড়ী ছিল তখন জয়পুরের অধীনস্থ একটি সামন্ত রাজ্য। জয়পুর হইতে মরুভূমির পথে উহার দূরত্ব প্রায় নব্বই মাইল; কিন্তু রেওয়ারী হইতে কুড়ি মাইল কম। তাই রাজা অজিত সিংহ এই নাতিদীর্ঘ পথই স্বামীজীর ভ্রমণের পক্ষে প্রকৃষ্টতর মনে করিয়াছিলেন। এদিকে আলোয়ারে স্বামীজীর অনেক ভক্ত তাঁহার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং তথায় যাইবার জন্য পূর্বেই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এই নির্বন্ধাতিশয় উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পক্ষে সোজা খেতড়ী যাওয়া শোভা পায় না। অতএব রেওয়ারীতে না নামিয়া তিনি আপাততঃ আলোয়ারে গেলেন। ঐ স্টেশনে পৌছাইলে দেখা গেল বহু পরিচিত বন্ধুবান্ধব তাঁহার স্বাগত সম্ভাষণের জন্য সমবেত হইয়াছেন—চারিদিকে লোকের ভিড় এবং নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া দুই-চারিটি কথা বলিবার জন্য ব্যগ্র। এমন সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল, যাহাতে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ দিকের পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার একজন পুরাতন অনুরক্ত ভক্ত দূরে দাঁড়াইয়া আছেন—দীনহীন বেশ। তাঁহার চোখেমুখে স্বামীজীর দর্শনে আনন্দ ফুটিয়া উঠিলেও এবং স্বামীজীর সান্নিধ্যলাভের আগ্রহ সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট দেখা গেলেও সম্মানিত ভদ্রলোকদের ঠেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে তাঁহার সাহসে কুলাইতেছে না। অমনি স্থান-কাল, আদব-কায়দা, লোকলজ্জা ইত্যাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, "রামস্নেহী, রামস্নেহী!" স্বামীজীর ভুল হয় নাই, ইনি রামস্নেহীই বটে! চারিপার্শ্বের ভিড় সরাইয়া তিনি রামস্নেহীকে নিকটে আনাইলেন এবং পূর্বেরই মতো প্রাণ খুলিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর ইহাই ছিল স্বভাব। আলমোড়ায় অভ্যর্থনা-সভার একপ্রান্তে তাঁহার প্রাণরক্ষক এক মুসলমান ফকিরকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি এমনিভাবে—তাহাকে কাছে আনাইয়া সভার নিকট পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। মাদ্রাজে পুনরাগমনের পর যখন তিনি বিরাট মিছিলের মধ্যে গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন তখন হঠাৎ দেখিলেন পথপার্শ্বে একখানি পরিচিত মুখ—স্বশিষ্য স্বামী সদানন্দের। অমনি তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "সদানন্দ বাবা, সদানন্দ বাবা, এদিকে এস।" গাড়ী থামানো হইল, সদানন্দ উহাতে উঠিলেন এবং একসঙ্গে

চলিলেন। স্বামীজী যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন, তখন উপেন্দ্রবাবু নামক এক যুবক তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে বিদেশপ্রত্যাগত স্বামীজী একদিন কলিকাতায় বলরামবাবুর গৃহে আছেন, এমন সময় উপেন্দ্রবাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তখন প্রায় পঞ্চাশ জন লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আলাপ-আলোচনায় নিরত ছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন ও দ্রুত আসন ছাড়িয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। উপেন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন যে, সে আলিঙ্গনে তাঁহার পাঠ্যাবস্থার স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল এবং তখনকার মতো তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্ববিজয়ী-সন্ন্যাসীরূপে না পাইয়া বাল্যসখারূপেই পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক স্বামীজী একদিনও যাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত থাকিয়া যাইত, এবং ঐ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রেমসমুদ্র উথলিয়া উঠিত।

আলোয়ারেও তাহাই হইল—এখানেও পুরাতন বন্ধু ও ভক্তদের মধ্যে তিনি সানন্দে তিন-চারিদিন কাটাইলেন। রাজ্যের মহারাজ তখন নগরে ছিলেন না; তথাপি স্বামীজীর আদর-আপ্যায়ন ও সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হইল না। ভক্তবৃন্দ তো ছিলেনই; তদুপরি রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারী সর্বপ্রকার সুব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। মহারাজের একটি বাড়ী তাঁহার ও সঙ্গীদের আবাসের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সেখানে নিত্য প্রচুর লোকসমাগম হইত। স্বামীজী তাহাদের মধ্যে বসিয়া অতীত কালেরই মতো গল্পগুজব করিতেন, উপদেশ দিতেন, পাশ্চাত্ত্যদেশে স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা বলিতেন, ভারতীয় কার্যের পরিকল্পনা শুনাইতেন। আগন্তুকেরা দেখিতেন, স্বামীজীর মন পার্থিব সম্মানে বিকৃত হয় নাই, পাশ্চাত্ত্যের ঐশ্বর্য তাঁহার দেশপ্রীতিকে ম্লান করে নাই, অগণিত নূতন বন্ধুলাভেও তাঁহার চিরন্তন স্নেহপ্রীতি মুছিয়া যায় নাই। কথাবার্তায় ছিল তাঁহার এক অতীত-সুলভ সরলতা, ভালবাসা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা। তাঁহার সেখানে অবস্থানের সুযোগে এক-আধটি বক্তৃতাও হইয়াছিল।

পূর্ববারে স্বামীজী আলোয়ারবাসীদের হৃদয়ে যে ধর্মোৎসাহ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন,তাহা তখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকায় অনেকেই তাঁহাকে স্বগৃহে একান্তভাবে পাইবার জন্য লালায়িত ছিলেন, অতএব নিমন্ত্রণের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। স্বামীজীর পক্ষে অল্পসময়ের মধ্যে সকলকে আপ্যায়িত করা সাধ্যায়ত্ত

ছিল না। কিন্তু একজনের আমন্ত্রণ তিনি পরম সমাদরে স্বীকার করিয়াছিলেন—সে একটি বৃদ্ধার। পূর্বে তিনি তাঁহার গৃহে একবার ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবারে তিনি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার মোটা চাপাটি খাইতে তিনি বড়ই উৎসুক।[১] শুনিয়া বৃদ্ধার চিত্ত আনন্দে নাচিয়া উঠিল আর নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া গেল। যথাকালে অভ্যাগত সকলকে পরিবেশন করিতে করিতে তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, "বাছা, আমার তো ইচ্ছা করে তোমাদের ভাল ভাল জিনিস খেতে দিই; কিন্তু আমি গরীব। ভাল জিনিস কোথায় পাব বল?" স্বামীজী পরম সন্তোষ-সহ বৃদ্ধার পরিবেশিত খাদ্যগুলি গ্রহণ করিতে করিতে শিষ্যদিগকে বলিলেন, "দেখছ হে, বুড়ীমার কি স্নেহ—আর এ চাপাটিগুলি কি সাত্ত্বিক!" বৃদ্ধাকে দারিদ্র্যে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া এবং তাঁহার পূর্বেকার স্নেহ-মমতার কথা ভাবিয়া স্বামীজী বিদায়কালে বৃদ্ধার অজ্ঞাতসারে গৃহস্বামীর হস্তে একখানি একশত টাকার নোট দিয়া গেলেন—ঐ ব্যক্তির কোন প্রতিবাদই গ্রাহ্য করিলেন না।

আলোয়ার হইতে সকলে জয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা খেতড়ীর রাজার বাঙ্গলোয় আশ্রয় লইলেন।[২] আশ্রয়স্থলে আরামে বসিয়া স্বামীজী পূর্বকথা স্মরণপূর্বক শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "এখানেই একদিন সামান্য ফকিরবেশে এসেছিলাম—তখন রাজপাচক অনেক মুখনাড়া দিয়ে দিনান্তে চারটি খেতে দিয়ে যেত; আর এখন পালকের গদিতে শয়নের বন্দোবস্ত হচ্ছে, কতলোক সেবার জন্য অহরহ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রয়েছে। এ কথাটি অতি সত্য যে, 'অবস্থা পূজ্যতে রাজন্, ন শরীরং শরীরিণাম্!'" এখানেও অন্যান্য স্থানের ন্যায় নগরবাসী অনেকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্তায় অনেকখানি সময় কাটিত; আবার যখনই অবসর পাইতেন তখনই তিনি সঙ্গীদিগকে লইয়া শাস্ত্রচর্চায় মগ্ন হইতেন। বস্তুতঃ এই ভ্রমণকালেও তিনটি চিন্তা তাঁহার মনে সর্বদা জাগরূক ছিল—প্রথমতঃ সঙ্গীদিগকে

১। 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা'র মতে একই সময়ে একজন বড়লোক ও ঐ বৃদ্ধা নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে স্বামীজী বৃদ্ধার নিমন্ত্রণই গ্রহণ করেন (৩২০ পৃঃ)।

২। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা 'উদ্বোধনে' (২৪৪ পৃঃ) শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখিয়াছেন যে, স্বামীজী একবার জয়পুরে আসিয়া শ্রীযুক্ত সংসার সেনের বাটীতে উঠিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহা খেতড়ী-রাজের সহিত পরিচয়ের পূর্বে আবু যাওয়ার পথে হইয়াছিল।

উপযুক্ত শিক্ষাদান এবং দ্বিতীয়তঃ সম্ভব হইলে তাঁহাদিগকে বিভিন্নকার্যে বা আশ্রমস্থাপনে নিয়োগ। স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে জানা যায়, তিনি কাশ্মীর, পাঞ্জাব, দেরাদুন ও আলমোড়ায় কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। শিষ্যদের দ্বারা কার্য করাইবার চেষ্টায় বিফল হইয়া তিনি ৮ই ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে জানাইয়াছিলেন, "আমরা কাল খেতড়ী যাত্রা করিব।···খেতড়ী হইয়া সকলকেই মঠে পাঠাইবার সঙ্কল্প আছে। যে-সকল কাজ এদের দ্বারা হইবে মনে করেছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। অর্থাৎ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে কেহই যে কিছুই করিতে পারিবে না—তাহা নিশ্চিত। স্বাধীনভাবে না ঘুরিলে ইহাদের দ্বারা কিছুই হইবে না। অর্থাৎ আমার সঙ্গে থাকিলে কে ইহাদের পুঁছিবে—কেবল সময় নষ্ট। এইজন্য ইহাদের পাঠাইতেছি মঠে।" পত্রের অপরাংশে আছে, "কাজ আমি চাই—কোন ফাঁকিবাজ চাই না। যাদের কাজ করবার ইচ্ছা নেই—'যাদু, এই বেলা পথ দেখ' তারা।" তাঁহার তৃতীয় চেষ্টা ছিল, দেশী ও বিদেশী বন্ধুদের নিকট অর্থসংগ্রহপূর্বক কলিকাতার মঠটির স্থায়িত্ব সম্পাদন করা। এই তৃতীয় চেষ্টাটি অন্যভাবে কিঞ্চিৎ সফল হইয়াছিল; ইতোমধ্যে বিদেশ হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ আসিয়াছিল এবং উপযুক্ত জমি সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছিল।

জয়পুর হইতে ৯ই ডিসেম্বর খেতড়ী অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ হইল। দীর্ঘ মরুপথ—৯০ মাইল ধরিয়া চলিয়াছে; প্রাকৃতিক শ্যামলশ্রী নাই, শুধু একঘেয়ে বালি ও পথের উত্থান-পতন এবং সরল ও বক্রগতি। তাহার উপর পথশ্রম তো আছেই। কেহ চলিয়াছেন রথযোগে (একপ্রকার গোযানে), কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা উষ্ট্রপৃষ্ঠে। পথ চলিতে চলিতে কত প্রসঙ্গ, কত আনন্দের কথাই না হইতেছে! আবার কোনও পড়াওয়ে (পথমধ্যে বিশ্রামস্থানে) পৌছাইবামাত্র স্বামীজী সকলকে লইয়া বেদান্ত-অধ্যাপনে নিমগ্ন হইতেছেন। স্বামীজী একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি এক পড়াওয়ে ভূত দেখিয়াছিলেন।

১২ই ডিসেম্বর খেতড়ী-রাজ স্বয়ং বার মাইল পথ অগ্রসর হইয়া স্বামীজীর পাদবন্দনা করিলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় ছয় ঘোড়ার গাড়ীতে বসাইয়া রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। খেতড়ী রাজ্যে তখন মহাধুমধাম চলিতেছে। রাজা মাত্র কিছুদিন পূর্বে ইওরোপ ভ্রমণান্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে প্রজাগণ তাঁহার অভিনন্দন ও আপনাদের হর্ষপ্রকাশের জন্য মহোৎসবের

আয়োজন করিয়াছে। তাহার উপর আবার রাজগুরুর আগমনে সকলের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়াছে। তাই ঐ উপলক্ষে দিবসব্যাপী ভোজ, আতশবাজী, আলোকসজ্জা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিবিধ সমারোহের আয়োজন হইয়াছে ; রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও অভ্যর্থনার্থ সমবেত হইয়াছেন। সম্মেলনস্থলে স্বামীজী ও রাজা উপস্থিত হইলে উভয়কেই অভ্যর্থনান্তর অভিনন্দন প্রদত্ত হইল এবং উভয়েই সমুচিত উত্তর দিলেন। অতঃপর পর্বতচূড়ায় অবস্থিত একটি মনোহর বাঙ্গলোয় স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীদের আবাসস্থল নির্দিষ্ট হইল। এই দলে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দও ছিলেন। তিনি খেতড়ীর ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়া 'ব্রহ্মবাদিনে' যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহার আবশ্যকীয় অংশগুলির অনুবাদ দিলাম :

"রাস্তায় যত প্রকার ব্যবস্থা প্রয়োজনানুকূল ও আরামপ্রদ হইতে পারে তাহার সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া মহামান্য খেতড়ী-রাজ খেতড়ী হইতে জয়পুরে পাঠাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং বার মাইল অশ্বশকটে অগ্রসর হইয়া স্বামীজীর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সমস্ত খেতড়ী নগর আনন্দ ও উৎসাহে পরিপুর্ণ ছিল। ইংলণ্ড ও ইওরোপে ভ্রমণ করিয়া সাফল্যমণ্ডিত মহামান্য রাজা স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসায় এবং ভগবদ্বিধানে ঠিক ঐ সময়েই তথায় স্বামীজীর আগমন হওয়ায় জনসাধারণের হৃদয়ের উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়াছিল ও নাগরিকগণ এক বিরাট ভোজ, উজ্জ্বল দীপালোক, আতশবাজীর আয়োজন করিয়াছিলেন। (সভায়) রাজাজী ও স্বামীজীকে অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইলে উভয়েই সমুচিত উত্তর প্রদান করিলেন।

"১১ই ডিসেম্বর[৩] (১৮৯৭) স্থানীয় বিদ্যালয়ে একটি সভায় রাজা ও স্বামীজী উভয়কেই বিবিধ সমিতির পক্ষ হইতে বহু অভিনন্দন প্রদত্ত হয় ; রাজাকে অভিনন্দনপ্রদানকারীদের মধ্যে কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ীর শিক্ষাবিভাগ এবং স্থানীয় যুবকবৃন্দের বিতর্ক-সমিতিও (ইয়ং মেনস ডিবেটিং ক্লাব) ছিলেন। তারপর বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক বালকগণ কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিল ; ইহাদের কয়েকটি বিশেষভাবে রাজার সম্মানার্থ রচিত হইয়াছিল। তারপর সভার

৩। ইংরেজী জীবনীতে ১১ই ডিসেম্বর উল্লিখিত হইলেও (৫৩৪ পৃঃ) স্বামীজীর ৮ই ডিসেম্বরের পত্রে ৯ই তারিখে খেতড়ী যাত্রার কথা থাকায় ১১ই তারিখ ভুল বলিয়া মনে হয়। খেতড়ী রাজ্যের দিনলিপিও (পরে দ্রষ্টব্য) ১৭ই তারিখের নির্দেশ করে।

সভাপতি খেতড়ী-রাজের অনুরোধে স্বামীজী মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করিলেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বাৎসরিক পুরস্কারবিতরণের জন্য এই অপূর্ব সুযোগটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজাজী সংক্ষেপে উত্তর দিতে গিয়া বিশেষভাবে রামকৃষ্ণ মিশনকে ধন্যবাদ জানাইলেন, কারণ মিশনের অধ্যক্ষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।… অবশেষে স্বামীজী স্বীয় স্বাভাবিক বাগ্মিতাবলম্বনে অনর্গল বক্তৃতার মুখে রাজাকে ধন্যবাদ জানাইলেন ও তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং ভারতের উন্নতিকল্পে সামান্য যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহাও রাজাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হইলে সম্ভব হইত না। তারপর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের তুলনা করিয়া তিনি বলিলেন, প্রতীচ্যের উদ্দেশ্য হইল সাংসারিক অভ্যুদয় আর প্রাচ্যের আদর্শ ত্যাগ। তিনি খেতড়ী-বাসী যুবকদিগকে উপদেশ দিলেন, তাহারা যেন পাশ্চাত্ত্যের আদর্শের চাকচিক্যে বিভ্রান্ত না হইয়া পূর্বদেশীয় আদর্শেই অনুরক্ত থাকে। তাঁহার মতে শিক্ষা বলিতে বুঝায়—মানুষের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে দেবত্ব অন্তর্নিহিত আছে উহাকে বিকশিত করা, অতএব শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার কালে উহাদের উপর আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। আমাদিগকে বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি শিশু অসীম দেবশক্তির ভাণ্ডারস্বরূপ এবং আমাদের চেষ্টা হইবে সেই অন্তঃস্থ সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগরিত করা। শিশুদের শিক্ষাদানকালে আর একটি স্মরণীয় বিষয় এই যে, তাহাদিগকে মৌলিক চিন্তা করিবার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিকতার অভাবই ভারতের বর্তমান অবনতির কারণ। তিনি বলিলেন, 'কেহই অপরকে শিখাইতে পারে না ; শিশুর উন্নতি নিজ প্রকৃতি অনুযায়ীই হইয়া থাকে, শিক্ষক শুধু উহার সাহায্য করেন।' তিনি শিশুদের শিক্ষার জন্য যে প্রণালীর নির্দেশ দিয়াছিলেন, উহা অনুসৃত হইলে তাহারা ঠিক ঠিক মানুষ হইবে, এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করিতে পারিবে।

"তারপর সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতিকে ধন্যবাদদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া সভার কার্য শেষ হইল।

"অভ্যর্থনাসভায় খেতড়ীর জনগণ প্রাচীন রীতির অনুসরণপূর্বক পাঁচখানি থালা স্বর্ণ-মোহরে পূর্ণ করিয়া রাজাকে উপহার দিল : রাজা আবার ঐ উপঢৌকনের অধিকাংশ রাজ্যের শিক্ষাকার্যের জন্য দান করিলেন। রাজাকে ভেট প্রদানের পর উপস্থিত সকল রাজকর্মচারী ও প্রজাবৃন্দ শ্রেণীবদ্ধভাবে পর পর স্বামীজীর

সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকে তাঁহাকে প্রণামান্তে দুইটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রণামী দিলেন। এই অনুষ্ঠানটিতে মোট দুই ঘণ্টা ব্যয়িত হইয়াছিল। খেতড়ী ত্যাগকালে রাজাজী স্বামীজীকে তিন সহস্র টাকা অর্পণ করিয়াছিলেন; উহা স্বামী সদানন্দ ও (বুড়ো) স্বামী সচ্চিদানন্দের মারফত মঠে প্রেরিত হইয়াছিল।

"২০শে ডিসেম্বর মহারাজের রাজপ্রাসাদে স্বামীজী বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রাসাদটি একটি পাহাড়ের উপর সুন্দরভাবে নির্মিত এবং স্বামীজী শিষ্যগণসহ উহাতে বাস করিতেছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং জনকয়েক ইওরোপীয়ান। সভাপতির আসনে উপবিষ্ট রাজা স্বামীজীকে শ্রোতাদের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলে আচার্যপ্রবর সার্ধ একঘণ্টা ব্যাপী যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, উহাতে তিনি স্বীয় উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন দুইটি সভ্যতার—গ্রীক সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার তুলনা হইতে আরম্ভ করিয়া ইওরোপের উপর—পিথাগোরাস, সোক্রেটিস ও প্লেটোর উপর, নব-প্লেটোবাদীদের উপর এবং পরে স্পেন, জার্মানী ও অপরাপর ইওরোপীয় জাতির উপর, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে, এমনকি আমাদের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার ইতিবৃত্ত খুলিয়া ধরিলেন। অতঃপর তিনি বেদসমূহ ও বৈদিক কাহিনীসমূহের আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখাইয়া দিলেন, উহার মধ্যে কত বিচিত্র ভাবধারা ও স্তরবিন্যাস রহিয়াছে। এই সমস্তের পশ্চাতে আছে এই অত্যুজ্জ্বল ভাবটি—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' স্বামীজী বলিলেন—এই বিষয়ে গ্রীকদের সহিত আর্যদের পার্থক্য এই যে, আর্যেরা বহির্জগৎ যাহা শিক্ষা দিতে পারে, তন্মাত্রে সন্তুষ্ট না হইয়া অন্তরাত্মাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং আত্মানুভূতির আলোকাবলম্বনে জীবনসমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। তারপর তিনি দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের কথা তুলিয়া তাহাদের মধ্যে এই বলিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন যে, উহারা যেন অধ্যাত্মানুভূতিতে আরোহণের বিভিন্ন সোপান; ঐগুলি অবলম্বনে ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকিলে অবশেষে স্বাভাবিক রীতিতেই অদ্বৈতানুভূতিতে উহার পরিণতি ঘটে, আর উহার শেষ কথা 'তত্ত্বমসি'। পরে তিনি বলিলেন, 'এখানকার লোক এখন হিন্দুও নহে, বৈদান্তিকও নহে—তাহারা ছুঁৎমার্গী। রান্নাঘর এখন তাহাদের মন্দির এবং হাঁড়ি দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

"স্বামীজীর স্বাস্থ্য তখন ভাল ছিল না। এই পর্যন্ত আসিয়াই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাই অর্ধঘণ্টা বিশ্রাম লইলেন। কিন্তু বক্তৃতাটি শেষপর্যন্ত শুনিবার জন্য শ্রোতারা ধৈর্যসহকারে বসিয়া রহিলেন। এই বিশ্রামের ফলে অবসাদ বিদূরিত হওয়ায় তিনি পুনর্বার অর্ধঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, জ্ঞানের তাৎপর্য হইল বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান পাওয়া ; যখন কোন বিজ্ঞান-বিভাগে সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যের পশ্চাতে অবস্থিত একমাত্র বস্তুকে পাওয়া যায়, তখন উহার পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। বক্তৃতা শেষ করিবার পূর্বে স্বামীজী রাজাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিলেন যে, প্রতীচ্যখণ্ডে হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্য প্রচারের জন্য রাজা তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি খেতড়ীবাসীদের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

"স্বামীজীর দিক হইতে খেতড়ীর কাজ ছিল যেমন আনন্দদায়ক তেমনি বিশ্রামপ্রদ। বক্তৃতা দেওয়া ও নিজের জন্য আয়োজিত অভ্যর্থনায় যোগ দেওয়া ছাড়া বাকি সময় তিনি অশ্বারোহণ, বিভিন্ন স্থান দর্শন এবং সঙ্গীদের সহিত ও রাজপরিবারের লোকদের সহিত বাক্যালাপে কাটাইতেন।

"একবার যখন খেতড়ী-রাজ ও স্বামীজী অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তখন স্বামীজী দেখিলেন, রাজার হাত হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতেছে ; স্বামীজীর গতিপথ হইতে একটি কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষশাখা স্বহস্তে সরাইয়া ধরার ফলেই ঐরূপ হইয়া থাকিবে। স্বামীজী এই বিষয়ে আপত্তি জানাইলে রাজা উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 'সর্বদা ধর্মরক্ষা করাই কি আমাদের কর্তব্য নয়, স্বামীজী ?' যুবক রাজা সত্যই ছিলেন খাঁটি ক্ষত্রিয়।

"স্বামীজীর বিদায়ের সময় আসিলে প্রিয় গুরুর বিরহচিন্তায় বিমর্ষহৃদয় রাজা জয়পুর পর্যন্ত তাঁহার সহিত চলিলেন। জয়পুরে একটি মন্দির-প্রাঙ্গণে রাজার সভাপতিত্বে একটি সভা আহূত হইয়াছিল এবং স্বামীজী প্রায় পাঁচশত শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করিলে তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। জয়পুর হইতে তিনি তাঁহার সকল শিষ্যকেই মঠে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন এবং নিজের সঙ্গে রাখিলেন শুধু ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলালকে।"

স্বামী সদানন্দজী যে বিবরণ দিয়াছিলেন, উহারই পরিপূরকরূপে আর একটি বিবরণ অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে—উহা খেতড়ী-রাজ্যের দিনলিপি ; উহা শ্রীযুক্ত বেণীশঙ্কর শর্মার পুস্তকে ('স্বামী বিবেকানন্দ : এ ফর্গটেন চ্যাপ্টার' ১২৮-

১৪৪ পৃঃ) ইংরেজী অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে উহার জ্ঞাতব্যাংশের বঙ্গানুবাদ দিলাম :

"১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ (রবিবার)। ইংলণ্ড, জার্মানী, ফরাসী ও ইতালী দেশ পরিভ্রমণান্তে মহামান্য মহারাজ ৬ই নভেম্বর সানন্দে খেতড়ীতে ফিরিয়াছেন। রাজ্যের জায়গিরদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ স্থির করিয়াছিলেন যে, আজ তাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইবেন এবং তাঁহার সম্মানার্থ একটি ভোজের আয়োজন করিবেন। এই উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দজীরও উপস্থিত থাকার কথা, এবং এই তারিখে তিনি আসিতে সম্মত আছেন জানিয়াই এই দিনটিই স্থিরীকৃত হইয়াছে। আজ সেই শুভদিন। রাজাজী তাঁহার দৈনিক কর্তব্য সমাপনান্তে একটি ভিক্টোরিয়া গাড়ীতে চড়িয়া সকাল সাড়ে নয়টায় পুকুর ধারে[৪] গেলেন—ইচ্ছা, জায়গাটি কিরূপ সজ্জিত হইয়াছে, দেখিয়া লইবেন ; ঐ স্থানেই উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। তারপর দশটার সময় তিনি মুন্সী জগমোহন লালের সহিত স্বামীজীর সংবর্ধনার জন্য (১২ মাইল দূরবর্তী) বাবাই নামক স্থানে গেলেন, স্বামীজী তখন সেখানে পৌঁছাইয়াছিলেন। মহারাজ স্বামীজীর পাদপদ্মে একটি স্বর্ণমুদ্রা ও পাঁচটি রৌপ্যমুদ্রা প্রণামী দিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বার্তালাপে নিমগ্ন হইলেন। অপরাহ্ণ চারিটার সময় মহারাজ বগিগাড়ীতে (ভিক্টোরিয়াতে) স্বামীজীকে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে ও মুন্সী জগমোহন লালকে সম্মুখের আসনে বসাইয়া খেতড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। (নগরের উপকণ্ঠে) জোঝুতে উপস্থিত হইলে নাগরিকদের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে আরতি করা হইল। ঠাকুর রামবক্সজী ও মুন্সী লক্ষ্মীনারায়ণজী অশ্বারোহীদের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা এখন শোভাযাত্রায় যোগ দিলেন। পথে বহু স্থানে স্বামীজীকে আরতির সহিত স্বাগত জানানো হইল। পুষ্করিণীর দিকে মুখ করিয়া যে মন্দির-প্রাসাদটি অবস্থিত আছে, স্বামীজীকে উহাতে বসানো হইল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতও (অধিকারীজী) আরতি করিলেন ও চারিটি রৌপ্যমুদ্রা দান করিলেন। মুন্সী লক্ষ্মীনারায়ণজী ও জোরজী প্রত্যেকে বিশটি মুদ্রা দিলেন এবং গণেশ দারোগা ও (বাঙ্গালী ডাক্তার) বাবু জীবন দাস একটি করিয়া মুদ্রা দিলেন। তারপর মহারাজ সাহেব স্নান সারিয়া

৪। পান্নালাল তালাব। এই পুকুর বা দীঘির পাড়েই পূর্ববারে ও এইবারে স্বামীজীর অভ্যর্থনা হইয়াছিল। রাজবাটী (বা বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র) হইতে উহা খুবই কাছে।

পোশাক পরিতে গেলেন; অপর সকলে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে সাতটায় রাজাসাহেব স্বামীজীর সহিত সভাস্থলাভিমুখে চলিলেন—স্বামীজী সঙ্গিগণসহ সম্মুখে চলিলেন, আর তাঁহাদের পশ্চাতে চলিলেন রাজাসাহেব। মন্দির-প্রাসাদ হইতে সভামণ্ডপ পর্যন্ত লাল সালু বিস্তৃত ছিল। রাজাসাহেব একটি সাদা গদিতে বসিলেন আর তাঁহার দক্ষিণে গালিচার উপর স্বামীজী সদলবলে উপবিষ্ট হইলেন।[৫] সমবেত সকলেও আসন গ্রহণ করিলেন এবং সম্মান প্রদর্শনের জন্য সকলে স্বামীজীকে অর্থ প্রদান করিলেন।" দিনলিপিতে উল্লিখিত আছে যে, এই দানের পরিমাণ ছিল ১৪৮৲ টাকা। "এই উপহার প্রদানকালে কলাবৎদিগের সঙ্গীত চলিতেছিল। তারপর মুন্সী জগমোহন লাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন।" এই অভিনন্দনের নিম্নে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির নামসহি ছিল। "তারপর স্বামীজী একটি ভাষণ দিতে গিয়া রাজাসাহেবের প্রশংসা করিলেন। পরবর্তী বক্তা ছিলেন ঠাকুর রামবক্স সিংহ। ইহার পরে রাজাসাহেব একটি যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন। বক্তৃতান্তে তিনি আসন গ্রহণ করিলে শ্রোতাদের চিত্তবিনোদনের জন্য কণ্ঠসঙ্গীত আরম্ভ হইল।

"ইহার পর স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে পুরোভাগে রাখিয়া রাজাসাহেব মন্দিরের পশ্চাতে যেখানে ভোজনের আয়োজন হইতেছিল সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসন ও চৌকি প্রস্তুত ছিল; অতিথিরা সকলে উপবেশন করিলেন। প্রায় আড়াই শত অতিথি ছিলেন।···ভোজনান্তে ঠাকুর রামবক্সজী স্বামীজীকে মাল্যভূষিত এবং চন্দন ও অগুরুতে লিপ্ত করিলেন। আটটার সময় তাঁহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন ও পুষ্করিণীর ধারের দোকানগুলি হইতে আতশবাজী দেখিয়া বগিগাড়ীতে চড়িয়া রাজপ্রাসাদে গেলেন। স্বামীজীকে (মহারাজের নিজ বাসস্থান) সুখমহলে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। সমস্ত পুষ্করিণীটি মৃত্তিকাধারে প্রজ্বলিত দীপে সজ্জিত হইয়াছিল, ঘাটে তরঙ্গাকারে বক্র বংশোপরি অর্ধচন্দ্রাকারে দীপাবলী সজ্জিত ছিল। সমগ্র (প্রাচীন দুর্গ) ভোপালগড়েও যে আলোকসজ্জা হইয়াছিল তাহাতে তের মণ ত্রিশ সের তৈল খরচ হইয়াছিল।

৫। রাজা বা মহারাজের দক্ষিণের আসন অতি সম্মানিত ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়া থাকে।

"১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭, সোমবার। রাজাসাহেব সুখমহলে গিয়া স্বামীজীর সহিত বার্তালাপ করিলেন।

"১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭, মঙ্গলবার। সন্ধ্যায় স্বামীজীর সহিত রাজাসাহেব অজিত-নিবাস-বাগ উদ্যানে গেলেন। ফিরিয়া তিনি স্বামীজীর বাসস্থান সুখ-মহলে গেলেন ও স্বামীজীর সহিত বার্তালাপ করিলেন। আটটার সময় রাজা-সাহেব স্বীয় প্রাসাদে ফিরিলেন।

"১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭, বুধবার। স্বামীজী রাত্রে আসিলেন ও উভয়ে সরদ মহলে (ঠাণ্ডা প্রাসাদে) আলাপ করিলেন। সাড়ে নয়টায় স্বামীজী চলিয়া গেলেন।

"১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭, শুক্রবার। দেড়টার সময় রাজাসাহেব বিদ্যালয়ে গেলেন। স্বামীজী পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটি সভার আয়োজন হইয়াছিল। প্রধান শিক্ষক শঙ্করলালজী নিজের ও শিক্ষকবর্গের পক্ষ হইতে রাজাসাহেব ও স্বামীজীকে দুইটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলেন। রাজাসাহেব স্বীয় ভাষণে ধন্যবাদ প্রকাশ করিলেন ও অতঃপর স্বামীজীকে সমন্দ অজিত-সাগর দেখাইতে লইয়া গেলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আসিয়া ছুটি চাহিলে তাহাদিগকে দুই দিনের ছুটি দেওয়া হইল এবং মিষ্টি খাওয়ার জন্য পনর টাকা দেওয়া হইল।...

"২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭, শনিবার। স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়া রাজা-সাহেবের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে বারাণ্ডায় গিয়া দীর্ঘকাল আলাপ করিলেন। সাতটার সময় রাজাসাহেব স্বামীজীর সহিত সুখমহলে গেলেন। সেখানে স্বামীজীর ধর্মবক্তৃতা দিবার কথা ছিল। অন্যান্য অনেকে সেখানে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। স্বামীজী বক্তৃতা দিলেন।

"২১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭, রবিবার। আজ সাড়ে চারিটায় রাজাসাহেব স্বামীজীর চারিজন সেবক[৬] ও স্বামীজীর সহিত বগিগাড়ীতে জয়পুর যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যায় বাবাই পৌছাইয়া সেখানে রাত্রিযাপন ও গল্পগুজব করিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর জয়পুর পৌছাইলেন।

৬। কে কে স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন, তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি নাই; তবে এই কয়জন অবশ্যই ছিলেন—স্বামী অদ্ভুতানন্দ, সদানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল।

"২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭। ছয়টার সময় রাজাসাহেব স্বামীজীর সহিত গোবিন্দ দাসের উদ্যানে গেলেন; সেখানে স্বামীজী বক্তৃতা দিলেন।

"১লা জানুয়ারি, ১৮৯৮, শনিবার। স্বামী বিবেকানন্দ আসিলেন এবং অভিবাদনাদির পরে রাজাসাহেবের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আজ স্বামীজীর জয়পুর ত্যাগের কথা। অতএব রাজাসাহেব ও মুন্সী জগমোহন লাল তাঁহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিবার জন্য আটটার সময় রেল স্টেশনে গেলেন। স্বামীজী আজমীঢ়ে গেলেন ও রাজাসাহেব প্রাসাদে ফিরিলেন।"

বাঙ্গলা জীবনীর মতে জয়পুরের সভাটি হইয়াছিল খেতড়ী-রাজের সভাপতিত্বে একটি মন্দির-প্রাঙ্গণে। সভায় প্রায় পাঁচশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এখান হইতে স্বামীজী শুধু ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলালের সহিত কিষেণগড়, আজমীঢ়, যোধপুর, ইন্দোর, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

যোধপুরে তিনি রাজ্যের প্রধান অমাত্য রাজা স্যার প্রতাপ সিংহের গৃহে আতিথ্য স্বীকারপূর্বক প্রায় দশ দিন অবস্থান করেন। পথে প্রত্যেক স্টেশনেই বহু সংখ্যক ব্যক্তি সমবেত হইয়া তাঁহার সংবর্ধনা করিয়াছিল। অতঃপর খাণ্ডোয়ায় উপস্থিত হইয়া যখন তিনি পূর্বপরিচিত উকিল শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে উঠিলেন, তখন তাঁহার প্রবল জ্বর। আট-দশ দিন সকলের ঐকান্তিক সেবাশুশ্রূষায় জ্বর সারিয়া গেলে তিনি পুনরায় যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। বিদায়ের পূর্বদিবস হরিদাসবাবু স্বামীজীর চরণ ধারণপূর্বক দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইলে স্বামীজী বলিলেন, "আমি চেলার দল বাড়াতে বা গুরুগিরি করতে চাই না। যারা গুরুগিরির অভিমান করে, তাদের দ্বারা দেশের বা নিজের কোন উপকার সাধিত হয় না। তবে এই সোজা সত্য কথাটি মনে রাখবেন যে, মানুষে যা করেছে, তা সাধন করে পাওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সর্বশক্তিমত্তার বীজ বিদ্যমান।" স্বামীজী যে দীক্ষা দিতেন না তাহা নহে; তবু কোন্ গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি এইক্ষেত্রে বিরত রহিলেন, হরিদাসবাবুর ন্যায় সজ্জনের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিলেন, তাহা এক্ষণে অনুমান করাও দুঃসাধ্য। নিগূঢ় কারণ অবশ্যই ছিল। সাধারণতঃ দেখা যাইত যে, তিনি চাহিবামাত্র দীক্ষা দিতেন না; প্রত্যেক প্রার্থীর প্রকৃতি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণান্তে যাহাকে যেরূপ অধিকারী মনে হইত, তাহাকে সেইরূপ পথে

পরিচালিত করিতেন এবং তদনুরূপ মন্ত্রাদি দিতেন। এইভাবেই কেহ ভক্তি, কেহ জ্ঞান, কেহ কর্ম বা কেহ রাজযোগের সাধনপদ্ধতি শিক্ষা পাইত, এবং স্বীয় আদর্শ অনুসরণপূর্বক অভীষ্টলাভের পথে অগ্রসর হইত। অধিকন্তু সকলকেই তিনি বলিয়া দিতেন, "আত্মনির্ভরতা ভিন্ন শ্রেষ্ঠতর সাধন নাই।"

খাণ্ডোয়া ত্যাগ করিয়া তিনি ক্রমে রাটলাম জংশন স্টেশনে পৌছাইলেন। শরীর তখন তাঁহার ভাল ছিল না, বিশ্রাম অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব যদিও গুজরাট, বরোদা ও বোম্বে প্রেসিডেন্সীর বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচারকার্যে গমনের জন্য আগ্রহপূর্ণ রাশি রাশি টেলিগ্রাম ও পত্র আসিয়াছিল, তথাপি তিনি সেসব অস্বীকারপূর্বক আপাততঃ গুজরাটের পথ না ধরিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিলেন। পথে জব্বলপুর স্টেশনে বহু লোক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিল; কিন্তু তিনি নামিলেন না—সোজা কলিকাতায় চলিলেন।

বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামীজীর ভারতীয় প্রচারকার্য এখানেই শেষ হইল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য তিনি পরেও পূর্ববঙ্গ ও আসামে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন; কিন্তু সেগুলির তেমন উল্লেখযোগ্য অনুলিপি সংরক্ষিত হয় নাই। শারীরিক অপারগতাবশতঃ এখন হইতে তাঁহাকে স্বীয় বাণীকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য অন্য উপায়ের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল; এই উপায়গুলি ছিল—স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন, শিষ্যদিগকে কার্যের জন্য প্রস্তুত করা, এবং সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ, ব্যক্তিগত পত্রালাপ ও উপদেশের সাহায্যে স্বীয় চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া যাওয়া। সে দাগ ছিল অনপসরণীয়, আর সে ভাবরাশির কার্যকরী শক্তি ছিল অসীম, অদম্য। তাই আজও উহা পূর্ণোদ্যমে ফলপ্রসব করিয়া চলিয়াছে এবং শত শত বৎসর ধরিয়া অপ্রতিহত-গতিতে ঐরূপ করিতে থাকিবে। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার সক্রিয় জীবনকাল, শুধু সক্রিয় কেন, মোট জীবনকালই বড় অল্প ছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অত্যল্প কালের মধ্যেও তিনি জনসাধারণের নিকট আত্মোন্নতির এমন এক সহজলভ্য অফুরন্ত শক্তিভাণ্ডার খুলিয়া ধরিয়াছেন যে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়—একজন মানুষের পক্ষে এত সম্ভব হইল কি করিয়া!

ভারতভূমির পুনরভ্যুত্থানের জন্য স্বামীজী যে বার্তা প্রচার করিলেন তাহা সংক্ষেপে বলিতে গিয়া ইংরেজী-জীবনীকারগণ লিখিয়াছেন যে, তিনি ধর্মের

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জাতির বিভিন্ন শাখার এমন একটি সাধারণ মিলনভূমির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যাহাকে ভিত্তি করিয়া ভারত পূর্বাপেক্ষাও শক্তিশালী ও গৌরবমণ্ডিত হইতে পারে। ভারতবাসীরা যে সংস্কৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে, উহার মূল্য ও ভাবী সম্ভাবনার কথা বলিতে গিয়া তিনি অন্যান্য সভ্যতার সহিত উহার তুলনা করিয়া দেখাইয়া দিলেন, উহার মান সর্বাধিক এবং উহা সত্যই অতি গৌরবের বস্তু। এই প্রকার তথ্যাবিষ্কারের ফলে ভারতবাসীর মনে স্বীয় জন্মভূমি ও তাহার কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি অধিকতর প্রীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। তাঁহার মতে ভারতীয় জীবনকে প্রাচীন ধারা অবলম্বনেই অগ্রসর হইতে হইবে, যদিও এই গতিপথে উন্নতির উপযোগী সর্বপ্রকার সামগ্রী অপরের নিকট হইতে সাদরে গ্রহণপূর্বক ভারতেরই চিরাচরিত রীতি অবলম্বনে সেগুলিকে আপনার মতো পরিবর্তিত করিয়া লইতে হইবে। ভারতমাতার প্রতি যদি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকে এবং তাঁহার পুনরুদ্বোধনের ব্রত যদি আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে অতীতের ধারা ও মর্মকথাকে সর্বতোভাবে অঙ্গীকার করার পরেই মাত্র নবীনকে বরণ করার কথা উঠিতে পারে। আর স্বামীজীর মতে আমাদের এই উত্তরাধিকার বলিতে প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ ধর্মকেই বুঝায়। ভারতীয় জীবনস্রোত অতীতকালে এই আধ্যাত্মিক খাতেই প্রবাহিত হইয়াছিল এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে বারি সেচনের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা এই প্রধান স্রোতস্বতী হইতেই সিঞ্চিত হইয়াছিল। অতীত কালে কতবারই না ধর্ম ভারতীয় জীবনকে বিবিধ সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছে! বিপদকালে ধর্মই সাংসারিক ক্ষেত্রেও জাতিকে সবল ও আত্মস্থ করিয়াছে। যখনই কোন প্রচলিত সমাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতিতে ত্রুটি বা দৌর্বল্য লক্ষিত হইয়াছে, তখন আধ্যাত্মিকতাই উহার প্রতিকারের নবীন পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। অতএব ভারতের পুনরুজ্জীবনের প্রকৃষ্ট উপায় হইল আধ্যাত্মিক আদর্শে উহার ভাবী কার্যধারা গড়িয়া তোলা। সর্বোপরি তিনি দেখাইলেন যে, ব্যক্তির সততা, আত্মশ্রদ্ধা, সবলতা, ধর্মপ্রাণতা ইত্যাদিরই উপর জাতির শক্তি-সামর্থ্য নির্ভর করে। অতএব জাতির পুনর্গঠনকার্য সার্থক করিয়া তোলার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র পরিবেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় ধর্মভিত্তিক চরিত্র গঠনের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইবে; বিশেষতঃ সাহস, বীর্য, আত্মবিশ্বাস, স্বার্থত্যাগ ও অপরের সেবার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভবিষ্যৎ

উন্নতিসাধনের জন্য তিনি ভারতীয় যুবকদের প্রতিই অধিক আস্থাবান ছিলেন এবং ভারতের সনাতন আদর্শ—ত্যাগ ও সেবার কথাই তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে শুনাইয়াছিলেন (৫৩৭-৩৮ পৃঃ)।

বাঙ্গলা-জীবনীতে উল্লিখিত আছে যে, স্বামীজী ঐ সময়ে অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যথা—"আন্তর্জাতিক বিবাহ-প্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদসাধন"; "একাধিক বিবাহ-নিবারণ"; "অবিবাহিতের সংখ্যাবৃদ্ধি আবশ্যক"; "ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যাপসারণ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার" এবং "আহারের সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন"; "সুবিবেচনাসহকারে সংস্কৃতবিদ্যার বিস্তার"; "জাতীয় ভিত্তিতে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন" এবং "পাশ্চাত্ত্য দেশে হিন্দুধর্ম ও দর্শন প্রচার এবং তদ্বিনিময়ে ব্যাবহারিক বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবককে তত্তদ্দেশে প্রেরণ।" শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের দ্বারা উল্লিখিত এই বিষয়গুলির বিস্তৃত পরিচয় পাঠকগণ স্বামীজীর গ্রন্থাবলীতে পাইবেন। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, বিবাহ ও জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে স্বামীজী সাধারণতঃ কোন প্রকার চরম সিদ্ধান্ত বলিতে রাজী ছিলেন না; কথাচ্ছলে তখনকার মতো কোনও অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেও পরে উহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, পরিবর্জন বা পরিবর্ধনাদিও করিতেন। আন্তর্জাতিক বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মত খুব সুস্পষ্ট বলিয়া মনে হয় না। বিধবাবিবাহ বিষয়েও তিনি সুস্পষ্ট মত দিতেন না। বলিতেন, বিধবাদের সমস্যা-সমাধান শিক্ষিতা বিধবারাই করিবে। তবে তিনি বাল্যবিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। পানাহার বিষয়ে তিনি মধ্যযুগীয় স্মৃতিবিধান অপেক্ষা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপর অধিক আস্থা রাখিতেন। ছুঁৎমার্গের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। আর তিনি বলিতেন যে, শিক্ষার উপযুক্ত বিস্তার হইলে জনসাধারণ নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী সমাজব্যবস্থা নিজেরাই গড়িয়া লইবে, ঐ বিষয়ে এখন হইতে বাঁধা-ধরা পথ ছকিয়া দেওয়া অনাবশ্যক ও অন্যায়। সমাজে সাম্যস্থাপন ও ভোগাধিকার নিরসনের কথাও তিনি শুনাইয়াছিলেন; কিন্তু সে সাম্য আসিবে উচ্চবর্ণকে অবনত করিয়া নহে, প্রত্যুত সকলকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাহায্যে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া। ফলতঃ সমাজের সমস্ত গতি ও প্রচেষ্টা হইবে ধর্মভিত্তিক, আর সংঘর্ষ অপেক্ষা পরস্পরের সেবাই হইবে বাঞ্ছনীয় কার্যধারা।

কিন্তু ধর্ম বলিতে স্বামীজী আচার-ব্যবহারমাত্রকে বুঝিতেন না। ভারতীয় বক্তৃতাগুলিতে এবং চিঠিপত্র ও বার্তালাপের মাধ্যমে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহার নিষ্কর্ষ এই : বাহ্যাচার হইতে অনুভূতিমূলক প্রকৃত ধর্মকে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার জন্য উহাকে আধ্যাত্মিকতা বলিলে বরং ভাল হয়। এই অনুভূতিই হইল ধর্মের মূল বস্তু, অনুভূতিনিরপেক্ষ যে ধর্ম তাহা মানুষকে মুক্তিপথে পরিচালিত না করিয়া বরং বিভ্রান্ত করে। আবার ধর্মকে শুধু বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে আবদ্ধ না রাখিয়া ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। কর্মযোগকে টীকা ও ভাষ্যাদির সম্মত কেবল শাস্ত্রীয় যাগ-যজ্ঞ বা ব্রত ও আচারাদির গণ্ডীতে সীমিত না রাখিয়া মানবজীবনের বিস্তৃততর সর্ব-ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বলিয়া জানিতে হইবে ; বস্তুতঃ জীবনের প্রতি কার্যকে ধর্ম-ভাবের দ্বারা অনুস্যূত করা চলে ও উহা বর্তমান যুগের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অধিকন্তু সাধনার চারিটি পথ—কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ না ভাবিয়া পরস্পরসমন্বিতরূপে জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কর্ম, ঈশ্বরানুরক্তি, নীরব ধ্যান ও বিচার প্রত্যেকের জীবনে স্বভাবতঃ অল্পাধিক বিকশিত ও অনুসৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা একটিমাত্র পথকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তাঁহারা তাহাই করুন ; কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে সমন্বয়ের পথই প্রশস্ততর। এই যোগসমন্বয়ের আলোচনাকালে ধর্মসমন্বয়ের কথাও স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত এই সমন্বয়াবলম্বনেই ধর্মবিরোধের অবসান হইবে এবং প্রত্যেক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ত্যাগ ও সেবা প্রত্যেক সাধকের সাধনার প্রধান অবলম্বন হইবে ; এমন কি এই আদর্শে প্রণোদিত হইয়া ব্যক্তিগত মুক্তিবাসনাকেও জলাঞ্জলি দিতে হইবে। স্বামীজী এইরূপে সর্বমুক্তির কথা শুনাইলেন এবং স্বমুক্তির বাসনাকে স্বার্থপরতার পর্যায়ভুক্ত করিয়া সর্বমুক্তিচেষ্টাকে উচ্চতর আসন দিলেন। আবার অবতারবাদ ইত্যাদি মানিয়া লইয়াও তিনি ব্যক্তি ও ধর্মগ্রন্থাদি অপেক্ষা ধর্মের মূল তথ্যগুলিকে অধিকতর মূল্যবান বলিয়া প্রচার করিলেন। যেসকল ধর্মানুষ্ঠানে বা ধর্মাদর্শে আপনাকে অযথা অত্যন্ত হীন মনে করিতে হয়, অথবা যেসব আচার অনুষ্ঠানে ভাবাবেগ, অঙ্গবিকার ইত্যাদিকে অধিক মূল্যবান বলা হয় এবং তাহার ফলে জাতীয় জীবনে দুর্বলতার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়, উহার পরিবর্তে তিনি সেই সব আচার ও চিন্তাপ্রণালীকেই অধিকতর সম্মান দিলেন, যাহাতে মানুষকে সবল ও আত্মশ্রদ্ধাবান করে। স্মৃতি ও

পুরাণাদি অপেক্ষা বেদ ও উপনিষৎ তাঁহার দৃষ্টিতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ফলতঃ বিচারমূলক ও তথ্যবহুল বেদান্তশাস্ত্রই হইবে সর্বশাস্ত্রের ভিত্তিভূমি। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সব মতই সত্য হইলেও চরম সত্য নিহিত আছে বেদান্তে—অদ্বৈতানুভূতিতে ; অন্যান্য সাধন ঐ চরমতত্ত্বে পৌছাইয়া দিবার পথ বা সোপান হিসাবেই গ্রহণীয়। এইরূপে স্বামীজী ধর্মক্ষেত্রে এমন এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গী আনিয়া দিলেন, যদবলম্বনে মানুষের মন অর্থহীন আচার-বিচারের নিগড় হইতে মুক্তি পাইল, অথচ অনুষ্ঠানাদিরই সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মপথে অগ্রগমনের ও সকলকে উন্নত করার পথেরও সন্ধান পাইল ; এককথায় পথভ্রান্ত মানবজাতি অন্ধকারে আলোকের সাক্ষাৎ পাইল। মনে রাখিতে হইবে, স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠে যে নববার্তা বিঘোষিত হইয়াছিল, তাহা স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী বিচিত্ররূপে রঞ্জিত হইলেও মূলতঃ উহা ছিল শাশ্বত বিশ্বাত্মারই বাণী এবং উহা নিনাদিত হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে স্থান-কাল-পাত্রনির্বিশেষে শাশ্বতকালের জন্য ও বিশ্বজনীন কল্যাণসাধনার্থ।

স্বপ্নের রূপায়ণ

রাটলাম হইতে স্বামীজী ঠিক কোনদিন কলিকাতায় ফিরিলেন বলিতে পারি না; তবে উহা নিশ্চয়ই ৬ই ফেব্রুয়ারির পূর্বে। ৬ই ফেব্রুয়ারিতে একটি স্মরণীয় ঘটনা 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' ('বাণী ও রচনা,' ৯।৬৯-৭১ পৃঃ) মুদ্রিত হইয়াছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরে নূতন বসতবাটী নির্মাণ করিয়াছেন। নবগোপালবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা—স্বামীজী দ্বারা বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। স্বামীজীও এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। নবগোপালবাবুর বাটীতে আজ[1] তদুপলক্ষে উৎসব। ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ সকলেই আজ তথায় ঐ জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত। বাটীখানি আজ ধ্বজ-পতাকায় পরিশোভিত, সামনের ফটকে পূর্ণঘট, কদলীবৃক্ষ, দেবদারু পাতার তোরণ এবং আম্রপত্রের ও পুষ্পমালার সারি। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে রামকৃষ্ণপুর আজ প্রতিধ্বনিত।

"মঠ হইতে তিনখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর পরিধানে গেরুয়া রঙের বহির্বাস, মাথায় পাগড়ি—খালি পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে যে পথে তিনি নবগোপালবাবুর বাটীতে যাইবেন, সেই পথের দুই ধারে অগণিত লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী 'দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীরঘরে'—গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আর দুই-তিনখানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথঘাট মুখরিত

১। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' তারিখ ৬ই ফেব্রুয়ারি, ও তিথি মাঘী পূর্ণিমা দেখিয়া মনে হয়, ইহা ১৮৯৮এর ঘটনা; পূর্ববৎসর ঐ সময় স্বামীজী মাদ্রাজে ছিলেন। মঠ আলোচ্য দিনে আলমবাজারে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

হইয়া উঠিল। লোকে যখন দেখিল, স্বামীজী অন্যান্য সাধুগণের মতো সামান্য পরিচ্ছদে খালি পায়ে মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারে নাই এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় পাইয়া বলিতে লাগিল, 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' স্বামীজীর এই দীনতা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে গ্রাম্যপথ মুখরিত হইতে লাগিল।

"গৃহীর আদর্শস্থল নবগোপালবাবুর প্রাণ আজ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের সেবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া তিনি চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে 'জয় রাম, জয় রাম' বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছেন।

"ক্রমে দলটি নবগোপালবাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্যে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজী মৃদঙ্গ নামাইয়া বৈঠকখানায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন, তদুপরি ঠাকুরের পোর্সিলেনের মূর্তি। ঠাকুর পূজায় যে যে উপকরণের আবশ্যক, আয়োজনে তাহার কোন অঙ্গে কোন ত্রুটি নাই। স্বামীজী দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

"নবগোপালবাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

"স্বামীজীর মুখে সকল বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া গৃহিণীঠাকুরানী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমাদের সাধ্য কি যে ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্য ঘর, সামান্য অর্থ। আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন।'

"স্বামীজী তদুত্তরে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'তোমাদের ঠাকুর তো এমন মার্বেল-পাথর-মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেননি; সেই পাড়া-গাঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম, যেন-তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না থাকেন তো আর কোথায় থাকবেন?' সকলেই স্বামীজীর কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূষাঙ্গ স্বামীজী সাক্ষাৎ মহাদেবের মতো পূজকের আসনে বসিয়া ঠাকুরকে আহ্বান করিলেন।

"পরে স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামীজীর কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতে

লাগিলেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাজনের শাঁক-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই পূজা করিলেন।

"নীরাজনান্তে স্বামীজী পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণতি-মন্ত্র মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়া দিলেন :

"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥"

"সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে শিষ্য ঠাকুরের একটি স্তব পাঠ করিল। এইরূপে পূজা সম্পন্ন হইল। উৎসবান্তে শিষ্যও স্বামীজীর সঙ্গে গাড়ীতে রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে পৌছিয়া নৌকায় উঠিল এবং আনন্দে নানা কথা কহিতে কহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হইল।" 'শিষ্য' বলিতে এখানে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-লেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বুঝিতে হইবে।

ইহারই এক সপ্তাহ পরে (১৩ই ফেব্রুয়ারি) বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জি মহাশয়ের বাগান-বাটী ভাড়া লইয়া মঠ আলমবাজার হইতে সেখানে স্থানান্তরিত হইল। ইহার দুইটি কারণ ছিল। কয়েক মাস পূর্বে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুনের ভূমিকম্পে আলমবাজারের জীর্ণ বাটীটি এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে, উহাতে বাস করা বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল।[২] দ্বিতীয় প্রবলতর কারণ এই ছিল যে, অনেক অনুসন্ধানের পর বেলুড়ে গঙ্গাতীরে ভাবী স্থায়ী মঠের জন্য একখণ্ড জমি সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ বৎসরের ৩রা ফেব্রুয়ারি ঐ জমির জন্য বায়না করা হয় এবং পরে ৪ঠা মার্চ শ্রীমতী হেনরিয়েটা মূলারের প্রদত্ত ৩৯০০০৲ টাকায় উহা ক্রয় করা হয়। ভূমিখণ্ড নীলাম্বর মুখার্জির উদ্যান-বাটী হইতে মাত্র এক ফার্লং উত্তরে অবস্থিত। ঐ জমির দখল লওয়া, অসমতল ভূমিকে সমতল করা, পুরাতন বাটীর সংস্কার ও পরিবর্তনাদি করা এবং ঐ সমস্তের রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রভৃতি কার্যের জন্য মঠটিকে উহারই সন্নিকটে লইয়া আসার প্রয়োজন ছিল। ভূমিখণ্ডের পরিমাণ ছিল প্রায় উনিশ বিঘা। ক্রয়কালে উহা নৌকা-মেরামত করা প্রভৃতি কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইত; সুতরাং উহা খুবই অসমতল ছিল। ঐ

২। স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্র, ১৪।৬।৯৭, স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, ১৫।৬।৯৭ ('উদ্বোধন', বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২); স্বামীজীর ২৪।৭।৯৭-এর পত্র।

ভূমিখণ্ডের উত্তরাংশে যে জীর্ণ পাকাবাড়ী ছিল উহা তখন একতলা ছিল।[৩] উহার উত্তরাংশে দুইখানি ঘর ও দক্ষিণাংশে একখানি ঘর ছিল; উভয়াংশের সংযোগ-স্বরূপ একখানি লম্বা ঘর ছিল এবং উহার পূর্বে একটি বারাণ্ডা গঙ্গার দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত ভৃত্যদের বাসের জন্য বাড়ীর উত্তর-পশ্চিমাংশে আর একটি পৃথক ছোট বাড়ী ছিল।[৪] স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (পূর্বনাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) পূর্বে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; স্বতরাং স্বামী অদ্বৈতানন্দের সাহায্যে তিনিই জমিকে সমতল করা ও উহাতে বাসোপযোগী গৃহাদি নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রধান পুরাতন বাটীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একখানি ঘর প্রস্তুত করেন এবং বাটীর উত্তরাংশকে বাদ দিয়া আর সমস্ত অংশটাকে দোতলা করেন। অধিকন্তু ঐ বাটীর পশ্চিমে জমির উত্তর-সীমায় চাকরদের ঘরের পশ্চিমে তিনি আর একটি নূতন দ্বিতল বাটী প্রস্তুত করেন। তাহার একতলায় হইল রান্নাঘর, ভাঁড়ার, ভোজনস্থান, ঠাকুরভাণ্ডার ইত্যাদি এবং উপরতলায় ঠাকুরঘর, ঠাকুরের শয়নগৃহ প্রভৃতি। এই সমস্ত কার্যে প্রায় এক বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল এবং ঐ সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন শ্রীযুক্তা ওলি বুল। জমিসংগ্রহ ও গৃহাদি নির্মাণের কথা আমরা একই সঙ্গে শেষ করিলাম, কিন্তু এখনও স্বামীজীর জীবনের পূর্ণ একটি বৎসরের ঘটনাবলী বলা হয় নাই। আমরা উহাতেই ফিরিয়া যাই।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, স্বামীজীর আদেশে স্বামী সারদানন্দ আমেরিকার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় গিয়া কার্য আরম্ভ করায় এবং ক্রমবর্ধমান ভারতীয় কার্যের পরিচালনের জন্য স্বামী সারদানন্দের ন্যায় একজন ধীর স্থির কার্যক্ষম ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়ায় স্বামীজীর আদেশে তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীমতী ম্যাক-লাউড এবং শ্রীযুক্তা ওলি বুলও ভারতে আগমনের জন্য স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে ১২ই জানুয়ারি জাহাজে আমেরিকা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ম্যাকলাউড আসিবার পূর্বে স্বামীজীর অনুমতি চাহিলে তিনি লিখিয়াছিলেন, "হাঁ, আসিতে পার যদি

৩। 'বাণী ও রচনা', ৯।১২৪; শ্রীমতী ম্যাকলাউড-এর বর্ণনা ('রেমিনিসেন্সেস') ও মঠবাড়ীর নির্মাণ-পদ্ধতি ইত্যাদি অবলম্বনে ও অনুমান সাহায্যে এই বর্ণনা দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত সমসাময়িক কোন বর্ণনা আমাদের জানা নাই।

৪। 'মহাপুরুষজীর পত্রাবলী'—উদ্বোধন কার্যালয়, ৪৮ পৃঃ।

তুমি আবর্জনা, অবনতি, দারিদ্র্য দেখিতে চাও ও কৌপীনপরিহিত মানুষের মুখে ধর্ম শুনিতে চাও। এতদ্ব্যতীত আর কিছুর আশা রাখিলে আসিও না। আমরা আর একটাও সমালোচনা শুনিতে প্রস্তুত নহি।" ইহা সত্ত্বেও তিনি লণ্ডনের পথে ভারতে আসিয়া সঙ্গী দুই জনের সহিত ১২ই ফেব্রুয়ারি বোম্বেতে নামিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া তখনই ট্রেন ধরিয়া ১৪ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ চারিটার সময় হাওড়া স্টেশনে পৌছিয়া দেখিলেন, স্বামীজী আরও দশ বার জন শিষ্যসহ সেখানে উপস্থিত আছেন। স্টেশন হইতে মহিলাদ্বয় কলিকাতার এক হোটেলে গেলেন ও স্বামী সারদানন্দ মঠে উপস্থিত হইলেন।[৫] ইঁহাদেরও পূর্বে মার্গারেট নোবল স্বগৃহের মমতা ত্যাগ করিয়া ২৮শে জানুয়ারি জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আসেন ও প্রথমে এক হোটেলে উঠিয়া পরে শ্রীযুক্তা মূলারের ভাড়া বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মার্চ মাসে নূতন মঠের বাড়ী ও জমির দখল পাইবার পর উক্ত মহিলাদ্বয় ও নিবেদিতা ঐ বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এখানে নিবেদিতার ভারতাগমন সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। স্বামীজীর ইহা একান্ত বাসনা ছিল যে, নিবেদিতা ভারতে আসিয়া ভারতীয় নারীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তিনি নিবেদিতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, ভারতীয় জীবনপ্রণালী ইংলণ্ডের তুলনায় এতই পৃথক্ এবং ভারতের আর্থিক অবস্থা এতই অনুন্নত যে, নিবেদিতা হয়তো উহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবেন না। অতএব নিবেদিতা যদিও ভারতাগমনের জন্য আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন তথাপি স্বামীজী এইসব কথা ভাবিয়া প্রথম নিবেদিতার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। পরে যখন বুঝিলেন, নিবেদিতার সঙ্কল্প অটুট ও নির্ভর-যোগ্য তখনও তিনি এক পত্রে (২৯শে জুলাই, ১৮৯৭) তাঁহাকে ভারতীয় অবস্থা খুলিয়া লিখিলেন ও তিনি যাহাতে পরে বাস্তবতার সম্মুখীন হইয়া আপসোস না করেন তজ্জন্য পূর্ব হইতেই সাবধান করিয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক আহ্বানও জানাইলেন:

"তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের

৫। 'রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৩৭-৩৮ পৃঃ।

নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন।

"কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কি ধরণের, তা তুমি ধারণা করতে পারনা। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নর-নারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; ভয়েই হোক বা ঘৃণায়ই হোক—তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে খামখেয়ালী মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখবে।...যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি।...

"কর্মে ঝাঁপ দেবার পুর্বে বিশেষভাবে চিন্তা ক'রো এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাকো। 'মরদ্‌কী বাত হাতীকা দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ে তিনি নিবেদিতাকে সাবধান করিয়া দিলেন। স্বামীজী নিজে মিস মূলারের প্রকৃতি খুব ভাল করিয়াই চিনিয়াছিলেন—তিনি বড় জেদী ও সর্ববিষয়ে আপনার মত খাটাইতে ব্যগ্র। এরূপ ব্যক্তির সহিত কাজ করিতে গেলে হয় পদে পদে কলহের মধ্যে পড়িয়া ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ হইতে হয়, নতুবা নিজের ব্যক্তিত্বকে মুছিয়া ফেলিয়া ঐ ব্যক্তিকেই সর্বতোভাবে অনুসরণ করিতে হয়। নিবেদিতা স্বভাবতই নবীন ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ গড়িয়া তুলিতে চাহিবেন, আর তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে বিসর্জন দিতেও পারিবেন না। অতএব স্বামীজী সাবধান করিয়া দিলেন, "তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মিস মূলার কিংবা অন্য কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে চলবে না।" ('বাণী ও রচনা', ৭।৩৮২-৮৩)।

মার্গারেট নোবল তবু আসিলেন। আদর্শের টান যখন সত্য সত্যই মানুষের

প্রাণে উপলব্ধি হয়, তখন জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যাভাবের চিন্তা তাহার গতিপথ রুদ্ধ করিতে পারে না; যে নৌকার পালে হাওয়া লাগিয়াছে, জলোপরি ভাসমান শৈবালপুঞ্জ কি তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে? নিবেদিতা আসিলেন, স্বামীজী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

তখন বেলুড়ের ভাড়া বাড়ীতে মঠের কাজ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী সেখানে থাকিয়া নিত্য শাস্ত্রাধ্যাপনাদি করিতেন এবং নবাগত সাধুব্রহ্মচারীদিগকে বিভিন্নরূপে বিবিধক্ষেত্রে সেবাকার্যের জন্য শিক্ষাদান করিতেন। সকলকে লইয়া ধ্যান, ভজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও সাধনা সংক্রান্ত আলোচনাদিতে তখন তাঁহার বহু সময় ব্যয়িত হইত। নিয়মিত অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি গীতা, উপনিষদ্, জড়বিজ্ঞান, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের নিকট ভাষণ দিতেন এবং প্রশ্নোত্তরাদিতেও প্রচুর সময় কাটাইতেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজী এই সমস্ত বিষয়ে যে আলোকসম্পাত করিতেন, তাহাতে শুধু আনন্দোৎপাদনই হইত না, শ্রোতাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনেও প্রচুর সাহায্যপ্রাপ্তি ঘটিত। ইহারই মধ্যে যে শিবরাত্রি-ব্রতানুষ্ঠান হইল তাহা বড়ই আনন্দপ্রদ ছিল; কারণ তখন মঠে প্রাচীন ও নবীন সাধুদের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ বিদেশে প্রচারকার্যে সাফল্য অর্জনান্তে তখন সবে মঠে ফিরিয়াছেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতও দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য সমাপনান্তে সেখানে আসিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এতদিন যাবৎ মঠের কার্য সুচারুরূপে পরিচালন করায় এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ নবাগতদিগকে শাস্ত্রশিক্ষা দেওয়ায় স্বামীজী খুবই আনন্দিত ছিলেন। অতএব তিনি স্থির করিলেন, শিবচতুর্দশীদিন অপরাহ্ণে এক সভা ডাকিয়া ইঁহাদের প্রত্যেককে অভিনন্দিত করা হইবে। তদনুসারে স্বামীজী সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে নবাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা ইঁহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে লিখিত ইংরেজী অভিনন্দন পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। তারপর স্বামীজীর নির্দেশানুসারে প্রত্যেক গুরুভ্রাতা দণ্ডায়মান হইয়া ঐ অভিনন্দনের সমুচিত উত্তর দিলেন। এই সময়ে স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এর কণ্ঠস্বর বাগ্মীদেরই সদৃশ।" সভাপতির ভাষণ দিতে উঠিয়া তিনি বলিলেন, "ঘরোয়া বৈঠকে বক্তৃতা দেওয়া এক কঠিন ব্যাপার। প্রকাশ্য বক্তৃতা-স্থলে বক্তা সহজেই বক্তব্য বিষয়মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া ফেলিতে পারেন, এবং তাই শ্রোতাদের উপর তাঁহার প্রভাবও হয় প্রচুর। কিন্তু শ্রোতার

সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলে এরূপ হয় না। তবু আমি চেষ্টা করিব।" তিনি গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবর্গকে ভাবী কার্যধারা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উপদেশ দিলেন; এবং সে কার্যপ্রণালীকে সুফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধরূপে কি করিতে হইবে তাহাও বুঝাইয়া দিলেন।

ইহারই পরে ২২শে ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিপূজা হইল। ঐ উপলক্ষে স্বামীজী ব্রাহ্মণেতর প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্তকে যজ্ঞোপবীত দান করেন। ঐ দিনের ঘটনাবলী বিবৃত করিতে গিয়া 'শিষ্য' শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখিয়াছেন:

"স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন। জন্মতিথি-পূজায় সেবার বিপুল আয়োজন! স্বামীজীর আদেশ মতো ঠাকুরঘর পরিপাটি দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'পৈতে এনেছিস তো?'

"শিষ্য—'আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশ মতো সব প্রস্তুত, কিন্তু এত পৈতার যোগাড় কেন, বুঝিতেছি না।'

"স্বামীজী—'দ্বিজাতি মাত্রেরই উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেবো। এরা সব ব্রাত্য (পতিত) হয়ে গেছে। শাস্ত্র বলে, প্রায়শ্চিত্ত করলেই ব্রাত্য আবার উপনয়ন-সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি, সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে। বুঝলি?...ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এরূপ গায়ত্রী-মন্ত্র (এখানে শিষ্যকে ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতির গায়ত্রী-মন্ত্র বলিয়া দিলেন) দিবি। ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণ পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নেই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না, ছোঁব না' বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে।...বলতে হবে—'তোরাও আমাদের মতো মানুষ, তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে।...এখন যারা পৈতে নেবে তাদের গঙ্গাস্নান ক'রে আসতে বল। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সবাই পৈতে পরবে।'

"স্বামীজীর আদেশ মতো সমাগত প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ভক্ত ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া শিষ্যের নিকট গায়ত্রী-মন্ত্র লইয়া পৈতা পরিতে লাগিল। মঠে

হুলস্থুল। পৈতা পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল, এবং স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজীর মুখারবিন্দ যেন শতগুণে প্রফুল্ল হইল।" ('বাণী ও রচনা,' ৯।৭৭-৭৮)।

স্বামীজী সাক্ষাৎভাবে সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপের বিরোধী হইলেও মনে হয়, এই ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক স্বীয় নীতি লঙ্ঘন করিলেন। অথচ এই আচরণের মূল সূত্রগুলি তাঁহার উপদেশের পরিপন্থী নহে। তিনি সকলকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করার কথা বহুবার বহুস্থলে বলিয়াছিলেন। সমাজে ভোগসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সকলকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিতে চাহিতেন। সত্যযুগে সকলে ব্রাহ্মণ ছিল; এযুগে অধিকার-সাম্য স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণকে অবনত করিতে হইবে না, প্রত্যুত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাহায্যে সকলকে ব্রাহ্মণত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আর এই উন্নয়নকরণের দায়িত্ব উচ্চবর্ণকেই গ্রহণ করিতে হইবে। স্বামীজী বলিতেন, "আমি সমাজতন্ত্রবাদী" (I am a socialist); কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও জানাইয়া দিতেন যে, ইহাকে তিনি আদর্শমতবাদ হিসাবে গ্রহণ করেন না, তবে 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'। নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা কোন দিন উন্নতির সুযোগ পায় নাই, এই মতবাদ অবলম্বনে যখন সে সুযোগ আসিতেছে, তখন ইহাকে বরণ করাই যুক্তিযুক্ত। তথাপি ইহা সত্য যে, প্রকৃত উন্নতি হয় অপরকে অবনত করিয়া নহে, পরন্তু নিজে উন্নত হইয়া। এইসব উপদেশাবলীর একটা চাক্ষুষ নিদর্শন দেখাইবারই জন্য যেন তিনি এই কার্যে অগ্রসর হইলেন। অথচ ব্রাহ্মণত্বের অবমাননা না করিয়া সকলকে ক্ষত্রিয়াদি-দ্বিজাতির ব্যবহার্য গায়ত্রী-মন্ত্রই দিলেন। অবশ্য বিপুল সমাজ এই বিষয়ে তাঁহার নেতৃত্ব তখনই মানিয়া লয় নাই, এখনও মানে নাই। তথাপি মহাপুরুষের মহাপ্রাণের আবেগ ও আবেদন ঐখানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এমন কথাও বলা চলে না। কে জানে অদূর ভবিষ্যতে কি হইবে, আর কেই বা বলিতে পারে যে, তাঁহার প্রবর্তিত শক্তি এখনও অলক্ষিতে আপনার কার্য করিতেছে না?

উক্ত অনুষ্ঠানের শেষে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঠে উপস্থিত হইলেন। "এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে যোগী সাজাইলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষ-মালা

প্রভৃতি দেওয়া হইল। এইবার স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া 'কূজন্তং রামরামেতি' মধুরস্বরে উচ্চারণ করিতে এবং স্তবান্তে কেবল 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' এই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর অর্ধনিমীলিত নেত্র, হস্তে তানপুরার সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শুনা গেল না! এইরূপে প্রায় অর্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্য কোন কথা নাই। স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত রামনামসুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা!

"রামনামকীর্তনান্তে স্বামীজী পূর্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন, 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ'। স্বামী সারদানন্দ 'একরূপ-অরূপ-নাম-বরণ' গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্থির-স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠ ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেসকল গান গাহিতেন, ক্রমে সেগুলি গীত হইতে লাগিল।

"এইবারে স্বামীজী সহসা নিজের বেশভূষা খুলিয়া গিরিশবাবুকে সাদরে এসকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশবাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ-বলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্তি হইয়া দাঁড়াইলেন, দেখিয়া ভক্তগণ অবাক হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজী বলিলেন: 'পরমহংসদেব বলতেন, ইনি ভৈরবের অবতার। আমাদের সঙ্গে এঁর কোনও প্রভেদ নেই।' গিরিশবাবু নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে আজ যেরূপ সাজে সাজাইতে চাহেন তাহাতেই তিনি রাজী। অবশেষে স্বামীজীর আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশবাবুকে পরানো হইল। গিরিশবাবু কোন আপত্তি করিলেন না।" (ঐ, ৭৯-৮০ পৃঃ)।

গিরিশবাবুকে মনের সাধে সাজাইয়া স্বামীজী তাঁহার মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যকথা শুনিতে চাহিলেন। কিন্তু গিরিশবাবুর মুখে কথা সরিল না, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ভাবিয়া ও ভক্তদের আমোদ-আহ্লাদ দেখিয়া যেন আনন্দে জড়বৎ হইয়া গিয়াছেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলব? কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী তোমাদের ন্যায় বাল সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এ অধমকে একাসনে বসিতে অধিকার দিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার

অপার করুণা অনুভব করি।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশবাবু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হঠাৎ থামিয়া গেলেন—আর কিছুই বলা হইল না।

তারপর স্বামীজী কয়েকটি হিন্দী গান গাহিলেন ও ভক্তগণ প্রথম পূজান্তে জলযোগের জন্য আহূত হইলেন। জলযোগের পর আবার সকলে নীচের বৈঠকখানায় সম্মিলিত হইলে নূতন উপবীতধারী এক ভক্তকে স্বামীজী বলিলেন, "তোরা হচ্ছিস দ্বিজাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গেছলি। আজ থেকে আবার দ্বিজাতি হলি। প্রত্যহ গায়ত্রী-মন্ত্র অন্ততঃ একশত বার জপবি। বুঝলি ?" ভক্ত "যে আজ্ঞা" বলিয়া আদেশ শিরোধার্য করিলেন।

ইতিমধ্যে মাস্টার মহাশয় আসিয়া প্রণামান্তে অতীব বিনয়সহকারে এক-কোণে দাঁড়াইয়া ছিলেন ; স্বামীজীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। স্বামীজী তাঁহার নিকট ঠাকুরের কথা শুনিতে চাহিলেও মাস্টার মহাশয় নীরব রহিলেন। ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদ হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দ অতি বৃহদাকার অদ্ভুত দুইটি পান্তুয়া লইয়া উপস্থিত হইলে সকলে উহা দেখিতে ছুটিলেন। পান্তুয়া দুইটি ঠাকুরঘরে পাঠাইয়া দিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "দেখছিস কেমন কর্মবীর ! ভয় মৃত্যু এসবের জ্ঞান নেই ; একরোখে কর্ম করে যাচ্ছে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়।...এরূপ কর্মে যখন চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্বজীবে সর্বঘটে বিরাজমান —এ তত্ত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি একপ্রকার ঈশ্বরসাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মবিকাশ। জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্ম-বিকাশ হয়, পরার্থে কর্মদ্বারা ঠিক তাই হয়।" এই সংক্রান্ত আরও কিছু আলোচনার পর স্বামীজী কিন্নরবিনিন্দিত কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন :

"দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে।" ইত্যাদি

গিরিশবাবু প্রভৃতি সকলেও তাঁহার সহিত কণ্ঠ মিলাইলেন। তারপর "মজল আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে" ইত্যাদি কয়েকটি গানের পর একটি জীবিত মৎস্য তিথিপূজার নিয়মানুসারে বাদ্যোদ্যম সহ গঙ্গায় ছাড়া হইল এবং পরিশেষে সকলে উৎসবান্তে প্রসাদ ধারণ করিলেন।

২২শে ফেব্রুয়ারির উৎসবটি সাধুভক্তগণ নিজেদের মতো ঘরোয়া ভাবেই

সম্পাদন করিলেন। ইহার গাম্ভীর্য, ঐকান্তিকতা, হর্ষানুভূতি অনুপম হইলেও জনসাধারণ ইহাতে বঞ্চিত ছিল। সর্বজনীন উৎসবের দিন ধার্য হইয়াছিল পরবর্তী রবিবারে (২৭শে ফেব্রুয়ারি)। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভক্তগণের আগমনকাল হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু রক্ষণশীল দলের প্ররোচনায় এবং স্বীয় ভাবাদর্শের অনুসরণক্রমে ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি মন্দিরের স্বত্বাধিকারীরা স্থির করেন যে, বিদেশপ্রত্যাগত ব্যক্তিদের আগমনে মন্দির কলুষিত করা চলে না। অতএব খেতড়ী-রাজের সহিত স্বামীজীর ঐ মন্দিরে প্রবেশের পর যে বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পরিণতিস্বরূপ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মোৎসব ঐ উদ্যানে করার অনুমতি প্রত্যাহৃত হইল। স্বামীজী ভাবিয়াছিলেন, মঠের জন্য সংগৃহীত নূতন জমিতেই সেবারে সর্বজনীন উৎসব হইবে। কিন্তু জমিটি বড়ই বন্ধুর ছিল; বিশেষতঃ ৪ঠা মার্চের পূর্বে উহাতে তাঁহাদের আইনতঃ অধিকার জন্মে নাই। অতএব উৎসবক্ষেত্র-নির্বাচন একটা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অবশেষে স্বামী যোগানন্দের আন্তরিক চেষ্টার ফলে ঐ জমির আরও উত্তরে গঙ্গাতীরে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয় ঠাকুরবাড়ী নির্মাণের জন্য যে ভূমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উহাতে উৎসব করার অনুমতি পাওয়া গেল, এবং যথাকালে মহাসমারোহে উৎসব সম্পন্ন হইল। এই উৎসবক্ষেত্রে বিদেশিনী ওলি বুল, ম্যাকলাউড, মূলার ও মার্গারেট শুধু ঘুরিয়া বেড়াইলেন না, ব্রাহ্মণী গোপালের মার দ্বারা সাদরে গৃহীতও হইলেন, নিষ্ঠাবতী বিধবা গোপালের মা তাঁহাদের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন এবং অন্যান্য পুরললনার সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ('ভগিনী নিবেদিতা', ৬৫ পৃঃ)।

এই কালে যেসব ভদ্রলোক স্বামীজীর সাক্ষাৎ অভিলাষে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনাগারিক ধর্মপালের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বামীজীর সহিত আলাপাদির পর তিনি পূর্বপরিচিতা শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে দেখিতে চাহিলেন। ওলি বুল তখন মঠের নূতন জমিতে অবস্থিত সেই জীর্ণ বাটীতে নিবেদিতা প্রভৃতির সহিত বাস করিতেন। নীলাম্বরবাবুর যে বাড়ীতে স্বামীজীরা থাকিতেন, উহা হইতে ঐ বাড়ীর দূরত্ব প্রায় দুই ফার্লং। পূর্বে কয়দিন মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সেদিনও দুর্যোগ চলিতেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও বৃষ্টি থামিল না দেখিয়া স্বামীজীরা বাহির হইয়া পড়িলেন। রাস্তা ছিল পিচ্ছিল, বন্ধুর ও কর্দমাক্ত; আর

মাঝে মাঝে শীতল বায়ু অস্থিপঞ্জর কাঁপাইয়া দিতেছিল। স্বামীজীর কিন্তু তবু মহা উল্লাস। তিনি হাস্যকোলাহল ও ঠাট্টা-তামাসা করিতে করিতে নগ্নপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; সঙ্গী শিষ্যদেরও কাহারও পায়ে জুতা ছিল না। ধর্মপালকেও স্বামীজী জুতা খুলিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্মপাল সে পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। ঐরূপ পথে জুতা-পায়ে চলিতে তাঁহার খুবই কষ্ট হইতেছিল; তাহার উপর তাঁহার একটি পা কিঞ্চিৎ খঞ্জ ছিল। এই ভাবে চলিতে চলিতে একস্থানে তাঁহার জুতা সমেত পা বসিয়া গেল, তিনি আর উহা তুলিতে পারিলেন না। স্বামীজী দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন এবং ধর্মপালের একহস্ত স্বীয় স্কন্ধে রাখিয়া দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে ধরিয়া পূর্ববৎ হাসিতে হাসিতে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিলেন। গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া সকলেই পদপ্রক্ষালন করিলেন। ধর্মপালও ঐরূপ করিবার জন্য কলসী হাতে লইলে স্বামীজী ক্ষিপ্রহস্তে উহা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "আপনি আমার অতিথি; অতিথির সেবার অধিকার আমার।" এই বলিয়া ধর্মপালের চরণ ধৌত করিতে উদ্যত হইলে ধর্মপাল মহা আপত্তি করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর শিষ্যগণের উপস্থিতিতে স্বামীজী ঐরূপ করিবেন, ইহা শিষ্যদের চক্ষেও বিসদৃশ বোধ হওয়ায় অবশেষে তাঁহারাই ঐ কার্যে অগ্রসর হইলেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র; কিন্তু স্বামীজীর অভিমানশূন্যতার নিদর্শন হিসাবে ইহার মহিমা প্রচুর।

ঐ সময়ে স্বামীজী কলিকাতায় কোন প্রকাশ্য সভায় প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত না হইলেও অপরের বক্তৃতাকালে দুই একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। এইরূপে ১১ই মার্চ ভগিনী নিবেদিতা যখন স্টার থিয়েটারে 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রভাব' ও স্বামী সারদানন্দ ১৮ই মার্চ 'আমেরিকায় আমাদের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, তখন ঐ উভয় দিবসেই স্বামীজীকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নিবেদিতাকে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট পরিচয় করাইয়া দিতে গিয়া তিনি প্রথমে মিস মূলার ও অ্যানি বেশান্তের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইংলণ্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়াছে—মিস মার্গারেট নোবল। ইঁহার নিকট আমাদের অনেক আশা। আমি অধিক কথা না বলিয়া আপনাদের সহিত মিস নোবল-এর পরিচয় করাইয়া দিতেছি।" ('বাণী ও রচনা', ৫।৩৪৮-৫৫ পৃঃ)। নিবেদিতার বক্তৃতার পরে স্বামীজী ওলি বুল ও মূলারকে দুই-চারিটি কথা বলিতে অনুরোধ করিলে ওলি বুল বলিলেন, "ভারতের সাহিত্য পাশ্চাত্ত্যবাসীদের নিকট

একটা জীবন্ত আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; বিশেষতঃ আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের বাণীসমূহ ঘরোয়া কথার মতো হইয়া গিয়াছে।" শ্রীমতী মূলার দাঁড়াইয়া শ্রোতাদিগকে "আমার বন্ধু ও স্বদেশীয়গণ" বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র চতুর্দিকে উচ্চ করতালিধ্বনি উত্থিত হইল। সে ধ্বনি প্রশমিত হইলে তিনি বলিলেন, তিনি ও স্বামীজীর অপর শ্বেতাঙ্গ শিষ্যবর্গ ভারতে পদার্পণের কাল হইতেই ভারতকে স্বদেশ বলিয়া অনুভব করিতেছেন। আর এই দেশ আধ্যাত্মিক আলোকের দেশ এই জন্য যে তাঁহারা এইরূপ করিতেছেন, তাহা নহে, কিন্তু ইহা স্বজনের দেশ এই জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশে যেসকল কার্য করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বিশেষ উল্লেখ করিতে চাহেন নাই, কেবল বলিলেন, সে দেশের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে স্বামীজী যে বিষম পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিয়াছেন, তাহার ফল যে কত সুদূরপ্রসারী হইবে, তাহা তিনি তখনই অনুমান করিতে সমর্থ নহেন—ইত্যাদি। এই দুইটি বক্তৃতা-সভা ছাড়াও স্বামীজী ২১শে মার্চ তারিখে কলিকাতায় বহুবাজারে অবস্থিত বিজ্ঞান পরিষদের এক সভায় একটি ভাষণ দিয়াছিলেন।

২৯শে মার্চ তিনি স্বামী স্বরূপানন্দ (অজয়হরি) ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দকে (সুরেন্দ্রনাথকে) সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে স্বামীজী অতি উচ্চ ধারণা ও আশা পোষণ করিতেন। সন্ন্যাস-দীক্ষার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ আমাদের একটা মস্ত লাভ হল।" আর এক সময় ইঁহারই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "স্বরূপানন্দের মতো একজন উপযুক্ত কর্মী পাওয়া সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লাভের চেয়েও বড়।"

ইহার চারিদিন পূর্বে ২৫শে মার্চ তারিখে মার্গারেট নোবলকে তিনি ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং নিবেদিতার অপূর্ব আত্মনিবেদন স্মরণ করিয়া সেই দিন হইতে নাম রাখিয়াছিলেন 'নিবেদিতা'। লোকসমাজে মার্গারেট নোবল অতঃপর ভগিনী নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা হইয়া ভারতের স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রায় অর্জন করিয়াছিলেন। আজ কেহ ভাবিতেই পারে না যে, নিবেদিতা ভারতের নহেন। তাঁহার সাহিত্যিক অবদান যেমন অপূর্ব ও অমূল্য, ভারত-কল্যাণার্থ কার্যাবলীও তেমনি বিচিত্র ও পবিত্র। সেদিনকার দীক্ষা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন: "একদিন মঠের ঠাকুরঘরে যে ব্রতদীক্ষা হইয়াছিল, তাহা ইঁহাদের মধ্যে একজনের পক্ষে যেন অবিস্মরণীয় হইয়া থাকে; সেদিন বলিতে

পারা যায় যে, যেন এক নবজীবন লাভের প্রথম সোপান হিসাবে তিনি (স্বামীজী) ঐ ব্যক্তিকে প্রথমে শিবপুজা শিখাইলেন এবং পরিশেষে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হিসাবে তাহার দ্বারা বুদ্ধের চরণে অঞ্জলিপ্রদান করাইলেন। তাঁহার নিকট যত বিভিন্ন আত্মা পথের সন্ধানের জন্য আসিবে, তাহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশেই যেন তিনি এই বাণী উচ্চারণ করিলেন, 'যিনি পরের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বোধিলাভের পুর্বে পাঁচ শত বার স্বীয় জীবন পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধের অনুসরণেরই জন্য হউক তোমার অভিযাত্রা।' এই অনুষ্ঠানটির রূপ যেমন ছিল অভিনব, তেমনি উহার উদ্দেশ্য ছিল অদৃষ্টপুর্ব। বিদেশিনী বিধর্মাবলম্বিনী মহিলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুর চিরানুসৃত ত্যাগমার্গে পরিচালনা ইহার পুর্বে ভারতের মাটিতে আর কে দেখিয়াছে?

মার্চ মাসে শ্রীযুক্তা ওলি বুল (ধীরামাতা), শ্রীমতী ম্যাকলাউড (জয়া) ও নিবেদিতা বেলুড় মঠের জন্য ক্রীত জমির উপরে যে পুরাতন বাটীটি ছিল, উহাকে নিজেদের ইচ্ছানুরূপ সাজাইয়া উহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করিলেন (সম্ভবতঃ মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে)। বাড়ীটিতে বসবাসের ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা বুঝাইতে গিয়া ম্যাকলাউড লিখিয়াছিলেন: "আমরা বাড়ীটিতে নূতন করিয়া চুনকাম করাইলাম, বাজারে গিয়া পুরাতন মেহগনির আসবাবপত্র আনিলাম এবং একটা বৈঠকখানা সাজাইলাম—অর্ধেকটা পাশ্চাত্ত্য রীতিতে ও অর্ধেকটা ভারতীয় কায়দায়। বাহিরের দিকে আমাদের একখানি খাবারঘর ছিল, একটা ঘর ছিল আমাদের শয়নকক্ষ, আর একখানি ঘর ছিল নিবেদিতার শয়নের জন্য। কাশ্মীরযাত্রার পুর্ব পর্যন্ত নিবেদিতা ছিলেন আমাদের অতিথি।" ('রেমিনিসেন্সেস', ২৩৯ পৃঃ)। স্বামীজী এই বাড়ীতে আসিয়া এই পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদের সহিত বিবিধ আলাপপ্রসঙ্গে তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন:

"গঙ্গাতীরস্থ বাড়ীখানির সম্বন্ধে স্বামীজী একজনকে বলিয়াছিলেন, 'ধীরামাতার ক্ষুদ্র বাড়ীখানি তোমার স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে, কারণ ইহা আগাগোড়া সবটাই ভালবাসায় মাখা।' বাস্তবিকই তাই। ভিতরে এক অবিচ্ছিন্ন মেলামেশার ভাব এবং বাহিরে প্রতিজিনিসটি সমান সুন্দর। শ্যামল বিস্তৃত শষ্পরাজি, উন্নত নারিকেলবৃক্ষগুলি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাদামী রঙ-এর গ্রামগুলি—সবই সুন্দর।

"যাঁহাদের মনে অতীতের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে, এমন অনেকে মাঝে মাঝে

আসিতেন এবং আমরা স্বামীজীর অষ্টবর্ষব্যাপী ভ্রমণের কিছু কিছু বিবরণ শুনিতে পাইতাম,...আর স্বয়ং স্বামীজী তথায় আসিতেন, উমামহেশ্বর ও রাধাকৃষ্ণের গল্প বলিতেন, কত গান ও কবিতার আংশিক আবৃত্তি করিতেন। বেশীরভাগ তিনি আজ একটি কাল একটি—এইরূপ করিয়া ভারতীয় ধর্মগুলিই আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন—তাঁহার যখন যেমন খেয়াল হইত, যেন তদনুসারেই কোন একটিকে বাছিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি কেবল যে ধর্মবিষয়ক উপদেশই আমাদিগকে দিতেন তাহা নহে। কখনও ইতিহাস, কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা বিভিন্ন সমাজ, জাতিবিভাগ ও লোকাচারের বহুবিধ উদ্ভট পরিণতি ও অসঙ্গতি—এ সকলেরও আলোচনা হইত। বাস্তবিক তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মনে হইত, যেন ভারতমাতা শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণস্বরূপ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখাবলম্বনে স্বয়ং প্রকটিত হইতেছেন।

"ভারতসংক্রান্ত বিষয়ে যাহা কিছু পাশ্চাত্ত্য মনের পক্ষে আস্বাদ করা অসম্ভব বলিয়া তাঁহার বোধ হইত, সেগুলিকে শিক্ষার প্রারম্ভেই খুব করিয়া বাড়াইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে হয়তো তিনি হরগৌরী-মিলনাত্মক একটি কবিতা[৬] আবৃত্তি করিতেন।

আলোচনার বিষয় যাহাই হউক না কেন, উহা সর্বদাই পরিণামে অদ্বয় অনন্তের কথায় পর্যবসিত হইত। সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান—যে-কোন তত্ত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটি যে সেই চরম অনুভূতিরই একটি দৃষ্টান্তমাত্র, তাহা তিনি সর্বদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতেন। তাঁহার চক্ষে কোন জিনিসই ধর্মের এলাকার বহির্ভূত ছিল না। একদিন আমরা কয়েকজন ইওরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। স্বামীজী সেদিন পারসিক কবিতার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। 'প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের বদলে আমি সমরকন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত'—এই পদটি আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি সহসা সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ, যে লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝিতে পারে না, তাহার জন্য আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই।'...সেই দিন অপরাহ্ণে কোন রাজনৈতিক বিষয়ের বিচার করিতে করিতে তিনি বলিলেন, 'দেখা যাইতেছে যে, একটি জাতি-

৬। 'অর্ধনারীশ্বরস্তোত্রম্' —শঙ্করাচার্য। "কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।" ইত্যাদি।

গঠনের পক্ষে সাধারণ প্রীতির ন্যায় একটা সাধারণ বিরাগেরও আবশ্যকতা আছে।'...

"২৫শে মার্চ। প্রাতে কুটীরে আসিয়া সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা সেখানে অতিবাহিত করা, আবার বৈকালে আসা—ইহাই স্বামীজীর এই সময়ের নিয়ম ছিল। কিন্তু এইরূপ সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিন[৭] সকালে—শুক্রবার দি ডে অফ অ্যানানসিয়েশন (দেবদূত আসিয়া ঈশা-জননী মেরীকে পুত্রজন্মের কথা জ্ঞাপন—২৫শে মার্চ)-এর দিন তিনি ফিরিবার সময় আমাদের তিনজনকে সঙ্গে করিয়া মঠে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে ঠাকুরঘরে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানান্তে একজনকে (অর্থাৎ নিবেদিতাকে) ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন।...পূজাশেষে আমরা উপর তলায় গেলাম। স্বামীজী যোগী শিবের ন্যায় জটা, বিভূতি, হাড়ের কুণ্ডল পরিধান করিয়া এক ঘণ্টাকাল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র-সংযোগে ভারতীয় গীত গাহিলেন। তারপর সন্ধ্যার সময় আমাদের নৌকায় বসিয়া তিনি আমাদের নিকট অকপটভাবে তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত সেই মহৎকার্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন এবং ভাবনাবিষয়ক অনেক কথা বলিলেন।" ('বাণী ও রচনা', ৯।২৬৪-৬৮ পৃঃ)।

নিবেদিতাকে তিনি প্রধানতঃ ভারতীয় আদর্শে, বিশেষতঃ হিন্দুভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, কারণ হিন্দু-নারী-সমাজের সেবা করিতে হইলে সেবক ও সেব্যের মধ্যে ভাবের ঐক্য থাকা আবশ্যক। শিক্ষার ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য যে-কোনও মাধ্যমের প্রয়োজন ও সাহায্য স্বীকৃত হউক না কেন, প্রেম ঐগুলির মধ্যে সর্বোত্তম, এমনকি উহাকে অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র ও অবশ্যস্বীকার্য মাধ্যম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একসুরে বাঁধা প্রাণগুলি যত সহজে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু সমাজের সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিয়া তো সামাজিক জীবনকে ঠিক আপনার করা চলে না। অতএব স্বামীজীর সমস্যা হইল, নিবেদিতা প্রভৃতি বিদেশিনীদিগকে কি করিয়া সমাজের অঙ্গীভূত করিবেন, কি করিয়া তাঁহাদের জন্য উচ্চবর্ণের স্বীকৃতি আদায় করিবেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-গোষ্ঠিভুক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে যদি ইঁহাদের প্রবেশাধিকার ঘটে, শ্রীমা, গোপালের মা, গোলাপ-মা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বিধবারা

৭। মনে হয় নিবেদিতারা দুই-একদিন মাত্র আগে ঐ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। পরবৎসর (১৮৯৯) ২৫শে মার্চ, শনিবারে নিবেদিতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিতা হন।

যদি ইঁহাদের পবিত্রতা স্বীকার করিয়া লয়েন, তবে কাজ খুবই সহজ হইবে। তাই তিনি প্রথমে পরমারাধ্যা শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু স্বামীজী পরে দেখিলেন তাঁহার অত ভাবনার কোন কারণ ছিল না, ১৭ই মার্চ মাতাঠাকুরানী স্বগৃহে আগতা নিবেদিতা প্রভৃতিকে আপন সন্তানজ্ঞানেই "এসো মা" বলিয়া সস্নেহে ডাকিয়া লইলেন এবং আদর করিয়া পার্শ্বে বসাইয়া খাওয়াইলেন। নিবেদিতা ব্রাহ্মণ-পরিবারে প্রবেশাধিকার পাইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে আহার করিয়াছেন। ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?" ('বাণী ও রচনা', ৮।৩০)। গোপালের মাও স্বগৃহে আগতা ইঁহাদিগকে অনুরূপ যত্নসহকারে গ্রহণ করিয়া নারিকেল-মুড়ি প্রভৃতি খাওয়াইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদিগকে ভারতীয় চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রার সহিত সুপরিচিত করাইবার উপর তিনি খুবই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। বেলুড়ের ঐ বাড়ীর পশ্চাদ্বর্তী বৃক্ষতলে তাঁহাদের সহিত বসিয়া তিনি ভারত-সংক্রান্ত কত আলোচনাই না করিতেন। এখানে তিনি ভারতের ইতিহাস, লোককথা, জাতিভেদ, আচার-বিচার ইত্যাদি সকল বিষয়ের নিগূঢ় রহস্যাবলী তাঁহাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতেন। ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদের মনে যেসব ভ্রান্ত ধারণা বা সংস্কার ছিল, তাহার সহিত তিনি বিন্দুমাত্র রফা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হিন্দুধর্মের সহিত প্রথম পরিচয়কালে উহার যেসব দিক তাঁহাদের দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য বা বিসদৃশ বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেসব রাখিয়া-ঢাকিয়া বলার চেষ্টা তিনি মোটেই করিতেন না, বরং সেগুলির চরম রূপটিই তাঁহাদের নিকট তুলিয়া ধরিতেন এবং তাঁহাদিগকে ঐগুলির মর্ম উপলব্ধি করাইতে চাহিতেন। হিন্দুদের জীবনধারা, ধর্মাদর্শ ও উপাসনা-রীতিগুলির অর্থবোধই ছিল পাশ্চাত্ত্য মনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন। স্বামীজী ঐসকল বুঝাইবার জন্য মনপ্রাণ ঢালিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা কহিতে থাকিতেন। তাঁহার আবেগপূর্ণ ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হইয়া বিদেশিনীরা অচেনা, অজ্ঞাতপূর্ব ও তাঁহাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত হিন্দুভাবরাশিরও একটা যুক্তিসম্মত তাৎপর্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাইতেন। তাঁহারা তখন ভারতীয় চিন্তা ও ধারণাদি বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া ঐগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতেন এবং ক্রমে ঐসকল ভাব

ও ভাবদ্যোতক শব্দাবলী ও প্রতীকাদিকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন। সত্য কথা বলিতে কি, স্বামীজীর মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য একাধারে মিলিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল। অতএব তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণপূর্বক পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদের পক্ষে উভয় সংস্কৃতির মূল সূত্র আবিষ্কার করা ও তদবলম্বনে জীবনে সামঞ্জস্য স্থাপন করা অসম্ভব ছিল না। তবে সে লক্ষ্যে পৌছানো একটু সময়-সাপেক্ষ ছিল, ঐজন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইত। আবশ্যক ছিল প্রাচীন সংস্কারের আমূল পরিবর্তন। ভারতীয়গণ যে ভাবরাশিকে সহজে জন্মাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য পাশ্চাত্ত্যবাসীকে করিতে হয় দীর্ঘ সাধনা আর গুরুরূপে স্বীকার করিতে হয় একজন লব্ধসিদ্ধি পরমকারুণিক মহাপুরুষকে। এইসমস্ত গুণাবলী স্বামীজীর ছিল, আর ছিল তাঁহার অসীম ধৈর্য। কথায় বাধা পাইয়া তিনি কখনও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। হয়তো প্রশ্নগুলি অবান্তর ও অর্থহীন হইত, তবু পথ সুকঠিন জানিয়া তিনি ব্যাখ্যাবিষয়ে কার্পণ্য করিতেন না।

নবীন জগতে নব ভাবধারা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যদের চক্ষে আর একটি নূতন মূর্তির আবির্ভাব ঘটিল—তিনি স্বয়ং স্বামীজী। ইওরোপ ও আমেরিকায় স্বামীজী ছিলেন ধর্মোপদেশক, সমন্বয়কর্তা, বেদান্তকেশরী। সেখানে তাঁহার প্রধান সমস্যা ছিল, মোহমুগ্ধ মানবকে মুক্তিপথের সন্ধান দেওয়া ও ঐ পথে পরিচালিত করা। তাঁহার মুখে তখন ধ্বনিত হইত ভারতের চিরন্তন বাণী, যাহা বিশ্বমানবেরও প্রাণের কথা। ভারতেও সে বাণী পূর্ববৎ উদ্ঘোষিত হইলেও ভারতের কল্যাণার্থ ।তনি যখন ঐ বাণীকে কার্যে পরিণত করিতে চাহিলেন, তখন বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হইল, তাহাও এক্ষণে ঐ বাণীর সঙ্গে মিলিয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহারা এখন পাইলেন শুধু বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষরূপে নহে, পরন্তু তৎসহ দেশপ্রেমিক দৃঢ়-সঙ্কল্প কর্মযোগী সন্ন্যাসিরূপে। এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বাণীদ্বয়ের মিলনভূমিতে দাঁড়াইয়া তিনি যেসকল ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সমস্যা সমাধানের যেসব নবীন পথের সন্ধান দিয়াছিলেন, তাহা তখনকার মতো মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হইয়া থাকিলেও আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তাহা নিবেদিতার লেখনীমুখে সংরক্ষিত হইয়া ভারত ও ভারতেতর দেশের জনগণের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। স্বামীজীকে ভালভাবে বুঝিতে হইলে তাঁহার এই

বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী, রচনাসমূহ ও উপদেশসকলের সহিত নিবেদিতার এই গ্রন্থরাজিও অবশ্য পাঠ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, সকলের সহিত সমভাবে কথা বলিলেও তিনি নিবেদিতার নিকট অনেক কিছু আশা করিতেন, অতএব তাঁহার এই মানস-দুহিতাটির শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকিত সমধিক। সুযোগ পাইলেই তিনি তাঁহাকে শিখাইতেন, পরিচালিত করিতেন, সময়বিশেষে শাসনও করিতেন। তিনি তাঁহাকে বলিতেন, "তোমার সাধনা হইবে—তোমার চিন্তারাশিকে, তোমার প্রয়োজনবোধকে, তোমার ধারণাগুলিকে ও তোমার অভ্যাসগুলিকে হিন্দুভাবে রূপায়িত করার জন্য। গোঁড়া ব্রাহ্মণী ব্রহ্মচারিণীরই মতো হইবে তোমার সম্পূর্ণ জীবনধারা—বাহিরে ও ভিতরে। তোমার মনে উপযুক্ত আগ্রহ জন্মিলে উপায়গুলি সহজেই আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তোমাকে তোমার অতীত ভুলিয়া যাইতে হইবে এবং অপরেও যাহাতে ভুলিয়া যায়, তজ্জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। তোমাকে ইহার স্মৃতি পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে।" স্বতই মনে হয়, ভারতীয় আদর্শ এবং উহার বাস্তব রূপ ও সমস্যাবলীর অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্বের সহিত প্রকৃত পরিচয় লাভের জন্য নিবেদিতার পক্ষে এইরূপ সাধনাই ছিল অত্যাবশ্যক। স্বামীজী এমন কথাও বলিতেন যে, ভারতীয় কোন ভাব বা কুসংস্কার অত্যন্ত অদ্ভুত ও সেকেলে ঠেকিলেও উহা শ্রদ্ধাসহকারে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে, শুধু অবিবেচকের মতো উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তিনি বলিতেন, "আমরা প্রত্যেকের সহিত তাহারই গোঁড়ামির ভাষায় কথা বলিব।" অবশ্য বিদেশীর পক্ষে এ পথ ছিল বড় কঠিন; বিশেষতঃ খাদ্য ও জীবনযাত্রার ধারার সহিত খাপ-খাওয়ানো ছিল প্রায় অসম্ভব। কাজেই পদে পদে অদ্ভুত রকমের ভুল হইত; কিন্তু স্বামীজী উহা সহ্য করিতেন এবং ভুল দেখাইয়া ঠিক পথের সন্ধান দিতেন।

সকল শিষ্যকে ভালবাসিলেও এবং সকলের অধ্যাত্মজীবন পরিচালনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিলেও প্রতীচ্যদেশাগতদের প্রতি তাঁহার একটা বিশেষ কর্তব্য ছিল; কারণ তাঁহারা একমাত্র তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া এই অজানা অচেনা দেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন বিষয়ে স্বীয় মত ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাবের সহিত আপস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতীয় কোন বিষয়ে মুরুব্বিয়ানা দেখাইলে বা কোন কিছুর নিন্দা করিলে তিনি

গর্জিয়া উঠিতেন। না বুঝিয়া সমালোচনা করিতে দেখিলে তিনি পাশ্চাত্ত্যবাসী-দিগকে বলিয়া দিতেন, তাহারা যদি সত্যই ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী হয় এবং ভারত হইতে কিছু শিখিতে চায়, তবে সশ্রদ্ধ মনোভাব লইয়া এই কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে—চাই সেজন্য খোলা মন ও অকপট হৃদয়। আর ভারতকে বুঝিতে হইলে চক্ষে আধ্যাত্মিকতার অঞ্জন মাখিতে হইবে, কারণ ভারতের সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান আধ্যাত্মিকতারই উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতকে এক দুর্বল প্রগতিহীন বা স্তব্ধগতি জাতি বলিয়া ভাবিতেও তাঁহার মনে কষ্ট হইত; কারণ তিনি দেখিতেন, ভারত তখনও নবীন ভাব আত্মসাৎ করিয়া বর্তমান জগতে বাঁচিয়া থাকিবার—শুধু বাঁচিয়া থাকিবার কেন, অতীত যুগে ভারতের যে মহিমা ছিল তদপেক্ষাও অধিকতর মহিমান্বিত হইবার শক্তি রাখে; আর এইরূপ বীর্য যাহার থাকে তাহাকে বৃদ্ধ না বলিয়া চিরনবীন বলাই সমীচীন। বস্তুতঃ ভারত অমর। তিনি চাহিতেন, পাশ্চাত্ত্যবাসীরা শ্রদ্ধা ও প্রেমের দৃষ্টিতে ভারতকে দেখিয়া ও চিনিয়া তাহার যে যে ক্ষেত্রে প্রকৃত অভাব আছে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানসহায়ে তাহা বন্ধুভাবে পুরণ করুক। তিনি ভারতের অপুর্ণতাকে কাহারও নিকট ঢাকিয়া রাখিতেন না, তিনি শুধু চাহিতেন যে, বাহিরের মানুষ সত্য ও পক্ষপাতহীন দৃষ্টি লইয়া ভারতকে চিনুক এবং তাহার সেবায় অগ্রসর হউক। শ্রীমতী ম্যাকলাউড (জয়া) একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনার কাজের সবচেয়ে বেশী সহায় কিভাবে হতে পারি?" স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল, "ভারতকে ভালবাস।" প্রকৃত ভালবাসা থাকিলে আর সব আপনি আসিয়া পড়ে। ভারতকে তিনি ভালবাসিতেন, অপরকেও ভালবাসিতে শিখাইতেন।

৩০শে মার্চ তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে দার্জিলিং রওনা হইলেন। সেখানে চিকিৎসকের মতানুসারে যদিও তিনি ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, তথাপি স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া অবনতিই ঘটিল—জ্বর ইত্যাদিতে ভুগিয়া শরীর দুর্বল হইয়া পড়িল। এইসব কারণে তিনি দার্জিলিং হইতে নামিয়া আসার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল যে, শহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। এই আশঙ্কা পুর্বেও তাঁহার মনে ছিল এবং ঐরূপ পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রস্তুতও ছিলেন। ২৯শে এপ্রিলের পত্রে তিনি শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে জানাইয়াছিলেন, "আমি যে শহরে জন্মেছি, তাতে যদি প্লেগ এসে পড়ে, তবে

আমি তার প্রতিকারকল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলেই স্থির করেছি।” যখন সংবাদ আসিল যে, প্লেগ করালমূর্তি ধারণ করার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ৩রা মে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী আসিয়া দেখিলেন, প্লেগে প্রাণনাশ যত হউক না হউক, মানুষের মনে আতঙ্ক এত অধিক হইয়াছে যে, ভীত জনসাধারণ দলে দলে নগরত্যাগে উদ্যত হইয়াছে, আর ইহা দেখিয়া সরকার তাহাদিগকে ধরিয়া রাখার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় হিতে বিপরীত ঘটিয়াছে—নগরজীবন তখন বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত। তিনি দেখিলেন, সেবাকার্যের জন্য হাসপাতালাদির ব্যবস্থা হইলেও লোকের ভয় নিবারণের উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব নাগরিকদিগকে সাহস দিবার জন্য স্বামীজীর আদেশে ঘোষণাপত্র বিতরণের ব্যবস্থা হইল। স্বামীজীর কথানুসারে নিবেদিতা দুই দিন ধরিয়া ঐ ঘোষণার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন এবং উহা বাঙ্গলা ও হিন্দীতে ভাষান্তরিত হইল। উহার মর্মার্থ এই ছিল যে, রামকৃষ্ণ মিশন জনগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদের সেবায় অর্থ ও সামর্থ্য অকুণ্ঠিত চিত্তে নিয়োগ করিবে। ঘোষণাপত্র-প্রচার ছাড়াও প্রয়োজনমত সেবাকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও স্বামীজীর ছিল। আয়োজন দেখিয়া একজন গুরুভ্রাতা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, “টাকা আসবে কোথা থেকে?” স্বামীজী ভ্রূকুটি করিয়া উত্তর দিলেন, “কেন? দরকার হলে নূতন মঠের জমি-জায়গা সব বিক্রী করব। আমরা ফকির; মুষ্টিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রী করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারা যায় তো কিসের জায়গা আর কিসের জমি?” ইহাই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের উপযুক্ত বাণী। এই মঠ স্থাপনের স্বপ্ন তিনি কতদিন ধরিয়া দেখিয়াছিলেন; ইহার জন্য তিনি কিরূপ প্রাণপাত পরিশ্রমই না করিয়াছিলেন। ভিক্ষা করিয়া বক্তৃতাদি দিয়া তিনি যাহা কিছু পাইয়াছিলেন, সবই এই কার্যে ব্যয় করিয়াছিলেন—নিজের জন্য কিছুই রাখেন নাই। অথচ আর্তের ব্যথা যখন প্রাণে বাজিল, তখন তিনি অম্লানবদনে বলিতে পারিলেন, তিনি তাঁহার সাধের বেলুড় মঠ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। অবশ্য কার্যতঃ তাহা করিতে হয় নাই; কারণ প্লেগের প্রকোপ তেমন বৃদ্ধি না পাওয়ায়, গবর্নমেণ্টের কঠোর বিধিসমূহ প্রত্যাহৃত হওয়ায়, স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় দরদী ব্যক্তিকে পার্শ্বে পাইয়া জনসাধারণ অনেকটা আশ্বস্ত হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ অন্য সূত্রে আসিয়া পড়ায় ঐরূপ কিছু করার আবশ্যক হইল না।

শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন না হইলেও প্রথমাবস্থায় স্বামীজী সর্বপ্রকার ব্যবস্থার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, "এক খণ্ড ভূমি খাজনা করিয়া লইয়া গবর্নমেণ্টের নিয়মানুযায়ী রোগীদের থাকিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ আড্ডা করিয়া এমনভাবে তাহাদের পরিচর্যা করা হইবে যে, তাহাতে হিন্দুসমাজের লোকের কোন আপত্তির কারণ হইতে না পারে। স্বামীজীর শিষ্যগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক লোকও স্বেচ্ছায় এই সেবাকার্য করিতে চাহিলেন। স্বামীজী তাহাদিগকে সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসমূহ প্রচার করিতে এবং স্বহস্তে শহরের গলি-ঘুঁজি ও ঘরদুয়ার পরিষ্কার করিতে উপদেশ দিতেন। এতদ্ভিন্ন বহু রোগীও সেবা-শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইল এবং স্বামীজীর উপর সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বর্ধিত হইল। সকলেই দেখিল, তিনি শুধু শুষ্ক দার্শনিক বিচার লইয়া সময়ক্ষেপ করেন না বা মৌখিক উপদেশ মাত্র দিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, সেই সকল বিচারসিদ্ধ সত্য ব্যাবহারিক জীবনে পরিণত করিয়া থাকেন ; মুখে যাহা বলেন, কার্যেও ঠিক তাহা পালন করিতে পারেন।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৭২৯)।

মহামারী দেখা দিয়াছিল এবং জনসাধারণকে সাহস দিবার জন্য ব্যবস্থাও চলিতেছিল। যতদিন এই আশঙ্কা সব দিক আতঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন স্বামীজী কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। এই দুরবস্থাকেও কিন্তু স্বামীজী মা-কালীরই একটি রূপ বলিয়া জানিতেন। ৩রা মে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর গৃহে নিবেদিতা ও অপর একজনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বামীজী তাঁহাদের বলিয়াছিলেন, "মা-কালীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি লোক ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ঐ দেখ, আজ মা প্রজাগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ভয়ে তাহারা কূল-কিনারা দেখিতে পাইতেছে না, এবং মৃত্যুর দণ্ডদাতা সৈনিক-বৃন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে যে, ভগবান শুভের ন্যায় অশুভ রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন না! কিন্তু কেবল হিন্দুই তাঁহাকে অশুভরূপেও পূজা করিতে সাহস পায়।" ('বাণী ও রচনা', ৯।২৬৮ পৃঃ)।

প্লেগের সমস্যার সমাধান তখনকার মতো হইয়া গিয়াছে দেখিয়া স্বামীজী পুনর্বার হিমালয়ের শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে চলিলেন। সেভিয়ার-দম্পতি তখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণান্তে আলমোড়ায় বাস করিতেছিলেন এবং পরিকল্পিত আশ্রমের জন্য উপযুক্ত জমির সন্ধানে ছিলেন। তাঁহারা স্বামীজীকে সেখানে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে ১১ই

মে (১৮৯৮) আলমোড়া যাত্রার দিন স্থির হইল। ঐ বুধবার সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে হাওড়া হইতে ট্রেন ছাড়িল। স্বামীজীর সঙ্গে চলিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, শ্রীযুক্তা ওলি বুল, কলিকাতাস্থ আমেরিকান কনসাল জেনারেলের পত্নী শ্রীযুক্তা প্যাটারসন, ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীমতী জোসেফিন ম্যাকলাউড। আমেরিকার দক্ষিণপ্রান্তে বক্তৃতা দিতে গিয়া স্বামীজী যখন বর্ণবৈষম্যের অত্যাচারে নিপীড়িত হইতেছিলেন, তখন এই প্যাটারসন-পত্নীই সর্বপ্রথম তাঁহার সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছিলেন।

ভারত-পরিচয়

এই যাত্রায় পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদিগের, বিশেষতঃ নিবেদিতার প্রকৃত ভারত-পরিচয় ঘটিল—কথায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ পাইলেন। এই কালের বহু বিবরণ নিবেদিতার দুইখানি গ্রন্থে—'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' (মাস্টার অ্যাজ আই স হিম) ও 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' (নোটস অব সাম ওয়াণ্ডারিংস উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ ইন দি হিমালয়াস)—অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয়ে স্বামীজীর ভ্রমণবৃত্তান্ত, চিন্তাধারা, ভারতপ্রীতি ও কার্যাবলীর যেমন দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই, তেমনি পাই পাশ্চাত্ত্য মনকে শিক্ষা দিয়া ভারতের সেবায় নিয়োজিত করার জন্য তাঁহার অদম্য চেষ্টার সাক্ষাৎ নিদর্শন। আমরা এই অধ্যায়ের বিষয়-বস্তুর জন্য প্রধানতঃ এই পুস্তকদ্বয়ের উপর নির্ভর করিব, যদিও স্থলবিশেষে অন্যান্য পুস্তকেরও সাহায্য লইতে হইবে। নিবেদিতার উক্ত প্রথম পুস্তকে আছে :

"মে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত আমরা কি অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়াই না ভ্রমণ করিয়াছি! আর যেমন আমরা একটির পর একটি করিয়া নূতন নূতন স্থানে আসিতে লাগিলাম, কি অনুরাগ এবং উৎসাহের সহিতই না স্বামীজী আমাদিগকে তত্রত্য প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুটির সহিত পরিচিত করাইয়া দিতেছিলেন! ভারত সম্বন্ধে শিক্ষিত পাশ্চাত্ত্য লোকদের অজ্ঞতা এত বেশী যে, উহাকে প্রায় নিরেট মূর্খামি বলা চলে ; অবশ্য যাঁহারা এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কতক ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আর আমাদের এই বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রাচীন পাটলিপুত্র বা পাটনা হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল বলিতে হইবে। রেলযোগে পূর্বদিক হইতে প্রবেশ করিবার মুখে কাশীর ঘাটগুলির যে দৃশ্য চক্ষে পড়ে, তাহা জগতের দর্শনীয় দৃশ্যগুলির অন্যতম। স্বামীজী সাগ্রহে উহার প্রশংসা করিতে ভুলিলেন না। লক্ষ্ণৌয়ে যেসকল শিল্পদ্রব্য ও বিলাসোপকরণ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগের নাম ও গুণবর্ণনা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। কিন্তু যেসকল মহানগরীর সৌন্দর্য সর্ববাদি-সম্মত ও যাহারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, শুধু সেইগুলিকেই যে স্বামীজী আগ্রহের সহিত আমাদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন তাহা

নহে। আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত খেত, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তন্ময়তা যেরূপ প্রগাঢ় হইত, এমন আর বোধ হয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখণ্ড ভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন, এবং তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কিরূপে ভাগে জমি চাষ করা হয় তাহা বুঝাইয়া দিতেন, অথবা কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করিতেন; তাহার আবার কোন খুঁটিনাটি বাদ যাইত না—যেমন, সকালের জলখাবারের জন্য যে রাত্রি হইতে খিচুড়ি উনানে চড়াইয়া রাখা হইত, তাহাও উল্লিখিত হইত। আমাদিগকে সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নপ্রান্তে যে আনন্দরেখা ফুটিয়া উঠিত, অথবা কণ্ঠ যে আবেগ-ভরে কম্পিত হইত, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব পরিব্রাজক-জীবনের স্মৃতিবশতঃ। কারণ আমি সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, দরিদ্র কৃষকগৃহে যে অতিথিসৎকার লাভ হয়, তাহা ভারতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না।”…(৮১-৮৩ পৃঃ)।

“সময়ে সময়ে এরূপ মনে হইত, যেন স্বদেশের অতীত গৌরববোধই স্বামীজীর ষোলআনা মনঃপ্রাণ অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার স্থানমাত্রেরই ঐতিহাসিক মূল্যবোধ অতি অসাধারণরূপে বিকাশ পাইয়াছিল। এই হেতু যখন আমরা বর্ষার প্রাক্‌কালে একদিন অপরাহ্ণে গুমোটের মধ্য দিয়া তরাই অতিক্রম করিতে-ছিলাম, সেই সময় তিনি আমাদিগকে যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন যে, এই সেই ভূমি যথায় ভগবান বুদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীলা প্রকটিত হইয়াছিল। বন্য ময়ূরগণ রাজপুতানা ও তাহার চারণগণের গীত মনে পড়াইয়া দিল। ক্বচিৎ কোথাও একটি হস্তী স্বামীজীর ভারতের প্রাচীনকালের যুদ্ধকাহিনীসকল বলিবার উপলক্ষ্যস্বরূপ হইল—সেই প্রাচীন যুগের ভারত, যাহা যতদিন সে বিদেশীয়দিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই জীবন্ত কামানরূপ সামরিক প্রাকার খাড়া করিতে পারিয়াছিল, ততদিন কখনও পরাজিত হয় নাই।”‥ (৮৩-৮৪ পৃঃ)।

“আমরা যখন কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতাম, তখন তিনি আমাদিগকে হিন্দু পরিবারগুলির বিশেষত্বসূচক, দ্বারদেশের উপরিভাগে দোদুল্যমান গাঁদা ফুলের মালাগুলি দেখাইয়া দিতেন। আবার ভারতবাসিগণ ‘সুন্দর’ বলিয়া যাহার আদর করেন, গায়ের সেই ‘কাঁচা সোনার রঙ’ তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেন। ইওরোপীয়দিগের আদর্শস্থল যে ঈষৎ রক্তাভ শ্বেত, তাহা

হইতে উহা কত বিভিন্ন! আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া টাঙ্গাযোগে যাইবার সময় তিনি অন্য সব ভুলিয়া, যে শিব-মাহাত্ম্য বর্ণনে তিনি কদাপি ক্লান্তিবোধ করিতেন না, তাহাতেই মগ্ন হইয়া যাইতেন। মহাদেবের লোকসমাগম হইতে অতিদূরে পর্বতশীর্ষে মৌনভাবে অবস্থিতি, তাঁহার মানবের নিকট কেবল নিঃসঙ্গত্ব-যাচ্ঞা এবং এক অনন্ত ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকা—এইসকল বিষয় বর্ণিত হইত।"…(৮৬ পৃঃ)।

১৩ই মে ভোরে সকলে কাঠগোদাম পৌছিয়া সেখান হইতে প্রথমে টাঙ্গায় ও পরে ঘোড়া বা ডাণ্ডী করিয়া নৈনীতালে উপনীত হন। স্বামীজী ডাণ্ডীতে গিয়াছিলেন। খেতড়ীর রাজা অজিত সিংহ তখন নৈনীতালে ছিলেন; সুতরাং স্বামীজী রাজার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারই বাসস্থানে সানন্দে দুই-তিন দিন কাটাইলেন। আলমোড়া হইতে লিখিত স্বামীজীর ২০শে মে তারিখের পত্রপাঠে জানা যায়, স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম) পুর্ব হইতেই আলমোড়ায় ছিলেন; আলমোড়ার পথে স্বামীজী নৈনীতালে পৌছিলে স্বামী প্রেমানন্দও সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর সকলে ১৬ই মে আলমোড়া যাত্রা করিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন:

"আমরা একটি বড় দল, অথবা প্রকৃতপক্ষে দুইটি দল। বুধবার সন্ধ্যাকালে হাওড়া স্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার প্রাতে হিমালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তিনটি ঘটনা নৈনীতালকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল—খেতড়ীর রাজাকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া আচার্যদেবের আহ্লাদ, দুইজন বাইজীর (বা দেবদাসীর) আমাদের নিকট সন্ধান জানিয়া লইয়া স্বামীজীর নিকট গমন এবং অন্যের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামীজীর তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করা; আর একজন মুসলমান ভদ্রলোকের এই উক্তি: 'স্বামীজী, যদি ভবিষ্যতে কেহ আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করেন, স্মরণ রাখিবেন যে, আমি মুসলমান হইয়াও তাঁহাদের সকলের অগ্রণী।'

"এই নৈনীতালেই স্বামীজী রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন, তাহাতে তিনি তিনটি বিষয় এই আচার্যের শিক্ষার মূলসূত্র বলিয়া নির্দেশ করেন: তাঁহার বেদান্তগ্রহণ, স্বদেশপ্রেমপ্রচার, এবং হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা। এইসকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা যে কার্যপ্রণালীর সূচনা করিয়াছিল, তিনি নিজে মাত্র তাহাই

অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবি করিতেন।” (‘বাণী ও রচনা’, ৯।২৬৯ পৃঃ)।

দেবদাসীদ্বয়-সংক্রান্ত ঘটনাটি বর্ণনা করিতে গিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে, নৈনী-সরোবরের[১] উপরে অবস্থিত মন্দিরদ্বয় দর্শন করার কালে তাঁহারা দুইটি নর্তকীকে পূজারতা দেখিলেন। পূজান্তে ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষা অবলম্বনে তাহারা স্বামীজীর উপস্থিতির কথা জানিতে পারিল ও তাঁহাকে দর্শন করিতে গেল। স্বামীজী ঐ দেবদাসীদ্বয়কে তাড়াইয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সমবেত জনতার মনে বেশ একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু স্বামীজী গ্রাহ্য করেন নাই। এই ঘটনা উপলক্ষে তিনি শিষ্যাদিগকে খেতড়ীর বাইজীর ঘটনাটি শুনাইয়াছিলেন। নিবেদিতা যে মুসলমান ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নামোল্লেখ না থাকিলেও খুব সম্ভবতঃ তিনি মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেন। তাঁহাকে লিখিত স্বামীজীর ১০ই জুন (১৮৯৮) তারিখের একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পত্রের একটি অংশ এইরূপ: “বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলামধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। ·· আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ দুই মহান মতের—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহের—সমন্বয়ই একমাত্র আশা। আমি মানস-চক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।” (ইংরেজী ‘কম্প্লিট ওয়ার্কস’, ৬।৪১৫)।

নৈনীতালে আর একজন ভদ্রলোকের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। ইনি পূর্বে তাঁহার মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের সহপাঠী ছিলেন, নাম যোগেশচন্দ্র দত্ত। যোগেশবাবু জানিতে চাহিলেন, “যদি কিছু টাকা তুলে এদেশের গ্র্যাজুয়েটদের বিলাতে পাঠিয়ে সিভিল সার্ভিস পড়িয়ে আনা যায়, তাতে কিরূপ ফল হয়? তারা দেশে ফিরে দেশের অনেক উপকার করতে পারে না কি?” স্বামীজী ইহাতে কোন উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, “ওতে কিছু হবে না হে! ওতে কেবল ছেলেগুলো সাহেবী ঢং শিখে আসবে আর এদেশে এসে সাহেব-ঘেঁষা হবে। এটা একেবারে ধ্রুবসত্য বলে জেনে রেখে দাও। তারা

১। নৈনীতাল—অর্থাৎ নয়নীদেবীর সরোবর।

শুধু নিজেদের উন্নতির চেষ্টা খুঁজবে, আর সাহেবদের মতো খাবে, পরবে ও চাল চালবে—দেশের কথা মনেও করবে না।” ঐদিন কথায় কথায় দেশের লোকের স্বদেশের উন্নতিকল্পে উৎসাহ ও উদ্যমের অভাবের আলোচনা করিতে গিয়া তিনি এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিয়াছিল। তাঁহার সেই গলদশ্রুলোচন দর্শনে সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ আলোচনাকালে যোগেশবাবুর বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সিং এম-এ মহাশয়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইনি তখন রামপুর স্টেট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন; পরে ইনি লক্ষ্ণৌ কাগজের কলের অন্যতম পরিচালক হইয়াছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া যোগেশবাবু ও তাঁহার বন্ধুর মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে যোগেশবাবু লিখিয়াছিলেন: “জীবনে কখনো সে দৃশ্যটি ভুলিব না। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের কথা তাঁহার হৃদয়ের পরতে পরতে জাগরূক ছিল। ভারতই তাঁহার প্রাণ, ভারতই তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান; ভারতের কথাই তিনি ভাবিতেন, ভারতের জন্য তিনি কাঁদিতেন, আর ভারতের জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চক্ষের প্রতি স্পন্দনে, ধমনীর প্রতি শোণিতবিন্দুতে ভারতের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ছিল না।”

নৈনীতালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য সমাগত ভদ্রলোকদিগকে তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশীয় নিম্নস্তরের অনেকের ধর্মসংক্রান্ত অজ্ঞতা বুঝাইবার জন্য একটি গল্প শুনাইয়াছিলেন: “একবার এক বিশপ কয়লার খনিতে গিয়াছিলেন। তিনি মজুরদের মধ্যে বক্তৃতা দিয়া বাইবেলের মহান সত্যগুলি শিখাইতে সচেষ্ট হইলেন ও বক্তৃতাশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমরা খৃষ্টকে জান তো?’ একজন প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া প্রতিপ্রশ্ন করিল, ‘আজ্ঞে, তার নম্বরটা কত?’ কি বিড়ম্বনা! তাহার ধারণা ছিল, বিশপ নম্বরটি বলিয়া দিলে সে মজুরদের মধ্য হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে।” আমাদের দেশে বলে, ‘সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ?’ স্বামীজী আরও বলিলেন, “পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা এশিয়ার লোকের মতো তেমন ধর্মপ্রাণ নয়। সাধারণের মধ্যে তো ধর্মের চিন্তাই নেই। যে কোন ভারতবাসী লণ্ডন বা নিউ ইয়র্কে গেলে, প্রথমেই তার চোখে পড়ে যে, সেখানকার দুর্নীতিপরায়ণতা তার কল্পিত নরকের চেয়েও বীভৎস। এশিয়ার লোক যতই অধঃপতিত হোক, লণ্ডনের হাইড পার্কে দিন দুপুরে যেসব কাণ্ড ঘটে, দেখলে তারও ঘৃণা হবে।” তিনি

বলিতেন, পাশ্চাত্ত্য দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে শুধু স্বধর্ম সম্বন্ধেই অজ্ঞ তা নয়, এদিকে খুব গোঁয়ার ও অসভ্য। একদিন আমি আমার এই প্রাচ্য পোশাক পরে লণ্ডনের এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় এক কয়লার গাড়ীর গাড়োয়ান আমার পোশাক দেখে বোধ হয় একটু আমোদ বোধ করলে। তারপরই তার হাতটা এমন সুড়সুড় করতে লাগলো যে, তৎক্ষণাৎ সে একটা কয়লার চাঁই আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। ভাগ্যক্রমে সেটা আমার গায়ে না লেগে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

নৈনীতাল হইতে ১৬ই মে স্বামীজী ডাণ্ডীতে ও অপর সকলে ডাণ্ডীতে বা অশ্বারোহণে আলমোড়ায় চলিলেন। ঐ রাত্রি তাঁহারা একটি ডাকবাঙ্গলোয় কাটাইয়া পরদিন আলমোড়ায় পৌছাইলেন। সেখানে স্বামীজী অপর সন্ন্যাসীদের সহিত সেভিয়ার-দম্পতির অতিথি হইলেন, পাশ্চাত্ত্য মহিলারা কিঞ্চিৎ দূরে একটি বাঙ্গলোতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা এখানে প্রায় একমাস ছিলেন। ম্যাক-লাউডের স্মৃতিকথা হইতে জানা যায়, নৈনীতালেও এইরূপ পৃথক বাসেরই ব্যবস্থা হইয়াছিল—মহিলারা একটি হোটেলে ছিলেন এবং ঐ তিন দিন স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের বিশেষ সাক্ষাৎ ঘটে নাই। স্বামীজীর ২০শে মের পত্রে জানা যায়, স্বামী প্রেমানন্দ নৈনীতাল হইতে আলমোড়া যাইবার পথে ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান ও তাঁহার হাতে চোট লাগে। এইজন্য স্বামীজী খুবই চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। আলমোড়ার অন্যান্য খবরের মধ্যে ঐ পত্রে আছে:

"আমার শরীর অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল, কিন্তু ডিস্পেপ্সিয়া (অজীর্ণতা) যায় নাই, এবং পুনর্বার অনিদ্রা আসিয়াছে।...এবারে আলমোড়ার জলহাওয়া অতি উত্তম। তাহাতে সেভিয়ার যে বাঙ্গলা লইয়াছে, তাহা আলমোড়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট। এনি বেস্যাণ্ট চক্রবর্তীর সহিত একটি ছোট বাঙ্গলোয় আছে। চক্রবর্তী এখন (গাজীপুরের) গগনের জামাই। আমি একদিন দেখা করতে গিয়াছিলাম। এনি বেস্যাণ্ট আমায় অনুনয় করে বললে যে, আপনার সম্প্রদায়ের সহিত যেন আমার সম্প্রদায়ের পৃথিবীময় প্রীতি থাকে ইত্যাদি। আজ বেস্যাণ্ট চা খাইতে এখানে আসিবে। আমাদের মেয়েরা নিকটে একটা ছোট বাঙ্গলোয় আছে এবং বেশ আছে। কেবল আজ মিস ম্যাকলাউড একটু অসুস্থ। হ্যারি সেভিয়ার দিন দিন সাধু বনে যাচ্ছে।...হরি ভাই-এর নমস্কার এবং সদানন্দ, অজয় ও সুরেনের প্রণাম জানিবে।"

আলমোড়ায় অবস্থানকালে দুই দলের পৃথক বাসের ব্যবস্থা হইলেও স্বামীজী পূর্বাভ্যাসানুসারে প্রতিদিন প্রাতরাশের সময় শিষ্যাদের বাটীতে উপস্থিত হইতেন এবং বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। বস্তুতঃ এই শিক্ষাদানের ব্যাপার কখনও একেবারে বন্ধ হয় নাই ; ট্রেনে, অশ্বপৃষ্ঠে, প্রাতরাশকালে বা ভ্রমণ করিতে করিতে যখনই সুবিধা হইত তখনই স্বামীজী স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার অপরের কল্যাণার্থ খুলিয়া ধরিতেন। সে বৎসর সারা গ্রীষ্মকালটাই এইভাবে কাটিয়াছিল। আলমোড়ায় বাঙ্গলোর বারান্দায় বসিয়া ঐরূপ আলোচনাকালে স্বামীজী প্রধান বক্তা হইলেও অপরেরা প্রশ্ন করিবার বা স্বীয় মত ব্যক্ত করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইতেন।

স্বামীজীর সহিত এইসব আলোচনাকালে নিবেদিতা স্বামীজীর বাণীর একটি মূলসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন : "আমার গুরুদেবের জীবনের মহত্ত্ব এবং সেই সঙ্গে খেদেরও বিষয় এই যে,…যে অবস্থায় মানুষ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে, সেই সমাধি-অবস্থালব্ধ শাশ্বত প্রজ্ঞা-লোকে তাঁহারও চিত্ত উদ্ভাসিত থাকিত বটে, কিন্তু উহা সেই সকল প্রশ্ন ও সমস্যার উপরই নিপতিত হইত, যাহা আধুনিক জগতের মনীষী ও কর্মিগণের আলোচনার বিষয়। তাঁহার আশা বিংশ শতাব্দীর মানবগণের আশাকে আপনার আশার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে বা বর্জন করিতে পারিত, কিন্তু উহার খোঁজ-খবর না লইয়া থাকিতে পারিত না। সমুদয় জ্ঞানভাণ্ডারকে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রথম ফলস্বরূপ চারিদিক হইতে সমগ্র মানবজাতির দুর্দশা ও তৎপ্রতিকূলে সংগ্রামের যে দৃশ্য প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় লোকের নয়নপথে সহসা পতিত হইয়াছিল, তাহা ইওরোপীয়গণের মতো তাঁহারও চক্ষে পড়িয়াছিল। ইওরোপ এ বিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছে তাহা আমরা জানি। গত ষাট বৎসর বা ততোধিককাল ধরিয়া ইওরোপীয় কলা, বিজ্ঞান ও কাব্য হতাশার ক্রন্দনে পূর্ণ। একদিকে অধিকারপ্রাপ্ত জাতিসমূহের উত্তরোত্তর বর্ধমান তুষ্টি ও ইতরজনোচিত প্রবৃত্তি, অন্যদিকে অধিকারনিরাকৃত জাতিসমূহের উত্তরোত্তর বর্ধমান বিষাদ ও যন্ত্রণা, আর মানবের উদার প্রকৃতি এসকলকে পাপ বলিয়া জানিয়াও শক্তির অভাবে ইহাদের রোধ বা দমনে অসমর্থ—এই দৃশ্যই ইওরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের চক্ষে পড়ে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং মর্মযাতনা ভোগ করিলেও উপায়ান্তর না দেখিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা শুধু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ইহাই বলিতে পারে, 'যাহার আছে, তাহাকে আরও দেওয়া হইবে, আর যাহার

নাই, তাহার নিকট হইতে তাহার যৎসামান্য সম্বলটুকুও কাড়িয়া লওয়া হইবে। সাবধান, যে পরাজিত হইবে, তাহারই সর্বনাশ!'

"প্রাচ্য জ্ঞানিমণ্ডলীরও কি এই অভিমত? তাহা হইলে মানবজাতির আর আশা কি? আমি আমার গুরুদেবের জীবনে এই প্রশ্নের একটি উত্তর দেখিতে পাই। আমি তাঁহাকে একাধারে ভারতের ও জগতের অতীত কালের সংখ্যাতীত আচার্য ও ঋষিগণের আধ্যাত্মিক আবিষ্কার ও ধর্মলাভের জন্য সংগ্রামের উত্তরাধিকারি-স্বরূপে এবং এক নূতনবিধ ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রবর্তক ও ঋষিরূপে দেখিতে পাই।...আমার বিশ্বাস যে, যেসকল উন্নত ও অসাধারণ চিন্তাপ্রণালী ও জ্ঞানভূমিতে তিনি অবাধে বিচরণ করিতেন, তাহার প্রত্যেকটির আধুনিকযুগের জন্য কোন-না-কোন সার্থকতা আছে। আমার বিশ্বাস, অনেক জিনিস, যাহা আমি বুঝিতে পারি নাই বলিয়া আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছে, তাহা অন্য কাহারও জীবনে অনুকূল ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবে।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ৯০-৯১ পৃঃ)।

নিবেদিতার এই দিব্যদৃষ্টিলাভ একদিনে হয় নাই, এই জন্য তাঁহাকে দীর্ঘ ক্ষুরধার পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কারণ ভারতের কল্যাণে উৎসর্গিত-প্রাণা তাঁহার মানসদুহিতার প্রতীচ্যসুলভ চিন্তাধারাকে ঢালিয়া সাজাইবার জন্য স্বামীজী সর্বদা সাতিশয় চেষ্টিত ছিলেন ও ক্ষেত্রবিশেষে অতীব কঠোর প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতেন। নিবেদিতার আত্মনিবেদনই তাঁহাকে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছিল, অপর কেহ হইলে অনেক আগেই ভাঙ্গিয়া পড়িত। ইহা আমরা ক্রমে বুঝিব, আপাততঃ আলমোড়ার শিক্ষা-কালেই ফিরিয়া যাই।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "প্রাতরাশের সময় আমাদের নিকট আসিয়া কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তায় কাটাইয়া দেওয়া স্বামীজীর পুরাতন অভ্যাস ছিল। আমাদের আলমোড়া পৌঁছিবার দিন হইতেই স্বামীজী এই অভ্যাস পুনরায় শুরু করিলেন। তখন (এবং সকল সময়ই) তিনি অতি অল্প সময় ঘুমাইতেন এবং মনে হয়, তিনি যে এত প্রাতে আমাদের নিকট আসিতেন, তাহা অনেক সময় আরও সকালে সন্ন্যাসিগণের সহিত তাঁহার একপ্রস্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিবার মুখে। কখনও কখনও, (কিন্তু কালে ভদ্রে) বৈকালেও আমরা তাঁহার দেখা পাইতাম, হয় তিনি বেড়াইতে বাহির হইতেন, নয় তো আমরা নিজেরাই, তিনি যেখানে

দলবলসহ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতাম।" ('বাণী ও রচনা', ৯।২৭০ পৃঃ)।

"আলমোড়ায় এই প্রাতঃকালীন কথোপকথনগুলিতে একটি নূতন ও অননুভূতপূর্ব ব্যাপার আসিয়া জুটিয়াছিল। উহার স্মৃতি কষ্টকর হইলেও শিক্ষাপ্রদ। ...পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, স্বামীজীর তদানীন্তন শিষ্যগণের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন একজন ইংরেজ রমণী।[২]...উক্ত শিষ্যাকে মঠে দীক্ষিত করিবার পরদিবস স্বামীজী উল্লাসের সহিত...তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'তুমি এখন কোন্ জাতিভুক্তা?' উত্তর শুনিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে কি প্রগাঢ় ভক্তি ও পূজার চক্ষে দেখেন; দেখিলেন যে, একজন ভারতীয় রমণীর তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতি যে ভাব, ইহারও এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই ভাব। স্বামীজীর তাৎকালিক বিস্ময় এবং আশাভঙ্গ বাহিরে প্রকাশ পাইল না বলিলেও হয়।...কিন্তু আলমোড়ায় আসিয়া যেন এক নূতন পাঠ লওয়া শুরু হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।...বহু সপ্তাহ পরে একবার কোন ঘটনা সম্বন্ধে উক্ত শিষ্যার নিরপেক্ষ মত জানিবার চেষ্টা করিয়া যারপরনাই বিফলমনোরথ হইয়া স্বামীজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'বাস্তবিকই তোমার যেরূপ স্বজাতিপ্রেম, উহা তো পাপ! অধিকাংশ লোকই যে স্বার্থের প্ররোচনায় কার্য করিয়া থাকে—আমি চাই, তুমি এইটুকু বুঝ; কিন্তু তুমি ক্রমাগত ইহাকে উলটাইয়া দিয়া বলিয়া থাক যে, একটি জাতিবিশেষের সকলই দেবতা। অজ্ঞতাকে এইরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা তো দুষ্টামি।" ('স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে', ১৮-২০ পৃঃ)।

"সুতরাং আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন আলোচনাসমূহ আমাদের সামাজিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-বিষয়ক বদ্ধমূল পূর্ব সংস্কারগুলির সহিত সঙ্ঘর্ষের আকার ধারণ করিত, অথবা তাহাতে ভারতীয় ও ইওরোপীয় ইতিহাস ও উচ্চ উচ্চ ভাবের তুলনা চলিত এবং অনেক সময় অতি মূল্যবান প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও শুনিতে পাইতাম। স্বামীজীর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, কোন দেশবিশেষ বা সমাজবিশেষের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি উহার দোষগুলিকে প্রকাশ্যে এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন, কিন্তু তথা হইতে চলিয়া আসিবার পর যেন

২। নিবেদিতা জাতে আইরিশ হইলেও, তখনকার দিনে তাঁহাকে ইংরেজ বলা হইত—তাঁহার পরিবারের সকলে ইংলণ্ডেই থাকিতেন।

সেখানকার গুণ ভিন্ন কিছুই তাঁহার মনে নাই, এইরূপই বোধ হইত।" ('বাণী ও রচনা', ৯।২৭১ পৃঃ)।

প্রথম দিন সকালের আলোচ্য বিষয় ছিল—সভ্যতার মূল আদর্শ। স্বামীজীর মতে প্রতীচ্যের আদর্শ সত্য, প্রাচ্যের ব্রহ্মচর্য। হিন্দুর বিবাহপদ্ধতি এই আদর্শ হইতেই সম্ভূত এবং সমস্ত বিষয়টির সহিত অদ্বৈতবাদের মৌলিক সম্বন্ধ রহিয়াছে।

আর একদিনের বিষয়বস্তু ছিল জাতিভেদ। সমস্ত জগতেই চারিটি মুখ্য জাতি আছে; আবার চারিটি মুখ্যজাতীয় কার্যও আছে। সব জাতির মধ্যেই একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি দেখা যায় বিভিন্ন জাতিতে উহাদের বিভিন্ন কর্মের প্রাধান্য আছে। ধর্মসম্বন্ধীয় কর্ম প্রধানতঃ হিন্দুরা সম্পাদন করিতেছে; প্রাচীন রোমকদের হস্তে ছিল যুদ্ধবিদ্যা; বাণিজ্যসংক্রান্ত কর্ম অধুনা মুখ্যতঃ ইংরেজের দ্বারা স্বীকৃত; আর আছে প্রজাতন্ত্র-মূলক কার্য, যাহা আমেরিকা সম্পন্ন করিবে। অতঃপর তিনি বুঝাইয়া দিলেন, আমেরিকাতে কিরূপে ভবিষ্যতে সাধারণ জনগণের অধিকার স্বীকৃত হইবে এবং আমেরিকা কিরূপে তখনও আদিম অধিবাসীদের মর্যাদা-প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত ছিল।

সময়ান্তরে তিনি উল্লাসসহকারে মোগলবংশের কীর্তিকাহিনী শুনাইতেন। আর দিল্লী ও আগ্রার কথা তাঁহার মুখে প্রায়ই শোনা যাইত। তাজমহলের বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ক্ষীণালোক, তারপর আরও ক্ষীণালোক—আর সেখানে একটি সমাধি!" সাজাহানের কথা তুলিয়া তিনি উৎসাহভরে বলিয়াছিলেন, "আহা, তিনিই ছিলেন মোগলবংশের ভূষণস্বরূপ! অমন সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যবোধ ইতিহাসে আর দেখা যায় না। আবার নিজেও একজন কলাবিদ্ লোক ছিলেন। আমি তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি, সেখানি ভারতবর্ষের কলাসম্পদের অঙ্গবিশেষ। কি প্রতিভা!" আকবরের প্রসঙ্গ তিনি আরও বেশী করিয়া করিতেন। আগ্রার সন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজবিহীন অনাচ্ছাদিত সমাধির বর্ণনান্তে আকবরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর কণ্ঠ যেন বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিত।

কথায় কথায় তিনি ইওরোপে চলিয়া যাইতেন। ইতালি ছিল তাঁহার বিবেচনায় "ইওরোপের সকল দেশের শীর্ষস্থানীয়; ধর্ম ও শিল্পের দেশ; একাধারে সাম্রাজ্য-সংহতি ও ম্যাটসিনির জন্মভূমি এবং উচ্চভাবের, সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রসূতি।"

"সর্ববিধ বিশ্বজনীন ভাবও আচার্যদেবের হৃদয়ে উদিত হইত। একদিন তিনি চীনদেশকে জগতের কোষাগার বলিয়া বর্ণনা করিলেন; এবং বলিলেন, তত্রত্য মন্দিরগুলির দ্বারদেশের উপরিভাগে প্রাচীন বাঙ্গলা-লিপি খোদিত দেখিয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইয়াছিল।" (ঐ, ২৭৩ পৃঃ)।

শিবাজীর প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "আজও পর্যন্ত ভারতের কর্তৃপক্ষ সন্ন্যাসীকে ভয় করে, পাছে তাঁহার গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুক্কায়িত থাকে।"

কখনও তিনি আর্যজাতির কথা বলিতেন। পূর্ণ উদ্যমে তাহাদের লক্ষণ বিচার করিতেন। বলিতেন—ইহাদের উৎপত্তি-নির্ণয় জটিল সমস্যা। সুইজরল্যাণ্ডের লোকদের সহিত চীনাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া সুইজরল্যাণ্ডে থাকাকালে ভাবিতেন যেন চীনদেশেই আছেন। নরওয়ের কতক অংশ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তারপর হাঙ্গেরীদেশীয় সেই পণ্ডিতের কথা বলিতেন, যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, হুনদের আদিবাসস্থান তিব্বত।

কখনও কখনও তিনি বলিতেন, ভারতের সমগ্র ইতিহাসকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সঙ্ঘর্ষমাত্ররূপে ব্যাখ্যা করা চলে। আর এই কথাও ঘোষণা করিতেন যে, যেসকল প্রেরণাবলে জাতির উন্নতি ও শৃঙ্খলাপসারণ হয়, তাহা ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই চিরকাল নিহিত ছিল। আর উৎকৃষ্ট যুক্তিবলে তিনি প্রমাণ করিতেন যে, মৌর্যযুগের ক্ষত্রিয়কুলই অধুনা বাঙ্গলার কায়স্থগণে পরিণত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের আদর্শের বিরোধ এইভাবে উপস্থাপিত হইত: "একটি প্রাচীন, গভীর এবং পরম্পরাগত আচার-ব্যবহারের প্রতি চির-বর্ধমান-শ্রদ্ধাসম্পন্ন; অপরটি স্পর্ধাশীল, আবেগপ্রবণ ও উদারদৃষ্টি-সম্পন্ন। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, এবং ভগবান বুদ্ধ—ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়া যে ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেটি ঐতিহাসিক উন্নতির এক গভীর নিয়মেরই ফলস্বরূপ।"

"বুদ্ধদেব সম্বন্ধে স্বামীজী যে সময় কথা কহিতেন, সেটি একটি মাহেন্দ্রক্ষণ; কারণ জনৈক শ্রোত্রী স্বামীজীর একটি কথা হইতে বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণ্যপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবটিই তাঁহার মনোগত ভাব, এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, 'স্বামীজী, আমি জানিতাম না যে, আপনি বৌদ্ধ!' উক্ত নাম শ্রবণে তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্যভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আমি বুদ্ধের দাসানুদাসগণের দাস। তাঁহার মতো কেউ কখন জন্মিয়াছেন কি? স্বয়ং

ভগবান হইয়াও তিনি নিজের জন্য একটি কাজও করেননি। আর কি হৃদয়! সমস্ত জগৎটাকে তিনি ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছিলেন। এত দয়া যে, রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী হইয়াও একটি ছাগশিশুকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত!' " তিনি সেদিন আরও বলিয়াছিলেন যে, বাল্যকালে তিনি শ্রীবুদ্ধের দর্শন পাইয়াছিলেন।[৩] বস্তুতঃ স্বামীজী বুদ্ধের কথা অনেকবার অনেক ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন; বুদ্ধের প্রশংসায় তিনি ছিলেন শতমুখ। একবার তিনি ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতিকে অম্বাপালীর কাহিনী শুনাইয়াছিলেন।

"একদিন প্রাতঃকালে এক সর্বাপেক্ষা নূতনত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হইয়াছিল। সেদিনকার দীর্ঘ আলোচনার বিষয় ছিল 'ভক্তি'—প্রেমাস্পদের সহিত সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য, যাহা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভূম্যধিকারী ভক্তবীর রায় রামানন্দের মুখে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে:

'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল;
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি।'

—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ

"সেই দিন প্রাতঃকালে তিনি পারস্যের বাব-পন্থিগণের (ব্যাবিস্টস্) কথা বলিয়াছিলেন—সেই পরার্থে আত্মবলিদানের যুগের কথা, যখন স্ত্রীজাতিকর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া পুরুষগণ কাজ করিত এবং তাহাদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিত। এবং নিশ্চিত সেই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া ভালবাসিতে পারে বলিয়াই তরুণবয়স্কগণের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠতা, এবং তাহাদের মধ্যে ভাবী মহৎকার্যের বীজ সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে—ইহাই তাঁহার ধারণা।

"আর একদিন অরুণোদয়কালে উদ্যান হইতে যখন উষার আলোকরঞ্জিত চিরতুষাররাশি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেই সময় স্বামীজী আসিয়া শিব ও উমা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলাপ করিতে করিতে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'ঐ যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি, উহাই শিব; আর তাহার উপর যে আলোক-সম্পাত হইয়াছে, তাহাই জগজ্জননী।' কারণ, এই সময়ে এই চিন্তাই তাঁহার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, ঈশ্বরই জগৎ—তিনি জগতের

৩। 'বাণী ও রচনা,' ৯।৭২-৭৩ পৃঃ

ভিতরে বা বাহিরে নহেন, আর জগৎও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, পরন্তু ঈশ্বরই এই জগৎ এবং যাহা কিছু আছে, সব।" ('বাণী ও রচনা', ৯।২৭৫ পৃঃ)।

"একদিন সন্ধ্যাকালে পরমহংস শুকের আখ্যানটি আমরা শুনিয়াছিলাম।

"বাস্তবিক শুকই ছিলেন স্বামীজীর মনের মতো যোগী। তাঁহার নিকট শুক সেই সর্বোচ্চ অপরোক্ষানুভূতির আদর্শস্বরূপ যাহার তুলনায় জীবজগৎ ছেলেখেলা মাত্র। বহুদিন পরে আমরা শুনিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কিশোর স্বামীজীকে 'যেন আমার শুকদেব' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা'—গীতার প্রকৃত মর্ম আমি জানি এবং শুক জানে আর ব্যাস জানিলেও জানিতে পারেন—ভগবদ্গীতার গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ এবং শুকের মাহাত্ম্যদ্যোতক এই শিববাক্য দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার মুখে যে অপূর্ব ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না; তিনি যেন আনন্দ-সমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

"আর একদিন স্বামীজী, হিন্দু-সভ্যতার চিরন্তন উপকূলে—আধুনিক চিন্তা-তরঙ্গরাজির বহুদূরব্যাপী প্লাবনের প্রথম ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে যেসকল উদারহৃদয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা বলিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কথা আমরা ইতিপূর্বেই নৈনীতালে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তিনি সাগ্রহে বলিলেন, 'উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাঁহার প্রভাব না পড়িয়াছে।' এই দুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যে একই অঞ্চলে মাত্র কয়েক ক্রোশের ব্যবধানে জন্মিয়াছেন, একথা মনে হইলে তিনি যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিতেন।" (ঐ, ২৭৫-৭৬ পৃঃ)।

স্বামীজী তাঁহার শিষ্যাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তনকারী ও বহুবিবাহ-রোধকারী মহাবীর।' তিনি তাঁহাদিগকে বিদ্যাসাগর-জীবনের অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনাও শুনাইয়াছিলেন। বালবিধবাগণের বিবাহ চলিতে পারে কিনা—মাতার এইরূপ সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য তিনি দীর্ঘকাল নির্জনে শাস্ত্রালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, শাস্ত্র ইহার বিরোধী নহে। তারপর এই প্রথার সমর্থনে পণ্ডিতদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কতিপয় দেশীয় রাজার চাপে পড়িয়া পণ্ডিতগণ স্বাক্ষর প্রত্যাহার করিলে ব্রিটিশ সরকার বাহাদুরের সাহায্যেই ইহা আইনে পরিণত

করা সম্ভব হইয়াছিল। স্বামীজী আরও বলিলেন, "আর আজকাল এই সমস্যা সামাজিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইয়া বরং একটা অর্থনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" ইহার পর নিবেদিতা মন্তব্য করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কেবল নৈতিক বলে বহু বিবাহকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি যে প্রভূত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম। যখন শুনিলাম যে, এই মহাপুরুষ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অনাহারে এবং রোগে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় মর্মাহত হইয়া 'আর ভগবান মানি না' বলিয়া সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়বাদের চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তখন "পোশাকী" মতবাদের উপর ভারতবাসীর কিরূপ অনাস্থা, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া আমরা যারপরনাই বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম।

"বাঙ্গলার শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে একজনের নাম স্বামীজী ইহার নামের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি ডেভিড হেয়ার; ইনি সেই বৃদ্ধ স্কটল্যাণ্ডবাসী নিরীশ্বরবাদী,—মৃত্যুর পর যাঁহাকে কলিকাতার (খৃষ্টান) যাজকবৃন্দ ঈশাহিজনোচিত সমাধিদানে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিসূচিকা রোগাক্রান্ত এক পুরাতন ছাত্রের শুশ্রূষা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার নিজ ছাত্রগণ তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া এক সমতল ভূমিখণ্ডে সমাহিত করিল এবং উক্ত সমাধি তাহাদের নিকট এক তীর্থে পরিণত হইল। সেই স্থানই আজ শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া কলেজ স্কোয়ার নামে অভিহিত হইয়াছে, আর তাঁহার বিদ্যালয়ও আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত এবং আজিও কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তীর্থের ন্যায় তাঁহার সমাধিস্থান দর্শনে গিয়া থাকে।

"এই দিন আমরা কথাবার্তার মধ্যে কোন সুযোগে স্বামীজীকে জেরা করিয়া বসিলাম—ঈশাহি-ধর্ম তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা। এইরূপ সমস্যা যে কেহ সাহস করিয়া উত্থাপন করিতে পারিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না; এবং আমাদিগকে খুব গৌরবের সহিত বলিলেন যে, তাঁহার পুরাতন শিক্ষক স্কটল্যাণ্ডবাসী হেস্টি সাহেবের সহিত মেলামেশাতেই ঈশাহি প্রচারকগণের সহিত তাঁহার একমাত্র সংস্পর্শলাভ ঘটিয়াছিল। এই উষ্ণমস্তিষ্ক বৃদ্ধ অতি সামান্য ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন এবং নিজ গৃহকে তাঁহার ছাত্রগণেরই গৃহ বলিয়া মনে করিতেন। তিনিই প্রথমে স্বামীজীকে

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভারত প্রবাসের শেষভাগে বলিতেন, 'হাঁ বাবা, তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! সত্যই সব ঈশ্বর!' স্বামীজী সানন্দে বলিলেন, 'আমি তাঁহার সম্পর্কে গৌরবান্বিত। তিনি যে আমাকে তেমন ঈশাহি-ভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, একথা তোমরা বলিতে পার কি? আমার তো মনে হয় না।'" (ঐ, ২৭৭-৭৮ পৃঃ)।

এই সব বৈঠকে লঘুতর বিষয়ও আলোচিত হইত। একদিন স্বামীজী একটি মজার গল্প বলিয়াছিলেন: তিনি তখন আমেরিকার এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন এবং স্বহস্তে রান্না করিয়া খাইতেন। রন্ধনকালে এক অভিনেত্রী ও একটি দম্পতির সহিত তাঁহার প্রায়ই দেখা হইত। অভিনেত্রী রোজ একটি করিয়া পেরুর কাবাব খাইত। আর ঐ দম্পতির মধ্যে পুরুষটির ব্যবসায় ছিল লোকের ফরমায়েস মতো ভূত-নামানো। স্বামীজী জানিতেন, এই ভূত-নামানো ব্যাপারটা নিছক লোক-ঠকানো বুজরুকি ছাড়া আর কিছু নহে। অতএব তিনি তাহাকে এই ঠগবাজী ছাড়িয়া দিতে বলিতেন। অমনি স্ত্রীটি পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে বলিত, "হাঁ মশায়! আমিও তো ওঁকে ঠিক এই কথাই বলে থাকি; কারণ উনিই যত ভূত সাজবেন আর টাকা-কড়ি যা কিছু তা মিসেস উইলিয়ামস নিয়ে যাবে।"

এক ইঞ্জিনিয়ার যুবকের গল্পও তিনি বলিয়াছিলেন। শিক্ষিত হইলেও সে মাতৃহারা ছিল এবং স্বর্গতা মাতাকে দেখিবার জন্য মিসেস উইলিয়ামস-এর শরণ লইয়াছিল। মজা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামীজীও ঐ ভূত-নামানোর আসরে উপস্থিত ছিলেন। ভূত-নামানোর সময়ে স্থূলকায়া ঐ মহিলা যখন পর্দার আড়াল হইতে ক্ষীণকায়া ইঞ্জিনিয়ার-জননীরূপে আবির্ভূতা হইলেন, তখন যুবকটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মা মা, তুমি প্রেতরাজ্যে গিয়ে কি মোটাই না হয়ে গেছ!" স্বামীজী বলিলেন, "এই দৃশ্য দেখে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল যে, লোকটার মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে।" এই বিভ্রান্ত যুবকের হিতসাধনের জন্য তিনি তাহাকে রুশদেশীয় এক চিত্রকরের কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। এক কৃষক তাহার মৃত পিতার আলেখ্য প্রস্তুত করার জন্য চিত্রকরকে ফরমায়েস দিয়াছিল। পিতার কোন চিত্র ছিল না। চিত্রকর মৃতব্যক্তির চেহারা কিরূপ ছিল জানিতে চাহিলে কৃষক উত্তর দিল, "তোমায় তো বাপু কতবার বললাম—তাঁর নাকের উপর একটা

আঁচিল ছিল!” কাজেই চিত্রকর একজন সাধারণ চাষীর ছবি আঁকিয়া তাহার নাকের ডগায় একটা বড় আঁচিল বসাইয়া দিয়া সংবাদ দিলেন, “ছবি প্রস্তুত, এসে দেখে যাও।” সে আসিয়া খানিকক্ষণ ছবিখানিকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া শোকবিহ্বল কণ্ঠে বলিল, “বাবা, বাবা, তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর তুমি কত বদলে গেছ!” এই ঘটনার পর ইঞ্জিনিয়ার যুবক স্বামীজীর সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

বাহ্যদৃষ্টিতে এইরূপ নানা বৈচিত্র্য ও আনন্দের মধ্যে দিন কাটিলেও নিবেদিতার জীবনে তখন চলিতেছিল একটা ভাবগত সংঘর্ষ। ভারতের সেবায় কৃতসংকল্প হইলেও তাঁহার প্রতীচ্য সংস্কার পদে পদে প্রতিবন্ধক ঘটাইত এবং ব্রিটিশ-সভ্যতার প্রতি আনুগত্য ভারতকে বুঝিবার পথে অন্তরায় হইত। স্বামীজী যে প্রক্রিয়া অবলম্বনে এইসকল বাধা অপসারণ করিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পুর্বেই পাইয়াছি। লণ্ডনেও নিবেদিতা স্বামীজীর অনেক কথায় প্রতিবাদ জানাইতেন; সে মনোবৃত্তি আলমোড়ায়ও অব্যাহত ছিল। কিন্তু উভয় স্থলের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে, স্বামীজী সেখানে ছিলেন বিদেশাগত অধ্যাত্মগুণমণ্ডিত আচার্য; আর এখানে তিনি ছিলেন নিবেদিতার নিজের গুরু —পথপ্রদর্শক। এখানে আপত্তির অবকাশ থাকিলেও শেষ পর্যন্ত উপদেশকে আদেশরূপে মানিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু নিবেদিতা সহসা আপনার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারপুর্ণ মনকে পরিবর্তন করিতে পারিতেন না; ফল ছিল মতের বিরোধ ও মানসিক আঘাত ও সন্তাপ। কারণ স্বামীজী রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিতে জানিতেন না—সত্য, নিছক সত্যের আকারেই তাঁহার শ্রীবদন হইতে উদ্গত হইত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, স্বামীজী যখন একদিন চীনদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, নিবেদিতা তখন বলিয়া উঠিলেন, “কিন্তু স্বামীজী চীনাদের অসত্যপরায়ণতা যে একটা সর্বজনবিদিত দোষ!” তৎক্ষণাৎ স্বামীজী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, “অসত্যপরায়ণতা, সামাজিক কঠোরতা—এগুলি অত্যন্ত আপেক্ষিক শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিশেষতঃ অসত্যপরায়ণতার কথা বলতে গেলে, মানুষ যদি মানুষকে বিশ্বাস না করত, তাহলে বাণিজ্য, সমাজ, বা যে কোন প্রকার সংহতি একদিনও টিকতে পারত কি? যদি বল, শিষ্টাচারের খাতিরে অসত্যপরায়ণ হতে হয়, তবে পাশ্চাত্ত্যদের এ বিষয়ে যে ধারণা, তার

সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় ? ইংরেজ কি সকল সময়েই যথাযথ স্থানে দুঃখ ও সুখ বোধ করে থাকে ? বলতে পার মাত্রাগত তারতম্য আছে। হতেও পারে, কিন্তু শুধু মাত্রাগত।"

একদিন নিবেদিতা বলিলেন, "হিন্দুরা এ জীবনের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন, আমি তা অনুভব করতে পারি না। আমার মনে হয়, নিজের মুক্তিসাধনের চেয়ে যেসকল মহৎ কাজ আমার প্রীতিকর তাতে সহায়তা করার জন্য ফের জন্মগ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।" স্বামীজী অমনি উত্তর দিলেন, "তার কারণ তুমি ক্রমোন্নতির ধারণাটা জয় করতে পার না। কিন্তু কোন বাইরের জিনিসই ভাল হয় না—তারা যেমন আছে তেমনি থাকে ; তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।"

স্বামীজী কখনও নিজ মতকে জোর করিয়া অপরের উপর চাপাইতে চাহিতেন না বটে ; তবু সত্যের স্বরূপ তুলিয়া ধরার জন্য ও বিকৃতদৃষ্টি অপসারিত করার জন্য ইওরোপীয় চিন্তাপ্রণালী, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির সমালোচনার প্রয়োজন হইত। আবার একদেশদর্শিতা, অযৌক্তিক স্বদেশপ্রেম ও পরদেশ-বিদ্বেষ ইত্যাদির প্রতিকারের জন্য কোন প্রক্রিয়া কঠোর মনে হইলেও স্বামীজী অযথা উহাকে কোন কোমল আবরণে ঢাকিয়া রাখার প্রয়োজন বোধ করিতেন না—সব কথা খুলিয়াই বলিতেন। এই প্রথা নিবেদিতার ক্ষেত্রেও প্রয়োজিত হইত। নিবেদিতাও ইহার সার্থকতা বুঝিয়া পরে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "শিখিবার বিষয় অনেক ছিল, কিন্তু সময় ছিল অতি অল্প ! শিক্ষার্থীর অহং-নাশই ছিল এখানে শিক্ষার প্রথম সোপান। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর সাহস ও অকপটতারও পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল।" কিন্তু এই তথ্য আবিষ্কারের পূর্বে সত্যই নিবেদিতার চিন্তাজগতে এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। স্বামীজীর উপর নির্ভর করিয়াই তিনি স্বদেশের মমতা বিসর্জনপূর্বক ভারতে আসিয়াছিলেন। হয়তো ভাবিয়া-ছিলেন, স্বামীজীকে পাইবেন এক সদাহাস্যময়, সহানুভূতিপূর্ণ আচার্যরূপে ; কিন্তু স্বামীজীর এই কালের ব্যবহারে মনে হইত, তিনি যেন উদাসীন, হয়তো বা বিরূপ। এবম্প্রকার চিন্তাও নিবেদিতার মনে অসহনীয় ছিল। একদিকে ছিল আশাভঙ্গের ফলে অবিশ্বাসের উদয়, অপর দিকে বিরক্তি ও কিঞ্চিৎ শক্তিপরীক্ষার প্রয়াস। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিবেদিতার জীবনে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আনিয়া দিল। সংঘর্ষের মূল কারণ অনুমান করা তেমন কষ্টসাধ্য ছিল না।

নিবেদিতা সর্বতোভাবে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বামীজীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে মতানৈক্যের বা বিসংবাদের অবকাশ ঘটিত না, কিন্তু নিবেদিতার একটা নিজস্ব প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনি বিদুষী, বুদ্ধিমতী, স্বাধীনজাতির নারী এবং চিন্তা ও কার্যে একটা স্বাতন্ত্র্যের অনুসরণেই অভ্যস্তা। স্বামীজীর অনন্যসাধারণ চরিত্র, আধ্যাত্মিকতা, উদারতা, বাগ্মিতা ও প্রবল ব্যক্তিত্বের দ্বারা আকৃষ্টা হইলেও নিবেদিতা ইতরসাধারণের ন্যায় অসহায়ভাবে নিজের ব্যক্তিত্বকে মুছিয়া ফেলিবেন, ইহার সম্ভাবনা ছিল না। বহির্জগতের সহিত আদানপ্রদানের সর্বোত্তম মাধ্যমরূপে যিনি বুদ্ধিকেই বরণ করিয়াছেন, তিনি কি করিয়া অকস্মাৎ অন্ধবিশ্বাস বা ভাবপ্রবণতার বেদিতে আত্মবলিদান দিবেন ?

দ্বিতীয়তঃ স্বামীজী নিজেও স্বীয় মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত করার কালে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা বা আনুগত্যের দাবী মানিয়া লইয়া অস্বাভাবিক কোমলতার আশ্রয় লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তেমন করিলে হয়তো নিবেদিতা স্বস্তিবোধ করিতেন ও স্বামীজীর কথা আরও সহজে মানিয়া লইতেন ; কারণ ভক্তিশ্রদ্ধার রীতিই এই যে, উহা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরাজয় স্বীকার করিয়া লওয়ার মধ্যেই আনন্দের সন্ধান পায়। কিন্তু স্বামীজীর চরিত্রে আপস বলিয়া তো কিছু ছিল না। আর ব্যক্তিগত আনুগত্যের তো বিশেষ মূল্য নাই, যদি তাহার পশ্চাতে আদর্শের প্রতি অন্ততঃ বৌদ্ধিক স্বীকৃতিও না থাকে। নিবেদিতাকে তিনি ৩রা নভেম্বর (১৮৯৭) তারিখে লিখিয়াছিলেন, "অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কাজের বিঘ্ন করে, 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি'—এই হবে মূলমন্ত্র।"

ভাবাদর্শের সংঘর্ষ যতই প্রবল হউক, একটি বিষয়ে নিবেদিতা রহিলেন অটল —সেবাকার্যে জীবন উৎসর্গ করার যে সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রতিকূল অবস্থায়ও তাহা রহিল অব্যাহত, অপরিবর্তিত। তিনি বুঝিলেন—ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে যে কার্যোদ্যম, তাহাতে তৃপ্তি ও সাফল্য থাকিলেও আদর্শানুসারে কর্তব্য সম্পাদন যে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা আনিয়া দেয় তাহার তুলনায় ইহা অকিঞ্চিৎকর। তবু মানসিক যন্ত্রণা ছিল, এবং উহা অপরেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীমতী ম্যাকলাউড ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং প্রতিকারের চেষ্টাও করিতেছিলেন। ম্যাকলাউড জানিতেন যে, ভাবী কর্মীর প্রস্তুতিকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুঃখবিজড়িত থাকে। কিন্তু কঠোরতার একটা সীমা থাকা

আবশ্যক, যাহাতে শিক্ষার্থীর মন একেবারে ভাঙ্গিয়া না পড়ে। নিবেদিতার ক্ষেত্রে তেমন অবাঞ্ছিত এক মুহূর্ত যে আসিয়া পড়িবে না কে জানে? অতএব ম্যাকলাউড স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামীজীকে এক সকালে শুনাইলেন—নিদারুণ মর্মবেদনায় নিবেদিতার শরীর-মন অবসন্ন; আশু এই অবস্থার অবসান আবশ্যক।

স্বামীজী সব শুনিয়াও নীরবে চলিয়া গেলেন; কিন্তু সন্ধ্যার সময় তিনি আবার আসিলেন ও ম্যাকলাউডের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক, এ অবস্থার পরিবর্তন একান্ত দরকার। আমি একলা জঙ্গলে যাচ্ছি; নির্জন বাসের ইচ্ছা। যখন ফিরে আসব, শান্তি নিয়ে আসব।" বলিতে বলিতে উর্ধ্বে নবচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি পরিচালিত হওয়ায় তিনি দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "দেখ, মুসলমানগণ শুক্লপক্ষীয় শশিকলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইস আমরাও নবীন শশিকলার সহিত নবজীবন আরম্ভ করি।" ইতিমধ্যে নিবেদিতা তাঁহার পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া রহিয়াছেন; স্বামীজী হস্ত প্রসারিত করিয়া স্বীয় মানসকন্যার মস্তকোপরি রাখিলেন ও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "বহুপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, এমন দিন আসিবে, যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয় নরেন্দ্র তাহার জন্মগত, স্পর্শমাত্রে জ্ঞানদান-ক্ষমতার বিকাশ করিবে। আলমোড়ায় সেইদিন সন্ধ্যাকালে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছিলাম।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ৯৯ পৃঃ)। সে শুভাশীর্বাদে ও স্পর্শে নিবেদিতার মনের দ্বন্দ্ব চিরকালের জন্য অপসৃত হইল।

২৫শে মে, বুধবার স্বামীজী চলিয়া গেলেন এবং আবার ফিরিলেন ২৮শে মে, শনিবারে। পূর্বেও তিনি প্রতিদিন দশ ঘণ্টা করিয়া অরণ্যানীর নির্জনতার মধ্যে থাকিতেন বটে, কিন্তু রাত্রিকালে নিজ তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতেন। তখন আবার চারিদিক হইতে এত লোক ঘিরিয়া ধরিত যে, তাঁহার ভাব ভঙ্গ হইত; তাই দিন কয়েকের জন্য লোকালয় হইতে দূরে পলায়নের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এবারে যখন তিনি ফিরিলেন, তখন দেখা গেল, তাঁহার বদনমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে ও আত্মতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ।[৪] তিনি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি এখনও সেই

৪। বাঙ্গলা জীবনীর মতে (৭৬১ পৃঃ) তিনি প্রত্যহ সীয়াদেবী নামক স্থানে যাইতেন ও রাত্রে ফিরিতেন; তারপরই সেভিয়ারদের সঙ্গে জায়গা খুঁজিতে যান। বর্তমান গ্রন্থে নিবেদিতার লিখিত যে মত অনুসৃত হইল, তাহা কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। ('বাণী ও রচনা', ৯।২৮০-৮১ পৃঃ)।

নগ্নপদে ভ্রমণক্ষম, শীতাতপসহিষ্ণু ও স্বল্পাহারে তুষ্ট সন্ন্যাসীই আছেন, প্রতীচ্যবাস তাঁহার ক্ষতি করিতে পারে নাই।

৩০শে মে, সোমবার তিনি সেভিয়ার-দম্পতির সহিত পুনর্বার এক সপ্তাহের জন্য অন্যত্র চলিলেন। এইবারের যাত্রার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—তিনি যে নির্জনবাসের জন্য লালায়িত ছিলেন, সে বাসনা তখনও সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই ; আলমোড়া শহরে বা উহার আশে-পাশে তেমন তৃপ্তিলাভের সুযোগও ঘটিতেছিল না। অতএব তিনি স্থির করিয়াছিলেন, এমন স্থানে যাইবেন, যেখানে কেহ তাঁহার সন্ধান পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ হিমালয়ে আশ্রম স্থাপনের উপযুক্ত স্থান সংগ্রহের চেষ্টা করাও আবশ্যক ছিল। দূরে একটি স্থানে ঐরূপ জমি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ; যদিও কার্যতঃ তাহা হয় নাই।[৫] এখানে আমরা আবার নিবেদিতার বিবরণে ফিরিয়া যাই।

"৩রা জুন। শুক্রবার প্রাতঃকালে আমরা বসিয়া কাজকর্ম করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক তার আসিল। তারটি একদিন দেরীতে আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—'কল্য রাত্রে (২রা জুন) উতকামণ্ডে গুডউইনের দেহত্যাগ হইয়াছে।' সে অঞ্চলে যে (টাইফয়েড) মহামারীর সূত্রপাত হইতেছিল, আমাদের বন্ধু তাহারই করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন ; তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীজীর কথা কহিয়াছিলেন।

"৫ই জুন। রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বামীজী স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের ফটক এবং উঠান হইয়াই তাঁহার রাস্তা। তিনি সেই রাস্তা ধরিয়া আসিলেন এবং সেই প্রাঙ্গণে আমরা মুহূর্তেকের জন্য বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলাম। তিনি দুঃসংবাদের বিষয় অবগত ছিলেন না ; কিন্তু তবু যেন পূর্ব হইতেই এক গভীর বিষাদচ্ছায়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং অনতিবিলম্বেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের[৬] কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, যিনি গোখুরা সর্পকর্তৃক দষ্ট হইয়া 'প্রেমময়ের নিকট হইতে দূত আসিয়াছে' এইমাত্র বলিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, 'এই মাত্র আমি এক পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে—পওহারী বাবা নিজ দেহদ্বারা তাঁহার যজ্ঞসমূহের পূর্ণাহুতি

৫। ইংরেজী জীবনী, ৫৭১ পৃঃ।

৬। গাজীপুরের পওহারী বাবা।

প্রদান করিয়াছেন। তিনি হোমাগ্নিতে স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়াছেন।' তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'স্বামীজী! এটা কি অত্যন্ত খারাপ কাজ হয় নাই?' স্বামীজী গভীর আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'তাহা আমি জানি না। তিনি এতবড় মহাপুরুষ ছিলেন যে, আমি তাঁহার কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকারী নহি। তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা তিনিই জানিতেন।'"

এই আঘাত সামলাইতে না সামলাইতে তাঁহাকে আর একটি কঠিন আঘাত সহ্য করিতে হইল। গুডউইনের দেহত্যাগের সংবাদ নিবেদিতারা চাপিয়া গেলেও ইহা স্বামীজীকে জানানো আবশ্যক ছিল। অতএব সেভিয়ারদের বাড়ীতে তিনি অপরের মুখে এই দুঃসংবাদ শুনিলেন। ইহাতে স্বামীজীর কিরূপ মর্মপীড়া ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব। আমরা জানি, অদৃষ্টবলে গুডউইনকে 'মাদ্রাজ মেল' নামক সংবাদপত্রের আফিসে কার্যগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ঐ কার্যে ব্যাপৃত থাকাকালেই তিনি টাইফয়েডে আক্রান্ত হন ও তাঁহাকে উতকামণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানেই ২রা জুন তাঁহার দেহ-ত্যাগ হয়। উক্ত সংবাদ প্রাপ্তির পরদিন ৬ই জুনের কথা নিবেদিতা এইভাবে লিখিয়াছেন:

"পরদিন প্রাতে তিনি খুব সকাল সকাল আসিলেন। দেখিলাম, তিনি এক গভীর ভাবে ভাবিত। পরে বলিলেন যে, তিনি রাত্রি চারিটা হইতেই উঠিয়া-ছিলেন এবং একজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া গুডউইন-সাহেবের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিয়াছে। আঘাতটি তিনি নীরবে সহিয়া লইলেন। কয়েক দিন পরে তিনি যেস্থানে প্রথম ইহা পাইয়াছিলেন, সেস্থানেই আর থাকিতে চাহিলেন না; বলিলেন, তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত শিষ্যের আকৃতি রাতদিন তাঁহার মনে পড়িতেছে, এবং ইহা যে দুর্বলতা, এ কথাও জ্ঞাপন করিলেন। ইহা যে দোষাবহ, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি বলিলেন যে, কাহারও স্মৃতির দ্বারা এইরূপে পীড়িত হওয়াও যা, আর ক্রমবিকাশের উচ্চস্তরে মৎস্য কিংবা কুকুর-সুলভ লক্ষণগুলি অবিকল বজায় রাখাও তাই, ইহাতে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নাই। মানুষকে এই ভ্রম জয় করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে, মৃতব্যক্তিগণ যেমন আগে ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি এইখানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতি এবং বিচ্ছেদটাই শুধু কাল্পনিক। আবার পরক্ষণেই কোন

ব্যক্তিবিশেষের (অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের) ইচ্ছানুসারে এই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, এইরূপ নিবুদ্ধিতামূলক কল্পনার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'গুডউইনকে মারিয়া ফেলার জন্য এরূপ এক ঈশ্বরকে যুদ্ধে নিপাত করাটা মানুষের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে নহে কি? গুডউইন বাঁচিয়া থাকিলে কত বড় বড় কাজ করিতে পারিত।'...

"কিন্তু এই প্রথম কয়েক ঘণ্টা স্বামীজী তাঁহার বিয়োগদুঃখে অটল রহিলেন এবং আমাদের সহিত বসিয়া ধীরভাবে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। সেদিন প্রাতঃকালে তিনি ক্রমাগত ভক্তি যে তপস্যায় পরিণত হয়, সেই কথা বলিতে লাগিলেন—কিরূপে প্রগাঢ় ভগবৎপ্রেমের খরতর প্রবাহ মানুষকে ব্যক্তিত্বের সীমা ছাড়াইয়া বহুদূর ভাসাইয়া লইয়া গেলেও আবার তাহাকে এমন এক স্থানে ছাড়িয়া দিয়া যায়, যেখানে সে ব্যক্তিত্বের মধুর বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ছটফট করে।

"সেদিন সকালের ত্যাগসম্বন্ধীয় উপদেশসমূহ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজনের নিকট অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইল; পুনরায় তিনি আসিলে উক্ত মহিলা তাঁহাকে বলিলেন, 'আমার ধারণা—অনাসক্ত হইয়া ভালবাসায় কোনরূপ দুঃখোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, এবং ইহা স্বয়ংই সাধ্যস্বরূপ।' হঠাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া স্বামীজী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই যে ত্যাগ-রহিত ভক্তির কথা বলিতেছ, এটা কি? ইহা অত্যন্ত হানিকর!' সত্যই যদি অনাসক্ত হইতে হয়, তবে কিরূপ কঠোর আত্মসংযমের অভ্যাস আবশ্যক, কিরূপে স্বার্থপর উদ্দেশ্য-গুলির আবরণ উন্মোচন করা চাই, এবং অতি কুসুম-কোমল হৃদয়েরও যে, যে-কোন মুহূর্তে সংসারের পাপকালিমায় কলুষিত হইবার আশঙ্কা বর্তমান, এই সম্বন্ধে তিনি সেইখানে এক ঘণ্টা বা ততোধিককাল দাঁড়াইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ভারতবর্ষীয়া সন্ন্যাসিনীর কথা উল্লেখ করিলেন, যিনি 'মানুষ কখন ধর্মপথে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে'—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর-স্বরূপ 'এক খুরি ছাই' প্রেরণ করিয়াছিলেন। রিপুগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুদীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর, এবং যে-কোন মুহূর্তেই বিজেতার বিজিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।" (ঐ, ২৮০-৮২ পৃঃ)।

ফলতঃ গুডউইনের নাম উল্লিখিত না হইলেও, তাঁহার মৃত্যু ও পওহারী বাবার মহাসমাধি আলমোড়ার ঐ ক্ষুদ্র দলটির উপর যে বিষাদাবরণ বিস্তার করিয়াছিল,

তাহা অন্যভাবে বৈরাগ্যাদির আলোচনা অবলম্বনে আপনার উপস্থিতি প্রমাণ করিতে লাগিল। এই ভাবটি তাঁহার মনকে দীর্ঘকাল অধিকার করিয়া ছিল বলিয়া মনে হয়। এমন কি একদিন ভগিনী নিবেদিতা গুডউইনের মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকটি পঙক্তি রচনান্তে স্বামীজীকে উহা দেখাইতে গেলে, ঐ টুকুতে যেন স্বামীজীর তৃপ্তি হইল না ; তিনি উহা লইয়া গেলেন এবং স্বীয় লেখনী ধারণপূর্বক শব্দবিন্যাস অপেক্ষা ভাবাভিব্যক্তির প্রতি অধিক জোর দিয়া দীর্ঘকাল ঐ কার্যে নিযুক্ত রহিলেন এবং পরিশেষে ঐ দৃষ্টি অবলম্বনেই উহাকে আদ্যোপান্ত বদলাইয়া 'রেকুইএস্‌ক্যাট্‌ ইন্‌ পাসে' (শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম -'বাণী ও রচনা', ৭।৪২৮ পৃঃ) শীর্ষক একটি সুন্দর ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া শোকসন্তপ্তা গুডউইন-জননীর নিকট পুত্রের স্মৃতিচিহ্ন ও সান্ত্বনাবাক্যস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। গুডউইন সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিলেন, "গুডউইনের ঋণ অপরিশোধনীয়। আর যাঁহারা মনে করেন, আমার কোন চিন্তাদ্বারা তাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, তাহার প্রত্যেকটি কথা শ্রীমান গুডউইনের স্বার্থলেশহীন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে আমি এমন একজন অকপট বন্ধু, ভক্তিমান শিষ্য ও অদ্ভুত কর্মীকে হারাইয়াছি, যে জানিত না, ক্লান্তি কাহাকে বলে। পরার্থে যাঁহারা জীবনধারণ করেন, এরূপ লোক জগতে অতি অল্প। সেই অত্যল্প সংখ্যারও আর একটি হ্রাস পাইল !"

এমনিভাবে কথাবার্তায় আরও চারিদিন আলমোড়ায় কাটিয়া গেল। ৯ই জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজী কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি অবতার বা মহাপুরুষের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অপর যুক্তিবাদীদেরই ন্যায় পক্ষ ও বিপক্ষ অবলম্বনে বিবিধ আলোচনা করিলেও, "আজ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বর্ণিত হইলেন।'…কিন্তু এই কয় দিবস যাবৎ স্বামীজী কোথাও গিয়া একাকী বাস করিবার জন্য ছটফট করিতেছিলেন। যে স্থানে তিনি গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছেন, সেই স্থান তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং পত্র আদান-প্রদানে সেই ক্ষত ক্রমাগত নূতন হইয়া উঠিতেছিল। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাহির হইতে কেবল ভক্তিময় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরে তিনি পূর্ণ জ্ঞানময় ছিলেন ; কিন্তু তিনি (স্বামীজী) নিজে বাহ্যতঃ কেবল জ্ঞানময় বলিয়া মনে হইলেও ভিতরে ভক্তিতে পূর্ণ, এবং সেইজন্য মাঝে মাঝে তাঁহাতে

নারীজনসুলভ দুর্বলতা ও কোমলতার ভাব দেখা যাইত।" এই পরিবেশের পরিবর্তন আবশ্যক জানিয়া স্থির হইল, স্বামীজী কাশ্মীরে যাইবেন। তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার সঙ্গে যাইবেন শুধু বিদেশিনী মহিলাবৃন্দ—শ্রীযুক্তা ওলি বুল, প্যাটারসন, ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা।[৭]

১০ই জুন আলমোড়া-বাসের শেষদিন অপরাহ্নে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা বলিলেন। যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের মনে ভাবনা জাগিয়াছিল যে, ক্যান্সার সংক্রামক-ব্যাধি এবং অপরেরাও ঠাকুরের এই সাংঘাতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে পারেন, সেদিন কেমন করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পথ্যের বাটি তুলিয়া ভুক্তাবশিষ্ট পায়স অম্লানবদনে গলাধঃকরণ-পূর্বক সকলের মনে সাহস আনিয়াছিলেন, সেই ঘটনাও পাশ্চাত্ত্য মহিলারা শুনিলেন। ১১ই জুন তাঁহারা আলমোড়া ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু আলমোড়া-ত্যাগের পূর্বে তিনি এই দুঃসময় দিনগুলির মধ্যেও একটি ভাবী কল্যাণের বীজ প্রোথিত করিতে পারিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। স্বামীজীর উদ্দীপনায়, ও উৎসাহী যুবক ও পূর্ণ বেদান্তবাদী শ্রীযুক্ত রাজম্ আয়ারের সম্পাদনায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মাদ্রাজ হইতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' বা 'এ্যাওয়েকেণ্ড ইণ্ডিয়া' নামক একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাজম্ আয়ার মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলে জুন-সংখ্যা প্রকাশের পরই পত্রিকা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। স্বামীজী পত্রিকাখানির খুবই প্রশংসা করিতেন। এবং আলমোড়ায় আসার পূর্ব হইতেই বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তদবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণের ও বেদান্তের বাণী সর্বত্র প্রচারের কথা প্রায়ই বলিতেন। এক সময় তিনি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশেরও কথা ভাবিয়াছিলেন। এখন 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র এই সঙ্কট-মুহূর্তে তিনি উহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সেভিয়ার-দম্পতিকে বলিয়া কহিয়া রাজী করাইলেন যে, তাঁহারা উহার ব্যয়ভার বহন করিবেন এবং স্বামী স্বরূপানন্দের সম্পাদনায় উহা আপাততঃ আলমোড়ার 'থম্পসন হাউস' নামক

৭। শ্রীযুক্তা প্যাটারসন সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নহি। তবে তিনি স্বামীজীর সহিত আলমোড়ায় আসিয়াছিলেন ঠিক এবং ২০শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী ডাল-হ্রদের তীরে প্যাটারসনের বাটীতে গিয়াছিলেন ('বাণী ও রচনা', ৯।৩২৭ দ্রঃ)। ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথায় তাঁহার সঙ্গে ম্যাকলাউডের নৌকাবাসের কথা আছে। ('রেমিনিসেন্সেস', ২৪১)।

রহিল এক উজ্জ্বল উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশপ্রেম। শিখদের অনুপম বীরত্ব ও সমরনাদ "ওয়াহ্ গুরু কী ফতে", তাঁহাদের ধর্মপুস্তক গ্রন্থসাহেব, শিখগুরুদের অপূর্ব ত্যাগ ও মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, তাঁহারা বেদান্তের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি জনসাধারণের মধ্যে এমন ভাবে প্রচার করিয়াছেন যে, আজও কৃষককন্যার চরকা হইতে "সোঽহম্ সোঽহম্" ধ্বনি উত্থিত হয়! পরে গ্রীকবীর সেকন্দরের পাঞ্জাব আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ও বৌদ্ধসম্রাটদের অভ্যুদয় প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি গান্ধারের ভাস্কর্য-শিল্পের সৌন্দর্য ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে আসিয়া পড়িলেন এবং শ্লেষপূর্ণস্বরে বলিলেন, ইওরোপীয় সাহেবেরা আবার বলে যে, আমরা নাকি গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পকলা শিক্ষা করিয়াছি! পাঞ্জাবে প্রবেশমাত্র স্বামীজী কিরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে গিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছেন :

"পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আমার গুরুদেবের স্বদেশপ্রেমের গভীরতম পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যদি কেহ তাঁহাকে সে সময়ে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ধারণা করিয়া বসিতেন যে, স্বামীজী এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি উহার সহিত আপনাকে এত অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে হইত যেন তিনি ঐ প্রদেশের লোকের সহিত বহু প্রেম ও ভক্তিবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন ; যেন তিনি উহাদের নিকট পাইয়াছেনও অনেক এবং দিয়াছেনও অনেক। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক ছিলেন, যাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিতেন যে, তাঁহাতে তাঁহারা গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের—তাঁহাদের প্রথম ও শেষ গুরুর অপূর্ব মিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা সন্দেহ-প্রবণ, তাঁহারা পর্যন্ত তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। আর যদি তাঁহারা তাঁহার আশ্রিত ইউরোপীয় শিষ্যগণ সম্বন্ধে—যাহাদিগকে তিনি নিজের করিয়া লইয়াছিলেন—তাঁহার সহিত একমত হইতে না পারিতেন, অথবা তাঁহার ন্যায় উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তিনি এই উদ্দামহৃদয় লোকগুলিকে তাঁহাদের মত পরিবর্তন না করা ও অটুট কঠোরতার জন্য যেন আরও অধিক ভালবাসিতেন। তিনি যে পাঞ্জাবী বালিকার চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে "শিবোঽহং শিবোঽহং" ধ্বনি শোনার কথা বলিতেন—যাহার বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল একটি অস্ফুট আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত—তাঁহার আমেরিকাবাসী শিষ্যগণ পূর্বেই তাহার সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন।

আবার এ কথাও বলিতে ভুলিলে চলিবে না যে, এই পাঞ্জাব প্রদেশের পরই তিনি (যেমন আর একবার তিনি কাশীতে জীবনের অপরাহ্ণ-সময়ে করিয়াছিলেন) একজন মুসলমান মিঠাইওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে মুসলমানী খাবার কিনিয়া খাইয়াছিলেন।” (‘স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি,’ ৮৫-৮৬)।

রাওলপিণ্ডিতে তাঁহারা ট্রেন হইতে নামিলেন ও ১৫ই জুন মারী পৌঁছিলেন। রাওলপিণ্ডি হইতে সকলে টাঙ্গায় ঐ পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। মারীতে তিন দিন বিশ্রাম উপভোগের পর ১৮ই জুন আবার কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা শুরু হইল। ঐ দিন ডুলাই-এ পৌঁছিয়া ডাক-বাঙ্গলোয় উঠিলেন। এখানে স্বামীজী হিন্দু-ধর্মের আর একটি দিক উদ্‌ঘাটিত করিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন : “ডুলাই-এ আমাদের হিন্দুধর্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া গেল। কারণ স্বামীজী গম্ভীর ও বিশদভাবে এই ধর্মের আধুনিক অধোগতির কথা আমাদিগকে বলিলেন, এবং উহাতে যেসকল কুরীতি বামাচার নামে প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলির প্রতি স্বীয় আপোসহীন বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করিলেন।” শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও ধর্মপথকেই অস্বীকার না করিলেও এই সকল সমাজবিরোধী ও পদস্খলনসঙ্কুল পিচ্ছিল ধর্মসাধনার উপায়কে খিড়কির দরজা বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই কথা বলার সঙ্গে স্বামীজী ইহাও দেখাইয়া দিলেন যে, ভারতেতর দেশেও এই জাতীয় সাধনপ্রণালী অল্পবিস্তর আছে, এবং এই সমস্তই বামাচারের অন্তর্ভুক্ত। ডুলাই হইতে আবার টাঙ্গায় চড়িয়া তাঁহারা বারামুল্লায় চলিলেন।

ঠিক হইয়াছিল যে, স্বামীজীর উপদেশামৃত পান করিবার জন্য সকলেই পালা করিয়া তাঁহার টাঙ্গায় উঠিবেন। এইভাবে চলিতে চলিতে তিনি স্বীয় জীবনের একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন। তাঁহার এক ধনী সহপাঠী রোগে ভুগিতেছিলেন ; এদিকে রোগনির্ণয় ও উপযুক্ত ঔষধপ্রয়োগ না হওয়ায় তিনি ক্রমে কৃশ হইয়া পড়িতেছিলেন। এমন সময় আত্মীয়েরা স্বামীজীকে ডাকিয়া আনিলেন—এই বিশ্বাসে যে, সাধু অলৌকিক শক্তিপ্রয়োগে অসাধ্য সাধন করিতে পারিবেন। স্বামীজী তখন গৃহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আসিয়া বন্ধুকে বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই অংশটি শুনাইলেন ও বুঝাইয়া দিলেন : “যিনি ব্রাহ্মণকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন ; যিনি ক্ষত্রিয়কে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন, ক্ষত্রিয় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন ; যিনি

লোকসকলকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন, লোকসকল তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে” ইত্যাদি।[৯] সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সহিত আপনার এই অভেদ ভাবনার কথা শুনিয়া ও উহাতে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক ঐরূপ চিন্তা করিয়া রোগী নিরাময় হইয়াছিলেন। ঐ বাক্যগুলির অন্তর্নিহিত বিশ্বপ্রেমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামীজী ভ্রমণসঙ্গীকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অনেক সময় কঠোর মনে হইলেও তিনি এই সর্বানুস্যূত প্রেমের বশবর্তী হইয়া সকলের কল্যাণেরই জন্য ঐরূপ ব্যবহার করেন ; এই মূলতত্ত্ব মনে রাখিলে আর ভুল বুঝার অবকাশ ঘটে না। ('বাণী ও রচনা', ৯।২৯০)।

ঐ ভ্রমণকালে তিনি শৈশবের একটি ঘটনাও বলিয়াছিলেন—কেমন করিয়া আচারবিশেষের অযৌক্তিকতা লইয়া মাতার সহিত তাঁহার তুমুল বিচার উপস্থিত হইয়াছিল। প্রচলিত রীতি অনুসারে আহারের সময় ডান হাতে জলের গ্লাস তুলিতে হয় ; কিন্তু নরেন্দ্র বুঝাইতে চাহিলেন, ঐরূপ না করিয়া পরিষ্কার বাঁ হাতে তোলাই তো ন্যায়সঙ্গত। তর্কের একদিকে যুক্তি, অপর দিকে লোকাচার। ইহার মীমাংসা কোথায় ? (ঐ, ২৯১ পৃঃ)।

“পথে যাইতে যাইতে···পুনরায় একদল পাদচারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাদের কৃচ্ছ্রানুরাগ দেখিয়া স্বামীজী কঠোর তপস্যাকে 'বর্বরতা' বলিয়া তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। যাত্রিগণ তাহাদের আদর্শের নামে ধীরে ধীরে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতেছে—এই দৃশ্যে তাঁহার মনে কষ্টকর স্মৃতি-পরম্পরার উদয় হইল, এবং মানবসাধারণের পক্ষ হইতে তিনি ধর্মের উৎপীড়নে অধীর হইয়া উঠিলেন।[১০] পরে আবার ঐ ভাব যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ চলিয়া গেল এবং তাহার পরিবর্তে এই 'বর্বরতা' না থাকিলে যে বিলাস আসিয়া মানুষের সমুদয় মনুষ্যত্ব অপহরণ করিত, এই ধারণা ঠিক তেমনই দৃঢ়তার সহিত উল্লিখিত হইল।” (ঐ, ২৯২ পৃঃ)।

ক্রমে তাঁহারা বারামুল্লায় উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে নৌকাযোগে ২০শে জুন শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৯। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৫।৭

১০। স্বামীজী বলিতেন, জনকয়েক উচ্চতম আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন অতিমানব সৃষ্টির জন্য জনসাধারণের অনুসরণীয় ধর্মাচরণকেও অযথা একটা কঠোর আকার দেওয়া হইয়াছে ; ইহা অযৌক্তিক।

ভূস্বর্গ

বারামুল্লা হইতে ২০শে জুন যাত্রা শুরু হইল। দলে অপর কোনও পুরুষসঙ্গী না থাকায় ছোট-খাট কাজগুলি স্বামীজীকেই করিতে হইত। বিদেশিনীরা ভাষা জানেন না, এদেশের রীতি-নীতি ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধেও তেমন কিছুই বিদিত নহেন। অতএব স্বামীজী নিজেই বারামুল্লায় নৌকা খুঁজিতে গিয়াছিলেন। অকস্মাৎ ডাক-বাঙ্গলোয় ঐ বিদেশিনীদের কামরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—এই কথা বলিতে বলিতে ছাতাটি জানুদ্বয়ের উপর রাখিয়া উপবেশন করিলেন। ডোঙ্গা ভাড়া করা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজে বাহির হইয়া হঠাৎ একজন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি স্বামীজীর নাম শুনিয়াই সর্বপ্রকার বন্দোবস্তের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়া স্বামীজীকে নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। অতএব দিনটি সকলের বেশ আনন্দে কাটিল। তাঁহারা কাশ্মীরী 'সামাভার' হইতে চা পান করিলেন ও ঐ দেশী মোরব্বা খাইলেন। পরে তাঁহারা তিনখানি ডোঙ্গাবিশিষ্ট এক নৌবহরে চড়িয়া[১] শ্রীনগর যাত্রা করিলেন প্রায় বেলা চারিটার সময়। প্রথম সন্ধ্যায় নৌকাগুলি স্বামীজীর এক পূর্বপরিচিত বন্ধুর বাগানের পার্শ্বে নঙ্গর করিল।

পরদিন তাঁহারা তুষারমণ্ডিত পর্বতরাজির দ্বারা বেষ্টিত এক সুমনোহর উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন; ইহাই বিশ্ববিশ্রুত কাশ্মীর উপত্যকা। একস্থানে নৌকা বাঁধিয়া সকলে প্রাতর্ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং অনেকগুলি ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া ও একজন সাধুর কুঠিয়ার মতো স্থানসঙ্কুলান হইতে পারে এমন বিরাট কোটরবিশিষ্ট এক চেনার গাছের পাশ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে ক্রমে এক খামারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানটি স্বামীজীর পূর্বপরিচিত। পূর্বের শরৎ ঋতুতে স্বামীজী যখন কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন তখন এই গোলা-বাড়ীতেই

১। শ্রীমতী ম্যাকলাউডের মতে চারিখানি নৌকা ছিল—একখানিতে ওলি বুল ও ম্যাকলাউড, দ্বিতীয়খানিতে শ্রীযুক্তা প্যাটারসন ও নিবেদিতা, তৃতীয়খানিতে স্বামীজী ও একজন সন্ন্যাসী; চতুর্থখানি রন্ধন ও আহারের জন্য ('রেমিনিসেন্সেস', ২৪১ পৃঃ)। নিবেদিতা অপর কোন সন্ন্যাসীর উপস্থিতি অস্বীকার করেন; তাঁহার মতে নৌকা ছিল তিনখানি।

কাশ্মীরী নারীদের প্রথানুযায়ী লালটুপি পরিহিতা ও শ্বেত অবগুণ্ঠনে আবৃতা এক বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্বামীজী তাঁহার নিকট জল চাহিয়া খাইবার পর বিদায় লইবার পূর্বে যখন ধীরভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, তুমি কোন্ ধর্মাবলম্বিনী ?" তখন বৃদ্ধা দৃপ্তকণ্ঠে সুস্পষ্ট উত্তর দিয়াছিল, "খোদাকে ধন্যবাদ! প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী।" বৃদ্ধার সেই স্বধর্মে আস্থা ও গৌরববোধের কথা স্বামীজী স্বদেশ ও বিদেশে বহু স্থানে সানন্দে বলিয়াছিলেন। আজ সেই পূর্বপরিচিত মুসলমান পরিবারটি স্বামীজীকে সাদরে গ্রহণ করিল এবং স্বামীজীর সহিত আগতা বিদেশিনীদের প্রতিও উপযুক্ত সৌজন্য প্রকাশ করিল।

শ্রীনগর পর্যন্ত রাস্তার চমৎকারিত্বে মুগ্ধা নিবেদিতা লিখিয়াছেন: "আমাদের যাত্রাপথের সৌন্দর্যসমূহের বর্ণনা করিতে গিয়া সহজেই আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়। কারণ,...বিতস্তা গিরিসঙ্কটের গীর্জার আকারে শোভমান পাহাড়গুলি ও শস্যক্ষেত্রবক্ষে লুক্কায়িতপ্রায় গ্রামসমূহ ঐ পথের অন্তর্গত। ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিলে কতকগুলি সুষমাময় দৃশ্যপরম্পরা মানসপটে উদিত হয়। এস্থলে আমি শ্রীনগরের বহির্দেশে সমুন্নত লম্বাডিদেশসুলভ পপ্লার গাছগুলি যে বীথি রচনা করিয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করিতে পারি।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ৮৭-৮৮ পৃঃ)। তাঁহারা আরও দেখিলেন, কোথাও কৃষক আপন মনে গান গাহিয়া চলিয়াছে; কোথাও সাধুরা আঁকাবাঁকা পথে দেবমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। পাহাড়ের সানুদেশ শত শত আইরিস পুষ্পে সুশোভিত। মধ্যে রহিয়াছে শ্যামল উপত্যকা ও শস্যক্ষেত্র, তাহার চতুর্দিকে শুভ্রশীর্ষ তুষারাবৃত পর্বতপ্রাকার।

শ্রীনগরে পৌঁছিবার পূর্বে এক সন্ধ্যায় আহারের পূর্বে ক্ষেতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে বিদেশিনীদের একজন স্বামীজীর নিকট অভিযোগ করিলেন, কালীঘাটে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দৃষ্টিতে ভক্তির আতিশয্য বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। "প্রতিমার সম্মুখে লোকে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয় কেন ?"—এই ছিল তাঁহার প্রশ্ন। স্বামীজীর হস্তে ছিল তখন ক্ষুদ্র নীল তিল ফুল, আর তিনি বলিতেছিলেন, "তিল আর্যগণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তৈলবাহী বীজ।" কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া তিনি ফুলটি ফেলিয়া দিলেন, আর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই পর্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর সেই

প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া কি একই কথা নয়?" ('বাণী ও রচনা', ৯।২৯৪)। বস্তুতঃ কোন বস্তু শুধু বস্তুরূপেই রসগ্রাহীকে আকর্ষণ করে না; উহার মধ্যে যে ভগবৎসৌন্দর্য নিহিত থাকে, তাহাই মানুষের হৃদয় কাড়িয়া লয়।

ক্রমে তাঁহারা ২২শে জুন শ্রীনগরে পৌছাইলেন। পূর্বেই স্বামীজী সকলকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়া গিয়া ধ্যান শিক্ষা দিবেন। এখন স্থির হইল যে, সকলে কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন এবং পরে নির্জনবাসের ব্যবস্থা হইবে। স্বামীজী ঐ সময়ে ভিন্ন বজরায় থাকিলেও, প্রতিদিন প্রাতরাশের সময় ঐ জন্য নির্দিষ্ট বজরাতে সকলের সহিত মিলিত হইতেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া বিবিধ বিষয়ে আলাপ করিতেন। অনেক সময় সকলে একসঙ্গে ভ্রমণেও বাহির হইতেন।

শ্রীনগরে প্রথম রজনীতে ইঁহারা সকলে ঐ নগরবাসী বাঙ্গালী রাজকর্মচারীদের দ্বারা ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানে পাশ্চাত্ত্য অতিথিদের মধ্যে একজন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন: "প্রত্যেক জাতির ইতিহাস বলিতে বুঝায় কতকগুলি বিশেষ আদর্শের বিকাশ ও উহার দৃষ্টান্ত। উক্ত জাতির সকলেরই উচিত, ঐগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা।" কিন্তু উপস্থিত হিন্দুগণ বলিলেন, ঐরূপ অবস্থাও একটা বন্ধন ব্যতীত আর কিছু নহে; মানবমন চিরকাল ইহা মানিয়া লইতে পারে না। অবশেষে স্বামীজী মধ্যস্থ হইয়া বুঝাইয়া দিলেন—সকলেই ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, মানবপ্রকৃতির পক্ষে ভৌগোলিক বিভাগ অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক বিভাগই অধিকতর বিচারসহ ও স্থায়ী। তারপর তিনি উপস্থিত সকলের পরিচিত দুই ব্যক্তির নাম করিয়া বলিলেন, "দেখ, প্রথম জন খৃষ্টান; তিনি বাঙ্গালী রমণী হইলেও খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আদর্শস্থানীয়া বলা চলে। দ্বিতীয় ব্যক্তি খৃষ্টান দেশে জন্মিলেও অনেক হিন্দুর চেয়েও ভাল হিন্দু। সব দিক ভাবিয়া দেখিলে ইহাই কি সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় নহে যে উহাদের একে অপরের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব প্রসার করিলেই ভাল হইত?" (ঐ, ৯।২৯৫)।

সকালের আলোচনা-মজলিসে "কখনও কাশ্মীর যেসকল বিভিন্ন ধর্মযুগের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে, কখনও বা বৌদ্ধধর্মের নীতি, কখনও বা

শিবোপাসনার ইতিহাস, আবার হয়তো বা কণিষ্কের সময়ের শ্রীনগরের অবস্থা—এইসকল বিষয়ের কথোপকথন চলিত।" একদিন বৌদ্ধধর্মের আলোচনাপ্রসঙ্গে অশোকের ধর্মসমন্বয়-প্রচেষ্টার কথা তুলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আসল কথা এই যে, বৌদ্ধধর্ম অশোকের সময়ে এমন একটি মহদনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছিল, যাহার জন্য জগৎ এই যুগেই সবেমাত্র উপযুক্ত হইয়াছে।" ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা অবলম্বনে তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন, "কিরূপে অশোকের ধর্মবিষয়ক একচ্ছত্রত্ব বার বার ঈশাহি ও মুসলমান ধর্মের তরঙ্গের পর তরঙ্গদ্বারা চূর্ণ হইয়াছিল, কিরূপে আবার এতদুভয়ের প্রত্যেকেই (খৃষ্টান ও মুসলমানধর্ম) মানবজাতির ধর্মবুদ্ধির উপর একচেটিয়া অধিকার দাবি করিত" এবং অবশেষে তিনি দেখাইলেন, এই মহাসমন্বয় কি উপায়ে স্বল্পকাল মধ্যেই সম্ভবপর হইবে বলিয়া অনুমান করা চলে।

আর একবার চেঙ্গিজ খাঁ বা জেঙ্গিজ খাঁ-এর প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলিলেন, "লোকে তাঁহাকে একজন নীচ, পরপীড়ক বলিয়া উল্লেখ করে,…কিন্তু তাহা সত্য নহে। এইরূপ মহামনা ব্যক্তিগণ কখনও কেবল ধনলোলুপ বা নীচ হইতে পারেন না। তিনি কোনও একটা একত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার (সময়ের) জগৎকে তিনি এক করিতে চাহিয়াছিলেন। নেপোলিয়নও সেই ছাঁচে গড়া লোক ছিলেন এবং সেকেন্দরও এই শ্রেণীর আর একজন। মাত্র এই তিনজন—অথবা হয়তো একই জীবাত্মা তিনটি পৃথক্ দিগ্বিজয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।" ইহার পর তিনি অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে লোকহিতকর বিভিন্ন নবপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের ন্যায় মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাদ্বয়ের কথাও তিনি খুব ভাবিতেন; এবং সম্প্রতি আলমোড়ায় স্থানান্তরিত 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র কথা তিনি রোজই বলিতেন। একদিন বৈকালে একখণ্ড কাগজ অপরদের সম্মুখে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "একখানি পত্র লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু উহা কবিতাকারে এইরূপ দাঁড়াইল—'টু দি অ্যাওয়েকেণ্ড ইণ্ডিয়া' (**'To the Awakened India'**)".

"২৬শে জুন। আচার্যদেব আমাদের সকলকে ছাড়িয়া একাকী কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ইহা না জানিয়া তাঁহার সহিত ক্ষীরভবানী নামক শুভ্র প্রস্রবণগুলি দেখিতে যাইবার জন্য জেদ

করিতে লাগিলাম। শুনিলাম ইতিপূর্বে কখনও কোন খৃষ্টান বা মুসলমান সেখানে পদার্পণ করে নাই। পরে আমরা ইহার দর্শনলাভে যে কতদূর কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত; কারণ ভগবান যেন স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলেন যে, এই নামটিই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা পবিত্র হইয়া উঠিবে।" পাথরের রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত ঐ ক্ষুদ্র প্রস্রবণটির জল দুধ, চাউল ও ফুলের রঙে গাঢ় হইয়া আছে। শত শত ধর্মকাম তীর্থযাত্রী মালা জপ করিতে করিতে কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিতেছে। বহু সাধু সন্ন্যাসীরও সমাগম সেখানে। একস্থানে ভস্মমাখা জটাধারী এক সন্ন্যাসী হোমাগ্নিপার্শ্বে বসিয়া আছেন; স্থানটিতে একটি ছোট বাজারও আছে। এই সমস্ত দেখিয়া, স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত আলাপ করিয়া এবং সন্ন্যাসী ও পুরোহিতের নিকট চিনি-প্রসাদ পাইয়া সকলে খুবই আনন্দিত হইলেন।

পরে তাঁহারা কাশ্মীরের অন্যান্য স্থান—তখত-ই-সুলেমান, নূরমহলের শালিমার বাগ, এবং নিশাৎ বাগ (আনন্দোদ্যান) প্রভৃতি স্থানও দেখিয়াছিলেন।

তখত-ই-সুলেমানে ছিল ক্ষুদ্র একটি মন্দির। তিন হাজার ফুট উচ্চ এই পাহাড়ের শীর্ষদেশ হইতে সমুদয় কাশ্মীর উপত্যকাটি সুন্দর দেখা যায়। ডাল-হ্রদ আঁকিয়া বাঁকিয়া নিম্নে বিস্তৃত, আর চারিদিকে অপূর্ব শান্ত শ্রী। ২৯শে জুন সকলে মন্দিরে উপস্থিত হইলে উহার অবস্থান ও পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "দেখ, মন্দিরের স্থাননির্বাচনবিষয়ে হিন্দুদের কি দক্ষতা! মন্দিরগুলি সবই প্রায় এমন জায়গায়, যেখানটা দেখতে খুব চমৎকার। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি হরিপর্বত ও মার্তণ্ড-মন্দিরের কথা উল্লেখ করিলেন। লোহিতাভ হরিপর্বত উঠিয়াছে নীল জলরাশির মধ্য হইতে—মনে হয় যেন একটি অর্ধশায়িত সিংহের মস্তকে মুকুট সুশোভিত। আর মার্তণ্ড-মন্দিরের পাদতলে বিরাজমান একটি শ্যামল উপত্যকা।

এইসব দিনে স্বামীজী ভারতীয় কৃষ্টি, ইতিহাস, ধর্ম, তাহার দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ে কত কথাই না বলিয়াছিলেন! সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্ত্য জীবনের সঙ্গে উহার তুলনাও করিতেন। পাশ্চাত্ত্য মহিলাদিগকে তিনি শুনাইয়াছিলেন তুলসীদাসের দোঁহা:

তুলসী জগমে আইয়ে সঁবসে মিলিয়ে ধায়।
ন জানৈ কেহি ভেকসে নারায়ণ মিলি যায়॥

—তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করে। জানি না, কোনরূপে নারায়ণ দেখা দেন।

আর শুনাইয়াছিলেন বেদের বাণী :

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

—একমাত্র দেবতা সর্বভূতে লুক্কায়িত আছেন ; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বকর্মের নিয়ামক, সর্বভূতের আধার, সাক্ষী, চৈতন্যদাতা, নিঃসঙ্গ ও নির্গুণ। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬।১১)।

তিনি শুনাইয়াছিলেন রাবণের কাহিনী। কেহ যখন রাবণকে পরামর্শ দিয়াছিল যে, রামরূপ ধরিয়া সীতাদেবীকে প্রতারণা করিলে সীতা রাবণের বশীভূতা হইবেন, তখন রাবণ উত্তর দিয়াছিল—রাম স্বয়ং ভগবান, তাঁহার রূপ ধারণ করিলে তাঁহার ধ্যানেই রাবণ মগ্ন হইয়া যাইবে ; তখন পরস্ত্রীর কথা মনে জাগিবে কিরূপে ?—"তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ ?" গল্পটি বলিয়া স্বামীজী মন্তব্য করিয়াছিলেন, "সুতরাং দেখ, অত্যন্ত সাধারণ বা অপরাধীর জীবনেও এইসব উচ্চভাবের আভাস পাওয়া যায়।" তিনি চিরকাল মানবজীবনকে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের প্রকাশ বলিয়াই জানিতেন। অতএব দুষ্কার্য বা দুর্বৃত্তিকেও ব্রহ্মের বিকৃত বা অপূর্ণ প্রকাশ ভাবিয়া ঐসব লইয়া বিশেষ মাথা ঘামাইতেন না ; বরং ঐরূপ ব্যক্তির চরিত্রে যেটুকু গুণ ধরা পড়িত, তিনি তাহারই প্রশংসা করিতেন।

একদিন খৃষ্টান সাধু ও 'ঈশানুসরণের' রচয়িতা টমাস আ কেম্পিসের কথা তুলিয়া স্বামীজী বলিলেন যে, এক সময়ে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণকালে 'গীতা' ও 'ঈশানুসরণ' এই গ্রন্থদ্বয়ই তাঁহার সম্বল থাকিত। আর এই সন্ন্যাসিপ্রবরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত একটি উক্তি তিনি উদ্ধৃত করিলেন : "ওহে লোকশিক্ষকগণ, চুপ কর ! হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তোমরাও থামো ! প্রভো, শুধু তুমিই আমার অন্তরের অন্তস্তলে কথা কও !"

আবার উদ্ধৃত করিতেন 'কুমারসম্ভবম্' হইতে (৫।৪) :

তপঃ ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥

—কঠোর তপস্যাই বা কোথায়, আর তোমার এই সুকোমল দেহই বা কোথায়? সুকোমল শিরীষপুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত সহ্য করিতে পারে, পক্ষীর ভার নহে। (অতএব উমা, তুমি তপস্যায় যাইও না)।

আবার মাঝে মাঝে গাহিতেন :

"এসো মা এসো মা, ও হৃদয়রমা, পরাণ-পুতলী গো!
হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো!" ইত্যাদি

গীতার শ্লোক ও গীতার কথা তো তাঁহার শ্রীবদনে প্রায় সর্বদাই ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে, জ্ঞানচর্চায় স্ত্রীলোকের ও শূদ্রের অধিকার নাই ; কারণ মহাভারত সকলেই পড়িতে পারে, এবং মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতায় উপনিষদের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উপনিষদ্ বুঝিতে হইলে গীতার সাহায্য প্রয়োজন।

এমনি করিয়া ৪ঠা জুলাই আসিয়া পড়িল। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র মহাসমারোহে স্বাধীনতা-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে ; ঐ তারিখেই আমেরিকা ইংলণ্ডের নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বামীজীর দলে তিনজন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা ছিলেন—শ্রীযুক্তা প্যাটারসন, ওলি বুল (ধীরামাতা) এবং শ্রীমতী ম্যাকলাউড (জয়া)। চতুর্থ মহিলা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা—ইংলণ্ডের নাগরিক। পূর্বদিন নিবেদিতা এই বলিয়া দুঃখ করিতে ছিলেন, "আমাদের আমেরিকার জাতীয় পতাকা নাই ; থাকিলে প্রাতরাশ-কালে উহা দ্বারা আমাদের দলের অপর যাত্রিগণকে তাঁহাদের জাতীয় উৎসব উপলক্ষে অভিনন্দিত করা যাইতে পারিত।" স্বামীজী কথাটি শুনিলেন এবং অভিপ্রায়টি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলেন। বাকি তিনজনের অজ্ঞাতসারে তিনি নিবেদিতার সাহায্যে ৪ঠা জুলাই-এর উৎসবের সব আয়োজন করিলেন। "৩রা তারিখ অপরাহ্ণে মহা ব্যস্ততার সহিত তিনি (স্বামীজী) এক কাশ্মীরী-'পণ্ডিত' (অর্থাৎ কাশ্মীরী হিন্দু) দরজীকে লইয়া আসিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, যদি এই ব্যক্তিকে পতাকাটি কিরূপে করিতে হইবে বলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে সানন্দে সেইরূপ করিয়া দিবে। ফলে তারকা ও ডোরা দাগগুলি অত্যন্ত আনাড়ীর মতো একখণ্ড বস্ত্রে আরোপিত হইল এবং উহা চিরশ্যামল গাছের কয়েকটি শাখার সহিত, ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত নৌকাখানির শিরো-ভাগে পেরেক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইল।" ('বাণী ও রচনা', ৯।৩০০)।

প্রবেশ-দ্বারটিও ডালপালা দিয়া সুসজ্জিত হইল। আর স্বামীজী 'টু দি ফোর্থ অব জুলাই' শীর্ষক স্বাধীনতার স্তুতিব্যঞ্জক একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিলেন। "এমন সময়ে আমেরিকাবাসিনীরা স্বাধীনতা লাভের দিবসে চা-পান করিবার জন্য নৌকাখানিতে পদার্পণ করিলেন। স্বামীজী এই ক্ষুদ্র উৎসবটিতে উপস্থিত থাকিবার জন্য আর এক জায়গায় যাওয়া স্থগিত করিয়াছিলেন।" অন্যান্য অভিভাষণের সহিত তাঁহার উক্ত কবিতাটি স্বাগতস্বরূপে সর্বসমক্ষে পঠিত হইল। কবিতাটি 'মুক্তি' এই নামে বঙ্গভাষায় পদ্যচ্ছন্দে অনূদিত ও 'বাণী ও রচনা'য় (৭।৪২৯-৩০) মুদ্রিত হইয়াছে। এই ৪ঠা জুলাইর সহিত স্বামীজীর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে—কবিতাবলম্বনে ইহার অন্তর্নিহিত ভাবধারা অর্থাৎ সর্বপ্রকার মুক্তির বার্তা প্রচারের জন্য এবং ঐ তারিখ ও বারে (৪ঠা জুলাই, শুক্রবার) মহাসমাধিতে তাঁহার নশ্বর দেহ হইতে মুক্তিলাভের জন্য। কবিতাটির শেষাংশ উল্লেখযোগ্য :

তারপর এলো দিন—সফলিয়া উঠিল যখন
সকল সাধনা কর্ম পূজা প্রেম আত্মবলিদান—
গ্রহণ করিলে আসি—সব হ'ল—সম্পূর্ণ সার্থক!
তখন উঠিলে তুমি—হে প্রসন্ন, ছড়াবার তরে
মুক্তির আলোক শুভ্র—সারা বিশ্ব মানবের 'পরে!
চল প্রভু, চল তব বাধাহীন পথে ততদিন—
যতদিন ওই তব মাধ্যন্দিন প্রখর প্রভায়
প্লাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর প্রতি দেশে দেশে
সেই আলো না হয় ফলিত, যতদিন নরনারী
তুলি উচ্চ শির—নাহি দেখে টুটেছে শৃঙ্খলভার,—
না জানে শিহরানন্দে তাহাদের জীবন নূতন।

শ্রীনগর হইতে ডাল-হ্রদে যাওয়ার পথে এই উৎসব হইল। অতঃপর সেখান হইতে ফিরিবার পথে ৫ই জুলাই-এর একটি ঘটনা। পাশ্চাত্ত্যে মেয়েলি শাস্ত্র অনুসারে কাহার কবে বিবাহ হইবে ইহা জানিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে তাহার পাতে কয়টি চেরী ফলের বিচি পড়িয়া আছে, তাহা গুনিয়া দেখা হয়। দলের একজন এরূপ করিলে স্বামীজী উহাকে পরিহাস না ভাবিয়া সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে যখন আসিলেন, তখন কেবলই উচ্চ

বৈরাগ্যের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "(রাজর্ষি) জনক হওয়া কি এত সোজা?—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হইয়া রাজসিংহাসনে বসা? ধনের বা ফলের অথবা স্ত্রীপুত্রের প্রতি কোন খেয়াল না রাখা? পাশ্চাত্ত্যে আমাকে বহু লোক বলিয়াছে যে তাহারা এই (জনকের) অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু আমি এইটুকুমাত্র বলিতে পারিয়াছিলাম – এমন সব মহাপুরুষ তো ভারতবর্ষে জন্মায় না!" তারপর নিবেদিতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "একথা মনে মনে বলিতে এবং তোমার মেয়েদের শিখাইতে কখনও ভুলিয়া যাইও না যে,

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ ॥

—মেরু পর্বত ও সর্ষপে যে প্রভেদ, সূর্য ও খদ্যোতে যে প্রভেদ, সমুদ্র ও ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী ও গৃহীতেও সেই প্রভেদ।

সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।

—পৃথিবীতে সকল বস্তুই ভয়যুক্ত, মানবের পক্ষে কেবল বৈরাগ্যই অভয়াস্পদ।"

আর তিনি বলিতেন, ভণ্ড সাধুরাও ধন্য; যাহারা ব্রত উদ্‌যাপনে অক্ষম হইয়াছে তাহারাও ধন্য, কেন না তাহারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং এইরূপে কতকাংশে অপরের সাফল্যের কারণ হইয়াছে। এই সঙ্গে মনে পড়ে তাঁহার লণ্ডনে বক্তৃতার কথা: "বৈরাগ্যই ধর্মের সূচনা। আজ কাল বৈরাগ্য বিষয়ে কথা বলা বড় অপ্রীতিকর। আমেরিকায় আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আসিয়া বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দিতেছি।" ('বাণী ও রচনা,' ২।১৫)।

শুধু কথায় নহে, কাশ্মীরে থাকাকালে কার্যেও তিনি এই বৈরাগ্যপ্রবণতা দেখাইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রায়ই অজ্ঞাতবাসে চলিয়া যাইতেন। ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া সহযাত্রিণীরা দেখিতেন, স্বামীজীর নৌকা নাই এবং বাকি মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন যে, তিনি কোথাও চলিয়া গিয়াছেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "১০ই জুলাই রাত্রে বিভিন্ন সূত্রে আমরা সংবাদ পাইলাম যে, আচার্যদেব সোনমার্গের রাস্তা দিয়া অমরনাথ গিয়াছেন এবং অপর একটি পথ দিয়া ফিরিবেন। কপর্দকমাত্র না লইয়া তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুশাসিত দেশীয় রাজ্যে এই ব্যাপারে তাঁহার বন্ধুবর্গের কোন উদ্বেগের কারণ হয় নাই। ১৫ই জুলাই অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমরা

নদীর অনুকূল স্রোতে কিয়দ্দূর যাইবার জন্য সবেমাত্র নৌকা খুলিয়াছি, এমন সময় ভৃত্যগণ দূরে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুকে চিনিতে পারিল এবং আমাদের সংবাদ দিল যে, স্বামীজীর নৌকা আমাদের অভিমুখে আসিতেছে। একঘণ্টা পরেই তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন। এবারকার গ্রীষ্মঋতুতে অস্বাভাবিক গরম পড়িয়াছিল এবং কয়েকটি তুষারবর্ত্ম ধ্বসিয়া যাওয়ায় সোনমার্গ হইয়া অমরনাথ যাইবার রাস্তাটি দুর্গম হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় তিনি ফিরিয়া আসেন।"

পর দিবস ১৬ই জুলাই একখানি ছোট নৌকায় নদীবক্ষে ভ্রমণকালেও ঐ বৈরাগ্যের সুরই তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। "নৌকা স্রোতের অনুকূলে চলিতেছে, আর তিনিও রামপ্রসাদের গানগুলি একটির পর একটি গাহিয়া চলিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু অনুবাদ করিয়া দিতেছেন।" তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :

"ভূতলে আনিয়া মাগো করলি আমায় লোহাপেটা,
(আমি) তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা।"
"মন কেন রে ভাবিস এত,
যেন মাতৃহীন বালকের মতো।"

১৭ই জুলাই তিনি ধীরামাতার নৌকায় আসিয়া কেবল ভক্তি সম্বন্ধেই কথা বলিতে লাগিলেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি অর্ধনারীশ্বর সম্বন্ধীয় "কস্তূরিকাচন্দন-লেপনায়ৈ, শ্মশান-ভস্মাঙ্গ-বিলেপনায়" ইত্যাদি স্তোত্রটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের কথাও বলিয়াছিলেন। রাগানুগা ভক্তির কথায় তিনি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, প্রাতরাশের কথাই ভুলিয়া গেলেন ; খাবার সামনে পড়িয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "যখন এইসব ভক্তির প্রসঙ্গ চলিতেছে, তখন আর খাবারের কি দরকার?" এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছাপূর্বকই বিদায় লইলেন। পুনর্বার যখন ফিরিলেন, তখনও ঐ প্রসঙ্গই করিতে লাগিলেন। কিন্তু হয় এই সময়ে কিংবা অন্য এক সময় তিনি এই কথাও বলিয়াছিলেন, যাহার নিকট তিনি বড় বড় কার্যের প্রত্যাশা রাখেন, তাহার নিকট রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। শিবই অদম্য এবং আগ্রহবান কর্মীর সৃষ্টিকর্তা এবং কর্মীর পক্ষে তাঁহারই পদে উৎসর্গিত হওয়া উচিত।

ইহার পরে তাঁহারা ইসলামাবাদ যাত্রা করিলেন। ঘটনাচক্রে ইহাই অমরনাথ-

যাত্রায় পরিণত হইল। ১৯শে জুলাই তাঁহারা এক জঙ্গলের মধ্যে "চির-অন্বেষিত পাণ্ড্রেস্থান (বা পাণ্ডবদের স্থান) মন্দির আবিষ্কার" করিলেন। স্বামীজীর মতে ইহার সহিত কাশ্মীরের পুরাতত্ত্বের মধুর স্মৃতি বিজড়িত ছিল। কাশ্মীরের ইতিহাসে চারিটি স্তর আছে—বৃক্ষ ও সর্প পূজার যুগ, বৌদ্ধধর্মের যুগ, সৌরোপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্মের যুগ ও মুসলমান ধর্মের যুগ। আলোচ্য মন্দিরটি ছিল বৌদ্ধযুগের নিদর্শন। ঐ নিস্তব্ধ দেবালয় ও বুদ্ধমূর্তিটি স্বামীজীর মনে গভীর ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল। তিনি মন্দিরের ভাস্কর্যাদি সঙ্গিনীদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে ছিল সূর্যচক্র। সর্পবেষ্টনা-বদ্ধ নরনারীব মূর্তিসমূহ ও অন্যান্য প্রাচীন ভাস্কর্য, আর মন্দিরের বাহিরে ছিল বুদ্ধদেবের একটি সুন্দর দণ্ডায়মান মূর্তি ও তদীয় জননী মায়াদেবীর ভগ্নমূর্তি। মন্দিরটি বৃহদাকার প্রস্তরে নির্মিত এবং পিরামিডের আকারে ক্রমে ঊর্ধ্বসূক্ষ্ম। স্বামীজীর মতে উহা মার্তণ্ডের মন্দিরেরও পূর্ববর্তী, এবং সম্ভবতঃ কণিষ্কের যুগের (১৫০ খৃষ্টাব্দের)। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, বৌদ্ধযুগে ভাস্কর্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল, সূর্যচিহ্নিত চক্র বা পদ্ম উহার কারুকার্যের একটা সাধারণ অংশ, সর্পসম্বলিত মূর্তিগুলি বৌদ্ধযুগের পূর্বের আভাস দেয়। কিন্তু সৌরোপাসনা-কালে ভাস্কর্যের অবনতি ঘটে ; তাই সূর্যমূর্তিটি নৈপুণ্যহীন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে নৌকায় ফিরিলেন ; কিন্তু তখনও স্বামীজীর মন ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্যাপৃত রহিল। তিনি ভূমধ্যসাগরের পথে জাহাজে আগমনকালে ক্রীট দ্বীপের সন্নিকটে রাত্রে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, উহার সহিত হায়ার ক্রিটিসিজ্‌ম্-এর (উচ্চস্তরের বাইবেল-সমালোচনার) মিল থাকায় এবং বৌদ্ধ অনুষ্ঠানাদির সহিত খৃষ্টধর্মের, বিশেষতঃ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বহু অনুষ্ঠানের সৌসাদৃশ্য থাকায় তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বৌদ্ধধর্ম হইতেই কালক্রমে খৃষ্টান ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং বৌদ্ধধর্মেরও পশ্চাতে রহিয়াছে উহার উৎসস্বরূপ বৈদিক ধর্ম। নৌকায় বসিয়া এইসব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলিল। স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন, যীশু খৃষ্টের ঐতিহাসিক সত্তা অবিসংবাদিত নহে—প্রধান ধর্মাচার্যদের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদের ঐতিহাসিকতা সন্দেহাতীত। বাইবেলের জীবনী-অংশ খৃষ্টজন্মের বহু পরে লিখিত—অ্যাক্টস অ্যাণ্ড এপিসল্‌স্ (Acts and Epistles)—কার্যাবলী ও পত্রাবলী—উহা হইতেও প্রাচীনতর। জীবনী-লেখক সেণ্ট জন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা বিবাদাতীত

নহে। কেবল সেণ্ট পল সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ; কিন্তু ইনি যীশুর সমসাময়িক নহেন। রেঁনার লিখিত ঈশা-জীবনী অপেক্ষা প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট স্ট্রসের জীবনী অধিক নির্ভরযোগ্য।[২]

ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্যাথলিকদের ম্যাসের (Mass) সহিত বৈদিক ভোগনিবেদনের সাদৃশ্য আছে; আর খৃষ্টানদের ব্লেসেড স্যাক্রামেণ্ট (Blessed Sacrament) হিন্দুদের পবিত্র প্রসাদ। তবে হিন্দুরা আসন করিয়া বসিয়া ভোগ নিবেদন করে; আর শীতপ্রধান দেশে হাঁটু-গাড়িয়া উহা করা হয়—তিব্বতীয় বৌদ্ধরাও হাঁটু-গাড়িয়া নিবেদন করে। প্রটেস্টাণ্টদের প্রার্থনা-প্রথা উহারা মুসলমানদের নিকট হইতে পাইয়াছে! মুসলমানরা পৌরোহিত্যের লোপসাধন করিয়াছে—বেদী হইতে শু কোরাণ-পাঠ চলে; অগ্রণী হইয়া যিনি প্রার্থনা পাঠ করেন, তিনি অপর সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া দণ্ডায়মান হন। প্রটেস্টাণ্টরা এই ভাবটি লইতে চেষ্টা করিয়াছে। ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের মস্তকের উপরিভাগ কেশমুক্ত করা (টনশার—Tonsure) প্রথাটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মস্তকমুণ্ডনেরই অনুকল্প।

ঈশা-জীবনের ঘটনাবলীর সহিতও ভারতীয় জীবনের সাদৃশ্য আছে। কূপ-পার্শ্বে এক অন্ত্যজা নারীকর্তৃক যীশুকে পানীয় জলপ্রদান ও ব্যভিচারের অপরাধে ধৃতা রমণীকে ক্ষমা করার কথা শুনিলেই ভারতীয় সন্ন্যাসীদের পথিপার্শ্বে জল চাহিয়া-খাওয়া ও বুদ্ধের অম্বাপালী-গৃহে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা মনে পড়ে; আর মনে পড়ে তাঁহার অন্ত্যজ-গৃহে ভোজনের কথা।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলার সহিত যীশুর জীবনের মিল এবং যীশুর 'পর্বতোপরি উপদেশ' ও বুদ্ধের উপদেশের সৌসাদৃশ্যের কথাও স্বামীজী বলিতে পারিতেন, আর দেখাইতে পারিতেন যে, ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের আলখাল্লা, টুপি ও কোমরবন্ধের সহিত তিব্বতী লামাদের পোশাকের হুবহু মিল আছে।

২। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিলেও যীশুর প্রতি তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "হিন্দুদর্শন-মতে ভাববিশেষের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, তাহার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নহে। স্বামীজী বাল্যকালে একদা শ্রীরামকৃষ্ণকে এই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব উত্তর দেন, 'যাঁহাদের মাথা হইতে এমন সব জিনিস বাহির হইয়াছে, তাঁহারা যে তাহাই ছিলেন, একথা কি তোমার মনে হয় না?" ('বাণী ও রচনা', ৯।৩০৮)।

তবে আলোচনামধ্যে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, "সমগ্র ঈশাহি-ধর্মই আর্যধর্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস।" আর বলিয়াছিলেন যে, খৃষ্টের পুনরুত্থান (রিসারেক্‌শন) ব্যাপারটা 'বাসন্তিক'-দাহ-প্রথার নবীন সংস্করণমাত্র।

প্রশস্ত, অগভীর ও নির্মল জলপূর্ণ নদীর শান্ত বক্ষে নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। ২০শে জুলাই প্রাতঃকালে স্বামীজী অপর দুই জনের সহিত নদীর ধারে ধারে ক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রায় তিন মাইল বেড়াইলেন। ঐ সময় 'মানুষ স্বভাবতঃ পাপী'—খৃষ্টানদের স্বীকৃত এই পাপবাদ সম্বন্ধে কথা তুলিয়া স্বামীজী বলিলেন, বেদে উহার নিদর্শন থাকিলেও, উহা প্রসারলাভ করিতে পারে নাই—যেন আরম্ভেই থামিয়া গিয়াছে। বেদে শয়তানকে ক্রোধের অধীশ্বর বলা হইয়াছে। বৌদ্ধদের মধ্যে সে কামের অধীশ্বর 'মার'-এ পরিণত হইয়াছে; বুদ্ধ 'মারজিৎ'। বাইবেলের শয়তান ও ঈশ্বরের মধ্যে বিশ্বজগৎ যেন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে —বেদে ঐরূপ বিভাগের নিদর্শন নাই। পাপবাদ মিশরীয়দের ও শেম-বংশীয়দের অধ্যুষিত জনপদমধ্যে বিস্তারলাভ করিলেও আর্যধর্মে উহা অবিদ্যার স্থান গ্রহণ করিল। আর্য-সাধককে বিদ্যা ও অবিদ্যার পারে যাইতে হইবে— উভয়ই ত্যাজ্য। মিশরীয় প্রভৃতির পাপবোধ ইউরোপীয়দের মধ্যে অনুসংক্রামিত হইয়াছে। বেদের আত্মা স্বভাবতঃ নিষ্পাপ; কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ পাপী বলিয়া মনে হয়।

তারপর ভারতের কথা উঠিল—ত্যাগ ও সেবাই ভারতের আদর্শ—হিন্দু-জননী সকলের শেষে ভোজন করেন; বিবাহ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, উহা জাতি ও বর্ণের কল্যাণের নিমিত্ত। ভারতীয় জীবনস্রোতে বলাধান করিতে হইবে। আবার কথার গতি পরিবর্তিত হইয়া হাসিঠাট্টা আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে নৌকা আসিয়া পড়িল এবং তখনকার মতো কথাবার্তাও শেষ হইল।

সেদিনকার সমস্ত বৈকাল অসুস্থ বোধ করিয়া স্বামীজী নিজ নৌকায় শুইয়া কাটাইলেন। নৌকা অবন্তীপুরাভিমুখে চলিল; সেখানে দর্শনীয় ছিল প্রাচীন নগরের দুইটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির—বিজবেহার-মন্দির ও মার্তণ্ড-মন্দির। ২২শে জুলাই[৩] যখন তাঁহারা বিজবেহার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তখন

৩। নিবেদিতার লেখায় ('বাণী ও রচনা', ৯।৩১০-১৩) এই তারিখগুলি বেশ এলোমেলো। আমরা তাঁহার ডায়েরী দেখিয়া ঠিক করিয়া দিলাম।

স্বামীজী কতকটা সুস্থ বোধ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য সকলের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি নিজেই বলিতেন—"শীঘ্র অসুখে পড়া এবং শীঘ্র সারিয়া উঠা"—ইহাই যেন ছিল তাঁহার ধাত। দিবসের বাকি অংশটুকু প্রধানতঃ সকলের সঙ্গে কাটাইয়া ও বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি দিবাশেষে স্বীয় নৌকায় ফিরিলেন। ২২শে জুলাই অপরাহ্নে তাঁহারা ইসলামাবাদে পৌছিলেন। বিজবেহারে নামিয়াই তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে অমরনাথ-যাত্রীদের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। সেইদিন বিকালে গোধূলির সময় গাছগুলির নীচে ঘাসের উপর বসিয়া স্বামীজী যখন ধীরামাতা ও জয়ার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন দুই টুকরা পাথর হাতে তুলিয়া বলিয়াছিলেন, "সুস্থ অবস্থায় আমার মন এটা ওটা সেটা লইয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু এতটুকু যন্ত্রণা বা পীড়া আসুক দেখি, ক্ষণিকের জন্যও আমি মৃত্যুর সামনা-সামনি হই দেখি, অমনি আমি এইরকম শক্ত হইয়া যাই"—বলিয়া পাথর টুকরা দুইটিকে পরস্পর ঠুকিলেন, বলিলেন, "কারণ আমি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করিয়াছি।" দুই-একঘণ্টা ধরিয়া আরও সব আধা-হাল্কা আধা-গম্ভীর কথা চলিতে লাগিল। তারপর স্থানীয় লোকেরা একটি শিশুকে সেখানে লইয়া আসিল—তাহার হাঁত কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। স্বামীজীও বৃদ্ধাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে ক্ষত স্থানটি ধুইয়া একটুকরা কাপড়ের ছাই উক্তস্থানে চাপাইয়া দিলেন। গ্রামবাসীরা আশ্বস্ত হইয়া ফিরিল এবং সেদিনকার মতো স্বামীজীদেরও কথাবার্তা শেষ হইল।

২৩শে জুলাই প্রাতঃকালে হরেক রকমের একদল কুলি তাঁহাদিগকে মার্তণ্ডের মন্দির দেখাইতে লইয়া যাইবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। "মার্তণ্ড-মন্দির এক অদ্ভুত প্রাচীন সৌধ। উহাতে স্পষ্টই মন্দির অপেক্ষা মঠের লক্ষণ অধিক। উহা এক অপূর্ব স্থানে অবস্থিত এবং যেসকল বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া উহা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের বিভিন্ন নির্মাণপদ্ধতি" স্পষ্টতঃ একত্র সমাহৃত হওয়ায় উহা আকর্ষণীয় হইয়াছিল। যথাস্থানে পৌছিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই স্বামীজী স্থাপত্যের অবেক্ষণ ও উদ্দেশ্য নিরূপণে যারপরনাই ব্যস্ত হইলেন। মন্দির দর্শনান্তে সূর্যাস্তের আলোতে অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন অতীব উপভোগ্য হইয়াছিল। ('স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে', ১০৩-০৫ পৃঃ)।

২৪শে জুলাই বেরীনাগের পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিলেন, অনেক তীর্থযাত্রী অমরনাথ দর্শনে চলিয়াছে। আর তাঁহারা দেখিলেন 'সরল' বৃক্ষ

রাজিতে আবৃত পাহাড়ের নীচে রহিয়াছে অষ্টভুজ-সরোবর-বিশিষ্ট জাহাঙ্গীরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। নিবিড় অরণ্যমধ্যে স্থাপিত তাঁহাদের তাঁবুগুলির পার্শ্ব দিয়া যখন যাত্রীরা চলিয়া গেল, তখন সেখানে রহিলেন শুধু স্বামীজী ও তাঁহার সহযাত্রিণীরা। সেদিন মধ্যাহ্নে স্বামীজী নিবেদিতার সহিত তাঁহার ভাবী কর্ম-সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য। আচার্যদেব সহসা তাঁহার মানসকন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কই, তুমি তো আজকাল তোমার স্কুলের কোনও কথা বল না, তুমি কি মাঝে মাঝে উহার কথা ভুলিয়া যাও?...দেখ, আমার ভাবিবার ঢের জিনিস রহিয়াছে। একদিন আমি মাদ্রাজের দিকে মন দিই, আর সেখানকার কাজের কথা ভাবি। আর একদিন আমি সব মনটা আমেরিকা বা ইংলণ্ড, বা সিংহল, অথবা কলিকাতায় দিই। এক্ষণে আমি তোমার স্কুলের কথা ভাবিতেছি।" নিবেদিতা তাঁহার পরিকল্পনা বলিয়া গেলেন—পরীক্ষামূলকভাবে একটি কার্যধারা প্রথমে সামান্যাকারে আরম্ভ হইবে এবং সেই শিক্ষাদান-প্রচেষ্টা ধর্মজীবনের ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। সব শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "তুমি উর্জিত উৎসাহ বজায় রাখিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক ভাব আশ্রয় করিবে, নয় কি? সমস্ত সম্প্রদায়ের পারে চলিয়া যাইবার জন্য তুমি একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবে। হাঁ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি।" নিবেদিতা বলিলেন, প্রথমেই গোটা যোজনাটি এককালে কার্যে পরিণত করা অসম্ভব হইলেও সঙ্কল্প সাধু হওয়া আবশ্যক এবং কার্যপ্রণালীও নির্দোষ হওয়া আবশ্যক। পরিশেষে স্বামীজী আবার বলিলেন, "তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা করিতে বলিতেছ; কিন্তু তাহা আমি পারিব না। কারণ আমি তোমাকে ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত—আমি যতটা অনুপ্রাণিত ঠিক ততটা অনুপ্রাণিত—বলিয়া মনে করি। অন্যান্য ধর্মে এবং আমার ধর্মে এইটুকুই প্রভেদ।...সুতরাং তুমি যাহা সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, আমি তাহাই করিতে তোমাকে সাহায্য করিব।" তাহার পর তিনি জয়া ও ধীরামাতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন যে, নিবেদিতার উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরুষদের জন্য আরব্ধ কার্যাপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইবে। আর নিবেদিতার দিকে ফিরিয়া এই বলিয়া কথা শেষ করিলেন, "হাঁ, তোমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু তোমার যে জ্বলন্ত উৎসাহ দরকার, তাহা তোমার নাই। তোমাকে 'দগ্ধেন্ধনমিবানলম্' হইতে হইবে। শিব! শিব!" বলিয়া মহাদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

২৫শে জুলাই একটি তাঁবুতে প্রাতরাশ সমাপনপুর্বক সকলে অচ্ছাবলের দিকে চলিলেন। এখানে জাহাঙ্গীরের আরও অনেক বাগান তাঁহাদের দৃষ্টি-গোচর হইল। বেরীনাগ ও অচ্ছাবল দর্শনান্তে মনে স্বতই সন্দেহ জাগে জাহাঙ্গীরের প্রিয় বিশ্রামস্থান বস্তুতঃ কোনটি? স্বামীজীরা বাগানগুলির চারিদিকে বেড়াইলেন, পাঠান খাঁর জেনানার সম্মুখবর্তী একটি স্থির জলাশয়ে স্নান করিলেন ও প্রথম বাগানটিতে প্রাক্‌মধ্যাহ্নের জলযোগ সমাপনান্তে অশ্বারোহণে ইসলামাবাদে ফিরিলেন। উক্ত জলযোগকালে স্বামীজী তাঁহার কন্যা নিবেদিতাকে তাঁহার সঙ্গে অমরনাথ গুহায় যাত্রা করিবার ও তথায় মহাদেবের চরণে উৎসৃষ্ট হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ধীরামাতাও ইহা অনুমোদন করিলেন। পূর্বেই স্থির হইয়াছিল যে, বাকি সকলেই একযোগে নৌকা করিয়া পহলগাম পর্যন্ত যাইবেন, এবং স্বামীজীদের অমরনাথ-দর্শন করিয়া ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সেখানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবেন। তদনুসারে সন্ধ্যায় নৌকা-গুলিতে উপস্থিত হইয়াই যাত্রার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। (ঐ, ১০৬-০৯ পৃঃ)।

আমরা পূর্বে কয়েকবার নিবেদিতাকে স্বামীজীর কন্যা বা মানসকন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ইহা আমাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে; প্রত্যুত নিবেদিতার নিজেরই ভাষা। তাঁহার লেখার বহু স্থলে এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থের এক জায়গায় আছে: "ভারতবর্ষে··· লোকে অসঙ্কোচে বুঝে ও মানিয়া লয় যে, কোন একটি ভাবসম্বন্ধ স্থাপন ব্যতীত সাধারণ লোকে কোন বিরাট ধর্মান্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে না। আমার নিজের কথায় বলিতে গেলে ক্রমশঃ আমি তাঁহার মানসকন্যাস্থানীয়া হইলাম। ইহা অতি মধুর সম্পর্ক এবং ভারতবর্ষে যেসকল ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সহিত গুরুদেবের জীবদ্দশায় আমার পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই আমাকে ঐ চক্ষে দেখিতেন।" স্বামীজী যে তাঁহাকে এই গ্রীষ্ম ঋতুতে ভাবী কার্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন, তৎসম্বন্ধে বলিতে গিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "তিনি নিজেই তাঁহাদের (ধীরামাতা, জয়া ও স্বামীজীর) সহিত একসঙ্গে আমার যাওয়ার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, তিনি আমার দ্বারা ভারতে যে কার্য করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমাকে নিজে উপদেশ দিবেন। কিন্তু এই শিক্ষা অতি সাধারণভাবেই প্রদত্ত হইত। আমরা সকলে বারাণ্ডায় বা বাগানে বসিতাম এবং সেই সময়ে স্বামীজী যে কথাবার্তা বলিতেন তাহাই

মনোযোগ সহকারে শুনিয়া যাইতাম—প্রত্যেকেই যিনি যতটা পারেন, উহার ততটুকু গ্রহণ করিতেন এবং পরে ইচ্ছামত তাহার আলোচনা করিতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সারা বৎসরটির মধ্যে মাত্র একটি দিন তিনি আমাকে অর্ধঘণ্টার জন্য তাঁহার সহিত একাকী ভ্রমণ করিতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তৎপরে আমাদের কথাবার্তা অনুভূতিমূলক কোন কিছু সম্বন্ধে না হইয়া বরং ভাবী কার্যের উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্বন্ধেই হইয়াছিল। তখন গ্রীষ্ম ঋতু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং আমিও আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা একটু একটু বুঝিয়াছি।" (ঐ, ৯৩-৯৫ পৃঃ)।

স্বামীজী ও নিবেদিতা ২৬শে জুলাই অপরাহ্ণে তীর্থযাত্রা করিলেন ; পথে একস্থানে তাঁহারা অপর যাত্রীদের দলে মিশিলেন ও ২৭শে জুলাই রাত্রিবাসের জন্য পাওয়ানে (বা বওয়ানে) তাঁবু খাটাইলেন। এখানে কয়েকটি পবিত্র উৎস আছে ; স্থানটি ক্ষুদ্র হইলেও বহু অমরনাথ-যাত্রীর আগমনে তখন একটি মেলার আকার ধারণ করিয়াছিল। সন্ধ্যায় দীর্ঘিকার পরিষ্কার কাল জলে দীপসমূহের প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে, যাত্রিগণ এক মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে দলবদ্ধ হইয়া যাইতেছে আর তাহাদের মুখে স্তোত্রাদি উচ্চারিত হইতেছে—সব মিলিয়া সেখানে তখন একটা জমাট ধর্মভাব। জয়া ও নিবেদিতা তথায় পৌঁছিয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শনীয় সব দেখিতে লাগিলেন ; তারপর ধীরামাতার তাঁবুর দ্বারে গিয়া দেখিলেন, বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী সাধু স্বামীজীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন।

এই সময় হইতেই সকলে লক্ষ্য করিলেন যে, স্বামীজীর নির্জনপ্রিয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহযাত্রিণীরা তাঁহার দর্শন খুব কমই পাইতেন। তিনি তীর্থযাত্রীদেরই ন্যায় সমস্ত আচার-ব্যবহার মানিয়া লইয়া ঠিক পরিব্রাজকরূপেই চলিতেছিলেন—বেশীর ভাগ দিন একাহারে কাটাইতেন, এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গ বড় একটা চাহিতেন না।

২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার তীর্থযাত্রীরা পহলগামে পৌঁছিলেন। ক্ষুদ্র গ্রামটি মেষপালকদের আবাসস্থল ; কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম। একটি মনোহর পার্বত্যনদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহারই মধ্যে মধ্যে ঊর্ধ্বতর দেশ হইতে বাহিত বালুরাশি মিলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নির্মাণ করিয়াছে। দুই পার্শ্বে সরল বৃক্ষের সারিতে শোভা বর্ধিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় মস্তকোপরি চন্দ্রমার উদয়

দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। নিবেদিতার মনে হইয়াছিল, এই সৌন্দর্যের সহিত শুধু সুইজরল্যাণ্ড বা নরওয়ের সর্বাপেক্ষা মনোরম দৃশ্যগুলির তুলনা করা চলে। পহলগামে পৌঁছাইয়া কোথায় স্বামীজীদের তাঁবু ফেলা হইবে, এই লইয়া সাধুদের মধ্যে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ম্লেচ্ছদের তাঁবু সন্ন্যাসীদের পার্শ্বে খাটানো চলে না—ইহাই ছিল আপত্তিকারকদের প্রধান বক্তব্য। কিন্তু স্বামীজী প্রথমে ঐ সব কথা মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অবশেষে একজন নাগা সাধু অগ্রসর হইয়া স্বামীজীকে বলিলেন, "স্বামীজী, ইহা সত্য যে, আপনার শক্তি আছে ; কিন্তু তাহা প্রকাশ করা উচিত নহে।" বলিতেই স্বামীজী চুপ করিয়া গেলেন এবং পরদিন যথাসময়ে তাঁবু অন্যত্র সরাইতে স্বীকৃত হইলেন। স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, এবং অপরেরাও জানিতেন, এই তাঁবু সরানোর ব্যাপারটা একটা অযৌক্তিক ভাবপ্রবণতাসঞ্জাত অন্যায় দাবী ; কারণ রাজ্যসরকারের ব্যবস্থানুসারে যে প্রধান কর্মচারী ও তাঁহার সহকারীরা শৃঙ্খলাদি রক্ষার জন্য ও সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধানের জন্য যাত্রীদের সহিত চলিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন অহিন্দু ; অথচ ইঁহাদের গতিবিধি, উপস্থিতি এবং পরে অমরনাথের গুহায় প্রবেশের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন আপত্তি উঠে নাই। আচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্মেও বহু অযৌক্তিকতা আছে জানিয়াও স্বামীজী সাধুদের দাবী মানিয়া লইলেন। অতঃপর তিনি নিবেদিতাকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন ছাউনিটির চারিদিকে ঘুরিয়া আসেন ও সাধুদিগকে ভিক্ষাপ্রদান করেন। এই ব্যবস্থায় সুন্দর ফল ফলিল—নিবেদিতা সাধুসেবার সুযোগ পাইলেন এবং সাধুরাও তাঁহার সহিত একটা আত্মীয়তা স্থাপনের অবকাশ পাইলেন। তাঁবু সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা গ্রহণের পরে দেখা গিয়াছিল যে, পরদিন প্রাতে স্বামীজীদের তাঁবুগুলি উঠাইয়া ছাউনির পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর স্থাপিত হইয়াছে। উহার সম্মুখেই ছিল খরস্রোতা লিডার (বা লীদর) নদী, আর নদীর অপর তীরে বৃক্ষরাজি-সমাচ্ছন্ন সুন্দর পর্বতমালা। খুব উচ্চে একটি রন্ধ্রের মধ্য দিয়া তুষারবর্ত্মও নয়নগোচর হইতেছিল।

কাশ্মীরের পথে স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৯৮

কাশ্মীরে ক্ষীর ভবানীর মন্দির

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী গভীর অধ্যাত্মানুভূতির সংস্পর্শ লইয়া স্বামীজীর জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বিদ্যমান—এই মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিলে এই স্থানদ্বয়ের ঘটনাবলীও স্বতই মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে। এই দুই দেবস্থানে লব্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও দৈব নির্দেশ তাঁহার পরবর্তী জীবনের গতির উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

অমরনাথ-দর্শনে স্বামীজী চলিয়াছেন ঠিক অপর দশ জন সাধুরই ন্যায়—তাঁহাদেরই সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, তীর্থযাত্রীর সমস্ত বা ততোধিক নিয়ম ও আচার-বিচার নিষ্ঠাসহকারে পালন করিয়া। অপর সাধুরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পথে ও ছাউনিতে তাঁহাকে ঘিরিয়া বহু আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকেন। স্বামীজী দিনে একবার আহার করেন; মন্ত্রজপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন, যথারীতি স্নানাদি করেন, কখনও সদালাপ করেন, কখনও বা মৌন থাকেন। পহলগামে যখন তাঁবু ফেলা লইয়া মতভেদ হইয়াছিল, তখনও আমরা দেখিয়াছি, স্বামীজী অপর সাধুদের মতই শেষ পর্যন্ত মানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি নিজে তো কিছুই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আসেন নাই, বরং পূর্ণ করিতেই আসিয়াছিলেন। এই সব আচার-বিচারের মাধ্যমেই যখন অনেকের ধর্মভাব প্রকাশ পায়, ধর্মকে যখন তাহারা এইসব রীতিনীতির সাহায্যেই বুঝিয়া থাকে এবং এইগুলি অবলম্বনেই যখন উচ্চতম অনুভূতিতে উপস্থিত হয়, তখন নিজের কিছু বলিবার বা শিখাইবার থাকিলে এই সকলের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণের অর্থ হইতেছে ইহাদের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যাওয়া এবং ঠিক সেই পরিমাণে অসাফল্য বরণ করা। সুতরাং স্বামীজী নিজ ভাবের বাহনরূপে প্রতীচ্য জগতে যেমন প্রতীচ্য জীবনকেই স্বীকার করিয়াছিলেন, প্রাচ্য জগতেও তেমনি প্রাচ্য জীবনকে তাহার দোষগুণসহ মানিয়া লইয়া উহাতে নবভাব অনুসঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রাকালেও এই সাধারণ কর্মপ্রণালীর ব্যতিক্রম হয় নাই।

আবার ইহাকে স্বামীজীর জীবনবিকাশের একটা স্বতঃপ্রণোদিত নিদর্শনরূপে না দেখিয়া উদ্দেশ্যসাধনের উপায়রূপে গ্রহণ করিলে সম্পূর্ণ ভুল হইবে। কারণ তিনি মতলব করিয়া কখনও কিছু করিতেন না—ভগবন্নির্দেশেই তাঁহার চলনভঙ্গী

নিয়মিত হইত। এই বিষয়ে তিনি একদিন নিবেদিতার সাংসারিক বুদ্ধিপ্রসূত পরামর্শদানের উত্তরে সক্রোধে বলিয়াছিলেন: "মতলব! মতলব আঁটা! এই জন্য পাশ্চাত্ত্যবাসী তোমরা কোনকালে একটা ধর্ম সৃষ্টি করতে পার না। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কখনও করে থাকেন তো, সে জনকয়েক ক্যাথলিক সাধু—যাঁরা মতলব এঁটে কাজ করতে জানতেন না। যারা মতলব এঁটে কাজ করে, তাদের দ্বারা কোন কালে ধর্মপ্রচার হয়নি, হতে পারে না।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১০৪ পৃ:)।

প্রায় দুই-তিন সহস্র যাত্রীর মধ্যে তাহাদেরই একজন হইয়া স্বামীজী সাধুদের সঙ্গে চলিয়াছেন ভগবদ্দর্শনে। সকলেরই মনে গভীর ভক্তিভাব। আর তাঁহাদের গতিবিধি, সাজ-সজ্জা নয়ন-মনোহর এবং বাক্যালাপাদিও শ্রুতিমধুর। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু; তাঁহাদের তাঁবুগুলিও গেরুয়া রঙ্-এর—কেহ কেহ বা গেরুয়া রঙ্-এর বৃহৎ ছত্রকেই মস্তকোপরি স্থাপন করিয়াছেন। দিনের মত ভ্রমণশেষে যখন কোন খালি জায়গায় ছাউনি পড়ে, তখন সেখানে যেন অকস্মাৎ আলাদিনের প্রদীপস্পর্শে নগর সৃষ্টি হইয়া যায়। মধ্যে প্রশস্ত রাস্তা; উভয় দিকে তাঁবু ও বিপণি। তীর্থযাত্রীর আবশ্যকীয় দ্রব্য—খাদ্য, শুখনা ফল, দুধ ও চালডাল প্রভৃতি ঐসব দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। একটা সুন্দর পরিষ্কার, অথচ অপরদের হইতে একটু পৃথক্ জায়গায় তহশিলদারের শিবির স্থাপিত হয়—উহার একদিকে স্বামীজীর শিবির ও অপর দিকে নিবেদিতার। সাধুদের মধ্যে যাঁহারা একটু বিদ্বান তাঁহারা স্বামীজীর তাঁবু ঘিরিয়া বসেন ও বহু বিষয়ে আলোচনা করেন। সকালে যখন আবার যাত্রা আরম্ভ হয়, তখন সে নগরের কোন চিহ্নই থাকে না—পড়িয়া থাকে শুধু উনানের ছাই। বিশ্রামস্থানে সাধুদের কেহ কেহ ধ্যানজপে সময় অতিবাহিত করেন, কেহ মৌন অবলম্বন করেন, কেহ বা শাস্ত্রালাপ করেন। আবার কেহ হয়তো ভস্মাবৃত কলেবরে প্রজ্বলিত ধুনিপার্শ্বে ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকেন। কোথাও অন্ধকার ভেদ করিয়া মশাল জ্বলে—তাহার আলোতে কোন ভক্ত-পরিবার সন্তানাদিসহ আহার প্রস্তুত করিতে বা ভোজনে ব্যাপৃত হন। আবার পথচলার কালটিও বেশ উপভোগ্য হয়। কত প্রান্তের বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত নরনারী, বালকবালিকা একই উদ্দেশ্যে একই দিকে চলিয়াছে—কোথাও বাজিতেছে শঙ্খ, কোথাও শিঙ্গা, আর মুখে উঠিতেছে মুহুর্মুহুঃ ধ্বনি—"হর হর বম্ বম্"!

সকলের হৃদয়ে অমরনাথ বিরাজমান থাকিয়া সকলকে সমসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন। "সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করা যেন তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ।···আর প্রত্যেক বিশ্রামস্থানে তাঁবু-খাটানো ও দোকান-সাজানোর কার্য অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে।" (ঐ, ১১১ পৃঃ)।

৩০শে জুলাই সকালে প্রাতরাশ করিয়া স্বামীজী ও নিবেদিতা যখন পুনর্বার অমরনাথের পথ ধরিলেন, তাহার পূর্বেই তাঁহাদের পার্শ্ববর্তী যাত্রীরা তাঁবু গুটাইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইখানেই তাঁহারা শেষ-মনুষ্যবসতি-চিহ্ন—একটি পুল, একখানি খামারবাড়ী ও তৎসংলগ্ন কর্ষিত ক্ষেত্র, আর দেওদার-কাষ্ঠনির্মিত খান কয়েক কুটীর দেখিতে পাইলেন। আর দেখিলেন "অবশিষ্ট যাত্রিগণের তাঁবুগুলি তখনও এখানেই একটি শষ্পাচ্ছাদিত বর্তুলাকার পাহাড়ের উপর রহিয়াছে।" (ঐ, ১১৩ পৃঃ)।

অনির্বচনীয় চারু দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া তিন সহস্র যাত্রী পুরোবর্তী উপত্যকাটিতে সানন্দে আরোহণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সেই দিনের (৩০শে জুলাই-এর) বিশ্রামস্থল চন্দনবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। এখানে একটি গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় ছাউনি পড়িল। সেদিন সমস্ত বৈকালবেলা বৃষ্টি হইয়াছিল এবং স্বামীজী মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য নিবেদিতার সহিত কথা বলিতে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু নিবেদিতার কোন অসুবিধা হয় নাই—তিনি ভৃত্যদের ও অন্যান্য যাত্রিগণের নিকট সর্বদাই অতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পাইতেছিলেন।

পরবর্তী স্থানের রাস্তাটি পূর্বের রাস্তা অপেক্ষা দুর্গম মনে হইতেছিল, বুঝি উহা অফুরন্ত। চন্দনবাড়ীর সন্নিকটে স্বামীজী বলিলেন যে, সম্মুখের তুষারবর্ত্মটি নিবেদিতাকে নগ্নপদে পার হইতে হইবে, কেননা উহাই তাঁহার প্রথম তুষার-রেখাতিক্রম। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতব্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উল্লেখ করিতেও তিনি ভুলিলেন না। ইহার পরেই বহু সহস্র-ফিট-ব্যাপী এক বিকট চড়াই। তারপর সরু পথ পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। সেই পথের অন্য প্রান্তে আর এক খাড়া চড়াই। প্রথম পর্বতটির শীর্ষে উঠিয়া রাস্তাটি শেষনাগকে (হ্রদকে) পাঁচশত ফুট নীচে ফেলিয়া উর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে—নিম্নে শেষনাগের জল গতিহীন। হ্রদের উপরে তুষারশিখরগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত ১২০০০ ফুট উচ্চে এক ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় (ওয়াবজান নামক স্থানে) ছাউনি পড়িল।

ছাউনি পড়িবার পর নিবেদিতা আর স্বামীজীকে দেখিতে পাইলেন না। সে রাত্রে (৩১শে জুলাই) ছাউনিতে, জুনিপার কাষ্ঠদ্বারা বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। এই কাষ্ঠ অনেক নিম্নে ছিল বলিয়া বৈকালে ও সন্ধ্যাবেলায় কুলিদিগকে বহুক্ষণ ধরিয়া দূরে দূরে উহার সন্ধানে ফিরিতে হইয়াছিল।[১]

তারপর পাঁচটি তটিনীর সঙ্গমস্থলে—পঞ্চতরণীতে যাইবার রাস্তাটি ছিল আরও সঙ্কীর্ণ। কষ্টে সৃষ্টে পগডণ্ডী ধরিয়া খাড়া খাড়া পাহাড় চড়াই-উতরাই করিয়া তাঁহারা যেখানে (১লা আগস্ট) ছাউনি করিলেন, উহা শেষনাগ অপেক্ষা নীচু ছিল এবং সেখানকার ঠাণ্ডাও বেশ শুষ্ক ও প্রীতিপদ ছিল। ছাউনির সম্মুখে ছিল এক শুষ্ক কঙ্করময় নদীগর্ভ; উহার মধ্য দিয়া পাঁচটি তটিনী প্রবাহিত। ইহাদের প্রত্যেকটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া স্নান করার বিধি। স্বামীজী অপরদের নজর এড়াইয়া ঐ রীতি অবলম্বনে একের পর এক প্রত্যেকটি স্রোতস্বতীতে স্নান করিলেন।

২রা আগস্ট অমরনাথের মহোৎসবের দিন প্রথম দল যাত্রী রাত্রি দুইটার সময়ই ছাউনি হইতে যাত্রা করিলেন; কিছু পরেই জ্যোৎস্নালোকে স্বামীজীরাও দেবদর্শনে নির্গত হইলেন। যে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে অমরনাথ গুহা অবস্থিত, সেখানে পৌছাইতে সূর্যোদয় হইয়া গেল। রাস্তার এই অংশটি খুব নিরাপদ ছিল না। একটি পগডণ্ডী প্রায় খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া উঠিয়া অপর পার্শ্বে—উপরের অংশে—শস্পাচ্ছাদিত জমির উপর একটি ক্ষুদ্র সোপানপরম্পরায় পরিণত হইয়াছিল। কোন মতে উতরাইটির তলদেশে পৌছিয়া যাত্রিগণকে অমরনাথের গুহা পর্যন্ত ক্রোশের পর ক্রোশ তুষারবর্ত্মের উপর দিয়া চলিতে হইয়াছিল। লক্ষ্যস্থানের মাইলখানেক পূর্বে বরফ শেষ হইল এবং সেখানে যে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে যাত্রিগণকে স্নান করিতে দেখা গেল। তখনও প্রস্তরবিকীর্ণ একটি বন্ধুর কঠিন চড়াই সম্মুখে আস্তীর্ণ ছিল। উহার উপরে উঠিয়া দেখা গেল, পুরোভাগে স্থিত পর্বতমালা সদ্যঃপতিত তুষারাবরণে শ্বেত-শোভা ধারণ করিয়াছে, আর পথশেষে যে গুহা রহিয়াছে, উহার যে অংশে সূর্যকিরণ কখনও প্রবেশ করে না, সেই গভীর প্রান্তে বিরাট তুষার-লিঙ্গটি বিরাজমান—দর্শনমাত্র মনপ্রাণ ভক্তিরসে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

১। স্বামীজীরা পুরাতন রাস্তায় গিয়াছিলেন। বর্তমান রাস্তা অপেক্ষাকৃত নিম্নে ও সুগম।

স্বামীজী ইতিমধ্যে ক্লান্ত হইয়া পিছনে পড়িয়াছিলেন। এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া নিবেদিতা কঙ্কর-স্তূপগুলির নীচে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দলে দলে যাত্রীরা গুহাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, তিনি বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। অনেক বিলম্বে স্বামীজী আসিয়া পৌঁছিলেন ও "আমি স্নান করিতে যাইতেছি, তুমি এগোও"—এই কয়টিমাত্র কথা বলিয়া নিবেদিতাকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। অর্ধঘণ্টা পরে তিনি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিরাট গুহার সূর্যকিরণরহিত এক অংশে বিশাল তুষার-লিঙ্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার মনে হইল, তিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের প্রত্যক্ষ দর্শনে ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গ তখন ভস্মাবৃত, পরিধানে কৌপীন ব্যতীত অন্য বস্ত্র নাই। গুহা তখন মহাদেবের স্তুতিবাদে ও "হর হর বম্ বম্" রবে মুখরিত। স্বামীজী ভক্তিবিহ্বলচিত্তে অপরের অলক্ষিতে কয়েকবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া লইলেন এবং অতঃপর একটা ভাবাবেগ সামলাইবার জন্য অকস্মাৎ দ্রুতপদে বাহিরে নির্গত হইলেন।

তাঁহার বদনমণ্ডল তখন আরক্তিম—চক্ষের সম্মুখে শিবলোকের সমস্ত দ্বার যেন উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে—তিনি দেবাদিদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়াছেন! "তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, পাছে তিনি 'মূর্ছিত হইয়া পড়েন', এইজন্য নিজেকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে উহা চিরদিনের মতো বর্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল।" ('স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে', ১১৫ পৃঃ)।

অর্ধঘণ্টা পরে নিবেদিতা ও এক সহৃদয় নাগা বন্ধুর সহিত বসিয়া জলযোগ করিতে করিতে স্বামীজী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমার মনে হইতেছিল যে তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব! আর তথায় কোন বিত্তাপহারী ব্রাহ্মণ (পাণ্ডা) ছিল না, কোন ব্যবসায় ছিল না, কোন কিছু খারাপ ছিল না; সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাবই ছিল। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই।" ইহারও পরে তিনি কথাপ্রসঙ্গে অমরনাথ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—সেই চিত্তবিহ্বলকারী দর্শন যেন তাঁহাকে স্বীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বলিয়াছিলেন, "ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, তখন এ শরীর আর রাখবে না।"

তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গটির মনোহর কবিত্বের দিকটাও দেখাইতে ভুলিতেন না, আর তিনি কল্পনা করিতেন যে, এক সুদূর অতীতকালে একদল মেষপালক কোন এক নিদাঘ দিবসে নিজ নিজ মেষযুথের অনুসন্ধানে বহু দূর ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবক্রমে এখানে আসিয়া পড়ে ও গুহামধ্যে প্রবেশপুর্বক তুষারলিঙ্গের অস্তিত্ব জানিতে পারে। সরলমনা তাহাদের তখনই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইনি স্বয়ং মহাদেব। স্বামীজী আরও বলিতেন যে, তিনি অমরনাথের নিকট ইচ্ছামৃত্যু-বর পাইয়াছিলেন। নিবেদিতাকেও তিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, এই তীর্থযাত্রার ফল তিনি তখনই উপলব্ধি না করিলেও একদিন ইহা সফল হইবেই, কেননা কারণ থাকিলে কার্য অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে অন্যপ্রসঙ্গে দুই চারিটি অনুভূতির কথা প্রকটিত হইলেও, তৎকালীন উপলব্ধি বিষয়ে তিনি সাধারণতঃ চাপিয়া যাইতেন। তথাপি ঐ দর্শনের প্রভাব যে অতি গভীর ছিল, তাহা তাঁহার আচরণ হইতেই বুঝিতে পারা যাইত। তিনি তখন সর্বদা শিবভাবে বিভোর থাকিতেন, আর মুখে অনুক্ষণ শিবমহিমা কীর্তিত হইত। মহাদেব চিরকালই তাঁহার উপাস্য ছিলেন—অমরনাথ সে ভাবপ্রবাহে বন্যা আনিয়াছিলেন।

রাখি-পুর্ণিমার দিনে[২] এই পুণ্য মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অনেকে স্বামীজীদের হস্তেও রক্ত ও পীত বর্ণের রাখি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তারপর নদীতীরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও ভোজন সমাপনান্তে তাঁহারা তাঁবুতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

ইহার পর তাঁহাদের প্রত্যাবর্তন শুরু হইল। ফিরিবার সময় তাঁহারা পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য 'হতিয়ার তলাও' (বা মরণ-হ্রদ) নামক হ্রদের উপরি-ভাগের রাস্তা ধরিয়া চলিলেন। এই স্থানেই কয়েক বৎসর পুর্বে চল্লিশ জন যাত্রী স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে চলিবার সময় তাহাদের কণ্ঠধ্বনির কম্পনে একটি তুষারস্তূপ স্থানচ্যুত হইয়া প্রবাহাকারে নামিয়া আসে ও যাত্রীদিগকে নিহত করে। এখানে একটি পগডণ্ডী খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া নামিয়া গিয়াছে। পায়ে হাঁটিয়া প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ারই মতো কষ্টে স্পষ্টে উহা অতিক্রম করিয়া

২। গুরু পুর্ণিমার দর্শনটিও প্রশস্ত।

স্বামীজীরা নীচে নামিলেন ও ক্রমে পহলগামে পৌছিলেন। রাস্তায় একস্থান হইতে তাঁহারা একটি কুলির হস্তে চিঠি দিয়া পহলগামে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পূর্বেই পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যাহ্নে পহলগামে পৌছিয়া দেখিলেন, ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না ; সহযাত্রীদের সহিত তাঁহাদের যে নিবিড় প্রেম সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে দ্রুতগামী পুরোবর্তী যাত্রীরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নৌকাগুলিতে তাঁহাদের সংবাদ দিয়া গিয়াছিল। পহলগাম হইতে তাঁহারা ইসলামাবাদ, বওয়ান ও (৭ই আগস্ট) পাণ্ড্রেস্থান হইয়া ৮ই আগস্ট রাত্রে শ্রীনগরে উপনীত হইলেন।

শ্রীনগরে স্বামীজীর বৈরাগ্যভাব যেন আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমাগত নিবেদিতা প্রভৃতিকে বলিতেন, তিনি বিদায় লইয়া নির্জনবাসে যাইবেন। আর বলিতেন, "রমতা সাধু বহতা পানি, ইসমে ন কোই মৈল লখানি" ; আবার বলিতেন, "যখনই কষ্টের মধ্যে পড়ি ও ভিক্ষোপজীবী হইতে হয়, তখনই আমি কত বেশী ভাল থাকি!" এইসব কাতরোক্তি, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ লোকের সহিত মেলামেশার আগ্রহ, পদব্রজে নিঃসম্বল ভ্রমণ-স্মৃতির পুনরুদ্বোধন, ইত্যাদি মিলিয়া অপর সকলকে সহজেই বুঝাইয়া দিত, তাঁহার মন তখন কোন্ অসাধারণ ভূমিতে বিচরণ করিতেছে। মহাপুরুষের চিত্তের ভাব তাঁহার অনুগামীদের হৃদয়েও সংক্রামিত হয়। শ্মশানবাসী মহাদেবের চিন্তায় বিভোর স্বামীজীর বৈরাগ্যোজ্জ্বল মনের সংস্পর্শে আসিয়া বিদেশিনীরাও অনুভূতিমূলক হিন্দুধর্মের গাম্ভীর্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিলেন।

অমরনাথ হইতে আগস্ট মাসের প্রথমভাগে স্বামীজী শ্রীনগরে ফিরিয়া আসেন ; সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে শিষ্যারা তাঁহার অনুমতিক্রমে অচ্ছাবলে তাঁবু ফেলিয়া তপস্যা করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি একাকী ক্ষীরভবানী দর্শনে যান এবং ১২ই অক্টোবর অপর সকলের সহিত কাশ্মীরত্যাগের পথে বারামুল্লা পর্যন্ত আসিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। ইহাই সংক্ষেপে তাঁহার কাশ্মীরবাসের শেষাংশের বিবরণ হইলেও ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১০৫-০৬ পৃঃ) আমাদিগকে ঐ সময়ের কয়েকটি ঘটনা নিবিড়তররূপে নিরীক্ষণ করিতে হইবে।

স্বামীজীর নৌকার যেসব মাঝি এতদিন তাঁহার স্বজনেরই ন্যায় পরিগণিত হইতেছিল এবং তাঁহার নিকট সর্বপ্রকার সাহায্যাদি পাইতেছিল তাহারা ৯ই

আগস্ট বিদায় লইল। পরে ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীজী বলিতেন, ভালবাসা এবং ধৈর্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময় বাড়াবাড়ি হইয়া পড়ে।

একদিন অপরাহ্ণে নিবেদিতার সহিত ক্ষেতগুলির উপর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অর্ধঘণ্টা যাবৎ আলাপ করিয়াছিলেন—ইহা আমরা পুর্বে বলিয়া আসিয়াছি। ১০ই আগস্টের যে স্মৃতি নিবেদিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা উল্লিখিত ঘটনারই বিবরণ বলিয়া মনে হয়। সেদিন তাঁহার কথাবার্তা সমস্তই স্ত্রী-শিক্ষা-কার্য ও এতৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় কি, এই বিষয়ক ছিল। স্বদেশ ও উহার ধর্মসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে সমন্বয়-মূলক, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব শুধু এইটুকু যে, তিনি চাহেন, হিন্দুধর্ম নিষ্ক্রিয় না থাকিয়া সক্রিয় হউক এবং উহা পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহা-দিগকে স্বীয় উদারভাবে আনয়নের সামর্থ্য রাখুক, আর কেবল ছুঁৎমার্গই তিনি উঠাইয়া দিতে চান—এই সব সম্বন্ধে তিনি বলিতে লাগিলেন। তারপর যাঁহারা খুব প্রাচীনপন্থী, তাঁহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্মভাব সম্বন্ধে আবেগভরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "ভারতের অভাব কার্য-কুশলতা; কিন্তু তজ্জন্য সে যেন কদাপি তাহার পুরাতন চিন্তাশীল জীবনকে উপেক্ষা না করে।"

১২ই আগস্ট দেখা গেল, স্বামীজীর দৈনন্দিন জীবনধারায় একটু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে—তিনি একজন ব্রাহ্মণ পাচক রাখিয়াছেন। অমরনাথ-যাত্রীরা ঘোরতর আপত্তি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে মুসলমান পাচকের হস্তে খাওয়া অন্যায়, "অন্ততঃ শিখদের দেশে এটি করবেন না, স্বামীজী।" স্বামীজী যখন যে দেশে থাকিতেন, সে দেশের আচার-বিচার সাময়িকভাবে মানিয়া চলিতেন ইহা আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি। কেন মানিতেন তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনাও করিয়া আসিয়াছি। এসব তিনি সর্বক্ষেত্রে যে পছন্দ করিতেন কিংবা চিরজীবনের জন্য স্বীকার করিয়া লইতেন, এরূপ মনে করিলে নিতান্তই ভ্রম হইবে। এই ভ্রমণকালেই তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, শ্বেতাঙ্গ শিষ্যদের যদি ভারতে রাখিতে হয়, তবে তিনি অপেক্ষাকৃত উদার বঙ্গদেশেই তাহার সূত্রপাত করিবেন—পাঞ্জাবে নহে। তাঁহার প্রকৃত মনোভাবের আর একটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ সময়েরই অপর একটি আচরণে। তিনি ব্রাহ্মণ পাচক রাখার সমকালেই "তাঁহার মুসলমান মাঝির শিশু কন্যাটিকে

উমারূপে পূজা করিতেছিলেন।" সেই চারি বৎসর বয়স্কা বালিকাটিকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, এবং কাশ্মীরের কথা স্মরণ করিতে গিয়া পরে বলিতেন, সে কেমন করিয়া নদীতীরে একটি নীলবর্ণের ফুল দেখিতে পায় এবং উহাকে লইয়া প্রায় কুড়ি মিনিট কাল খেলা করিতে থাকে। ('স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে', ১২১-২২ পৃঃ)।

পূর্ববারে স্বামীজী যখন কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি আশা পাইয়াছিলেন যে, কাশ্মীরে মঠ ও সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তাঁহাকে রাজ্য সরকার হইতে একখণ্ড উপযুক্ত ভূমি দেওয়া হইবে। এইবারে নদীতীরে মহারাজের অনুমোদনক্রমে একখণ্ড জমি মনোনীত হইল। শ্বেতাঙ্গ শিষ্যারা স্থির করিলেন আইনানুসারে জমি হস্তান্তরিত হইবার পূর্বেই তাঁহারা উহাতে তাঁবু ফেলিয়া উহাকে স্বামীজীর প্রথম স্ত্রী-মঠের অনুকল্পরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবেন। ইওরোপীয়দিগের ছাউনির জন্য যে কয়টি ছোটখাটো স্থান সংরক্ষিত ছিল, উহা তাহাদের অন্যতম এবং ঐ জমিখণ্ডের উপর তিনটি চেনার গাছ জন্মিয়াছিল। ইওরোপীয়ানদের জন্য জমিটি নির্দিষ্ট থাকায় ঐরূপ ছাউনি ফেলিতে কোন বাধা না থাকিলেও, শেষ পর্যন্ত জমিটি স্বামীজীর হস্তগত হইল না; যেহেতু মহারাজের উৎসাহ ও সম্মতি থাকিলেও ব্রিটিশ সরকারের রেসিডেণ্ট স্যার অ্যাডালবার্ট ট্যালবট সাহেব বাধ সাধিলেন।[৩] ইহাতে স্বামীজী বিশেষ মর্মাহত হইলেও কিছু করা সম্ভব ছিল না—স্বামীজীকে কাশ্মীরে আশ্রমস্থাপনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতেই হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাব্যতীত কিছুই হইবার নহে; আর এই সিদ্ধান্তও তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন যে, কাশ্মীর বা কোনও দেশীয় রাজ্যে তাঁহার পক্ষে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সাধ্যায়ত্ত নহে।

১৪ই আগস্ট রবিবারে ধীরামাতাদের অনুরোধে স্বামীজী তাঁহাদের সহিত চা-পানের জন্য ঐ ছাউনিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেদিন এক ইওরোপীয় ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; ধীরামাতাদের বিশ্বাস ছিল, ইনি বেদান্তানুরাগী ও স্বামীজীর সহিত আলাপ করিলে উপকৃত হইবেন। স্বামীজীর ইহাতে উৎসাহ না থাকিলেও ধীরামাতার অনুরোধক্রমে অনিচ্ছাসহকারেই সেখানে আসিয়া-

৩। ট্যালবট সাহেব দুইবার এই প্রস্তাবটি কাউন্সিলের কার্যতালিকা হইতে কাটিয়া দেন; সুতরাং আলোচনা পর্যন্ত হয় নাই। ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১১৮; বাঙ্গলা জীবনী, ৭৮৬)।

ছিলেন। ফলেও দেখা গিয়াছিল, স্বামীজীর অনুমান ঠিকই ছিল; তিনি ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও নিষ্ফল হইয়াছিলেন।

১৬ই আগস্ট মঙ্গলবারে[৪] স্বামীজী আবার নদীতীরে শ্বেতাঙ্গ শিষ্যাদের উক্ত ছাউনিতে মধ্যাহ্নভোজনে যোগ দিয়াছিলেন। আহারের পর অপরাহ্নে এমন জোর বৃষ্টি হইল যে, তিনি ফিরিতে পারিলেন না। সুতরাং নানা বিষয়ে আলোচনা চলিল। টেবিলে টড্-এর লিখিত একখানি 'রাজস্থান' পড়িয়া ছিল। উহা তুলিয়া লইয়া তিনি মীরাবাঈ-এর কথা পাড়িলেন। মীরাবাঈকে স্বামীজী অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি মীরাবাঈ-এর গান অনুবাদ করিয়া শিষ্যাদিগকে শুনাইতেন, আর গাহিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া গান :

হরিসে লাগি রহোরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাই।
সুগা পড়ায়কে গণিকা তারে তারে মীরাবাঈ॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা বলিয়া বৈল চরাই।
এক বাতকা টাণ্টা পড়ে তো খোঁজ-খবর না পাই॥
ঐসী ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাঈ।
সেবা বন্দি ঔর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাঈ॥

স্বামীজীর মতে, বাঙ্গলার তদানীন্তন জাতীয় ভাবসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ 'রাজস্থান' গ্রন্থ হইতে গৃহীত, আর ঐ গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অংশ মীরাবাঈ-এর জীবনী। মীরার প্রচারিত দৈন্য, প্রার্থনা ও সর্বজীবসেবা শ্রীচৈতন্য প্রচারিত 'নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব-পুজনে'র সহিত তুলনীয়। বৃন্দাবনে এক বৈষ্ণব সাধু (রূপ গোস্বামী) মীরাবাঈ-এর সহিত এই বলিয়া সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হন যে, তিনি স্ত্রীমুখ দর্শন করেন না। তবু মীরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৃন্দাবনে আর কেহ পুরুষ আছে আমি জানিতাম না; আমার ধারণা

৪। 'বাণী ও রচনা', ৯।৩২৪ পৃষ্ঠায় ১৬ই সেপ্টেম্বর মুদ্রিত থাকিলেও সেদিন মঙ্গলবার ছিল না, ছিল শুক্রবার; ১৬ই আগস্ট ছিল মঙ্গলবার। অধিকন্তু আলোচ্যকালে নিবেদিতারা ছিলেন নদীতীরের ছাউনিতে বা 'স্ত্রীমঠে'; তাঁহারা অচ্ছাবলে নির্জনবাসে যান সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে। (ঐ, ৯।৩২৩ এবং 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১০৭ পৃঃ)।

ছিল, শ্রীকৃষ্ণই এখানে একমাত্র পুরুষরূপে বিরাজমান।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন ও বৈষ্ণব সাধু তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। মীরাও তাঁহাকে মাতার ন্যায় আশীর্বাদ করিলেন।

তারপর স্বামীজী আকবর, প্রতাপসিংহ প্রভৃতির কথা তুলিলেন, আকবরের সভাকবি তানসেনের কথা শুনাইলেন, বীরবালা কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীও আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

২০শে আগস্ট শনিবারে[৫] স্বামীজী ও স্টং নামক এক ব্যক্তি আমেরিকার কনসাল জেনারেল ও তাঁহার পত্নীর আমন্ত্রণে দুই দিনের জন্য ডাল-হ্রদের তটে গেলেন। তাঁহারা সোমবারে ফিরিয়া আসিলেন ও মঙ্গলবারে 'স্ত্রী-মঠে' পদার্পণ করিলেন। তখন তিনি গাণ্ডেরবল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাহার পূর্বে যাহাতে কয়েক দিন শিষ্যাদের কল্যাণসাধন করিতে পারেন, এইজন্য স্বীয় নৌকা তাঁহাদের কাছেই রাখিলেন।

এই শিবিরবাসেও কিন্তু শিষ্যাদের মন তৃপ্ত হইল না। তাঁহারা আরও দূরে নির্জনবাস ও ধ্যানধারণার জন্য লালায়িত ছিলেন। অতএব ৩রা সেপ্টেম্বর অচ্ছাবলাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ইসলামাবাদ হইয়া সেখানে ৫ই সেপ্টেম্বর পৌঁছিলেন (নিবেদিতার দিনলিপি)। এই বিষয়ে ও পূর্ববর্তী ঘটনাপরম্পরা সম্বন্ধে স্বামীজী ২৮শে আগস্ট মেরীকে লিখিয়াছিলেন: "কয়েকদিনের জন্য আমি দূরে[৬] চলে গিয়েছিলাম। এখন আমি মহিলাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি। তারপর যাত্রি-দলটি যাচ্ছে কোন পাহাড়ের পিছনে এক বনের মধ্যে একটি সুন্দর শান্ত পরিবেশে, যেখানে কুল কুল ক'রে ছোট নদী বয়ে চলেছে। সেখানে তারা দেবদারু গাছের নীচে বুদ্ধের মতো আসন ক'রে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকবে। এ-রকম প্রায় মাসখানেক চলবে"; ('বাণী ও রচনা', ৮।৪৫)। অচ্ছাবল হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী মার্তণ্ড-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় (নিবেদিতার

৫। 'বাণী ও রচনা'তে ২০শে সেপ্টেম্বরের উল্লেখ থাকিলেও উহা আগষ্ট হইবে মনে হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর ছিল মঙ্গলবার, ২০শে আগষ্ট শনিবার। বস্তুতঃ 'স্ত্রীমঠে' বাস ও অচ্ছাবলে নির্জন-বাসের বিবরণ মিশ্রিত হইয়া এই ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকিবে।

৬। সম্ভবতঃ গাণ্ডেরবলে।

দিনলিপি) তিনি শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর খেতড়ীর রাজাকে লিখিলেন, "এখানে আমি দু-সপ্তাহ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি।"

উক্ত নির্জনবাসকালে স্বামীজীর সহিত একজন আফগান রাজকুমারের পরিচয় হয়। আর জানা যায়, একদিন নদীতীরে প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলির নিম্নে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস, এক জীবনে নেতা গড়ে ওঠে না। নেতা জন্মায়। কারণ, শৃঙ্খলাস্থাপন ও আদর্শ নির্বাচনই শক্ত কাজ নয়; নেতার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তিনি অত্যন্ত ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের সাধারণ সহানুভূতিসূত্রে বাঁধতে পারেন। আর এটি শুধু স্বভাবদত্ত ক্ষমতা থেকে আপনিই হয়ে যায়, চেষ্টা করে এটা করা যায় না।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১০৭-০৮ পৃঃ)। এই সূত্রে তিনি ইহাও দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, সমসাময়িক দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি নেতার জীবনকাল হইতেই ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছিল, অপরটি ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

অমরনাথ-দর্শনের অব্যবহিত পুর্বে ও পরে স্বামীজীর মন শিব-ভাবে বিভোর ছিল; কিন্তু অতঃপর কোন অজ্ঞাত কারণে,"স্বামীজীর চিত্ত শিব হইতে শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি সর্বদাই রামপ্রসাদের গানগুলি গাহিতেছিলেন—যেন তিনি আপনাকে শিশু বলিয়া কল্পনা করিতে করিতে সেই ভাবে মগ্ন হইয়া যাইবেন। তিনি একবার আমাদের কয়েকজনকে বলিয়াছিলেন যে, যেদিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন, তিনি জগন্মাতার উপস্থিতি অনুভব করিতেন—যেন তিনি সাকাররূপে কক্ষমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্বদা জগন্মাতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিকভাবে কথা কহিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১১৭ পৃঃ)। এই ভাব যখন গভীরতর হইল, তখন তিনি বলিতেন, তিনি চিরব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন—যে চিন্তায় মানুষকে দগ্ধ করিতে থাকে। তাহাকে নিদ্রা বা বিশ্রামের পর্যন্ত অবসর দেয় না, এবং অনেক সময় মনুষ্যকণ্ঠেরই ন্যায় আদেশ প্রদানপূর্বক সর্ববিষয়ে পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত করিতে থাকে, আদৌ ছাড়িতে চাহে না —ঐ সময় তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া তেমনি ভাবরাশি প্রবল প্রবাহাকারে ধাবমান হইতেছিল। সে ভাবধারার মধ্যে পাপবাদের কোন স্থান ছিল না—সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, উত্তম-অধম ইত্যাদি সমস্ত দ্বন্দ্ব এককালে

তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। "এখন যেন তিনি জগতের মধ্যে যাহা কিছু ঘোররূপ, যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্বোধ্য, তাহারই উপর সমগ্র মনঃসংযোগ করিতে লাগিলেন। এই পথ দিয়াই তিনি এখন প্রপঞ্চের পশ্চাতে যে অদ্বয় ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তাঁহাকে লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।...রোগ ও যন্ত্রণা দেখিলেই তাঁহার মনে পড়িত, তিনিই যথায় বেদনা অনুভূত হইতেছে, সেই স্থান, তিনিই যন্ত্রণা এবং তিনিই যন্ত্রণাদাতা। কালী! কালী! কালী।" (ঐ, ১১৮ পৃঃ)। তিনি এক প্রবল প্রেরণাবশে এই চিন্তাগুলি কবিতাকারে লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; আবেগভরে কবিতাটি লিখিবার পরেই ভাবের আতিশয্য সহ্য করিতে অপারগ তাঁহার অবসন্ন দেহ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। বল-লাভান্তে উঠিয়া তিনি শিষ্যাদের বজরায় গিয়া ঐ লিপিটি রাখিয়া আসিলেন। শিষ্যারা একটি স্থান দর্শনান্তে বজরায় ফিরিয়া স্বামীজীর শ্রীহস্ত-লিখিত কবিতা 'কালী দি মাদার' দেখিতে পাইলেন। কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উহা পরে 'মৃত্যুরূপা মাতা' নামে পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন ও ঐ অনুবাদ 'বাণী ও রচনা'য় মুদ্রিত হইয়াছে (৭।৪১২)। সেখানে উহার রচনাকাল ক্ষীরভবানী-দর্শনের পরে বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও নিবেদিতার বর্ণনা ঐ মতের পরিপোষক নহে ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১১৯ পৃঃ)। ভাব-গাম্ভীর্য, শব্দ-বিন্যাস, ছন্দের গুরুগম্ভীর বিস্তার, জাগতিক ধ্বংসলীলার নিপুণ শব্দচিত্র ইত্যাদি মিলিয়া মূল কবিতাটিকে অতি উচ্চসুরে বাঁধিয়া দিয়াছে।

এই কবিতা-রচনার দিন কয়েক পূর্ব হইতেই স্বামীজী স্বীয় নৌকাখানিকে অপর নৌকাগুলি হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন; কাহারও সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। শুধু একজন ব্রাহ্ম ডাক্তার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে খবর লইবার জন্য সেখানে যাইতেন। ইনি ঐ সময়ে কাশ্মীরে ছিলেন এবং স্বামীজীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। কবিতা-রচনার পরদিন ডাক্তারবাবু যথারীতি স্বামীজীর বজরায় উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া কথা না বলিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন ৩০শে সেপ্টেম্বর দেখা গেল, স্বামীজী ক্ষীরভবানী নামক দেবীস্থান দর্শনে চলিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন, কেহ যেন তাঁহার পশ্চাদনুসরণ না করে। সেদিন হইতে ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

৬ই অক্টোবর অপরাহ্ণে শিষ্যারা দেখিলেন, স্বামীজীর নৌকা উজান বাহিয়া

তাঁহাদেরই দিকে আসিতেছে। স্বামীজী নৌকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—একহস্তে নৌকার একটি বাঁশের খুঁটি ধরিয়া আছেন, আর অপর হস্তে রহিয়াছে কতকগুলি হরিদ্রাবর্ণের ফুল। নৌকা নিকটে আসিলে তিনি শিষ্যাদের বজরায় প্রবেশ করিলেন এবং নীরবে হস্তধৃত গাঁদাফুলের মালাটি একে একে সকলের মস্তকে ছোঁয়াইয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। অবশেষে মালাটি একজনের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটি আমি মাকে নিবেদন করেছিলাম।" তারপর বসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আর 'হরি ওঁ' নয়; এবার 'মা মা'।" তাঁহার ভাবস্রোতে বাধা না দিবার জন্য সকলে নির্বাক বসিয়া রহিলেন, আর তাঁহাদের মনে হইল, এমন কিছুতে স্থানটি ভরপুর হইয়া গিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেও বাক্যস্ফুরণ অসম্ভব। স্বামীজী আবার বলিলেন, "আমার স্বদেশপ্রেম ভাসিয়া গিয়াছে; আমার যাহা কিছু ছিল, সব গিয়াছে। এখন কেবল 'মা মা'।" আর একটু মৌন থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমার খুব অন্যায় হয়েছে; মা আমাকে বলিলেন, 'যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে ঢুকে আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তোর তাতে কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস? না আমি তোকে রক্ষা করি? সুতরাং আমার আর স্বদেশপ্রেম বলে কিছু নেই এখন আমি ছোট শিশু।"

তারপর নানা বিষয়ে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানাইলেন, তিনি অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিবেন। আবার দুই-এক কথায় ইহাও প্রকাশ করিলেন যে, গত সপ্তাহের মানসিক গুরুশ্রমের ফলে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা উপস্থিত হইয়াছিল। আর সস্নেহে বলিলেন, "এখন আমি এর চেয়ে বেশী বলতে পারব না; বলতে নিষেধ আছে।" বিদায় লইবার সময় সকলকে কিন্তু পরিষ্কার জানাইয়া গেলেন, "কিন্তু আধ্যাত্মিক অংশে আমি কোনরকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইনি!" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১২০-২১ পৃঃ)।

পরে জানা গিয়াছিল, ক্ষীরভবানীতে তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন—যেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় অধ্যাত্মানুভূতির উপর যে প্রলেপ পড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল, উহা তিনি নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প—তিনি তখন আর কর্মী, উপদেষ্টা বা জননেতা নহেন—শুধু সন্ন্যাসী, মার নিকট ক্ষুদ্র অসহায় শিশু! ঐ কয়দিন তিনি দেবীর নিকট প্রত্যহ হোম করিতেন, এক মণ দুগ্ধের দ্বারা ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তণ্ডুল বাদাম প্রভৃতির সহিত ভোগ দিতেন, সাধারণ ভক্তের ন্যায় বসিয়া বহুক্ষণ মালাজপ

করিতেন, এবং একটি ব্রাহ্মণের শিশুকন্যা নিত্য উমারূপে তাঁহার পুজা পাইত। ক্ষীরভবানীর মন্দিরে অবস্থানকালে একদিন বিধর্মীদের অত্যাচারজনিত ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ও প্রতিমার দুর্দশার কথা ভাবিয়া তাঁহার মনে এই খেদ উপস্থিত হইল: "কেমন করে লোক এসব অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে? প্রতীকারের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি! আমি যদি সে সময়ে থাকতুম, কখনও এরকম হতে দিতুম না। প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা করতুম।" ঠিক সেই সময়ে তিনি পুর্বোক্ত দৈববাণী শুনিলেন, "যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে ঢুকে" ইত্যাদি। আবার তাঁহার মনে হইল, তিনি নিজে যদি একটি নূতন মন্দির স্থাপন করিতে পারিতেন, তবে বড ভাল হইত। তখনই পুনর্বার মায়ের কণ্ঠধ্বনি শুনিলেন, "বৎস! আমি মনে করলে অসংখ্য মন্দির ও মঠ স্থাপন করতে পারি। এই মুহূর্তেই এখানে প্রকাণ্ড সপ্ততল স্বর্ণ-মন্দির নির্মিত হতে পারে।" মন্দির যে হয় নাই, তাহা মায়েরই ইচ্ছানুসারে।

অন্যান্য অনুভূতির কথা প্রকাশ্যে বলা নিষেধ ছিল বলিয়া আমাদের আর জানিবার উপায় নাই। বাঙ্গলা জীবনীর পাদটীকায় শুধু এইটুকু উল্লিখিত আছে: "ক্ষীরভবানীতে গভীর অন্ধকার রাত্রে উগ্র তপস্যা করিতে করিতে স্বামীজীর আরও যেসকল অদ্ভুত দর্শন ও অনুভূতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস তিনি দুই-একজন গুরুভ্রাতাকে দিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্মজীবনের সেসকল নিগূঢ় রহস্য সর্বসাধারণের গোচর করা অনুচিত বিবেচনায় তাহা গোপন করা হইয়াছে। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বামীজীর সমুদয় প্রকৃতি এই সময়ে মায়িক সংস্কারসমূহের উর্ধ্বে উঠিবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতেছিল।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৭৯১ পৃঃ)

পরবর্তী কয়দিন শিষ্যারা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেন না বলিলেই চলে—তিনি নিজ নৌকায় ধ্যানে কাটাইতেন কিংবা তীরে আপনমনে পদচারণ করিতেন—শিষ্যারা নৌকার ছাদে বসিয়া থাকিলেও সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। তবে পুর্বোক্ত দিনের পরদিন নিবেদিতা ও অপর একজন শিষ্যা স্বামীজীর নিকট নদীতীরে উপস্থিত আছেন এমন সময় একজন নাপিতকে দেখিয়া তিনি তাহাকে কাছে ডাকিলেন ও মুখে বলিলেন "এসব আর থাকবে না।" নাপিতকে লইয়া চলিয়া যাইবার আধঘণ্টা পরে যখন তিনি ফিরিলেন তখন তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, আর শ্রীবদন হইতে দিব্যজ্যোতি উৎসারিত হইতেছে। 'মৃত্যুরূপা

মাতা' কবিতাটি আবৃত্তি করিতে করিতে কহিলেন, "এর প্রত্যেক কথাটি সত্য। আর আমি তা কাজেও প্রমাণ করেছি—দেখ, আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।"

একদিন এক জিজ্ঞাসু একটি প্রশ্ন লইয়া আসিয়াছিলেন ; স্বামীজীও মুণ্ডিত-মস্তকে ও সন্ন্যাসীর বেশে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জিজ্ঞাসুর সমস্যা ছিল, "ন্যায়ের সমর্থন করিতে গিয়া মৃত্যুও শ্রেয়, না, গীতার উপদেশমত, যাহাতে কোন কিছুরই প্রতিক্রিয়া না করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা করা উচিত?"[৭] স্বামীজী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি কোন প্রতি-ক্রিয়ার পক্ষপাতী নহি।" তাহার পরই আবার বলিলেন, "এটি সন্ন্যাসীর জন্য। গৃহস্থদের জন্য আত্মরক্ষাই বিহিত।" লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে মুহূর্তে তিনি আপনাকে কর্তব্যবিহীন, প্রতিক্রিয়ারহিত মাতৃগতপ্রাণ ক্ষুদ্র শিশু বলিয়া মনে করিতেছিলেন, সে মুহূর্তেও তিনি ঐ ভাবটি সর্বসাধারণের গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন নাই। এখানেই স্বামীজীর বিশেষত্ব। অন্যত্রও তিনি বহুবার বলিয়া-ছিলেন যে, সকলকে নির্বিচারে সন্ন্যাসের প্ররোচনা দিয়া বৌদ্ধধর্ম একটা মস্ত ভুল করিয়াছিল।

এখন কাশ্মীর ত্যাগের সময় আসিল। সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেলে তাঁহারা নৌকাযোগে বারামুল্লায় চলিলেন ও ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেখানে পৌছাইলেন। বারামুল্লা পর্যন্ত আগমনকালে স্বামীজীর মনোভাব বুঝাইবার জন্য নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "স্থির হইয়াছিল যে, পরদিন (১২ই অক্টোবর) অপরাহ্নে তিনি লাহোর যাত্রা করিবেন, এবং আমরা আরও কিছুদিন বারামুল্লাতেই অবস্থান করিব। নদীবক্ষে আসিতে আসিতে আমরা তাঁহাকে অতি অল্পই দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি প্রায় সর্বদা মৌনীই থাকিতেন এবং একাকী নদীতীরে অনেক দূর ভ্রমণ করিতেন—আমাদের বজরায় ক্ষণেকের জন্যও কচিৎ পদার্পণ করিতেন। ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর তিনি যে দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে

৭। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, আমি কোনক্রমে বুঝিতে পারি নাই, কিরূপে এই ব্যক্তি এই বিশেষ উপদেশটি গীতা হইতে সংগ্রহ করিলেন।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১২২)।

ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। আবার, সম্প্রতি তাঁহার যে মহান উপলব্ধি ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার শরীর নিশ্চয়ই এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি নিজে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কারণ যন্ত্রণা একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করিলে যেমন তাহার আর উপলব্ধি হয় না, তেমনি শরীরও দীর্ঘকাল ধরিয়া মাত্রাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক ভাব সহ্য করিতে পারে না।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১২৩ পৃঃ)।

১২ই অক্টোবর সকালে প্রাতরাশের পর স্বামীজী শিষ্যাদের নিকট আসিলেন এবং অনেকক্ষণ বসিয়া আলাপ করিলেন। কথা শুনিতে শুনিতে শ্রোত্রীদের মনে হইতেছিল, তাঁহারা যেন কোন উচ্চ ধর্মভূমিতে সমারূঢ়া হইয়াছেন। মাঝে মাঝে তিনি ধর্মভাবোদ্দীপক গান গাহিতেছিলেন, এবং গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করিয়া দিতেছিলেন—সবই মাতৃবিষয়ক। এই পঙ্‌ক্তিদ্বয় তিনি বার বার গাহিয়াছিলেন :

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি (ভবসংসার-বাজার মাঝে)—
ঘুড়ি লক্ষের দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।

আবার স্বরচিত 'মৃত্যুরূপা মাতা' হইতে আবৃত্তি করিয়াছিলেন :

দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালি, করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণনিক্ষেপে প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !

মাঝখানে থামিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখেছিলাম, তা সব সত্য—বর্ণে বর্ণে সত্য।" তারপর আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছিলেন :

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।

"মা সত্য সত্যই তার কাছে আসেন। আমি নিজ জীবনে এটি প্রত্যক্ষ করেছি। কারণ আমি মৃত্যুকে সাক্ষাৎভাবে আলিঙ্গন করেছি।" তারপর নিজের তদানীন্তন মনোভাব বলিয়া যাইতে লাগিলেন : "আমার আর কোন কামনা নেই। আমি শুধু গঙ্গাতীরে মৌনী, কৌপীনমাত্রধারী পরিব্রাজকের জীবন যাপন করতে চাই। আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই। 'স্বামীজী' চিরদিনের মতো মরেছে। আমি কে যে জগতকে শিক্ষা দিবার ভার যেন

আমারই বলে মনে করছি? এ তো কেবল আস্ফালন ও বৃথা অহঙ্কার। জগন্মাতার আমাকে প্রয়োজন নেই—আমারই জগন্মাতাকে প্রয়োজন আছে। যিনি এই অবস্থা উপলব্ধি করছেন, তাঁর কাছে নিষ্কাম কর্মও মায়া বই আর কিছু নয়। প্রেমই একমাত্র পথ।"

তারপর তিনি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের আখ্যায়িকা শুনাইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার শতপুত্র-হন্তা শত্রু বিশ্বামিত্রের রচিত একখানি গ্রন্থ নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিলেন, এমন সময় অরুন্ধতী আসিয়া তিনি কি করিতেছেন দেখিলেন ও বলিলেন, "দেখ, আজ চন্দ্রের কি উজ্জ্বল শোভা।" বশিষ্ঠ মস্তক না উঠাইয়াই বলিলেন, "প্রিয়ে, বিশ্বামিত্রের প্রতিভা এর চেয়েও দশহাজার গুণ উজ্জ্বল।" ঘটনাটি সমাপ্ত করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "আমাদের প্রেমও ঐরূপ হওয়া চাই, বিশ্বামিত্রের প্রতি বশিষ্ঠের যেমন ছিল—তাহাতে ব্যক্তিগত ইষ্টানিষ্টের স্মৃতির লেশমাত্র থাকিবে না।"

স্বামীজী অতঃপর পৃথক্ ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; অতএব সকলকে বারামুল্লায় রাখিয়া গন্তব্যপথে যাত্রা করিলেন। পূর্বে তিনি মুসলমান সরদার মাঝির অল্পবয়স্ক যে কন্যাটিকে উমারূপে পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহার গাড়ী চলিয়া যাইবার পূর্বে সে মাথায় এক বারকোশ আপেল লইয়া সানন্দে ছোট ছোট পা ফেলিয়া তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল ও রাস্তায় ব্যবহারের জন্য ঐগুলি টাঙ্গায় তুলিয়া দিল। তারপর দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল সেইদিকে যেদিকে গাড়ীখানি চলিতে চলিতে দূরে মিলাইয়া গেল।

স্বামীজীর বিভিন্ন পত্র হইতে জানা যায় যে, কাশ্মীরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। প্রধানতঃ এই কারণেই তিনি শিষ্যাদের লইয়া দেশভ্রমণের অভিপ্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং বেলুড় মঠে পত্র লিখিয়াছিলেন, যাহাতে স্বামী সারদানন্দ আসিয়া এই কার্যের ভার গ্রহণ করেন। তিনি না আসা পর্যন্ত উক্ত মহিলারা বারামুল্লাতে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ ঐ কার্যের জন্য ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সেবার জন্য স্বামী সদানন্দও লাহোরে আসিয়া স্বামীজীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, তিনি করাচিতে স্বীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রের বাড়ীতে যাইবেন এবং এইজন্য হরিপদবাবুর নিকট হইতে পাথেয় বাবদ পঞ্চাশ টাকা আনাইয়াছিলেন। কিন্তু যাওয়া হইল না। ১৬ই অক্টোবর

হরিপদবাবুকে লাহোর হইতে এক পত্রে জানাইলেন : "কাশ্মীরে স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং নয় বৎসর যাবৎ ৺দুর্গাপূজা দেখি নাই—এবং এ বিধায় কলিকাতা চলিলাম।…পঞ্চাশ টাকা আমার গুরুভ্রাতা সারদানন্দ লাহোর হইতে করাচি পাঠাইবেন।"

হরিপদবাবুকে ও খেতড়ী-রাজকে লিখিত ঐ সময়ের পত্র হইতে আরও জানা যায় যে, স্বামীজী তখন কপর্দকশূন্য ছিলেন—আমেরিকান মহিলাদের অর্থে তাঁহার ব্যয় নির্বাহ হইত, ভারত হইতে তিনি কিছুই পাইতেন না। ইহা তাঁহার মনঃপূত ছিল না বলিয়াই ঐ ভদ্রমহোদয়দ্বয়ের নিকট অর্থভিক্ষা করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরে স্বামীজীর স্বাস্থ্যহীনতার কথা বলিতে গিয়া একটি ঘটনা মনে পড়ে। একজন মুসলমান ফকিরের এক চেলা মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট আসিত। একদিন ঐ চেলাকে ভয়ানক জ্বর ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতে দেখিয়া স্বামীজী দয়াভিভূত হইলেন ও তাহার মাথা কয়েক মিনিট নিজ অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া ধরিলেন। তাহাতেই সে ব্যক্তি নিরাময় হইল। ইহার ফলে সে স্বামীজীর প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঘনঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। কিন্তু ফকিরের মনে ভয় উপস্থিত হইল—চেলা বুঝি হাতছাড়া হইয়া যায়। সে প্রথমে চেলাকে নিষেধ করিল ও স্বামীজীর নাম করিয়া বহু কটূক্তিও করিল। চেলা তবু নিরস্ত হইল না দেখিয়া সে অভিচার প্রয়োগ করিয়া বলিল, কাশ্মীর পরিত্যাগের পূর্বেই স্বামীজী বিষম বমন ও শিরোঘূর্ণন পীড়ায় আক্রান্ত হইবেন। প্রকৃতই ঐরূপ ঘটিল। স্বামীজীর ইহাতে বিরক্তি উপস্থিত হইল—ফকিরের উপর নহে, প্রত্যুত নিজেরই উপর। অভিমানভরে বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমার কি করলেন? বেদান্ত-প্রচার আর অদ্বৈতানুভূতি করেও যদি একটা বাজীওয়ালার কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না পারলুম, তবে আর কি হল?" ইহা নিতান্ত অভিমানেরই কথা, এবং অপরেরাও উহা ঐ অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা চলে, তিনি যখন কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে অনুরূপ কথা বলেন, তখন শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "বিদ্যা! বিদ্যা মানতে হয় বই কি, বাবা! তাঁরা তো আর ভাঙ্গতে আসেন না! আমাদের ঠাকুর হাঁচি টিকটিকি পর্যন্ত মেনেছেন।" অর্থাৎ বিদ্যা সৎই হউক আর অসৎই হউক, উহা জাগতিক নিয়মানুসারেই আপন ফল প্রসব করে;

ইহার ভাল-মন্দের জন্য ভগবানকে টানিয়া আনা বৃথা। জাগতিক নিয়মকে জাগতিক নিয়ম বলিয়াই মানা উচিত। তারপর শ্রীমা বলিলেন, "শঙ্করাচার্যও তো শুনতে পাই নিজের শরীরে ব্যাধিকে আসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জান, খুড়তুত দাদার (হলধারীর) অভিসম্পাতে ঠাকুরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে আসা একই কথা।" স্বামীজী তবু বলিয়াছিলেন, শ্রীমা যতই বুঝান না কেন, ঠাকুর বস্তুতঃ কিছুই নহেন, আর তিনি তাঁহাকে মানিতে রাজী নহেন। শ্রীমা তখন সকৌতুকে উত্তর দিয়াছিলেন, "না মেনে থাকবার জো আছে কি, বাবা? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা!" ('শ্রীমাসারদাদেবী', ২৩৬ পৃঃ)। স্বামীজী কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহাষ্টমী দিবসে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রকাশানন্দ ও বিমলানন্দের সহিত বাগবাজারে মায়ের বাটীতে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে এইসব কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। মা অবশ্য স্বামীজীর সহিত সরাসরি কথা বলিতেন না—তাঁহার অনুচ্চস্বরে কথিত কথাগুলি ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল স্পষ্টস্বরে স্বামীজীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আদর্শের বাস্তব রূপ

১৬ই অক্টোবর (১৮৯৮) স্বামীজী লাহোর হইতে সোজা কলিকাতায় চলিলেন। ১৮ই অক্টোবর যখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাটীতে অবস্থিত মঠে উপনীত হইলেন, তখন দীর্ঘকাল পরে তাঁহার আগমনে আনন্দের একটা সাড়া পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া দুশ্চিন্তাও বৃদ্ধি পাইল। আরও দেখা গেল যে, তিনি যেন আপনভাবেই মগ্ন থাকেন, বাহিরের জীবন-ধারার সহিত যেন কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার প্রত্যাবর্তনের দুই-তিন দিন পরে যখন শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার শ্রীচরণদর্শনে আসিলেন, তখনও ঐভাব চলিতেছে। চক্রবর্তী মহাশয়কে দেখিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলিলেন, "কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা কন না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে গল্পসল্প করে স্বামীজীর মনটা নীচে নামাতে চেষ্টা করিস।" শিষ্য উপরে গিয়া দেখিলেন, স্বামীজী মুক্ত পদ্মাসনে পূর্বাস্য হইয়া উপবিষ্ট—যেন ধ্যানমগ্ন। মুখে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়ন অন্তর্মুখ। তিনি শিষ্যকে দেখিয়া বসিতে বলিলেন; কিন্তু চুপ করিয়াই রহিলেন। পরে শিষ্য চেষ্টা করিয়া অমরনাথ দর্শনের কথা পাড়িলে স্বামীজী বলিলেন, "অমরনাথ দর্শনের পর থেকে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।…অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর মন্দিরে খুব তপস্যা করেছিলুম।…অমরনাথ যাবার কালে একটা খাড়া চড়াই ভেঙ্গে উঠেছিলুম। সে রাস্তায় যাত্রীরা কেউ যায় না, পাহাড়ী লোকেরাই যাওয়া-আসা করে। আমার কেমন রোক হল, ঐ পথেই যাব। যাব তো যাবই। সেই পরিশ্রমে শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কনকনে শীত যে, গায়ে যেন ছুঁচ ফোটে।…আমিও কৌপীন মাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলুম; তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় যেন জড় হয়ে গিয়েছিলুম।…তিন-চারটা সাদা পায়রা দেখেছিলুম; তারা গুহায় থাকে কি নিকটবর্তী পাহাড়ে থাকে তা বুঝতে পারলুম না।" ('বাণী ও রচনা', ৯।৮৯-৯০)।

তারপর ক্ষীরভবানীর কথা উঠিল। স্বামীজী সেখানে দৈববাণী শুনিয়া-

ছিলেন। শিষ্য স্বামীজীর পূর্বকার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি তো বলিতেন—এই সকল দৈববাণী আমাদের ভিতরের ভাবের বাহ্য প্রতিধ্বনি মাত্র। স্বামীজী ইহার উত্তরে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা ভেতরেরই হোক, আর বাইরেরই হোক, তুই যদি নিজের কানে আমার মতো ঐরূপ অশরীরী কথা শুনিস, তা হ'লে কি মিথ্যা বলতে পারিস? দৈববাণী সত্য সত্যই শোনা যায়—ঠিক যেমন আমাদের এই কথাবার্তা হচ্ছে, তেমনি।" (ঐ, ৯।৯১)।

স্বামীজী বেলুড়ে ফিরিয়া কিছুদিনেরই মধ্যে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে ব্রহ্মচারীদিগকে শিক্ষাদান, সমাগত ভক্তদের সহিত আলাপ ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে নবসংগৃহীত ভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাগৃহ, শয়নাগার, রন্ধনশালা ও সাধুদের বাসস্থানাদি নির্মিত হইতেছিল; বন্ধুর ভূমিও সমতল হইতেছিল। স্বামীজীর কাশ্মীর-বাসকালে কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়া—তখন বৎসরের শেষের দিকে—মঠ-বাটী-নির্মাণ হইয়া গিয়াছিল, সামান্য একটু-আধটু যাহা বাকি ছিল, স্বামীজীর অভিমতানুযায়ী তাহা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শেষ করিতেছিলেন।[১] ('বাণী ও রচনা', ৯।১৬৬)। স্বামীজী প্রায়ই নূতন জমিতে বেড়াইতে যাইতেন। স্থির হইয়াছিল, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ১২ই নভেম্বর মঠের নূতন জমিতে শুভ পদার্পণ করিবেন। নৌকা হইতে প্রথমে তিনি নীলাম্বরবাবুর বাগানে নামিলেন, তাঁহার সঙ্গে ছিল তাঁহার নিত্য-পূজিত ঠাকুরের প্রতিকৃতিখানি। ঠাকুরঘর দর্শনান্তে মঠের সাধুরা তাঁহাকে নূতন জমিতে লইয়া গেলে তিনি নিজ শ্রীহস্তে পূজাস্থান পরিষ্কার করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিলেন। তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনকালে পূজ্যপাদ স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দও কলিকাতায় চলিলেন—তাঁহাদের উদ্দেশ্য, পরদিবস নিবেদিতার বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন।

১। "এই সালে এপ্রিল মাস হইতে মঠের গৃহাদি নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নামক ঠাকুরের একজন ভক্ত ও ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইনি পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন) এই সকল কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৭৯৫ পৃঃ)।

পুরাতন মঠবাড়ীর বর্ণনা আমরা পূর্বে এক পাদটীকায় দিয়াছি। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ১৪।৭।৯৮ তারিখের দিনলিপিতে আছে: "রায়বাহাদুর আসিয়া বাড়ীটি পরীক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন, বাড়ীর উভয় পার্শ্বেই দোতলা হইতে পারে।"

স্বীয় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে নিবেদিতা উত্তর ভারত ভ্রমণান্তে ১লা নভেম্বর কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাকে রাখার সর্বোত্তম সম্ভাব্য স্থান হইতেছে, শ্রীশ্রীমায়ের ভাড়া বাড়ী। নিবেদিতাকে রাখার সমস্যার সম্মুখীন হইয়া স্বামীজী যখন শ্রীমার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তিনি উহা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব নিবেদিতা যখন বলরামবাবুর গৃহে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন পুর্বসিদ্ধান্তানুযায়ী তিনি তাঁহাকে শ্রীমার ১০।২নং বোসপাড়া লেনের ভাড়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলেন; নিবেদিতা অতঃপর সেখানেই থাকিয়া গেলেন। ঐ বাড়ীর প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে দুইখানি গৃহ ছিল—একটিতে অসুস্থ অবস্থায় স্বামী যোগানন্দ বাস করিতেন, অপরটিতে থাকিতেন নিবেদিতা। নিবেদিতা সেখানে আট-দশ দিন থাকিয়া স্বীয় ভাবী কর্মকেন্দ্রের জন্য উহারই নিকটবর্তী ১৬ নম্বর বাড়ীটি ভাড়া লইলেন। নূতন কার্যারম্ভের পুর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সভা হইল; উহাতে সভানেত্রী ছিলেন নিবেদিতা। সভাটি বলরামবাবুর বাড়ীতে, উহার সম্মুখবর্তী দ্বিতলের বড় হলঘরে হইয়াছিল। 'উদ্বোধনে' (৪২ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২৫৯ পৃঃ) প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে জানা যায়:

"…নিবেদিতার সেই প্রথম উদ্যম। বাগবাজার পল্লীতে বালিকা-বিদ্যালয় খুলবেন সঙ্কল্প। একদিন বলরামবাবুর বাড়ীতে সব গৃহস্থ ভক্তদের একটি সভা গোছের ঘরোয়া জলসা হলঘরে হলো। যাতে গৃহস্থেরা মেয়ে দেন ঐ স্কুলে—এই আবেদন। সকলে বসে আছেন, এমন সময় অতর্কিতভাবে স্বামীজী সবার পেছনে আসন গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। মাস্টার মহাশয়, সুরেশ দত্ত, হরমোহনবাবু প্রভৃতি ছিলেন। স্বামীজী কয়েক-জনকে হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলে গুঁতো দিচ্ছেন আর বলছেন, 'ওঠ, ওঠ! ওঠ না! শুধু মেয়ের বাপ হলেই তো হবে না। জাতীয়ভাবে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাতে সহযোগিতা তোদের সবাইকে করতে হবে। উঠে বল্, আবেদনের প্রত্যুত্তর দে। বল, হাঁ আমরা রাজী আছি; আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দেব।' কেউ ওরূপ বলতে সাহস করছিলেন না। শেষে স্বামীজী হরমোহনবাবুকে জিদ করে চাপা গলায় বললেন, তোকে দিতেই হবে। তাঁর হয়ে স্বামীজী নিজে তখন বললেন, 'Well Miss Noble, this

gentleman offers his girl to you.'[২] নিবেদিতা প্রথমে দেখতে পাননি যে, ভিড়ের মধ্যে স্বয়ং স্বামীজী আছেন। তাঁকে দর্শন করে ও তাঁর উৎসাহবাণী শুনে নিবেদিতা খুব বেশী রকমের খুশী হলেন, হাততালি দিতে লাগলেন, এবং শেষে আনন্দে বিভোর হয়ে নাচতে লাগলেন—ঠিক যেন একটি ছোট বালিকা!"

পরদিন ৺কালীপূজার শুভতিথি ১৩ই নভেম্বর, রবিবারে শ্রীমা নিবেদিতার বাটীতে পুজা করিলেন ও প্রাণ খুলিয়া ভাবী বিদ্যালয়ের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। ঐ দিনও স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সহিত স্বামীজী ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি তখনও বলরামবাবুর বাড়ীতেই ছিলেন। তার পরদিন সোমবারে যখন পাড়ার কয়েকটি ছোট ছোট বালিকাকে লইয়া নিবেদিতার বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইল, তখনও স্বামীজী উক্ত গুরুভ্রাতাদের সহিত আগমনপূর্বক নিবেদিতার উৎসাহবর্ধন করিয়াছিলেন।

বেলুড়ে ফিরিয়া স্বামীজীর শরীর তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিত বালিকা-বিদ্যালয় আরম্ভ হইয়াছে; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্থায়ী মঠ-স্থাপনের কার্য সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে; গৃহ নির্মাণাদির জন্য উপযুক্ত টাকা শ্রীযুক্তা ওলি বুল দিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, ঐ সকল কার্য সম্পাদনের পরও মঠের ব্যয়ভার পরিচালনার জন্য কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে—ইত্যাদি দেখিয়া স্বামীজীর মনও তখন বেশ প্রফুল্ল আছে। তিনি নূতন জমিতে বেড়াইতে গিয়া আনন্দে ভরপুর হইতেন ও ভবিষ্যতে ঐ স্থান কত সৎকার্যের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিবে ইত্যাদি কথা ভাবিতেন ও অপরকে বলিতেন। একদিন এইভাবেই স্বীয় শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে আসিলেন। বাড়ীগুলি তখনও যদিও সম্পূর্ণ বাসোপযোগী হয় নাই; তবু সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া সমতল করা হইয়াছে। স্বামীজীর হস্তে একটি দীর্ঘ যষ্টি, গায়ে গেরুয়া রঙের ফ্লানেলের আলখাল্লা, মস্তক অনাবৃত। শিষ্যের সহিত গল্প করিতে করিতে তিনি উত্তরের মঠবাড়ী হইতে দক্ষিণের ফটক পর্যন্ত বার কয়েক পদচারণা করিয়া অবশেষে দক্ষিণের বিল্ববৃক্ষের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঐ তরুমূল তখন বাঁধানো হইতেছে। দাঁড়াইয়া তিনি গান ধরিলেন:

২। "দেখুন, মিস নোবল, এই ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে আপনার হাতে দেবেন।"

গিরি গণেশ আমার শুভকারী।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী!

গাহিতে গাহিতে শিষ্যকে বলিলেন, "হেথা আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী! বুঝলি? কালে এখানে কত সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হবে।" বলিতে বলিতে বিল্বতরুমূলে উপবেশনপূর্বক বলিলেন, "বিল্বতরুমূল বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে বসে ধ্যান-ধারণা করলে শীঘ্র উদ্দীপনা হয়—ঠাকুর একথা বলতেন।"

ইহারও বহু পূর্বে—মঠের নূতন জমি যখন মাত্র ক্রয় করা হইয়াছে এবং উহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তখন শিষ্যসহ স্বামীজী সেখানে একদিন বেড়াইতে গিয়া, জমির উত্তরাংশে যে বাড়ী ছিল উহার পূর্বদিকের বারাণ্ডায় পৌঁছিয়া পায়চারি করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হবে। সাধন-ভজন ও জ্ঞানচর্চায় এই মঠ প্রধান হবে—এই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে, মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে উচ্চাদর্শ সকল বেরোবে। এই মঠভুক্ত সাধুদের ইঙ্গিতে কালে দিগদিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে। যথার্থ ধর্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে—মনে এরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।" ('বাণী ও রচনা', ৯।১২৪-২৫)

তারপর তিনি ভাবী মঠ হইতে তিন প্রকার দানব্যবস্থার কথা বলিলেন—অন্নদান, বিদ্যাদান, জ্ঞানদান। তিনি আরও বলিলেন, শিক্ষাবিষয়ে প্রাচীন গুরুকুল-প্রথার পুনরুজ্জীবন আবশ্যক। একটি অন্নসত্রে নারায়ণজ্ঞানে দীনদুঃখীদের সেবা করিয়া ব্রহ্মচারীরা আত্মজ্ঞানলাভের যোগ্যতা অর্জন করিবে ও সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হইবে। "ঈশ্বর করেন তো এ মঠকে মহাসমন্বয়ক্ষেত্র করে তুলতে হবে। ঠাকুর আমাদের সর্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয়মূর্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটি এখানে জাগিয়ে রাখলে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্বমতের সর্বপথের আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ—সকলে যাতে এখানে এসে আপন আপন আদর্শ দেখতে পায়, তা করতে হবে।" মঠের ঐ জমি সংগৃহীত হওয়ার পরে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সেখানে স্থাপন করিয়া স্বহস্তে পূজা করিয়াছিলেন। তাহারই উল্লেখ করিয়া

বলিলেন, "সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম, তখন মনে হ'ল যেন এখান হতে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে ফেলেছে!··· শঙ্কর এ অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন, আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব ব'লে এসেছি। ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে, পর্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে।" (ঐ, ১২৮-২৯)।[৩]

স্বামীজী যখন স্বীয় সঙ্কল্পানুযায়ী বনের বেদান্তকে শহরের কর্মকোলাহল-মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট এবং ঐ বিষয়ে সাফল্যলাভের পথও ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতেছে, এমন সময়ে সমজাতীয় একটি প্রস্তাব আসিল শিল্পপতি জামশেদজি এন. টাটার নিকট হইতে। প্রস্তাববাহী পত্রখানি এই :

এস্‌প্ল্যানেড, হাউস
বোম্বে
২৩শে নভেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ,

আমার বিশ্বাস জাপান হইতে চিকাগো যাইবার পথে সহযাত্রীরূপে আমাকে আপনার মনে আছে। ভারতে সন্ন্যাসধর্মের প্রসার ও উহাকে নষ্ট না করিয়া কার্যকর পথে পরিচালিত করিবার কর্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত এখনও আমার বেশ স্মরণ আছে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার সম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার এই ভাবগুলি মনে স্বতই উদিত হইতেছে। আপনি নিশ্চয়ই এই সম্বন্ধে শুনিয়াছেন বা পড়িয়া থাকিবেন। আমার মনে হয়, এই সন্ন্যাসধর্মকে অধিকতর সুষ্ঠুরূপে কাজে লাগানো যাইতে পারে, যদি ত্যাগব্রতীদের জন্য এরূপ মঠ অথবা

৩। 'বাণী ও রচনার' ৯।১১০ পৃষ্ঠায় ৯ই ডিসেম্বরের (১৮৯৮) বিবরণের পরে ১২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত দিনের বিবরণ থাকায় স্বভাবতঃ মনে হইবে ইহা পরবর্তী ঘটনা। কিন্তু হয়তো তাহা নহে। ৯ই ডিসেম্বর (১৮৯৮) মঠের নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য দিনের বিবরণের গোড়াতেই আছে, "বর্তমান মঠের জমিও অল্পদিন হইল খরিদ করা হইয়াছে।···মঠের জমিটি যিনি খরিদ করাইয়া দেন, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত আসিয়া বিদায় লইলেন।" অতএব উদ্ধৃতিমধ্যে যে "ঠাকুর স্থাপন"-এর উল্লেখ আছে, উহা সম্ভবতঃ জমি দখল লওয়ার সময়ের কথা, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বরের ব্যাপার নহে।

আবাসগৃহ নির্মিত হয়, যেখানে তাঁহারা সাধারণ চরিত্রনীতি মানিয়া চলিবেন এবং জড়বিজ্ঞানের চর্চায় ও লোককল্যাণের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। আমার মত এই যে, এরূপ সন্ন্যাসধর্মের অনুকূলে যদি কোন সুযোগ্য নেতা আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা আমাদের মাতৃভূমির ত্যাগধর্ম, বিজ্ঞান ও সুখ্যাতির প্রভূত সহায়তা হয়। আমার বিবেচনায় বিবেকানন্দই এই আন্দোলন-পরিচালনের একমাত্র যোগ্যতম অধিনায়ক। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগুলিকে জাতীয় জীবনে ফলপ্রসূ করিবার মহান ব্রতে আপনি নিযুক্ত হইবেন কি ? এ বিষয়ে দেশবাসিগণকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য একখানা উদ্দীপনা-পূর্ণ পুস্তিকা-প্রচারের দ্বারা কার্য আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ। পুস্তিকাপ্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার আমি সানন্দে বহন করিব। আমার শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি—

ভবদীয় একান্ত বিশ্বস্ত

জামশেদজি এন. টাটা

জামশেদজি স্বামীজীর একটা দিক দেখিয়াছিলেন—ত্যাগভিত্তিক কার্যোদ্যম ; ধর্মের দিকটা তিনি দেখেন নাই। স্বামীজী এই পত্রের ঠিক কি উত্তর দিয়াছিলেন জানা নাই। তবে অস্বীকার করিয়াছিলেন নিশ্চয় ; কারণ ইহাতে তাঁহার আদর্শ পূর্ণ প্রতিফলিত হয় নাই। এই জাতীয় আরও প্রস্তাব অন্যসূত্রে তিনি পাইয়া থাকিবেন ; কারণ তাঁহার ন্যায় শক্তিমান বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তির সাহায্যে নিজ নিজ পরিকল্পনা সফল করিতে অনেকেই উদ্যত ছিলেন। এই সব এখন অজ্ঞাত থাকিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে, গুরুগতপ্রাণ স্বামীজী স্বাধীনভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক নবকার্যধারা-রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে রূপপ্রদানের জন্য কেন্দ্ররূপে পরিকল্পিত বেলুড় মঠের বাড়ীঘর যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তখন সকলের সম্মতিক্রমে স্থির হইল, ৯ই ডিসেম্বর (১৮৯৮) আনুষ্ঠানিকভাবে মঠারম্ভ হইবে। প্রাতঃকালে স্বামীজী গঙ্গাস্নান সারিয়া ভাড়া-বাড়ীতে অবস্থিত ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। "অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল বিল্বপত্র ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব দর্শন !···স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ ঠাকুরঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।" ('বাণী ও রচনা', ৯।১১০-১১)।

অতঃপর নূতন মঠাভিমুখে উত্তর দিকে একটি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা আরম্ভ

হইল। পুরোভাগে চলিলেন স্বয়ং স্বামীজী—দক্ষিণ-স্কন্ধোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের পূতদেহাবশেষপূর্ণ তাম্রপাত্র বহন করিয়া। অন্যান্য সন্ন্যাসিবৃন্দের সহিত শিষ্য শরচ্চন্দ্রও পশ্চাতে চলিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি ও জয়ধ্বনি রবে পার্শ্ববর্তী জাহ্নবী যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব, তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি!' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহু কাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।" (ঐ)। শিষ্য স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলেন যে, কাশীপুরে ঠাকুরের অসুখের সময় ব্যয়াধিক্যের কথা তুলিয়া অনেক ভক্ত যখন যুবক-সেবকদের প্রতি বিরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন, তখন ঐ ভক্তদের উপর নির্ভর না করিতে উপদেশ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীকে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

এইরূপ প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে সকলে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজীর স্কন্ধ হইতে 'আত্মারামে'র কৌটাটিকে নামাইয়া ভূম্যোপরি আস্তীর্ণ আসনে স্থাপনপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন; অপর সকলেও প্রণাম করিলেন। অনন্তর স্বামীজী পূজায় বসিলেন। পূজান্তে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে হোম করিলেন। সর্বশেষে সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সাহায্যে স্বহস্তে প্রস্তুত পায়সান্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিবেদন করিলেন। শরৎবাবু লিখিয়াছেন, "বোধ হয়, ঐদিন ঐস্থানে তিনি কয়েকটি গৃহস্থকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন।" পূজান্তে স্বামীজী সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে একে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়কেন্দ্র করে রাখেন।" সকলেই করজোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন।

অনুষ্ঠানশেষে স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কারও আর অধিকার নেই; কারণ আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছি। অতএব তুইই মাথায় করে ঠাকুরের এই কৌটা তুলে মঠে নিয়ে চল।" কৌটা স্পর্শ করিতে শিষ্যের সঙ্কোচ হইতেছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ভয় নেই, মাথায় কর; আমার আজ্ঞা।" অগত্যা শরৎবাবু সন্তর্পণে ও ভক্তিভরে উহা মাথায় তুলিয়া লইলেন, আর মনে করিলেন,

'আত্মারামের কৌটা'র স্পর্শে আজ তাঁহার জীবন ধন্য হইল। ফিরিবার পথে খালের উপর একটা ছোট সাঁকো পার হইতে হয়—তালগাছের গুঁড়ি ফেলিয়া প্রস্তুত। স্বামীজী ঐখানে আসিয়া শিষ্যকে হুঁশিয়ার করিয়া দিলেন, "দেখিস, এবার খুব সাবধান; খুব সতর্কে যাবি।" নূতন মঠের ঠাকুরঘর তখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায় সাধুরা সেই আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা-দিবস হইতেই সেখানে বাস করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের অধিকাংশই বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত নীলাম্বরবাবুর বাগানে কাটাইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে ঐ ভাড়াবাড়ী ছাড়িয়া নূতন মঠে চলিয়া আসেন। মধ্যবর্তী এই কয়দিন কয়েকজন মাত্র সাধু নূতন বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন।

অগ্রহায়ণের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রারম্ভে[৪] দেখা গেল, স্বামীজী সংস্কৃত-চর্চায় খুব মন দিয়াছেন। "আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় তিনি এই কালেই রচনা করেন। অতঃপর আর একদিন স্বামীজী "ওঁ হ্রীঁ ঋতং" ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তবটি রচনা করিয়া স্বশিষ্য শরচ্চন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখিস, এতে কিছু ছন্দঃপতনাদি দোষ আছে কিনা।" শিষ্য উহার নকল করিয়া লইলেন। সেদিন স্বামীজীর মুখে যেন সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন; তিনি শিষ্যের সহিত এমন সুললিত বাক্যবিন্যাসসহ সংস্কৃত ভাষায় দুই ঘণ্টা যাবৎ আলাপ করিয়াছিলেন যে, সুপণ্ডিতের পক্ষেও ঐরূপ করা কদাচিৎ সম্ভব হয়। স্তবটি নকল করা হইয়া গেলে তিনি শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ, ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্খলন হয়, তাই তোদের বলি দেখে-শুনে দিতে।" শিষ্য অমনি বলিলেন, "মশায়, ও-সব স্খলন নয়—উহা আর্ষপ্রয়োগ।" স্বামীজী তথাপি কহিলেন, "তুই তো বললি, কিন্তু লোকে তা বুঝবে কেন?" সুন্দর ঘটনাটি আর সুন্দরতর এই উত্তর-প্রত্যুত্তর। একদিকে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ—শিষ্যের দ্বারা ভাষা সংশোধন করাইতে উদ্যত, অন্যদিকে ভক্তিপরায়ণ শিষ্য—গুরুর সর্বপ্রকার কথা নির্বিচারে মানিয়া লইতে প্রস্তুত!

স্বামীজী ঐ প্রসঙ্গে আরও কথা তুলিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি যদিও

৪। 'বাণী ও রচনা'য় (৯।৯৩) উল্লিখিত স্থলের উপরে লিখিত আছে, "কাল—নভেম্বর, ১৮৯৮"। কিন্তু প্রবন্ধ মধ্যে আছে—"অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ" (অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রথম ভাগ)।

স্বজাতির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন প্রচেষ্টার আয়োজন করিতেছেন, তথাপি জনসাধারণ ঐসব নির্বিবাদে গ্রহণ করিতেছে না। ভাষার কথা তুলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের প্রথা তুলিয়া দিয়া বিশেষণাদির সাহায্যে উহাদের কার্য সম্পাদনের পক্ষপাতী; কারণ অধিক ক্রিয়াপদের ব্যবহারের ফলে বাক্যমধ্যে বিরাম ঘটে এবং বাক্য জোরদার হয় না। "ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। এই দেখ না—আগেকার কালের সন্ন্যাসীদের চালচলন ভেঙ্গে দিয়ে এখন কেমন এক নূতন ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদও করছে। কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে কি?—না আমরাই তাতে ভয় পাচ্ছি?...দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু পরিবর্তন করে নিতে হয়।...আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে—যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক বাঁচতে পারবে, নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এ দেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।" ('বাণী ও রচনা', ৯।৯৩-৯৪)।

কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া স্বামীজী যদিও এইরূপ নানা কাজে ব্যাপৃত ছিলেন—যদিও তিনি মঠের কার্যাদির তত্ত্বাবধান করিতেন, আগন্তুক ভক্ত ও ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ করিতেন এবং কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন, তথাপি তাঁহার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। তাঁহার প্রত্যাগমনের দিনকয়েক পরেই ২৭শে অক্টোবর তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর. এল. দত্তের নিকট তাঁহার বুক পরীক্ষা করানো হয়, কবিরাজদেরও সাহায্য লওয়া হয়।[৫] উক্ত ডাক্তারবাবু ও কবিরাজগণ সকলেই বলিয়া দেন, সাবধানে থাকা উচিত, নতুবা রোগ প্রবলাকার ধারণ করিতে পারে। সম্ভবতঃ এই কালে বা ইহার কিছুকাল পরে ডাক্তারের

৫। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর দিনলিপিতে আছে: "October 18, 1898 : Swamiji came from Cashmir this morning. Saw the Math land. October 28, 1898 : (I) Gone to Calcutta to settle Dr. R. L. Dutt to see Swamiji. October 29, 1898 : Paid to Dr. R. L. Dutt Rs. 40/-. Paid for medicines and other expenses Rs. 10/-. October 31, 1898 : Swamiji gone to Calcutta for a change."

উপদেশানুসারে তাঁহার নৌকাভ্রমণের ব্যবস্থা হয়। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' ঐরূপ ভ্রমণের একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তখনও মঠ-বাটী সম্পূর্ণ নির্মিত হয় নাই —কিছু বাকি আছে। মঠে এই সময়ে স্বামীজী কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেন— যথা, বালব্রহ্মচারীরা গৃহস্থ হইতে দূরে থাকিবে, পৃথক্ আহার ও বিশ্রাম করিবে, আগন্তুকগণ তাহাদের বিছানায় বসিতে পারিবেন না—ইত্যাদি। শিষ্য ঐ সকলের কারণ জানিতে চাহিলে স্বামীজী সব বুঝাইয়া দিলেন। বিকালে তিনি বেড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিলেন এবং শিষ্যসহ মঠের নূতন জমিতে আসিয়া প্রধান বাড়ীটির সম্মুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন। অচিরে বজরা আসিয়া পড়িল। নড়ালের রায় বাবুদের বজরাখানি কিছুদিনের জন্য মঠের সামনেই বাঁধা থাকিত; স্বামীজী ইচ্ছামত উহাতে উঠিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতেন। আলোচ্য দিনে তিনি স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্দ ও শিষ্য শরৎবাবুর সহিত নৌকায় উঠিয়া ছাতে বসিলেন। নৌকা উত্তরাভিমুখে চলিল। গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি নৌকার তলদেশে প্রতিহত হইয়া কলকল শব্দ করিতে লাগিল। তখন মৃদুমন্দ পবন প্রবাহিত হইতেছিল, সূর্যাস্তের তখনও অর্ধঘণ্টা বাকি। নৌকা দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া ক্রমে পেনেটিতে ৺গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাটীর ঘাটে আসিয়া থামিল। এই বাগান এক সময়ে মঠের জন্য ক্রয় করিবার কথা হইয়াছিল। স্বামীজী নামিয়া একটু বেড়াইলেন এবং বলিলেন যে, এখানে মঠ না হওয়ায় ভালই হইয়াছে; কারণ ভক্তদের যাতায়াতে কষ্ট হইত। সেখান হইতে নৌকা মঠে ফিরিয়া আসিল।

এই সময়ে স্বামীজীর চক্ষে নিদ্রা ছিল না। রাত্রির অধিকাংশ সময়ই জাগিয়া কাটাইতে হইত। শরীরের অবসাদ কোন কালেই কাটিত না। অথচ আগন্তুক কাহাকেও ফিরাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। বিশ্রামের অভাবসত্ত্বেও জিজ্ঞাসুর আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। ইহাতে স্নানাহারাদির কোন নিয়ম প্রতিপালিত হইত না, এবং তাহার ফলে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা ঘটিত। তাই গুরুভ্রাতারা, সেবকগণ ও বন্ধুবর্গ আপত্তি জানাইতেন; কিন্তু যিনি পরার্থে জীবনধারণ করেন, তাঁহার পক্ষে শুধু স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে কল্যাণার্থীকে ফিরাইয়া দেওয়া চলে না; তিনি ঐ সকল আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া উত্তর দিতেন, "এরা আমায় দেখবার জন্য, কি দুটো কথা শোনবার জন্য কত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছে; আর

আমি শরীর খারাপ হবে ভেবে এখানে বসে তাদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারব না ?”

তখন স্বামীজীর খুবই ইচ্ছা হইত যে, একটু নিদ্রা হউক, শরীরের ক্লান্তি একটু বিদূরিত হউক, মস্তিষ্ক একটু বিশ্রাম লাভ করুক। বলরামবাবুর বাড়ীতে তিনি একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর বিশ্রাম করিতেছিলেন এবং শিষ্য শরৎবাবু পদসেবা করিতেছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে স্বামীজীর মনে পড়িল, সেদিন সূর্যগ্রহণ। বিশ্রামের প্রয়োজনবোধকালে, এমন কি অসুস্থতার মধ্যেও তাঁহার কথাবার্তায় সর্বদাই একটা কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষিত হইত। আজও স্বাভাবিক কৌতুকভরে সহাস্যে বলিলেন, “গেরণ লেগেছে, এইবার একটু ঘুমুই।” কিন্তু ঘুম কি সহজে আসে ? খানিক পরে যখন চারিদিক বেশ অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন বলিলেন, “এই ঠিক গেরণ”— বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন, ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই ভাল ঘুম হইল না। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বালকের ন্যায় শিষ্যকে বলিলেন, “লোকে বলে, গেরণের সময় যা করা যায়, তার শতগুণ ফল হয়। ভাবলুম, যদি এই সময় একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, তবে এর পর হয়তো ভাল ঘুম হবে ; কিন্তু তা হবার নয়। মিনিট পনেরো ঘুমিয়েছি বটে ; কিন্তু মা আমার কপালে সুনিদ্রা লেখেননি।”

চিকিৎসাব্যপদেশে বা অন্য নানা কারণে স্বামীজীকে তখন প্রায়ই কলিকাতায় যাইতে হইত। সেখানে প্রয়োজনমত তিনি অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ন্যায় বলরামবাবুর গৃহে রাত্রিবাস করিতেন। ঐ বাটীতে থাকারই কোন এক সময়ে স্বামী যোগানন্দ, শরৎবাবু ও ভগিনী নিবেদিতার সহিত স্বামীজী আলিপুরের পশুশালা দেখিয়াছিলেন। স্বামী যোগানন্দ ও শরৎবাবুকে ভিন্নভাবে সেখানে চলিয়া যাইতে বলিয়া তিনি ভগিনী নিবেদিতার সহিত যথাস্থানে উপস্থিত হইলে উক্ত বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায়বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয় স্বামীজী প্রভৃতিকে যথোচিত সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন ও প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া বাগানের দ্রষ্টব্য জানোয়ারদের দেখাইলেন। স্বামীজী আনন্দসহকারে সব কিছু দেখিলেন, মাঝে মাঝে হাসিঠাট্টাও করিতে লাগিলেন। অজগর সর্প একই স্থানে কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকার অভ্যাস হইতে কি করিয়া ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে কচ্ছপে পরিণত হয়, তাহা বর্ণনা করিয়া তিনি শরৎবাবুকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, “তোরা না কচ্ছপ

খাস ? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণামে কচ্ছপ হয়েছে ; তাহ'লে তোরা সাপও খাস !" বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যাহাই হউক, কচ্ছপ খাইলে সাপ খাওয়া হয়, এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে শরৎবাবু প্রস্তুত ছিলেন না ; কাজেই এই বিষয় লইয়া বেশ হাসাহাসি চলিতে লাগিল। যখন সিংহদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন রামব্রহ্মবাবুর আদেশে ঐ পশুদিগকে তাহাদের আহার্য মাংস দেওয়া হইলে উহাদের গর্জন শুনিয়া ও আহার দেখিয়া স্বামীজী বেশ আমোদিত হইলেন। অতঃপর সকলে বানরশালায় প্রবেশ করিলেন। বানর দেখিলেই স্বামীজী হাসিয়া বলিতেন, "ওহে, তোমরা এ শরীরে কেন প্রবেশ করলে ? আর জন্মে কি কর্ম করেছিলে, যার ফলে এ দেহ ধারণ করতে হয়েছে ?"

রামব্রহ্মবাবু কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন। পশু-দর্শনান্তে সকলে একই টেবিলে চা-পান ও জলযোগের জন্য বসিলেন। ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট দ্রব্যগ্রহণে শরৎবাবুর আপত্তি আছে জানিয়াও স্বামীজী বার বার বলিয়া নিবেদিতার স্পৃষ্ট চা ও মিষ্টান্ন তাঁহাকে খাওয়াইলেন এবং নিজে গ্লাস হইতে জল পান করিয়া উহার অবশিষ্টাংশ শিষ্যকে পান করাইলেন। স্বামীজী অল্প মাত্র চা পান করিলেন। নিবেদিতাও চা-পান করিলেন।

ইহার পর ডারুইনের ক্রমবিকাশ-বাদ সম্বন্ধে রামব্রহ্মবাবু স্বামীজীর অভিমত জানিতে চাহিলে স্বামীজী বলিলেন যে, ডারুইনের মত সঙ্গত হইলেও, উহাকে তিনি ক্রমবিকাশের কারণবিষয়ক চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহেন। বরং সাংখ্যদর্শনে উহার যে আলোচনা হইয়াছে, উহা সমীচীনতর মনে হয়। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে নিম্নজাতির উর্ধ্বজাতিতে উদ্বর্তনের কারণরূপে জীবন-সংগ্রাম (স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স) ও প্রাকৃতিক নির্বাচন (ন্যাচারেল সিলেক্সন) স্বীকৃত হয়। পতঞ্জলির মতে একজাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণতি ঘটে "প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা" (জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ—পাতঞ্জল যোগসূত্র, ৪।২)। প্রতিবন্ধক বা বাধার সঙ্গে দিবারাত্র লড়াই করিয়া যে উহা সাধিত হয়, তাহা নহে ; বরং লড়াই ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। হাজার জীবকে ধ্বংস করিয়া যদি একটি জীবের উন্নতি হয়, তবে সে ক্রমবিকাশের দ্বারা জগতের কোন উন্নতিই হয় না। আর যদি বা স্বীকার করা হয় যে, জাগতিক ক্ষেত্রে এই উপায়েও উন্নতি হয়, তথাপি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ইহা উন্নতির পরিপন্থী। "আমাদের দেশীয়

দার্শনিকগণের অভিপ্রায়—জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির ও বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্বতোভাবে সরে দাঁড়ালে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরে যাই হোক, উচ্চস্তরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায়, সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রতিবন্ধকগুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য না বলে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। হাজার পাপীর প্রাণ-সংহার করে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্ত্যদের—পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতি লাভ হয়—এই মতটা কতদূর ভীষণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে!" রামব্রহ্মবাবু স্বামীজীর ব্যাখ্যা শুনিয়া ও উহার অভিনবত্ব লক্ষ্য করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং কথায়ও উহা প্রকাশ করিলেন।

বলরামবাবুর বাটীতে ফিরিয়া স্বামীজী প্রায় অর্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিলেন। স্বীয় কক্ষ হইতে তাঁহার নির্গমনের পর শরৎবাবু পুনর্বার ডারুইনের ক্রমবিকাশ-বাদের কথা তুলিলে, তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, ইতর-প্রাণিজগতে ডারুইনের মত সত্যসত্যই অনেকটা খাটে; কিন্তু মনুষ্যজগতে জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হওয়ায় ঐ নিয়ম উলটাইয়া যায়। "যাঁদের আমরা বাস্তবিক মহাপুরুষ বা আদর্শ বলে জানি, তাঁদের বাহ্য সংগ্রাম একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না।... যে পরের জন্য যত ত্যাগ করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়; আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান জানোয়ার হয়।... মানুষের সংগ্রাম হচ্ছে মনে...মনের ওপর আধিপত্য লাভের জন্য বা সত্ত্ব-(গুণ)--বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই সংগ্রাম চলেছে।" শিষ্য যেমনি আপত্তি তুলিলেন, "তাহা হইলে আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্য এত করিয়া বলেন কেন?"—স্বামীজী অমনি গর্জিয়া উঠিয়া উত্তর দিলেন, "তোরা কি আবার মানুষ?...নিজেদের দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহার স্থিরভাবে আলোচনা ক'রে দেখ দেখি, তোরা মানব এবং মানবেতর স্তরের মধ্যবর্তী জীববিশেষ কিনা! দেহটাকে

আগে গড়ে তোল। তবে তো মনের উপর ক্রমে আধিপত্যলাভ হবে।" "কিন্তু সবল শরীরে অনেক জড়বুদ্ধিও তো দেখা যায়?" "তাদের যদি তুই যত্ন ক'রে ভাল ভাব একবার দিতে পারিস, তা হ'লে তারা যত শীগগীর তা কাজে পরিণত করতে পারবে, হীনবীর্য লোক তত শীগগীর পারবে না। দেখছিস না, ক্ষীণ শরীরে কাম-ক্রোধের বেগ ধারণ হয় না। শুঁটকো লোকগুলো শীগগীর রেগে যায়—শীগগীর কামমোহিত হয়।" "কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়?" "তা নেই কে বলছে? মনের উপর একবার সংযম হয়ে গেলে, দেহ সবল থাক বা শুকিয়েই যাক, তাতে আর কিছু এসে যায় না।"

স্বামীজীর স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না, বরং কলিকাতার কার্য ব্যস্ততায় উহাতে প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে ইত্যাদি ভাবিয়া চিকিৎসকগণ ও বন্ধুরা স্থির করিলেন যে, তাঁহার অন্যত্র বায়ুপরিবর্তনের জন্য যাওয়া আবশ্যক। তদনুসারে তিনি ১৯শে ডিসেম্বর ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথের সহিত বৈদ্যনাথ-ধাম (দেওঘর) যাত্রা করিলেন এবং সেখানে ঐ মাসের শেষ কয়টি দিন ও জানুয়ারি মাসটা কাটাইয়া ফেব্রুয়ারির প্রারম্ভে আবার কলিকাতায় ফিরিলেন। দেওঘরে তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার হাঁপানি এত প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, মনে হইত যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি তখন অধিকাংশ সময় নির্জনে কাটাইতেন, অথবা একটু ভাল মনে করিলে সামান্য পড়াশুনা করিতেন, চিঠিপত্র লিখিতেন কিংবা একটু বেড়াইতে বাহির হইতেন। সময়ে সময়ে এত শ্বাসকষ্ট হইত যে, মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিত, সর্বাঙ্গে আক্ষেপ হইত এবং উপস্থিত সকলে মনে করিতেন, বুঝি বা প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া যাইবে। স্বামীজী বলিতেন, এই সময় তিনি একটি উঁচু তাকিয়ার উপর ভর দিয়া বসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেন; ভিতর হইতে যেন ক্রমাগত নাদ উত্থিত হইত—"সোঽহং সোঽহং", আর কর্ণে যেন বাজিতে থাকিত অদ্বৈততত্ত্বের সিদ্ধান্ত—"একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

দেওঘরে একদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি দেখিলেন, রাস্তার ধারে একটি দুঃস্থ লোক পড়িয়া আছে—সে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে এবং শীতে কাঁপিতেছে, তাহার পরিধানে একখানি ধূলিধূসরিত ছিন্নবস্ত্র। এইরূপ আর্তনারায়ণের সেবার জন্য স্বামীজীর

চিত্ত স্বভাবতই অস্থির হইয়া উঠিল ; কিন্তু তিনি স্বয়ং আছেন পরের বাড়ীতে ; এরূপ রুগ্ন দরিদ্র ব্যক্তিকে গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতীত কিরূপে সেখানে লইয়া যাওয়া চলে ! অতএব তিনি মুহূর্তমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিলেন। কিন্তু মুহূর্তমাত্রই চিন্তার অবকাশ ঘটিল ; তিনি তখনই গুরুভ্রাতার সাহায্যে সে ব্যক্তিকে ধরিয়া দাঁড় করাইলেন এবং দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে স্বীয় বাসস্থানে উপস্থিত করিলেন। সেখানে একখানি ঘরে তাহাকে শোয়াইয়া অঙ্গমার্জনা করিলেন, পরিষ্কার বস্ত্র আনাইয়া পরাইয়া দিলেন ও আগুনের সেঁক দিতে লাগিলেন। এইরূপ শুশ্রূষার ফলে লোকটি আরোগ্য লাভ করিল। প্রিয়নাথবাবু ইহাতে বিরক্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং স্বামী বিবেকানন্দ শুধু বক্তৃতা দেন না, মুখে যাহা বলেন, কার্যেও তাহা করেন, তাঁহার বুদ্ধি ও হৃদয় সমভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং অতি মূর্খ, দরিদ্র ইত্যাদির মধ্যে তিনি সত্যই নারায়ণের দর্শন পাইয়া থাকেন—এই চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

দেওঘরে বসিয়াও স্বামীজী মঠের সব সংবাদ রাখিতেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শ্রীমা ২০শে ডিসেম্বর মঠদর্শনে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীপদরেণুস্পর্শে মঠভূমি পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। স্বামীজী চাহিতেন যে, মঠের সাধুরা অধ্যাত্মবিদ্যার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানাদিতেও পণ্ডিত হউন। তদনুসারে ঐ সময়ে ভগিনী নিবেদিতা সাধুদের আমন্ত্রণে মঠে আসিয়া ব্রহ্মচারীদের নিকট শারীরবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা ও কিণ্ডার-গার্ডেন-শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই সব সংবাদে স্বামীজী খুবই সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি জানুয়ারির শেষে (১৮৯৯)[৬] পুনর্বার বেলুড় মঠে গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ও শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইলেন।

৬। ইংরেজী জীবনীতে ৩রা ফেব্রুয়ারির উল্লেখ থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই, স্বামীজী বেলুড়ে বসিয়া ম্যাকলাউডকে ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে পত্র লিখিতেছেন। স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতে উল্লেখ আছে, স্বামীজী ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁহাদিগকে প্রচারের জন্য বরোদা প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতে বলেন এবং ৩১শে জানুয়ারি তাঁহাকে বলেন, সাম্রাজ্যবাদী সরকার যেভাবে অর্থ ঢালিতেছেন, তাহাতে ভারতের জনতা খৃষ্টান হইয়া যাইবে ; হিন্দুদের জাতিভেদও এইজন্য দায়ী। রামকৃষ্ণ মিশনকে ইহাদের উদ্ধারের উপায় বাহির করিতে হইবে।

মঠে ফিরিয়া তিনি নিজ স্বাস্থ্যসম্বন্ধে শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে ২রা ফেব্রুয়ারি (১৮৯৯) এক পত্রে লিখিয়াছিলেন : "বৈদ্যনাথে বায়ুপরিবর্তনে কোন ফল হয়নি। সেখানে আট দিন আট রাত্রি শ্বাসকষ্টে প্রাণ যায় যায়। মৃতকল্প অবস্থায় আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এখানে এসে বেঁচে উঠবার লড়াই শুরু করেছি। ডাঃ সরকার এখন আমার চিকিৎসা করছেন। আগের মতো হতাশ ভাব আর নেই। অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি।"

দেওঘরের অসুখের সংবাদ আমরা মহিষাদলের রাজার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্রাংশ হইতেও পাই।[৭] তিনি স্বীয় বন্ধু কাশীবাসী স্বামী শুভানন্দকে স্বামীজী সম্বন্ধে যেসব পত্র লিখিতেন, তাহার একখানিতে আছে : "১৮ই জানুয়ারি, ১৮৯৯ :·· স্বামীজীর শরীর বড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বৈদ্যনাথ হইতে তিনি অদ্য দুদিন হইল এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন, 'আমার শরীর অত্যন্ত uneasy হইয়া উঠিতেছে—শীঘ্র গুপ্তকে পাঠাও' (গুপ্ত—অর্থাৎ স্বামী সদানন্দ)। গতকল্য বোম্বে মেলে শরৎ মহারাজ ও গুপ্ত মহারাজ চলিয়া গিয়াছেন। রাখাল মহারাজ প্রভৃতি তাঁহাকে এখানে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। যদি একান্ত না আসেন পশ্চিমের কোন সিটি—(বেনারস প্রভৃতি)—যেখানে সিভিল সার্জন আছে, সেইখানে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত।"

৭। শচীনবাবুর চিঠিতে একটা মজার খবরও পাওয়া যায়। উহার সহিত স্বামীজীর জীবনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও আমরা এইজন্য উল্লেখ করিতেছি যে, উক্ত ঘটনা স্বামীজীর কার্যক্ষেত্রের স্বরূপটি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। ঐ পত্রাংশে আছে : "গরীব রামকৃষ্ণসভা is an association recently started by the গৃহী ভক্ত's (disciples) as a sister one of the Ramakrishna Mission at Baghbazar. But the Swamijis don't approve of it, they look upon it as a rival association likely to hamper the smooth working of the Ramakrishna Mission. There is a danger of a split in the camp. The সন্ন্যাসী's and গৃহী ভক্ত's were never so opposed to each other." তাঁহার ১৬ই মার্চের পত্রাংশে আছে যে, গিরীন্দ্রবাবু, হরমোহনবাবু প্রভৃতি সেবারে ঠাকুরের উৎসবে মঠে যান নাই—আলাদা উৎসব করিয়াছিলেন : "এদিকে গৃহীদের সহিত breach খুব wide হইতে চলিল।" অবশ্য শচীনবাবু এই বিচ্ছেদকে বড় করিয়া দেখিতেছিলেন—পরবর্তী ইতিহাস তাঁহার ভয়ের সত্যতা প্রমাণ করে নাই।

স্বাস্থ্য যেমনই হউক, চুপ করিয়া থাকা তাঁহার ধাতে ছিল না। ২রা ফেব্রুয়ারি পূর্বোক্ত পত্রেই আছে: "আবার কাজে লেগেছি, ঠিক নিজে করছি না, ছেলেদের পাঠিয়ে দিচ্ছি সারা ভারতে আবার একটা আলোড়ন জাগাবার জন্য।" কথাটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ইংরেজী জীবনীতে। ঐ গ্রন্থানুসারে বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিবার ঠিক পরদিনই তিনি একটি সভা ডাকিয়া সন্ন্যাসীদের বুঝাইলেন যে, অতীত যুগে ভগবান বুদ্ধের অনুগামীরা যেভাবে দূরদূরান্তরে গমনপূর্বক বুদ্ধের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণানুগামীদিগকে এযুগে ঠিক তেমনি ভারতের সর্বত্র সে বাণীর বার্তাবহরূপে দিগদিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তানুসারে তিনি সেই দিনই স্বীয় শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দকে তৎক্ষণাৎ পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে যাইতে আদেশ করিলেন। প্রথম শিষ্য বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "স্বামীজী আমি কি প্রচার করব? আমি তো কিছুই জানি না।" স্বামীজী তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তবে যা, তাই বলগে। ওটাও তো একটা মস্ত বড় কথা।" শিষ্য তবু মিনতি করিতে লাগিলেন যাহাতে তিনি তপস্যার অনুমতি পাইতে পারেন, কার্যে নামিবার পূর্বে প্রথমে জ্ঞানলাভপূর্বক আত্মমুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহাতে স্বামীজী গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুই যদি আত্মমুক্তির জন্য সাধনা করতে চাস তো তুই জাহান্নমে যাবি। পরমার্থ লাভ করতে হলে পরের মুক্তির জন্য চেষ্টা কর, আত্মমুক্তির লালসায় জলাঞ্জলি দে। ঐ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।" তারপর তিনি আরও নরম হইয়া বলিলেন, "বাবারা, কাজে লেগে যা, মনপ্রাণ দিয়ে কাজে লেগে যা! ঐ হচ্ছে কাজের কথা; ফলের দিকে দৃষ্টি দিবি না। যদি অপরের কল্যাণসাধন করতে গিয়ে নরকগামী হতে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? স্বার্থপরতা নিয়ে নিজের স্বর্গলাভ করার চেয়ে এ ঢের ভাল।" পরে তিনি ঐ শিষ্যদ্বয়কে ঠাকুরঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সেখানে তিনজনে কিয়ৎকাল ধ্যানে কাটাইবার পর তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "এখন আমি তোদের ভেতর আমার শক্তিসঞ্চার করব; ঠাকুর তোদের পেছনে থাকবেন।" সেদিন সারাক্ষণই তাঁহাকে বেশ স্নেহময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, কিভাবে প্রচার করিতে হইবে ও কিরূপ ব্যক্তিকে কিরূপ মন্ত্র দিতে হইবে। এই প্রকারে শ্রীগুরুর আশীর্বাণী মস্তকে ধারণপূর্বক তাঁহারা ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা রওনা হইয়া

গেলেন। স্বামীজী স্বীয় গুরুভ্রাতা সারদানন্দ ও তুরীয়ানন্দকেও গুজরাটে প্রচারের জন্য আদেশ করিলেন এবং ইঁহারাও ৭ই ফেব্রুয়ারি ঐ জন্য যাত্রা করিলেন। (ইংরেজী জীবনী, ৬৩০ পৃঃ)।

স্বামী ত্রিগুণাতীত অনেককাল ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন, রামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারের জন্য বঙ্গভাষায় একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিবেন। স্বামীজী এই প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং আমেরিকা হইতে লিখিত একাধিক পত্রে এই বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছিলেন। পরেও নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীমতী ম্যাকলাউড লিখিয়াছেন: "মঠ স্থাপনের জন্য শ্রীযুক্তা ওলি বুল বহু সহস্র ডলার দিয়াছিলেন। আমার তো বেশী কিছু ছিল না; তাই আটশত ডলার জমাইতে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন আমি স্বামীজীকে বলিলাম, 'এই একটু সামান্য অর্থ আছে; আপনার কাজে লাগতে পারে।' তিনি বলিলেন, 'তাই নাকি? তাই নাকি?' 'হাঁ!' 'কত হবে?' —তিনি শুধাইলেন। এবং আমি উত্তর দিলাম, 'আটশ ডলার।' তৎক্ষণাৎ তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'এই নে, তোর প্রেস কিনে ফেল।' তিনি প্রেস কিনিলেন এবং উহা হইতে 'উদ্বোধন'-নামক রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের (মুখপত্র) বাঙ্গলা সাময়িক (পাক্ষিক—পরে মাসিক) পত্রিকা প্রকাশিত হইল" ('রেমিনিসেন্সেস', ২৪৩ পৃঃ)। প্রেস ক্রয় করা হইয়াছিল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের একেবারে শেষে। প্রেসের জন্য টাকার সংস্থান করা ছাড়াও স্বামীজী 'উদ্বোধন'-এর জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া এবং ভক্তদিগকে প্রবন্ধ লিখিতে ও গ্রাহক হইতে বলিয়া এই কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। পত্রিকার নাম তিনিই নির্বাচিত করেন। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সব ঠিক হইয়া গেলে ১লা মাঘ (১৩০৫, ইং ১৮৯৯, জানুয়ারির মধ্যভাগ) 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সংখ্যা বাহির হইল; স্বামীজী তখন বৈদ্যনাথে। মঠে ফিরিয়া এই বিষয়ে শিষ্য শরৎবাবুর সহিত যে আলাপ হয় তাহার বিবরণ দিতে গিয়া শরৎবাবু লিখিয়াছেন ('বাণী ও রচনা,' ৯।১৭৩-৭৭):

"পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীজী লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সভ্যগণকে স্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্ম-সম্বন্ধীয় মত পত্র সহায়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।" শরৎবাবুর সহিত আলোচনাকালে স্বামীজী বলিয়াছিলেন: "এই পত্রের

ভাব ভাষা—সব নূতন ছাঁদে গড়তে হবে। ঠাকুরের ভাব তো সবাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাঙ্গলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন ক্রিয়াপদের ব্যবহার করলে, ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে ক্রিয়াপদের ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে।...তুই বুঝি মনে করেছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এই দেখ, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন, ধ্যানধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কাজে নেবেছে। এ কি কম স্বার্থত্যাগের কথা! আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল দেখি!...দেশে নবভাব প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করেছিস?...আমরা তো গৃহীদের মতো নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল কাজ কর্ম—এটা জেনে রাখবি।...কোন বিষয়কে প্রথমে পায়ে দাঁড় করাবার শক্তি এখনও তোদের হয় নি। সেটা করতে এইসব সর্বত্যাগী সাধুরাই সক্ষম। এরা কাজ ক'রে ক'রে মরে যাবে, তবু হটবার ছেলে নয়।" এইরূপ কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ডাকিলেন এবং "আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে ত্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও টাকা দিতে আদেশ করিলেন।" তারপর তিনি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "উদ্বোধনে সাধারণকে কেবল গঠন-মূলক ভাব দিতে হবে, নেতিবাচক ভাব মানুষকে দুর্বল করে দেয়। দেখছিস না, যেসকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে, 'এটার কিছু হবে না, বোকা, গাধা'—তাদের ছেলেগুলো অনেক স্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়।...ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন।"

স্বামীজী এই কালে বক্তৃতা করিতেন না; কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী সারদানন্দ ও অপর কেহ কেহ তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে নিরত ছিলেন। স্বামীজী মাঝে মাঝে এইসব বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ভগিনী নিবেদিতা মিনার্ভা থিয়েটারে যখন 'নব্য-ভারত-আন্দোলন' বিষয়ে বক্তৃতা দেন, তখন মঠের অপরাপর সাধুদের সহিত স্বামীজীও সেখানে গিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই ১৯শে মার্চ (১৮৯৯) বর্তমান বেলুড় মঠে সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে নিবেদিতা বক্তৃতা

দেন ও স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই উহা শ্রবণ করেন। নিবেদিতা তাঁহার বক্তৃতার সারবস্তুর জন্য স্বামীজীরই উপর নির্ভর করিতেন, ইহার প্রমাণস্বরূপ জানিতে পারা যায় যে, ১২ই ফেব্রুয়ারি তিনি আলবার্ট হলে কালী ও কালীপূজা সম্বন্ধে বক্তৃতার পুর্বে বক্তব্য বিষয় লিখিয়া স্বামীজীকে দেখিতে দেন এবং তিনিও পড়িয়া অনুমোদন করেন। ২৮শে মে নিবেদিতা কালীঘাটে যে বক্তৃতা দেন, তাহারও তথ্যাংশ তিনি স্বামীজী ও স্বামীজীর জনৈক শিষ্যের সাহায্যে সংগ্রহ করেন। ঐ সভায় স্বামীজীর উপস্থিত থাকিবার কথা ছিল; কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তাহা সম্ভব হয় নাই।

রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে এই বৎসরের অন্যতম প্রধান ঘটনা প্লেগ-রোগাক্রান্তদের সেবা ও রোগনিবারণার্থ বিবিধ প্রচেষ্টা। এই কার্যপরিচালনার জন্য মিশন একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। 'উদ্বোধন'-এ (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) এই বিষয়ে লিখিত হইয়াছিল: "কলিকাতায় প্লেগ-কার্য-সম্পাদিকা ভগিনী নিবেদিতা, প্রধান কার্যাধ্যক্ষ স্বামী সদানন্দ। অন্যান্য কার্যকারিগণ—১। স্বামী শিবানন্দ; ২। স্বামী নিত্যানন্দ; ৩। স্বামী আত্মানন্দ।" কলিকাতায় প্লেগ আসার দুর্ভাবনা স্বামীজীর মনে পুর্ব হইতেই ছিল; সত্যই যখন উহা শুরু হইল, তখন তিনি ৩১শে মার্চ হইতে উক্ত বিধানে সেবাকার্য আরম্ভ করাইলেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় গুরুভক্ত সদানন্দ ও গুরুগতপ্রাণা নিবেদিতা কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা দেওয়ার স্থান ইহা নহে। আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, স্বামীজীর মহাপ্রাণের স্পন্দন অন্য বহুপ্রাণেও সাড়া জাগাইয়াছিল এবং তাঁহারাও মিশনের কার্যে অর্থ ও সামর্থ্যানুসারে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। অর্থসংগ্রহের জন্য ও প্লেগ হইতে মুক্ত থাকা বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিশনের উদ্যোগে ক্লাসিক থিয়েটারে একটি জনসভা আহূত হয়; উহাতে স্বামীজীর সভাপতিত্বে নিবেদিতা 'প্লেগ ও ছাত্রগণের কর্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। স্বামীজীর ও নিবেদিতার উদ্দীপনাময় যুক্ত-আহ্বানে সেদিন পনর জন ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে মিশনের কার্যে যোগ দেন। ('ভগিনী নিবেদিতা,' ১৪০)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ আলমোড়া জেলার পুর্বাংশে মায়াবতী নামক স্থানে হিমালয়ের শান্ত শীতল, সুন্দর ও শ্যামল পরিবেশের মধ্যে প্রায় ৬৫০০ ফুট উচ্চ এক পাহাড়ের উপর অদ্বৈত আশ্রম

স্থাপনের ফলে স্বামীজীর আর একটি মহতী ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইল। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি এবং বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকমাত্র অবগত আছেন যে, স্বামীজী বরাবরই এই সঙ্কল্প পোষণ করিতেন এবং ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ইহা কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে এমন একটি অদ্বৈতভাবমূলক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে যেখানে অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপাদি-বিরহিত শুদ্ধ অদ্বৈত-সাধনা চলিতে থাকিবে ও যেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিষ্যবৃন্দ পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলিবেন ও উভয় ভূখণ্ডের ভাবরাশির আদান-প্রদানের অবকাশ পাইবেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল ভূমি সংগ্রহের জন্য তিনি ও সেভিয়ার ধরমশালা, মারী, শ্রীনগর, দেরাদুন, আলমোড়া প্রভৃতি বহু অঞ্চলে যুক্তভাবে কিংবা পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় অবশেষে আলমোড়ার একটি ভাড়া-বাড়ীতে সেভিয়ার ও স্বরূপানন্দের দ্বারা 'প্রবুদ্ধ-ভারত' পরিচালন-কার্যের গোড়াপত্তন করিয়া স্বামীজী অন্যত্র ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর সেভিয়ার-দম্পতিই এই পরিকল্পনার রূপায়ণে তৎপর হইয়া যথাকালে মায়াবতীর এই জমির সন্ধান পাইলেন এবং স্বামী স্বরূপানন্দের সহিত উহা দেখিতে গিয়া পছন্দ করিলেন। স্থানটির নিজস্ব মনোহারিত্ব তো আছেই, আবার সেখান হইতে নন্দাদেবী, ত্রিশূল, আপি প্রভৃতি উচ্চ শৃঙ্গসম্বলিত সুদীর্ঘ চির-তুষারমালাও দৃষ্টিগোচর হয়। বৃক্ষরাজি-সমাকীর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল এই অরণ্য প্রদেশ খুবই নির্জন। সেভিয়ার এই সুবিস্তৃত জমিটি ক্রয় করিলেন এবং উহাতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধুদের সহিত সেখানে বসবাস আরম্ভ করিলেন। 'প্রবুদ্ধ-ভারত'—পত্রিকাও সেখানে চলিয়া আসিল।

স্বামীজীর ভাবধারা বুঝিবার পক্ষে এই অদ্বৈতাশ্রমের পরিকল্পনাটি অবশ্য অনুধ্যেয়। ইহার অনুষ্ঠানপত্রের (প্রস্পেক্টাস-এর) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি যে লিপিটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ এই ('বাণী ও রচনা', ১০।২৬৩):

"যাঁহার মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, আবার যিনিই এই ব্রহ্মাণ্ড, যাঁহার মধ্যে আত্মা, যিনি এই আত্মার মধ্যে অবস্থিত, এবং যিনিই এই মানবাত্মা, তাঁহাকে, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মস্বরূপ, জানিলে আমাদের সমস্ত ভয় দূর হইয়া দুঃখের অবসান হয় এবং পরম মুক্তিলাভ হয়। যেখানেই প্রেমের প্রসারণ কিংবা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি দেখা যায়,

সেখানেই উহা শাশ্বত সত্যের—বহুত্বে একত্বের উপলব্ধির, উহার ধারণা ও কার্য-কারিত্বের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। পরাধীনতাই দুঃখ ; স্বাধীনতাই সুখ।

"অদ্বৈতই একমাত্র মতবাদ, যাহা মনুষ্যকে তাহার স্বাধিকার প্রদান করে, এবং তাহার সমস্ত পরাধীনতা, তৎসংশ্লিষ্ট সকল কুসংস্কার দূর করিয়া আমাদিগকে সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা ও কার্য করিবার সাহস প্রদান করে ; পরিশেষে উহাই আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম করে।

"দ্বৈতভাবের দুর্বলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া এতদিন এই মহান সত্য প্রচার করা সম্ভবপর হয় নাই। এই কারণে আমাদের ধারণা—এই ভাব মানবসমাজের কল্যাণে সম্যক্ প্রচারিত হয় নাই।

"এই মহান সত্যকে ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীন ও পূর্ণতর প্রকাশের সুযোগ দিয়া মানব-সমাজকে উন্নত করিতে আমরা হিমালয়ের এই উর্ধ্বপ্রদেশে—যেখানে ইহা প্রথম উদ্গীত হইয়াছিল—এই অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করিতেছি।

"এখানে সমস্ত কুসংস্কার এবং বলহানিকারক মলিনতা হইতে অদ্বৈতভাব মুক্ত থাকিবে, আশা করা যায়। এখানে শুধু 'একত্বের শিক্ষা' ছাড়া অন্য কিছুই শিক্ষা দেওয়া বা সাধন করা হইবে না। যদিও আশ্রমটি সমস্ত ধর্মমতের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন, তবুও ইহা অদ্বৈত—কেবলমাত্র অদ্বৈতভাবের জন্যই উৎসর্গীকৃত হইল।"

স্বামীজীর জীবনের কার্যাবলীর মূল সূত্রগুলি এই লেখার মধ্যে বিন্যস্ত থাকিলেও, স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নহে। ইহারই সাক্ষ্যস্বরূপে আমরা শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসুর আর একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করিলাম। পত্রমধ্যস্থ ইংরেজী শব্দগুলির বঙ্গানুবাদ আমাদের : "মিস নোবল স্বামীজিগণের নিকট অনেকটা সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লাস্ট লেকচার (শেষ বক্তৃতা) কালীঘাটের মায়ের নাটমন্দিরে হইয়াছিল। স্বামীজীও এই লেকচারে [সাবজেক্ট (বিষয়)—কালী] প্রিসাইড (সভাপতিত্ব) করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল—হালদারেরা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহাদের ইদানীং স্বামীজীর উপর বিশেষ ভক্তি হইয়াছিল। তাহার কারণ ইহার এক সপ্তাহ পূর্বে[৮] স্বামীজী সহসা কালীঘাটে মায়ের শ্রীমন্দিরে যাইবার ইচ্ছা করিয়া দুই-

৮। কালী সম্বন্ধে কালীঘাটে নিবেদিতার বক্তৃতা হয় ২৮শে মে রবিবার বিকাল পাঁচটায়। অতএব শচীনবাবুর বর্ণিত ঘটনাটি ২১শে মে তারিখের হইতে পারে।

তিনজন মহারাজ (অর্থাৎ সন্ন্যাসী) ও মিস নোবল সহ তথায় যাইলেন—হালদারেরা সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। মায়ের মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিল। মায়ের প্রসন্ন শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিয়া বিবেকানন্দের হৃদয়ে ভাবসাগর উথলিয়া পড়িল। বেদান্তের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া ভাবরাশি ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি হইল—বিশাল লোচনদ্বয় আরক্তিম হইল, দরদর বেগে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, স্বামীজীর কমনীয় কণ্ঠ হইতে অনর্গল সুন্দর স্তবরাজি বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া চন্দনচর্চিত জবাকমল শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন, সকলকে দিতে বলিলেন। কালীঘাটবাসী সকলে ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। মিস নোবল তৎপরে লেকচার দিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল। লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল—অবশ্য স্বামীজীকে দেখিতে ও শুনিতে। আমিও গিয়াছিলাম, মানিকদাদাও গিয়াছিলেন। কিন্তু লোকেরা যখন শুনিল যে, স্বামীজী কতকটা অসুস্থ এবং আসিতে পারিবেন না, তখন তাহারা অতীব নিরাশ হইয়াছিল।"[১]

যুগাচার্যের জীবনে স্থান কাল ও পাত্র অনুযায়ী বিবিধ ভাব বিকশিত হইয়া বিভিন্ন ধারায় সকলের কল্যাণ সাধন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই মৌলিক কথা মনে রাখিলেই মাত্র স্বামীজীকে বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিয়াছিলেন: "তখন মঠে স্বামীজীর সেবা করি, দিনরাতই কাছে কাছে থাকতে হয়। একদিন সকালে এক ছোকরা এসে বললে, 'স্বামীজী আপনি তো দেশ-বিদেশে নতুন এক ধর্ম প্রচার করে এলেন?' স্বামীজী বললেন, 'নতুন ধর্ম বলতে তুমি কি বোঝ?' সে বললে, 'আপনি তো গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়—এ-সব মানেন না?' স্বামীজী বললেন, 'সে কি! আমি রোজ গঙ্গাস্নান করি, তা সম্ভব না হলে একটু গঙ্গাজল মাথায় দিই, মুখে দিই।' সে তো সব বুঝে চলে গেল। একটু পরে এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এসে বলছেন, 'স্বামীজী আপনি তো আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মই সারা পৃথিবীতে প্রচার করে এলেন? ধন্য আপনি!' স্বামীজী বললেন, 'সনাতন হিন্দুধর্ম বলতে আপনি কি বোঝেন?' 'এই কাশীতে মরলে মুক্তি হয়-এটা তো আপনি মানেন?' 'না, জ্ঞান বিনা

১। শেষ বাক্যটি ইংরেজীর অনুবাদ। পত্রখানির তারিখ ১০ই জুলাই, ১৮৯৯। এই একই পত্রে স্বামীজীর দ্বিতীয় বার মার্কিন দেশে যাইবার আয়োজনের সংবাদও আছে।

মুক্তি হয় না। জ্ঞান হলে যেখানেই মরুক মুক্তি হবে! জ্ঞানের চর্চা করুন, আমি সর্বদা জ্ঞানের চর্চা করি।' আমি তো দুজনের সঙ্গে দু-রকম কথা শুনে অবাক্। নতজানু হয়ে বললুম, 'স্বামীজী, ওরা তো যে যার চলে গেল, আমি যে পড়লাম মহাফাঁপরে?' স্বামীজী বললেন, 'তুই জিগ্যেস কর, তোকে তোর মত উত্তর দেব।' আমি বললুম, 'বলুন, তাহলে কিসে মুক্তি?" স্বামীজী গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'গুরুসেবায়'।"[১০]

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, স্বামীজীর পরিকল্পনা বিবিধাকারে রূপায়িত হইতেছিল। তাঁহার উদ্যোগ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কয়েকটি স্থায়ী কার্যক্ষেত্র এবং প্রচারকেন্দ্রও প্রবর্তিত হইয়াছিল—বেলুড়ে, মাদ্রাজে, মায়াবতীতে, কলিকাতায় (নিবেদিতার বিদ্যালয়), মুর্শিদাবাদের মহুলা গ্রামে (অনাথ আশ্রম) ও নিউ ইয়র্কে। লণ্ডন, সিংহল ইত্যাদি স্থানেও প্রচারকার্য চলিতেছিল। তাঁহার আদেশে সারদানন্দ ও তুরীয়ানন্দ কাথিয়াওয়ারে এবং বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ পূর্ববঙ্গে প্রচারার্থ গিয়া কয়েক মাস ঐ কার্যে নিরত ছিলেন। পূর্ববঙ্গের এই প্রচারকার্যের ফলস্বরূপে পরে যথাকালে স্থায়ী কর্মকেন্দ্রও গড়িয়া উঠিয়াছিল। অধিকন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ী সাহায্য-কার্যও চলিতেছিল; মুর্শিদাবাদ জেলায় স্বামী অখণ্ডানন্দের দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যের কথা আমরা বলিয়া আসিয়াছি; কলিকাতায় দুইবার প্লেগকার্যের কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীতের নেতৃত্বে দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য পরিচালিত হয়; তিনি সেখানে চুরাশীটি গ্রামের বহু সহস্র ব্যক্তিকে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সেবা করিয়াছিলেন। প্রায় একই সময়ে স্বামী বিরজানন্দ দেওঘরে তৃতীয় আর একটি সেবাকেন্দ্রের পরিচালনা করেন। দক্ষিণেশ্বর ও কলিকাতায়ও অনুরূপ কার্য পরিচালিত হইয়াছিল। এই সকল কার্যের সমকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের জন্য দুইখানি সাময়িক-পত্র—'প্রবুদ্ধ-ভারত' ও 'উদ্বোধন'—রামকৃষ্ণ মঠের সাধুদের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইতেছিল, আর একখানি সাময়িকপত্র—'বেদান্তকেশরী'—স্বামীজীর আনুকূল্যে তাঁহারই ভক্তগণ মাদ্রাজ হইতে বাহির করিতেছিলেন। প্রচারকার্য তখন আরও একটি ধারাবলম্বনে প্রবাহিত হইতেছিল—প্রতিবৎসর বিভিন্ন স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ

১০। 'উদ্বোধন', বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, ২৬৩-৬৪।

জন্মোৎসবানুষ্ঠান প্রবর্তিত হওয়ায় বহু সহস্র ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবার সুযোগ পাইতেছিল। এতদ্ব্যতীত স্বামীজীর পুস্তক ও বক্তৃতাদি মুদ্রিত হইয়া দূরদূরান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণবাণী বহন করিতেছিল।

এই বিরাট কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে, স্বামীজীর প্রকল্পগুলি কত দ্রুত ফলপ্রসূ হইতেছিল। কিন্তু স্বামীজী শুধু কার্য-প্রসারের দ্রুততায় সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি জানিতেন ভাবসংশুদ্ধির প্রতি সমুচিত দৃষ্টি না রাখিলে অতিপ্রসারের ফলে মূলভিত্তিই বিপর্যস্ত হইতে পারে। এইজন্য তিনি স্বয়ং বক্তৃতা, পুস্তক প্রণয়ন ও কথাবার্তার মাধ্যমে স্বীয় ভাবসমষ্টি সুপরিস্ফুটাকারে প্রকাশের জন্য অতিমাত্র আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই প্রচেষ্টা দুইটি ধারা অবলম্বনে চলিয়াছিল—জনসাধারণের জন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর জন্য। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আবার তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, একটা সুসংবদ্ধ সন্ন্যাসি-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না তুলিলে সংহত-শক্তি, উদ্দেশ্যের একতানতা ও আদর্শানুসরণে আত্মত্যাগের পরম্পরা সংরক্ষিত হইবে না এবং তাহার ফলে ভাবসংশুদ্ধিও ব্যাহত হইবে। এই অভিপ্রায়ানুসারে তিনি মার্কিন দেশেও সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও ভারতে আসিয়া ঐ দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়াছিলেন। এই কার্যে স্বামীজীকে কিরূপ বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহার আভাস পূর্বেই দিয়া আসিয়াছি। আমরা আরও দেখিয়াছি, জনসাধারণও তাঁহার মতাবলীকে বা সনাতন ধর্মের নবীন ব্যাখ্যাকে দ্বিধাহীনচিত্তে অভিনন্দিত করে নাই। এখানে নূতন দুই-চারিটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ বিষয়েরই আর একটু দিগ্‌দর্শনে প্রবৃত্ত হইব। আমরা জানি, স্বামীজী চাহিতেন বনের বেদান্তকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে, স্বার্থপ্রণোদিত আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে[১১] সর্বমুক্তির আকৃতিতে পরিণত করিতে এবং আচারাদির পঙ্কিল গর্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আধ্যাত্মিকতাকে স্ফটিকস্বচ্ছ বেগবতী বিশাল স্রোতস্বিনীর আকার প্রদান করিতে। সঙ্ঘর্ষ যখনই ঘটিত, তখন ঠিক এই-খানেই ঘটিত।

'হিতবাদী'র স্বনামধন্য স্বদেশপ্রেমিক সম্পাদক স্বর্গত সখারাম গণেশ দেউস্কর

১১। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দুই প্রকারে প্রকটিত হইতে পারে—সংসারের পীড়াদায়ক পরিবেশ হইতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টারূপে, অথবা ভগবৎপ্রেরণায় আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতালাভের সাধনাকারে। আমরা প্রথম দিকটারই কথা বলিতেছি।

একদিন দুইজন বন্ধুসহ স্বামীজীর সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিলেন। বন্ধুদের মধ্যে একজন পাঞ্জাব হইতে আসিয়াছেন জানিয়া স্বামীজী তাঁহার সহিত ঐ প্রদেশের অভাবাদির সম্বন্ধে কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। তখন পাঞ্জাবে অন্নাভাব চলিতেছিল ; অতএব অন্নাভাব দূরীকরণের বিবিধ উপায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী ক্রমে জনসাধারণের উন্নতিবিধানের কথায় আসিয়া পড়িলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহাদের বৈষয়িক ও সামাজিক প্রগতির জন্য শিক্ষাপ্রদানের দায়িত্ব উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই জাতীয় আরও কথাবার্তার পর বিদায়গ্রহণকালে পাঞ্জাবী ভদ্রলোক অতি বিনয়সহকারে স্বীয় নৈরাশ্যের কথা ব্যক্ত করিলেন : "মহাশয়, ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন উপদেশলাভের উচ্চ আশা নিয়ে আমরা আপনার নিকট এসেছিলাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কথাবার্তা তুচ্ছ বিষয়াবলীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে গেল। দিনটাই বৃথা গেল !" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ গাম্ভীর্যধারণপূর্বক বলিলেন, "মহাশয়, যে পর্যন্ত আমার দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে,—সে পর্যন্ত আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো ও তার যত্ন লওয়া—আর যা কিছু তা হয় ধর্মধ্বজিতা বা অধর্ম !" স্বামীজীর কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া তিনজন আগন্তুকই অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই নবীন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা তো দূরের কথা, ইহার তাৎপর্য অবধারণ করাও তখনকার দিনে ছিল সুদূরপরাহত। এমনকি এত বড় পণ্ডিত যে সখারাম, তিনিও সেদিন স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতার প্রমাণ না পাইয়া, পাইয়াছিলেন শুধু তাঁহার স্বদেশপ্রেমের পরিচয়—যদিও সে পরিচয় ছিল বড়ই নিবিড়, প্রাণস্পর্শী ও প্রেরণাপ্রদ। স্বামীজীর দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে স্বামীজীর জনৈক শিষ্যের নিকট ঐ ঘটনা বিবৃত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঐ কথাগুলি তাঁহার অন্তঃকরণে চিরতরে জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার সম্মুখে স্বদেশপ্রেমের এমন এক অচিন্তনীয় জীবন্ত চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছিল, যাহার কল্পনাও তিনি পূর্বে করিতে পারেন নাই।

এই সময়েই উত্তর ভারত হইতে এক দিগ্‌গজ পণ্ডিত আসিয়াছিলেন স্বামীজীর সহিত বেদান্তবিচার করিতে। স্বামীজীর মন তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের প্রতিকার বিষয়ে নিজ অসামর্থ্যের কথা ভাবিয়া অতীব বিষাদগ্রস্ত ; অতএব পণ্ডিতকে বেদান্তবিচারের অবকাশমাত্র না দিয়া তিনি বলিলেন, "পণ্ডিতজী, সর্বত্র যে ভয়ঙ্কর হাহাকার উঠছে, প্রথমে তার নিরসনের জন্য—

একমুষ্টি অন্নের জন্য, স্বদেশবাসীর আর্তনাদ বন্ধ করবার নিমিত্ত সচেষ্ট হন, তারপর আমার সহিত বেদান্তবিচারের জন্য আসবেন। বেদান্ত-ধর্মের সারমর্ম এই যে, অন্নাভাবে মুমূর্ষু জনগণের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করতে হবে।" পণ্ডিতজী কি বলিয়াছিলেন কিংবা স্বামীজীর বাক্যকে কি অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানা না থাকিলেও আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, তিনি ইহাকে পাণ্ডিত্য বা ধর্মপ্রাণতা বলিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।

আর এক প্রকার আপত্তির পরিচয় পাই 'ভারতী'-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা ঘোষালকে লিখিত স্বামীজীর ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৯ তারিখের পত্র হইতে। এই আপত্তি উঠিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা সম্বন্ধে। পত্রে আছে : "যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধস্বত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়িবে না, জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও তো দেখি নাই সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর! দু-এক জন আমাদের 'হবি'র (খেয়ালের) জায়গায় তাঁহাদের 'হবি' বসাইতে চাহিয়াছেন—এই পর্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টানদিগের অনন্ত নরকভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি, জানিবেন। তবে মানুষ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ হইতে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক দার্শনিকের লণ্ঠন হাতে করিয়া অনেক দিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্বদা একটা বাউলের গান গাহিতেন —সেটা মনে পড়িল :

> মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো জানা,
> সে দু-এক জনা ;
> সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।

তারপর যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটু খুঁত আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড়-ঘড় ইত্যাদি —আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে!"

স্বামীজী কোন্ পথে চলিবেন—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের আগ্রহে সাম্প্রদায়িকতার

স্রোতে গা ভাসাইবেন অথবা তথাকথিত স্বদেশপ্রেমিক গুরুপূজা-বিরোধীদের সন্তুষ্টির জন্য নবযুগাবতারকে অস্বীকার করিবেন?

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সরলাদেবী নিবেদিতার নিকট স্বামীজীর রন্ধনের প্রশংসা করিয়াছেন শুনিয়া স্বামীজী একদিন তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্বক স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। রন্ধনকালে সরলাদেবীরই সম্মুখে তিনি নিবেদিতাকে এক কলিকা তামাক সাজিতে বলেন ও নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করেন। নিমন্ত্রিতা মহিলারা চলিয়া গেলে স্বামীজী অপরদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি শুনিয়াছিলেন—এ দেশের কোন কোন শিক্ষিত মহলের ধারণা, তিনি শ্বেতাঙ্গদিগের প্রশংসা ও ছন্দানুবর্তনের দ্বারা স্বকার্যসাধন করেন ও তাহাদিগকে শিষ্য করেন। সরলাদেবীর সম্মুখে পাশ্চাত্ত্য নারীর স্বতঃস্ফূর্ত সেবার প্রমাণ দিয়া তিনি ঐ ভ্রান্তধারণার নিরসন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গাগত ঘটনা ছাড়িয়া আমরা আবার স্বামীজীর কল্যাণমার্গানুসন্ধান ও উহার অনুসরণের পথে ঘাতপ্রতিঘাতেই ফিরিয়া যাই।

স্বামীজী দেখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন, নানা ঐতিহাসিক বিড়ম্বনার মধ্যে ভারতের উচ্চবর্ণের চিন্তাজগতে উৎকর্ষ মোটামুটি অব্যাহত থাকিলেও, জাগতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণ চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, জীবনের মান ক্রমশঃ অবনত হওয়ায় শরীরধারণের পর্যন্ত সমুচিত ব্যবস্থা লোপ পাইয়াছে; আর দৈহিক দুর্বলতা বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও আপন প্রভাব সম্প্রসারণের আশঙ্কা জাগাইয়া জাতীয় ইতিহাসে একটা সঙ্কট মুহূর্ত সৃজন করিয়াছে। বৌদ্ধদের নিরঙ্কুশ সন্ন্যাসবাদও জাতীয় জীবনে পঙ্গুত্ব ও বুদ্ধিবিভ্রম উৎপাদন করিয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা ও আচণ্ডালব্রাহ্মণ সকলের মুখে "নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্" ইত্যাদি বৈরাগ্যের কথা শ্রুতিমধুর হইলেও সহস্রবাধাসঙ্কুল জীবনসংগ্রামে উহা বড়ই প্রতিকূল। আবার মায়াবাদের কদর্থ ও সাধনাবস্থাকে সিদ্ধাবস্থার সমপর্যায়ভুক্ত করার ফলে অধ্যাত্মক্ষেত্রেও এক বিকট অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ভগবানের প্রেমের আকর্ষণে কর্ম আপনা হইতে খসিয়া পড়ে; কিন্তু যে তমোগুণী ব্যক্তি ভীতিবিহ্বলচিত্তে স্বার্থপরিচালিত হইয়া পলায়নপর মনোবৃত্তি অবলম্বন করে, অথচ নিজ ব্যবহারের সমর্থনজন্য প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের আচরণের নজির টানে আর জাগতিক উৎকর্ষাদির প্রচেষ্টাকে মায়াজনিত বিভ্রম বলিয়া নস্যাৎ করে, তাহার নিকট কি আশা করা যাইতে পারে? এই চিন্তা ও কার্য, মন ও

মুখের মধ্যে অসামঞ্জস্যদর্শনে স্বামীজী সখেদে বলিয়াছিলেন, "উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই; আমাদের বেদান্তমত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, কিন্তু আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি। মহানিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড-শরীর ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি না।" ('বাণী ও রচনা', ৭।৩২৩)।

আর একটি দোষ তিনি লক্ষ্য করিলেন—ভারতবাসী আদর্শভ্রষ্ট হইয়া প্রতীচ্য কৃষ্টির প্রতি ধাবিত হইতেছে; তাই তিনি সাবধান করিয়া দিলেন: "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" (ঐ, ৬।২৪৯)।

স্বজন সঙ্গে

স্বামীজীর বাণীর প্রতি নবীন ও প্রাচীন সমাজের কিঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া আমরা দেখিলাম। রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীর সহিত উঁহার প্রাথমিক সম্বন্ধের কথাও পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর মনোভাব এই বিষয়ে পরে কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল? তাঁহাদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ ছিল গ্রহণ এবং অগ্রহণের একটা মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া। স্বামীজীও ইহা জানিতেন। তাই সময়বিশেষে সন্দেহবাদীর যুক্তি নিরসনে অগ্রসর হইতেন, অন্য সময়ে শুধু মত শুনিয়া লইয়া নীরব থাকিতেন। ·কিন্তু সঙ্কল্পচ্যুত তিনি কখনও হইতেন না; বরং বাধা-বিঘ্ন আছে জানিয়া অধিকতর দৃঢ়পদক্ষেপে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেন।

একসময়ে তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন—অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে শয্যাত্যাগ করিতে হইবে এবং মুখাদিপ্রক্ষালনান্তে ঠাকুরঘরে ধ্যানে বসিতে হইবে; যিনি যেদিন এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি সেদিন মঠে আহার পাইবেন না, ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি করিতে হইবে। এই নিয়ম প্রবর্তনের পর একদিন স্বামী শিবানন্দ (তারক) নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পরে সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী ইহা লক্ষ্য করিয়া যথাসময়ে তাঁহাকে বলিলেন, "তারকদা, আজ আপনার তো ঠাকুরঘরে যেতে দেরী হয়েছে!" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ স্বামীজী, দশ মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছিল।" "তারকদা, আমরা তো নিয়ম করেছি, ওরূপ দেরী হলে সেদিন ভিক্ষা করে খেতে হবে।" স্বামী শিবানন্দ অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই, আমি এক্ষণি ভিক্ষায় বেরিয়ে যাচ্ছি, যা পাব তাই খাব।" স্বামী শিবানন্দ ভিক্ষাটনে নির্গত হইলেন, যথাসময়ে মঠে প্রসাদগ্রহণের ঘণ্টা বাজিল, কিন্তু স্বামীজীকে ভোজনস্থলে দেখা গেল না। তিনি মঠের পশ্চিম বারাণ্ডায় বসিয়া রহিলেন। কিছু পরে স্বামী শিবানন্দ ভিক্ষা করিয়া ফিরিলে তাঁহাকে দেখিয়াই স্বামীজী সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "দেখি তারকদা, কি কি এনেছেন? অনেক দিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিনি, আসুন আজ আমরা দু-ভাইয়ে বসে ভাগ করে খাই।" এই বলিয়া উভয়ে পরম পরিতোষ সহকারে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন। ('উদ্বোধন', বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, ২৬২)।

আর একদিন স্বামী প্রেমানন্দের শয্যাত্যাগে বিলম্ব হইলে স্বামীজী আদেশ করিলেন, "যা তার কানের কাছে ঘণ্টা বাজিয়ে আয়।" ইহাতে প্রেমানন্দ নিদ্রাত্যাগান্তে স্বামীজীর নিকট আসিলেন ও কৃতাপরাধের জন্য বলিলেন, "আজ উঠতে পারিনি ; আমার জন্যে সকলের অসুবিধা হয়েছে বুঝতে পারছি। তা ভাই, তুমি তো নিয়ম করেছ, যে উঠতে পারবে না তার শাস্তি হবে—আমায় শাস্তি দাও।" শ্রবণমাত্র স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোকে আমি শাস্তি দেব একথা তুই ভাবতে পারলি বাবুরাম ?" সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। স্বামী প্রেমানন্দের অবস্থাও তখন অনুরূপ। অবশেষে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মধ্যস্থ হইয়া যেন স্বামীজীরই প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলেন, "শাস্তির প্রশ্ন হচ্ছে না ; তবে নিয়ম আছে যে, ভিক্ষা করতে হবে।" স্বামী প্রেমানন্দ সেদিন মাধুকরী-ভিক্ষাদ্বারা উদরপূর্তি করিলেন।

আর একদিন স্বামী অদ্ভুতানন্দকে (লাটু) লইয়া আর এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। সকালে ঘণ্টা বাজিলে উঠিতে হইবে এই নিয়মপালনে পরাঙ্মুখ অদ্ভুতানন্দ একদিন কাপড়-গামছা লইয়া মঠ ছাড়িয়া চলিলেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাচ্ছিস ?" "কলকাতায় ?". "কেন ?" "তুমি ওদেশ থেকে এসেছ, কত নিয়ম করছ—আমি ওসব মানতে পারব না। আমার মন এখনও এমন ঘড়ি-ধরা হয়নি যে, তুমি ঘণ্টা বাজাবে, আর আমার মন অমনি ধ্যানে বসে যাবে।" নবীন ও প্রাচীন ধারার মধ্যে সামঞ্জস্যের পথ যেন অকস্মাৎ খুঁজিয়া না পাইয়া স্বামীজী প্রথমে বলিলেন, "তবে তুই যা !" কিন্তু ফটক পার হইতে না হইতে লাটু মহারাজকে ধরিয়া আনিয়া বলিলেন, "তোকে এ নিয়ম মানতে হবে না ; যারা নূতন এসেছে, তাদের জন্য এ নিয়ম করা হয়েছে।" নূতন ধারায় চলিতে গিয়া প্রাচীনদের মধ্যে এইরূপ অপ্রীতির উদ্ভব করা অপেক্ষা নূতনদের লইয়া নূতন ধারা প্রবর্তন করাই শ্রেয়ঃ—এইভাবেই এই পর্বের শেষ হইল।

ইহার পর শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের সহিত ঐ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আলাপের দুই-একটি দৃষ্টান্ত। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় দেহত্যাগ করেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি। ইহার পূর্বে কোনও এক সময়ে স্বামীজী তাঁহাকে দেখিতে যান। রামবাবুর শরীর তখন খুবই অসুস্থ। সেই দিনের ঘটনাটি

ললিত চট্টোপাধ্যায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন: "আমি গেলুম স্বামীজীর সঙ্গে রামবাবুর ওখানে। স্বামীজী গিয়ে তাঁর কাছে বসলেন। আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমনি সময় রামবাবু বাথরুমে যাবার জন্য উঠছেন দেখেই স্বামীজী নিজে তাঁর পায়ে একটা চটি পরিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? জুতোটা এগিয়ে দে।' আমি তাঁর আদেশে তাড়াতাড়ি আরেক পাটি চটি তাঁকে পরিয়ে দিলাম। তিনি বাথরুম থেকে ফিরে এসেই স্বামীজীর গলা জড়িয়ে ধরে একেবারে ভেউ ভেউ করে কান্না! বলছেন, 'ওরে বিলে, আমি এদ্দিন তোকে ভুল বুঝেছিলাম। আজ বুঝলাম ঠাকুর কেন তোকে মাথার মণি বলতেন। তুই আমায় মাপ কর, তা না হলে ঠাকুরের কাছে আমি স্থান পাব না।' স্বামীজী যত বলছেন, 'রামদা তুমি এসব কি বলছো? ওসব কী ভাবছ?'—রামবাবু তা কি শোনেন? তিনি কেবল বলছেন, 'তুই আমায় ক্ষমা না করলে আমি ঠাকুরের কাছে স্থান পাব না।' শেষ পর্যন্ত স্বামীজী যখন বললেন, 'রামদা, তুমি এসব কিছু ভেবো না, তোমার কোন ভয় নেই। ঠাকুরের কাছে আমি স্থান পেলে তুমিও ঠিক স্থান পাবে। তখন তিনি শান্ত হন।" ললিতবাবুর শ্রীমুখে শুনিয়া স্বামী সন্তোষানন্দ এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য ইহা বেলুড় মঠের প্রাচীন সাধুদেরও নিকট সুবিদিত ছিল। স্বামী সন্তোষানন্দ আরও লিখিয়াছেন যে, তিনি পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দের শ্রীমুখে এই কথাও শুনিয়াছিলেন, "শেষকালে রামবাবু স্বামীজীর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।"

ইহার পর ভক্তপ্রবর নাগমহাশয়ের সহিত মিলনের কথা। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একদিন শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় স্বামীজীকে দেখিতে বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন। তখন স্বামীজীর স্বতই জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, উচ্চতম অনুভূতিসম্পন্ন এই ভক্তশ্রেষ্ঠ তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করেন। আমরা 'বাণী ও রচনা' (৯।১৬৯-৭২) হইতে ইহাদের বার্তালাপটি উদ্ধৃত করিলাম।

নাগমহাশয়—"আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিব-দর্শন হ'ল।"

কথাগুলি বলিয়া নাগমহাশয় করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

স্বামীজী—"শরীর কেমন আছে?"

নাগমহাশয়—"ছাই হাড়মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম!" ঐরূপ বলিয়া নাগমহাশয় স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

স্বামীজী—(নাগমহাশয়কে তুলিয়া) "ও কি করছেন?"

নাগমহাশয়—"আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ।"

স্বামীজী—(শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) "দেখছিস, ঠিক ভক্তিতে মানুষ কেমন হয়! নাগমহাশয় তন্ময় হয়ে গেছেন, দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে! এমনটি আর দেখা যায় না।" (প্রেমানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া)—"নাগমহাশয়ের জন্য প্রসাদ নিয়ে আয়!"

নাগমহাশয়—"প্রসাদ! প্রসাদ!" (স্বামীজীর প্রতি করজোড়ে) "আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে।"

মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ উপনিষদ্ পাঠ করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আজ ঠাকুরের একজন মহাভক্ত এসেছেন। নাগমহাশয়ের শুভাগমনে আজ তোদের পাঠ বন্ধ থাকল।" সকলেই বই বন্ধ করিয়া নাগমহাশয়ের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। স্বামীজীও নাগমহাশয়ের সম্মুখে বসিলেন।

স্বামীজী—(সকলকে লক্ষ্য করিয়া) "দেখছিস! নাগমহাশয়কে দেখ; ইনি গেরস্ত, কিন্তু জগৎ আছে কি নেই, এঁর সে জ্ঞান নেই; সর্বদা তন্ময় হয়ে আছেন।" (নাগমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) "এইসব ব্রহ্মচারীদের ও আমাদের ঠাকুরের কিছু কথা শোনান।"

নাগমহাশয়—"ও কি বলেন! ও কি বলেন! আমি কি ব'লব? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি; ঠাকুরের কথা এখন লোক বুঝবে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!"

স্বামীজী—"আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মরলুম।"

নাগমহাশয়—"ছি! ও কথা কি বলছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া—এপিঠ আর ওপিঠ; যার চোখ আছে, সে দেখুক।"

স্বামীজী—"এ-সব যে মঠ-ফঠ হচ্ছে, একি ঠিক হচ্ছে?"

নাগমহাশয়—"আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি, তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।"

স্বামীজী—"আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা সব শিখবে।"

নাগমহাশয়—"ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, 'গৃহেই থেকো।' তাই গৃহেই আছি; মধ্যে মধ্যে আপনাদের দেখে ধন্য হয়ে যাই।"

স্বামীজী—"আমি একবার আপনার দেশে যাব।"

নাগমহাশয়—(আনন্দে উন্মত্ত হইয়া) "এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হয়ে যাবে, কাশী হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট আমার হবে কি?"

স্বামীজী—"আমার তো ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।"

নাগমহাশয়—"আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝবে? দিব্যদৃষ্টি না খুললে চিনবার জো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝতে পারে নি।"

স্বামীজী—"আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝব ঠাকুরের ও আমাদের আসা সার্থক হ'ল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে—মুক্তি-ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন কৃতকার্য হওয়া যায়।"

নাগমহাশয়—"ঠাকুরের আশীর্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাকেও দেখি না; যা ইচ্ছা করবেন, তাই হবে।"

স্বামীজী—"কই, কিছু হয় না—তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না!"

নাগমহাশয়—"তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে; আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!"

স্বামীজী—"মঠের এরা আমায় যত্নে রাখে।"

নাগমহাশয়—"যাঁরা করছেন তাঁদেরই কল্যাণ, বুঝুক, আর নাই বুঝুক। সেবার কমতি হ'লে দেহ রাখা ভার হবে।"

স্বামীজী—"নাগমহাশয়, কি যে করছি, কি না করছি—কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই

মতো কাজ ক'রে যাচ্ছি। এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি না।"

নাগমহাশয়—"ঠাকুর যে বলেছিলেন—'চাবি দেওয়া রইল।' তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।"

স্বামীজী একদৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগমহাশয় ও অন্যান্য সকলকে দিলেন। প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পায়চারি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে স্বামীজী একখানি কোদাল লইয়া আস্তে আস্তে মঠের পুকুরের পূর্বপারে মাটি কাটিতে-ছিলেন—নাগমহাশয় দর্শনমাত্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "আমরা থাকতে আপনি ও কি করেন?" স্বামীজী কোদাল ছাড়িয়া মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেন: কিরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরে নাগমহাশয় অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং স্বামীজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও আর একজন সাধু তাঁহার কলিকাতার খোলার ঘরে গিয়া সাধ্য-সাধনা করিয়া সামান্য কিছু খাওয়াইয়াছিলেন—ইত্যাদি বলিলেন।

স্বামীজী—"নাগমহাশয় আজ মঠে থাকবেন কি?"

শিষ্য—"না। ওঁর কি কাজ আছে, আজই যেতে হবে।"

স্বামীজী—"তবে নৌকা দেখ। সন্ধ্যা হয়ে এল।"

নৌকা আসিলে শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ও নাগমহাশয় স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি হইতে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রাচীনদের নিকট স্বামীজী যে পরবর্তী কালে স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বসংশয়মুক্ত সাহায্য একেবারে পাইতেন না, তাহা নহে; অল্পবিস্তর পাইতেন ঠিকই। তবু আমরা পরেই দেখিতে পাইব যে, নবীন ধারা প্রবর্তনের জন্য তাঁহাকে নবীনদের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইত; তাই ইহাদের জীবনগঠনে তাঁহার অনেকখানি শক্তিসামর্থ্য ব্যয়িত হইত। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক—স্বামীজী যে সর্বদা কাজের কথা মাথায় রাখিয়াই সকলের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতেন এরূপ নহে। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই বন্ধুবান্ধবদের সহিত গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টায় কাটিয়া যাইত। তবে ইহাও সত্য যে, মহামানবের প্রতিচেষ্টাই ইতরসাধারণের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ

হইয়া থাকে। এই হিসাবেই আমরা পরবর্তী বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ভগিনী নিবেদিতা 'প্রবুদ্ধ-ভারতের' পক্ষ হইতে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য একজন সঙ্গিসহ বজরা করিয়া বেলুড়ে উপস্থিত হইলেন এবং পোস্তার গায়ে নৌকা বাঁধিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; স্বামীজী তখন এক গাছতলায় ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। এক্ষণে সংবাদ পাইয়া নিবেদিতার বজরায় চলিলেন, কারণ সন্ধ্যার পরে মঠে প্রবেশ করা অনুচিত জানিয়া নিবেদিতা নামেন নাই। স্বামীজী নৌকায় উঠিয়া ছাদের উপর বসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিলেন, "প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্বরূপ আমরা এখনও জানি না। যখন সেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদয় হবে, তখন আর দেখবার প্রয়োজন থাকবে না, কোন পথে সবচেয়ে কম বাধা আসবে। তখন প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকবে মহৎ কাজ করবার। আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্তও নয়—আমার উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা।"[১] অথবা বলিতে পারা যায়, স্বামীজী তখন আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের পুনরুজ্জীবনে ব্যাপৃত ছিলেন।

নারী-সমাজের উন্নতিকে অবহেলা করিয়া দেশকে জাগ্রত করা সুদূরপরাহত—স্বামীজী ইহা জানিতেন, এবং এই জন্যই নিবেদিতার আত্মদানকে তিনি অতীব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তখন কলিকাতায় প্লেগ-এর সেবাকার্য চলিতেছে। ঐ কার্যে নিরত স্বামী সদানন্দ আসিয়া স্বামীজীকে জানাইলেন, নিবেদিতা কত একান্তভাবে এই সেবাকার্যে নিযুক্ত আছেন। শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "ঐ প্রকার কার্যোদ্যম—ঐ মনুষ্যত্ব ও সহযোগিতা ছাড়া ধর্ম হতেই পারে না। ঐ দেখ নিবেদিতা কেমন এক কোণে পড়ে আছে, আর ইংরেজরা তাকে সাহায্য করছে। ভগবান তাদের সকলের কল্যাণ করুন।" সমস্ত শুনিয়া সেদিন স্বামীজীর এতই আনন্দ হইল যে, সদানন্দের সহিত উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিষয়ে দুই ঘণ্টা যাবৎ আলাপ করিলেন। নিবেদিতাও সদানন্দের মুখে সব শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন।

১। এই অংশ 'ভগিনী নিবেদিতা', ১৫২ পৃঃ, 'রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৭৭ পৃঃ, 'বাণী ও রচনা', ৯।৪৮৩ পৃঃ, ম্যাকলাউডকে লিখিত নিবেদিতার ১২ই মার্চের (১৮৯৯) পত্র—এইগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনপূর্বক লিখিত হইল।

অথচ মজা এই যে, নিবেদিতা যখন আসিয়া (৯ই এপ্রিল, ১৮৯৯) প্লেগের কথা তুলিলেন, তখন তিনি সেসব কথায় চাপা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্লেগ, নিবেদিতা, প্লেগ !" তিনি আরও বলিলেন, "আমাদের লোকগুলি হয়তো তেমন ভদ্র বা মার্জিত নয় ; কিন্তু বাঙ্গলাদেশে ওরাই হল মনুষ্যত্বশালী মানুষ।[২] ইওরোপের মেয়েরা অপুরুষোচিত ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা দেখিয়ে পুরুষত্বকে বাঁচিয়ে রাখে। বাঙ্গালী মেয়েরা কবে তা করতে শিখবে এবং পুরুষচরিত্রে সর্বপ্রকার দুর্বলতাকে নিষ্ঠুর টিটকারী দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে ?" স্বামীজী সেদিন নিবেদিতার কাজের কোন উল্লেখই করিলেন না। ইহাই ছিল তাঁহার ধারা—অসাক্ষাতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, সাক্ষাতে নীরবতা।

স্বামীজীর কার্যধারার আর একটা দিক ঐ সময়েই প্রকাশ পাইয়াছিল। নিবেদিতা তখন দুঃস্থ প্লেগ রোগীদের ব্যক্তিগত শুশ্রূষায় অনেকটা সময় কাটাইতেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, ঐরূপ না করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দিলে অধিকতর সুফললাভ হইবে। নিবেদিতা সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার বন্ধুদের কেহ কেহ ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। অনুরূপ ক্ষেত্রে ইহারও পূর্বে স্বামীজী মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ সেবাকার্যে নিযুক্ত স্বামী অখণ্ডানন্দকে জানাইয়াছিলেন যে, কেবল তণ্ডুলবিতরণের দ্বারা একটিমাত্র গ্রামের অভাব দূর করাও অসম্ভব ; বরং শিক্ষা, উপদেশ ও উপার্জনের ব্যবস্থা অবলম্বনে আর্তদিগের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করা আবশ্যক। ('বাণী ও রচনা', ৭৷৩৭৩)।

স্বামীজী ধৈর্য ধরিয়া শিখাইতে জানিতেন। তাই শিষ্যের বা শিষ্যার শক্তিও স্বতঃ ধীরে ধীরে স্ফুরিত হইত। আমরা দেখিতে পাই, এই শিক্ষাগুণে নিবেদিতার বৈরাগ্য বর্ধিত হইয়াছিল ; তাই বৈরাগ্যোজ্জ্বল হৃদয় লইয়া একদিন তিনি স্বামীজীর নিকট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং স্বামীজীও ২৫শে মার্চ (১৮৯৯) তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন—'নিবেদিতা' নাম প্রদানের ঠিক এক বৎসর পরে। এই ২৫শে মার্চটিকে নিবেদিতা স্বীয় নবজন্মের তারিখ বলিতেন। ১৭৷৩৷১৯০৪ তারিখে তিনি ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, "ছয় বৎসর পূর্বে আজিকার দিনটিতে আমি শ্রীশ্রীমার প্রথম দর্শন লাভ করি এবং তোমার সঙ্গে বেলুড়ে গমন করি। পরের শুক্রবার,

২। স্বামীজী প্লেগকার্যে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের কথা বলিতেছিলেন।

২৫শে মার্চ, যেদিন আমি নিবেদিতা নামে অভিহিত হই, তাহার বার্ষিক দিবস। সুতরাং আমরা (ম্যাকলাউড ও আমি) সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিতেছি।" ('ভগিনী নিবেদিতা', ৭৬)। নিবেদিতা অপর একখানি পত্রে ম্যাকলাউডকে স্বীয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য-গ্রহণের সংবাদও দিয়াছিলেন। সেদিন তিনি স্বামীজীর নির্দেশে ঠাকুরঘরে পূজা করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধের চরণেও অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন। হোম সম্পাদিত হইয়াছিল নীচে অন্য কোন স্থানে। ('সন্দীপন', ১৯৬৬, ৬২-৬৩ পৃঃ)।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় স্বামীজীর বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহার 'স্বামীজীর স্মৃতি' ('বাণী ও রচনা', ৯।৩৯০-৯১) হইতে স্বামীজীর কল্যাণ সাধনের পন্থা সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রিয়নাথবাবু জানিতে চাহিয়াছিলেন, "স্বামীজী, তুমি সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্মে যে টাকা আমরা চাঁদা করে তুললুম, আমি ভেবেছিলুম, তুমি দেশের দুর্ভিক্ষের কথা শুনে কলকাতায় পৌছবার আগেই আমাদের 'তার' করবে—আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না করে দুর্ভিক্ষ নিবারণ ফণ্ডে ঐ সমস্ত টাকা চাঁদা দাও। কিন্তু দেখলুম, তুমি তা করলে না। এর কারণ কি?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি ইচ্ছেই করেছিলুম যে, আমায় নিয়ে একটা খুব হইচই হয়। কি জানিস? একটা হইচই না হলে তাঁর (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের) নামে লোক চেতবে কি করে? এত সংবর্ধনা কি আমার জন্মে করা হল, না তাঁর নামেরই জয় জয়কার হল?...যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য এসেছেন, তাঁকে না জানলে লোকের মঙ্গল কি করে হবে? তাঁকে ঠিক ঠিক জানলে তবে মানুষ তৈরী হবে। আর মানুষ তৈরী হলে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ানো কতক্ষণের কথা?...নতুবা আমার নিজের জন্মে এত হাঙ্গামের কি দরকার ছিল?...দুর্ভিক্ষ তো আছেই; এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই; কারণ সেসব দেশে মানুষ আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে, তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক; তখন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ঠিক-ঠিক চেষ্টা আসবে। ক্রমে সে চেষ্টাও করব—দেখ না!"

আর একদিন কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়ীতে বসিয়া কথা হইতেছিল ('বাণী ও রচনা', ৯।৪১৯)। স্বামীজী বলিতেছিলেন, "নিজেদের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে; তাহলেই দেশের যত কিছু সমস্যা ক্রমশঃ আপনা-আপনি মীমাংসিত হয়ে যাবে।...অভাবটা কার? রাজা পূরণ করবে, না

তোমরা পূরণ করবে? ভিখারীর অভাব কখনও পূর্ণ হয় না। রাজা (ইংরেজরা) অভাব পূরণ করলে সব রাখতে পারবে, সে লোক কই? আগে মানুষ তৈরী কর। মানুষ চাই; আর শ্রদ্ধা না আসলে মানুষ কি করে হবে?"

অতঃপর 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ'-গ্রন্থ অবলম্বনে (১৯৪-২০৪ পৃঃ) আমরা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, যাহার সময় সঠিক জানা না থাকিলেও দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমান করা চলে। বিশেষতঃ যেস্থলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের উল্লেখ আছে, উহা ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দেরই ঘটনা হইবে; কেননা স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমনের পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদে চলিয়া যান এবং তারপর প্রধানতঃ সেখানেই বাস করিতে থাকেন। প্রথম ঘটনাটি স্বামীজীর মাতৃভক্তির পরিচায়ক। সেদিন তিনি বলরামবাবুদের বাড়ীতে ছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দও ছিলেন। স্বামীজী তখন বহুমূত্র রোগে কাতর, রাত্রে প্রায়ই নিদ্রা হইত না। তাই দিবাভাগেও অনেক সময় বিছানায় শুইয়া থাকিতেন বা ঘুমাইতেন। সেদিন তাঁহাদের বাড়ীর ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন কোথায়?" ব্রহ্মানন্দজী উঁকি মারিয়া দেখিলেন, স্বামীজী নিদ্রিত। এই অবস্থায় তাঁহাকে জাগানো অনুচিত বিবেচনা করিয়া তিনি আর ডাকিলেন না; ঝিও চলিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বামীজী যখন সব শুনিলেন, তখন তিনি না ডাকার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিরস্কার করিলেন; কারণ তিনি ভাবিলেন, হয়তো তাঁহার মাতা কোন বিশেষ প্রয়োজনে ঝিকে পাঠাইয়াছিলেন, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া তখনই একখানি গাড়ী ডাকিয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি ঝিকে কেন পাঠিয়েছিলে?" মা কিন্তু সবিস্ময়ে কহিলেন, "না, ঝিকে তো আমি তোর কাছে পাঠাইনি।" স্বামীজী অমনি বাড়ীর পুরাতন ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগো, তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে কেন?" সে উত্তর দিল, "আমি বাগবাজার চিৎপুর অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলুম; ভাবলুম, একবার নরেনকে দেখি আসি। রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) আমাকে বললে তুমি ঘুমুচ্ছ, তাই ফিরে চলে এলুম।" শুনিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দকে তিরস্কার করার জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহাকে ঐ গৃহে আনাইয়া বলিলেন, "রাজা (ব্রহ্মানন্দ), বড় অন্যায় করেছি; তোকে শুধু শুধু গালাগালি দিয়েছি।"

বস্তুতঃ সময়বিশেষে স্বামীজী গুরুভ্রাতাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেও, তাঁহাদের

প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল অসীম। শরীর তখন তাঁহার অসুস্থ; তিনি জানিতেন, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, বাকি স্বল্পকালের মধ্যে আরব্ধ কার্যকে দৃঢ়-ভিত্তিতে স্থাপন করিতে হইবে। তিনি বলিতেন, "আমার কাজ হবে ইস্পাতের মতো দৃঢ় আর বিদ্যুতের মতো দ্রুত।" মরজগতে এই উভয়ের সম্মিলন দুঃসাধ্য বলিলেই চলে; কিন্তু মনোমত কাজ হইতেছে না দেখিলেই তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন ও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতেন। আবার পরমুহূর্তেই সব ভুলিয়া একেবারে জল হইয়া যাইতেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহার স্বভাব জানিতেন; তাই এইসব রূঢ় কথা গায়ে মাখিতেন না। পুরাতন মঠবাড়ীর সম্মুখের অংশটায় গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাট নির্মাণের কথা উঠিলে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা হরিপ্রসন্ন মহারাজ (বা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, যাঁহাকে স্বামীজী পেসন বলিয়া ডাকিতেন) বলিলেন—হাজার তিনেক টাকায় কাজ হইয়া যাইতে পারে। স্বামীজী ভাবিলেন, এত অল্প টাকায় যখন এই আবশ্যকীয় কাজটি হইয়া যাইবে, তখন উহা সারিয়া ফেলাই ভাল। অতএব কাজ শুরু হইল; কিন্তু খরচ তিন হাজার টাকা অতিক্রম করিয়া ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। একদিন স্বামীজী হিসাব চাহিয়া দেখিলেন, খরচের পরিমাণ মাত্রা ছাড়াইয়া চলিয়াছে। অমনি তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিরস্কার করিতে থাকিলেন, এবং ব্রহ্মানন্দ দুঃখিত হইয়া স্বীয় কক্ষে প্রবেশপূর্বক দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বিরক্তির ভাব কাটিয়া গেলে স্বামীজী ব্রহ্মানন্দের জন্য দুঃখিত হইয়া হরিপ্রসন্ন মহারাজকে বলিলেন, "দেখ তো পেসন, রাজা কি করছে।" হরিপ্রসন্ন দরজার কাছে গিয়া ডাকাডাকি করিলেন, তবু সাড়া না পাইয়া স্বামীজীকে জানাইলেন, তিনি ডাকিয়া সাড়া পান নাই। স্বামীজী কহিলেন, "তুই তো ভারি বোকা! তোকে বললুম দেখতে রাজা কি করছে, আর তুই কিনা এসে বলছিস, তার ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ! দেখ শীগগির রাজা কি করছে।" বিজ্ঞানানন্দ পুনর্বার সেখানে গিয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া দেখেন, ব্রহ্মানন্দ কাঁদিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র স্বামীজী ঐ ঘরে গিয়া ব্রহ্মানন্দকে বুকে জড়াইয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, "রাজা, রাজা, আমায় ক্ষমা কর। আমি কি অন্যায় করেছি—তোমাকে গালাগালি করেছি; আমায় ক্ষমা কর।" স্বামীজীর ভাব দেখিয়া ব্রহ্মানন্দের সমস্ত খেদ দূরীভূত হইল এবং তিনি সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন, "তুমি অমন করছ কেন? আমায় গালাগালি দিয়েছ—তাতে হয়েছে কি? তুমি ভালবাস, তাইতো এসব বলেছ।"

আর একদিনের কথা। মঠের কোন একটি কার্য স্বামীজীর মনঃপুত না হওয়ায় তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। স্বামীজীর স্বভাব জানিতেন বলিয়া ব্রহ্মানন্দ নীরবে সব শুনিয়া গেলেন। তিনি জানিতেন, স্বামীজী বিরক্তিভরে কড়া কথা শুনাইলেও উহা তাঁহার অন্তরের ভাব নহে; অধিকন্তু স্বামীজীর শরীর তখন অসুস্থ; কথায় কথায় জবাব দিতে গেলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইয়া শরীর আরও খারাপ হইবে। সেইদিনের বকাবকির পর ব্রহ্মানন্দজীকে কার্যব্যপদেশে কলিকাতায় যাইতে হইল এবং বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিতে হইল। এদিকে স্বামীজী তাঁহাকে দিনকয়েক দেখিতে না পাইয়া অনুমান করিলেন, তিনি রাগ করিয়াছেন। তাই তিনি স্বয়ং কলিকাতায় গেলেন এবং পথে মিষ্ট দ্রব্য কিনিয়া ঐ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ব্রহ্মানন্দজীকে দেখিয়াই স্বামীজী সোল্লাসে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "রাজা, তোর জন্য এই খাবার নিয়ে এসেছি—তুই খা।"

বস্তুতঃ ইঁহাদের সৌহৃদ্য ছিল অতি গভীর ও অপূর্ব। স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমি মুখে যাই বলি না কেন, তুমি আমার অন্তর জান," আর লিখিয়াছিলেন, "তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি, ও মঠে আর কেউ নেই যে সইবে।" কৈশোর হইতেই ইঁহারা পরস্পরকে জানিতেন; শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বনপূর্বক সেই বন্ধুত্ব অনুপম নিবিড়তর প্রেমে পরিণত হইয়াছিল।[৩]

আবার ইঁহারা পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধাও করিতেন যথেষ্ট। স্বামীজী একদিন মঠে পদচারণ করিতে করিতে অকস্মাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে প্রণামপুরঃসর বলিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" ব্রহ্মানন্দজীও তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।"[৪]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনীপাঠে আরও কয়েকটি ঘটনা অবগত হওয়া যায়। মঠের মূলবাটী ও পূজাগৃহ নির্মিত হইয়া গেলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যখন স্বামীজীরই

৩। স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতে উল্লিখিত আছে, দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার দিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর বিশ্রামকালে স্বামীজী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি অযথা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বকিতেছেন।

৪। এই ঘটনা সর্ববাদিসম্মত হইলেও ঘটনাস্থল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ'-এর মত অন্যরূপ (১৭২) পৃঃ।

অনুমোদনানুসারে সম্মুখের পোস্তা ও ঘাটের নির্মাণকার্যে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁটার সময় তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া নীচের ভিত প্রভৃতি গাঁথিতে হইত। এক দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া তিনি গলদঘর্ম হইয়া নিবিষ্টমনে কার্যপরিচালনা করিতেছিলেন, যাহাতে জোয়ারের পূর্বেই আরব্ধ অংশ শেষ হইয়া যায়:; জলপিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতে থাকিলেও তাঁহার অন্যত্র যাওয়ার অবকাশ ছিল না। উপরের বারাণ্ডায় স্বামীজী চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী বরফ দিয়া দুগ্ধপান করিতে করিতে অকস্মাৎ বিজ্ঞানানন্দকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন। পাত্র তখন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; তবু উহা সেবকের হাতে দিয়া বলিলেন, "যা, পেসনকে গিয়ে দে।" গ্লাসটি পাইয়া বিজ্ঞানানন্দ ভাবিলেন, এই অবস্থায়ও স্বামীজী ব্যঙ্গ করিতেছেন! তথাপি আদেশপালন ও প্রসাদধারণ করা উচিত, এই বুদ্ধিতে অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাই পান করিলেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মুখে যেন কে সুধা ঢালিয়া দিল, পিপাসা তখনই নিবৃত্ত হইল, শরীরও স্নিগ্ধ হইল।

স্বামীজীকে তিনি যেমন ভালবাসিতেন, তেমনি ভয়ও করিতেন। স্বামীজীকে বিরক্ত দেখিলে তিনি দূরে দূরে ঘুরিতেন, এবং স্বামীজী ডাকিলেও বলিতেন, "এখন মশায় কাজে খুব ব্যস্ত আছি, পরে আসব।" বেলুড়ে নবনির্মিত মঠ-বাড়ীর দ্বিতলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরখানি স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল; উহারই পার্শ্বে একখানি ঘরে বিজ্ঞানানন্দ শয়ন করিতেন। তিনি রাত্রে উঠিলে পদশব্দে পাছে স্বামীজীর নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে পা-টিপিয়া চলিতেন। তাঁহারই ঘরের পূর্বে ছিল দোতলার বারাণ্ডা। সেখানে স্বামীজী বেড়াইতেন। একরাত্রে বিজ্ঞানানন্দ শুনিয়াছিলেন, ঐ বারাণ্ডায় পদচারণ করিতে করিতে স্বামীজী দীর্ঘকাল ধরিয়া "(আমার) মা ত্বং হি তারা; তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা" ইত্যাদি গানটি অনেকক্ষণ যাবৎ গুনগুন করিয়া গাহিতেছেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা প্রথমে ততটা অনুভব করিতে পারিতেন না, স্বামীজীর নিকটই তিনি উহা প্রথমে জানিতে পারেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বেশী যেতাম না; তা স্বামীজী কি করে জানতে পারেন। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?' আমি বললাম, 'না, মশায়।' স্বামীজী বললেন, 'এক্ষুণি যাও, প্রণাম করে এস।' আমি তো মাকে প্রণাম করতে চললাম। মনে মনে ভাবছি, কোন প্রকারে একটা ঢিপ করে প্রণাম করে চলে আসব। মাকে প্রণাম

ক'রে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বললেন, 'সে কি পেসন! সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর—মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা!' আমি আবার সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে চলে আসি। আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে, স্বামীজী আবার পেছনে পেছনে আসবেন।"

স্বামীজীকে অতখানি সমীহ করিয়া চলিলেও উভয়ের মধ্যে সহজ সরল ভাববিনিময়ের অভাব ছিল না। একদিন স্বামীজী বলিলেন, "পেসন, দেশকালের উপযোগী করে নূতন স্মৃতি লিখতে হবে, বুঝলে? পুরনো স্মৃতি আর চলবে না।" বিজ্ঞানানন্দ অমনি উত্তর দিলেন, "মশাই, আপনার স্মৃতি চলবে কেন, দেশ নেবে কেন?" স্বামীজী ইহা শুনিয়া যেন ছোট ছেলেটির মতো অভিমানভরে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাখাল, শোন, শোন! পেসন বলে আমার কথা নাকি দেশ নেবে না।" ব্রহ্মানন্দ ব্যাপারটা সহজেই বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত মধ্যস্থের ন্যায় উত্তর দিলেন, "পেসন কি জানে? ও ছেলেমানুষ! তোমার কথা দেশ একদিন নিশ্চয় নেবে।" স্বামীজীর তখন কত আনন্দ! বলিলেন, "শুনলে পেসন? দেশ আমার কথা নেবেই।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন পাশ-করা ইঞ্জিনিয়ার; কিছুকাল সরকারী উচ্চপদেও নিযুক্ত ছিলেন। তাই ইঁহার কার্যকরী বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর স্বামীজীর খুব বিশ্বাস ছিল। কাশ্মীর-ভ্রমণ সমাপনান্তে স্বামীজী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য দেখাইয়াছিলেন এবং বেলুড়ের ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রথম নক্সা তাঁহারই দ্বারা আঁকাইয়াছিলেন। পরে (১৯৩৬-৩৮ খৃষ্টাব্দে) মন্দির নির্মাণকালে ঐ নক্সাই মূলতঃ গৃহীত হয়, যদিও উপযোগিতা ও সৌন্দর্য ইত্যাদির কথা ভাবিয়া কিছু কিছু পরিবর্তনও সংসাধিত হয়। ভাবী মন্দির সম্বন্ধে স্বামীজী এইরূপ বলিয়াছিলেন:

"এই ভাবী মঠ-মন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্প সম্বন্ধে যত সব ভাব নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব। বহুসংখ্যক জড়িত-স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাট-মন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত-সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র ব'সে ধ্যানজপ করতে পারে, নাট-মন্দিরটি এমন বড় ক'রে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাট-মন্দিরটি এমন ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর

থেকে দেখলে ঠিক 'ওঙ্কার' বলে ধারণা হবে। মন্দিরমধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এইসব ভাব রয়েছে, এখন জীবনে কুলোয় তো কাজে পরিণত ক'রে যাব। নতুবা ভাবী বংশীয়েরা ঐগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করতে পারে তো করবে। আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে। সেজন্য ধর্ম, কর্ম, বিদ্যা, জ্ঞান, ভক্তি—সমস্তই যাতে এই মঠকেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমন ভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে তুলতে হবে।" ('বাণী ও রচনা', ৯।১৯১)।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে আমরা যেমন স্বামীজীর চরিত্রে কোমল-কঠোরের এক অপূর্ব সমাবেশ দেখিয়া আসিয়াছি, স্বামী প্রেমানন্দ-সম্পর্কিত একটি ঘটনায়ও তাহাই দেখিতে পাই। একদিন অপরাহ্নে স্বামীজী মঠ-বাড়ীর বারাণ্ডায় অনেককে লইয়া বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন; ক্রমে সন্ধ্যা হয় হয়, তখনও পাঠ চলিতেছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূর্বেই মাদ্রাজে চলিয়া যাওয়ায় স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম) পূজা ও আরাত্রিকাদির ভার লইয়াছিলেন। আরাত্রিকাদি-কার্যে তাঁহাকে যাঁহারা সাহায্য করিতেন, তাঁহারাও সেই পাঠচক্রে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ প্রেমানন্দজী আসিয়া নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদিগকে ডাকিলেন, "চল হে চল, আরতি করতে হবে, চল।" তখন একদিকে সকলে স্বামীজীর সম্মুখে বেদান্তপাঠে নিরত, অপরদিকে তাঁহারই গুরুভ্রাতার আদেশ, আরতিতে যোগ দিতে হইবে; নবাগতেরা বেশ একটু ফাঁপরে পড়িলেন। এদিকে বেদান্তপাঠে ও চিন্তাধারায় বাধাপ্রাপ্ত স্বামীজী উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানি ছবির সামনে সলতে-পোড়া নাড়লে আর ঝাঁজ পিটলেই মনে করেছিস বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়? তোরা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি—।" এইরূপ বলিতে বলিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, বেদান্তচর্চায় বাধা দেওয়ার জন্য আরও কর্কশবাক্য শুনাইতে লাগিলেন। ফলে বেদান্তপাঠ বন্ধ হইয়া গেল—কিছুক্ষণ পরে আরতিও শেষ হইল। আরতির পরে কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দকে কোথাও দেখা গেল না। তখন স্বামীজীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া "সে কোথায় গেল, সে কি আমার

গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল ?”—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলকে চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে পাঠাইলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহাকে ছাদে বিষণ্নমনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বামীজীর নিকট লইয়া আসা হইল। তখন স্বামীজী সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে বহু যত্ন করিলেন ও বহু মিষ্ট কথা বলিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, “গুরুভাই-এর প্রতি স্বামীজীর অপূর্ব ভালবাসা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। কেবল যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া উদারতর হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। পরে স্বামীজীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, যাঁহাকে স্বামীজী বেশী গালাগালি দিতেন, তিনিই তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র।” (ঐ, ৯।৩৫৬)।

এইসঙ্গে গুরুভ্রাতাদের সহিত রসিকতাও ছিল। সরলমনা স্বামী অদ্বৈতানন্দকে (বুড়ো গোপালদাকে) স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন, “গোপালদা এবারে গুডফ্রাইডে সোমবারে পড়েছে।” স্বামীজীর ঠাট্টাকে গোপালদা বিশ্বাসভরে শুনিয়া বলিলেন, “বাঃ, আশ্চর্য তো!” অমনি উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার স্মৃতিলিপিতে ভগিনী নিবেদিতা ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। (‘রেমিনিসেন্সেস’, ৩৫১-৭১ পৃঃ)। স্বামীজী তখন বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে আছেন। হলঘরে জনকয়েক বসিয়া আছেন ও স্বামীজী পার্শ্বের গৃহে বিশ্রাম উপভোগ করিতেছেন। এমন সময় ভগিনী নিবেদিতা সেখানে আসিলেন—অতি সৌম্য মূর্তি, পরিধানে প্রায় পদতল পর্যন্ত বিস্তৃত হালকা গেরুয়া রঙ-এর আলখাল্লা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি স্বামীজীর গৃহের দ্বারদেশে গিয়া নতজানু হইয়া করজোড়ে ও পরে ভূমিস্পর্শপূর্বক ভারতীয় রীতিতে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে করযোড়ে নতজানু থাকিয়া স্বামীজীর সহিত দুই-চারিটি কথা বলিলেন, গৃহে প্রবেশ করিলেন না।

তিনি চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সেখানে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে জনকয়েক শিষ্য মৃদঙ্গ ও করতাল লইয়া আসিয়াছিলেন। এই দলটি অপর সকল হইতে একটু পৃথকভাবে এক কোণে গিয়া বসিলেন। গোসাঁইজীকে দেখিবামাত্র স্বামীজী স্বগৃহ হইতে হলে প্রবেশ করিলেন ও হলের

মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। অমনি গোসাঁইজী তাঁহার পদধূলি লইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু স্বামীজী বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং গোসাঁইজীর পদধূলি লইতে হাত বাড়াইলেন। ফলতঃ কেহই কাহারও ধূলি লইতে পারিলেন না। আর একবারও ঐরূপ বৃথা চেষ্টার পর স্বামীজী হাত ধরিয়া গোসাঁইজীকে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। বিজয়কৃষ্ণ তখন ভাবে আত্মহারা ছিলেন। তাঁহার ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে স্বামীজী তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু পুনর্বার গোস্বামীজীর ভাবাবেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাক্যস্ফুরণ হইল না; তিনি শুধু বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর কৃপা করে আমায় আশীর্বাদ করেছেন।" তারপর তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন ও তাঁহার কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। অমনি তাঁহার শিষ্যবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গোসাঁইজীর ভাব কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও তাঁহার পদস্খলন হইতেছিল; তাই শিষ্যবৃন্দ তাঁহাকে সন্তর্পণে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

কিছু পরে মন্মথবাবুও দূর হইতে স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন—চরণস্পর্শ করিলেন না—এবং স্বামীজীর সহিত দুই-একটি কথা বলিয়াই গৃহে ফিরিয়া গেলেন। মন্মথবাবুর এই আচরণে ঐ কালের বাঙ্গালী সমাজের মনোভাবই কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। মন্মথবাবু নিজেই লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার এক ব্রাহ্ম বন্ধু—নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট স্বামীজীর সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম হইলেও পূর্বেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদা দেবীর শ্রীচরণদর্শনে ভক্তিবিহ্বল হইয়া সস্ত্রীক তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সব ঘটনা জানা থাকিলেও এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অশেষ ভক্তিমান ও স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেও মন্মথবাবুর ব্রাহ্মণত্বাভিমান তাঁহাকে স্বামীজীর পাদস্পর্শ করিতে দিল না। স্বামীজী তথাপি তাঁহার সহিত দুই-চারিটি বাক্যালাপ করিলেন এবং তখন মন্মথবাবুর মনে হইল, তাঁহার জাত্যভিমান যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তিনি ঐ অবস্থায়ই সেই দিনকার মতো বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় বার যখন মন্মথবাবু স্বামীজীর দর্শনে বেলুড়ে যান, তখন ডিসেম্বর মাস (১৮৯৮?)। স্বামীজী রান্নাঘরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার হস্তে ছিল একটি পশমের টুপি ও গায়ে পশমের ড্রেসিং গাউন—সাদা

জমির উপর কালো রঙ-এর ছক কাটা। স্বামীজীর রঙ ছিল ফরসা; আবার তাঁহার অন্তরের আত্মজ্যোতিতে উহা বেশ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। মুখে ছিল অপূর্ব সৌম্যভাব ও বিশাল লোচনদ্বয়ে ছিল এক দিব্য আকর্ষণী শক্তি। মন্মথবাবু আজ নিঃসঙ্কোচে সে লোকোত্তর পুরুষের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন ও শিষ্যবৎ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পার্শ্বেই একটি ছোট তাঁবুতে চা-পানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্বামীজী মন্মথবাবুকে ডাকিয়া সেখানে লইয়া গেলেন, এবং চা খাইতে খাইতে অনেক কথা বলিলেন। তারপর মঠপ্রাঙ্গণের পূর্বদিকে মঠ-বাড়ীর (পশ্চিমের?) বারাণ্ডায় বসিয়া কথাবার্তা হইল। স্বামীজী সেখানে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন, এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, ও স্বামী সারদানন্দ বেঞ্চিতে উপবিষ্ট ছিলেন। স্বামীজী সেদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয় হইয়াছিল এবং এইরূপ পরিস্থিতি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফরাসী দেশে পরবর্তী প্রকল্পিত মহাসভাকে ধর্মীয় মহাসভা না বলিয়া ধর্মেতিহাসের মহাসভায় পরিণত করার জল্পনা চলিতেছিল।[৫] আমেরিকায় স্বামীজীর পত্রের বাক্সে এমন সব পত্র আসিত যাহাতে তাঁহাকে হিন্দুধর্ম-প্রচার বন্ধ না করিলে দণ্ডপ্রদানের ভয় দেখানো হইত; অবশ্য বন্ধুত্বপূর্ণ পত্রও আসিত ততোধিক। ফলতঃ সেদিন মন্মথবাবুর মনে তখনও প্রাচীন সংস্কারোদ্ভূত যেটুকু দ্বিধা ছিল, তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল।

৫। প্যারিসের সভা হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। স্বামীজী মন্মথবাবুকে উহার উদ্যোগপর্বের কথা বলিতেছিলেন। ডিসেম্বর মাসে এই সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া পূর্বে উল্লেখ থাকিলেও উহা ঠিক নাও হইতে পারে, কারণ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে স্বামীজী নূতন বাড়ীতে বাস করিতেন না।

বেলুড় মঠে গুরুভাই ও শিষ্যবৃন্দ সহিত স্বামীজী, ১৮৯৯

নবীন সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, ধর্মভিত্তিক ত্যাগ ও সেবা অবলম্বনে ভারতে নূতন জাগরণের সূত্রপাত করিতে, আর সেই নব আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন একদল সন্ন্যাসীকে যাঁহারা নবীন যুগের বার্তাবহ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠাপক হইবেন, যাঁহারা মন-মুখ এক করিয়া স্বার্থচিন্তাশূন্য হইয়া এবং "অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া" মূর্খ-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, আর্ত-নারায়ণ ও সর্বাবস্থার নরনারীর সর্বার্থক উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন এবং এইভাবে তাহাদের ভগবান লাভের পথ বাধাহীন বা সুগম করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুক্তিদ্বারও অর্গলমুক্ত করিবেন, যাঁহারা "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" জীবন উৎসর্গ করিবেন। এই বিরাট কর্মপ্রচেষ্টা নেতিমূলক বেদান্তবাদ হইতে উৎসারিত হইতে পারে না—ইহাই ছিল তদানীন্তন পণ্ডিতবর্গের ধারণা। কিন্তু স্বামীজী কার্য ও কথায় দেখাইলেন অন্যরূপ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন অবলম্বনে অদ্বৈত-বেদান্তবাদী সাধুরা আরম্ভ করিলেন বনের বেদান্তকে সর্বত্র ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য প্রচেষ্টা। আর তাঁহাদের কর্ণে বাজিতে লাগিল স্বামীজীর বাণী—"যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়।" শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ছিল অদ্বৈতের সঙ্গে কর্মের মিলন; স্বামীজীর জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

ভারতে বসিয়া ভারতকে তিনি প্রাধান্য দিলেন; কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে—স্বামীজী শুধু ভারতের নহেন, তিনি বিশ্বের। অতএব তিনি সন্ন্যাসীদের কর্তব্য নির্দেশস্থলে বলিলেন "জগদ্ধিতায়", তিনি বলিলেন না—শুধু ভারতহিতায়।

আবার ধর্মের যে রূপ তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইল তাহা গতানুগতিকের পুনরাবৃত্তি নহে। তিনি উহার যে নিষ্কর্ষ সকলের সম্মুখে স্থাপন করিলেন, তাহা অনেকাংশেই অভিনব, অথচ কোন অংশেই উহা হিন্দু মতের বা বেদান্ত-বাদের বহির্ভূত নহে। এ পর্যন্ত ভাষ্য ও টীকাদিতে একই ব্যক্তির জীবনে জ্ঞান ভক্তি কর্ম ও যোগের সমন্বয় সাধন বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, বরং

হিন্দুসাধারণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, এইগুলি পরস্পরনিরপেক্ষ, এমনকি পরস্পরবিরোধী সাধন মার্গ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাবলম্বনে স্বামীজী দেখিলেন, মানুষের জীবনকে এমনভাবে একটা কৃত্রিম ভাগে বিভক্ত করা চলে না। ব্যক্তি বিশেষের জীবনে এই চারিটি যোগমার্গের মধ্যে কোনও একটির প্রাধান্য থাকিলেও প্রকৃত মানুষ এইগুলির সমন্বয়েই গঠিত—সকলেরই জীবনে থাকে অল্পাধিক বিচার, ভক্তি, সৎকর্মস্পৃহা ও নীরব-ধ্যানপরায়ণতা। সুতরাং স্বামীজী স্পষ্টই নির্দেশ দিলেন যে, তাঁহার পরিকল্পিত মঠজীবনে এই চারি মার্গেরই সমন্বয় ঘটিবে—শুধু সামূহিক ভাবে সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক স্তরে নহে, প্রাতিস্বিকভাবেও বটে। তিনি বলিলেন যে, প্রত্যেককেই কর্ম বিভাগের কার্য কিছু না কিছু করিতে হইবে; আর যিনি চতুর্মার্গের সমন্বয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে প্রকৃষ্ট রূপে গঠিত হয় নাই।

স্বামীজীর পরিকল্পিত কর্মমার্গকে কিন্তু কর্মযোগের সমার্থক বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কর্মযোগে ঈশ্বরার্থে ফলার্পণের নির্দেশ আছে; স্বামীজীর 'কার্যে পরিণত বেদান্তে' নিজের জন্য ফল অর্জনান্তে ভগবানকে অর্পণের কথাই উঠে না; কারণ এখানে আদ্যন্ত সমস্ত প্রচেষ্টাই ভগবানের জন্য—ফলোৎপত্তির পূর্বেও উহা ভগবানের, মধ্যাবস্থায়ও ভগবানের এবং সমাপ্তিতেও ভগবানের। শিবজ্ঞানে জীবের সেবার মূল কথাই তাই; এখানে স্বার্থচিন্তার অবকাশ নাই। তারপর কর্ম বলিতে টীকাকার ও ভাষ্যকারগণ যাগযজ্ঞ ও ইষ্টপূর্তাদি শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কাণ্ডকেই বুঝিয়াছেন। স্বামীজীর মতে যে কোন সৎ কর্মকেই ঈশ্বরারাধনার অবলম্বন রূপে গ্রহণ করা চলে; কর্মমাত্রকেই পূজায় পরিণত করা চলে। অধিকন্তু ঈশ্বর যদি মন্দিরে বা মঠে সাধককে দর্শন দিয়া তৃপ্ত করেন, তবে তিনি চাষার গোলাবাড়ীর আঙ্গিনায় কিংবা শ্রমিকের কারখানার দরজায় দেখা দিবেন না, ইহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই। প্রাচীন সাধকমণ্ডলীতেও ইহা স্বীকৃত যে, ভগবানকে সরল মনে ঐকান্তিক ভক্তিভরে ডাকিলে তিনি সর্বত্র সর্বপথে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আর ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণোপলব্ধ সমন্বয়ের মর্মকথা। আবার পূর্বসূরীদের মতে কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তিলাভ ও ভক্তি পরিপক্ক হইলে জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু মতবাদ হিসাবে এই তত্ত্বের প্রতি অগ্রসর না হইয়া স্বামীজী বাস্তব সাধকজীবন ও সিদ্ধির আলোকসম্পাতে দেখিলেন কার্যে পরিণত বেদান্তেরই মধ্যে এমনভাবে চতুর্মার্গের সমন্বয় ঘটিয়াছে, এবং

পরার্থে কর্মব্যাপৃত থাকার সমকালেই ভক্তি জ্ঞান ও ধ্যানের এমন উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে যে, কার্যে পরিণত বেদান্ত হইতে শুধু পরম্পরাক্রমে নহে, প্রত্যুত সাক্ষাৎভাবেও মুক্তিফল আসিতে পারে। জনকাদির জীবন ইহাই প্রমাণ করে—যদিও উহা দুর্লভ; তবে অন্যপ্রকারে মুক্তিপ্রাপ্তিও তদপেক্ষা সহজ নহে। বস্তুতঃ লক্ষ্যে পৌছিবার পক্ষে মার্গ অপেক্ষা ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ও সরল অকপট সাধনাই অধিক ফলপ্রদ। মনে রাখিতে হইবে আমরা কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভের অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি না, কর্মাকারে অভিব্যক্ত ও উপলভ্যমান অদ্বৈতজ্ঞান হইতে মুক্তির কথাই বলিতেছি।

কর্ম হইতে চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইতে পর পর ভক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হইয়া মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে—এইরূপ ক্রম তর্কস্থলে অস্বীকার না করিলেও স্বামীজী দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি অবলম্বনে এই কথাই প্রায়শঃ বলিতেন যে, সাধনা হিসাবে যোগসমূহের এই প্রকার পরম্পরার কথা ভুলিয়া গিয়া বরং দ্বৈত হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত হইতে অদ্বৈতানুভূতির পারম্পর্য স্বীকার করা উচিত। ইহাই যুক্তিসম্মত মানসিক বিকাশ; প্রত্যুত বাস্তব জীবনে সাধনার দৃষ্টিতে কর্ম-বিরহিত ভক্তি বা জ্ঞান, ভক্তি-বিচ্যুত জ্ঞান বা ধ্যান, অথবা জ্ঞান সম্পর্কশূন্য কর্ম বা ধ্যান ইত্যাদি নিছক কল্পনামাত্র। এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীরই সহিত ছিল তাঁহার কার্যে পরিণত বেদান্তের অধিকতর সামঞ্জস্য।

আর যেসব ভাব বা আচরণ ধর্মের নামে নির্বিচারে অনুসৃত বা অনুষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে অবনতি ঘটায়, তিনি ছিলেন তাহার উপর খড়্গহস্ত। উহাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক ভাব অত্যুত্তম হইলেও অনুকরণপ্রিয় অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া অকল্যাণের আকর হয়। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে।...যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবনলীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।...বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধিসহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ ক'রে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।...এই ঘোর কামকাঞ্চনাসক্তির সময় ঐ (বৃন্দাবন-) লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না।" ('বাণী ও রচনা', ৯।১৪৫)। স্বামীজীর মতে সঙ্কীর্তনের মাতামাতিতে

ক্ষণিক উদ্দীপনা হইলেও উহার প্রতিক্রিয়াকালে মন তমঃতে ডুবিয়া যায়; তান্ত্রিক বহু আচারও এই হিসাবে সর্বসাধারণের পক্ষে অবশ্য বর্জনীয়।

শঙ্করাচার্য মায়াকে মিথ্যা বা অনির্বচনীয় বলিলেও সাধারণ অদ্বৈতবাদী বলেন, "জগৎ অলীক"; 'মিথ্যা' ও 'অলীক'-এর পারিভাষিক বিবাদ ছাড়িয়া স্বামীজী বলেন, মায়া স্বাভাবিক অবস্থার হুবহু পটচিত্রমাত্র। পরস্পর-বিরুদ্ধ পরিস্থিতিরাশির সমষ্টিস্বরূপ এই জগৎ পরম সত্য বা চরম আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে না—এই বিরোধরাশির, এই অস্থিরতার মধ্যে একমাত্র দ্বৈতাতীত চরম সত্য বস্তু আমাদের স্বীয় আত্মা—আর সে আত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন। জগৎ তখনই মায়াময় বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, যখন আমরা উহাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করি। বস্তুতঃ একই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সর্বত্র অনুস্যূত; ভক্তি, মুক্তি, জ্ঞান, ধ্যান, ধর্ম, কর্ম—যাহা কিছু সবই এই আত্মাকে লইয়া। যে যত স্বীয় ক্ষুদ্র আমিত্বকে বর্জনপূর্বক পরমাত্মার সহিত একত্বানুভব করিবে সে তত ধার্মিক, ততই মায়াবর্জিত ও মুক্তির নিকটবর্তী। অতএব ত্যাগের অর্থ হইল—একমাত্র ভগবানকে প্রকৃতরূপে গ্রহণ করা—স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পরমার্থে নিমজ্জিত হওয়া। ইহাই হইল সমস্ত ধর্মের, সর্বপ্রকার নীতিবাদের বনিয়াদ—অধ্যাত্মজীবনের মূল ভিত্তি। স্বামীজী মায়াবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্রহ্মবাদী।

স্বামীজীর প্রতিষ্ঠাপিত সন্ন্যাসাদর্শের মধ্যে লক্ষণীয় তত্ত্ব এই যে, তিনি ব্যক্তিগত মুক্তি কামনাকেও স্বার্থপরতার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন এবং সমষ্টির মুক্তির জন্য আত্মবলিদানকেই উচ্চতর আসন দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যে পর্যন্ত দেশের একটা কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে, আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়াবার চেষ্টা করা।" "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"—তিনি নিজে আচরণ করিয়াছিলেন, আর অপরকেও আত্মোৎসর্গের জন্য আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছিলেন, "তোর আমার মতো কীট হচ্ছে মরছে; তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল। তোরাই তো দেশের আশা ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে বড় কষ্ট হয়। লেগে যা! লেগে যা! দেরী করিস না—মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে। আর পরে করবি বলে বসে থাকিসনি—তাহলে কিছু হবে না।...মানুষের দুঃখে যাহারা সহানুভূতি দেখাতে না পারে, তারা

আবার কিসের মানুষ ?” “তোমরা কি মানুষকে ভালবাস ? তাহলে এসো, ভাল হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে যেও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ এরূপ এক সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো, মানুষ চাই, জন্তু নয়।”

স্বামীজীর সাধ ছিল—এই আত্মবলিদানে অগ্রসর যুবকদের লইয়া সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ গঠন করিবেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি অবসর সময়ে নবাগত সাধু-ব্রহ্মচারীদের ও গুরুভ্রাতাদের লইয়া শাস্ত্রালোচনা ও বিচারাদি করিতেন, ঠাকুরঘরে নিয়মিত ধ্যানে বসিতেন, পুজা-অর্চাদিতে যোগ দিতেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবিধ কর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করিতেন। তিনি জানিতেন, উপযুক্ত কর্মী প্রস্তুত হইলে কাজ আপনা হইতেই চলিতে থাকিবে। এইজন্য তিনি মানুষগঠনের কার্যেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। এই শিক্ষাকার্য আবার যত্নসাধ্য না হইয়া অনেক ক্ষেত্রে আপনা হইতেই সংসাধিত হইত। তিনি শুধু সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেই অর্ধেক কার্য নিষ্পন্ন হইয়া যাইত। কাজের মধ্যে ছোট বড় ছিল না—তাঁহার ইচ্ছানুসারে কেহ রন্ধন, কেহ বক্তৃতাপ্রদান, কেহ আর্তের সেবা ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন এবং বিশ্বাস রাখিতেন যে, উহাতেই শ্রেয়োলাভ হইবে। তিনি বলিতেন, “যে কাজই হউক, খুব মনোযোগের সহিত করা চাই। যে ঠিকভাবে এক ছিলিম তামাক সাজতে পারে, সে ঠিক ধ্যান-ধারণাও করতে পারে। যে রান্নাটাও ভাল করে করতে পারে না, সে কখনও পাকা সাধু হতে পারে না। শুদ্ধ মনে একচিত্তে না রাঁধলে খাদ্যদ্রব্য সাত্ত্বিক হয় না।” বক্তৃতাপ্রদান শিখাইবার কালে কোন সাধুকে অত্যধিক লাজুক মনে হইলে বলিতেন—“দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাকে লজ্জা দূর করবার বড় একটা সুন্দর উপায় বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যখন লোক দেখে লজ্জা হবে তখন মনে করবি, ‘লোক না পোক’!” এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা শিষ্যদের লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহারা ধর্মের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে বক্তৃতা দিতে থাকিতেন এবং স্বামীজীও মধ্যে মধ্যে “বেশ হচ্ছে, বাহবা” ইত্যাদি বলিয়া উৎসাহ দিতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “চেষ্টা করলে কালে এ খুব ভাল বক্তা হবে।” কাজের বিচার তিনি সাফল্যের দিক হইতে না করিয়া উৎসাহ, উদ্যম, ঐকান্তিকতা ইত্যাদির মাপকাঠিতে করিতেন—যে যতটা পারে হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতার শিখুক, ইহাই ছিল

তাঁহার ভাব। তখন স্বামী সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি প্রাচীনেরা দর্শনাদি শিক্ষা দিতেন এবং সকলেই ধ্যানাদির জন্য ঠাকুরঘরে যাইতেন ; কিন্তু মঠের কার্যের ভার ছিল যুবকদের উপর। স্বামীজী বলিতেন, "ওদেরও একটু স্বাধীনতা থাকা চাই, ওদেরও দায়িত্ববোধ হওয়া চাই ; না হলে এর পরে বড় বড় কাজ করবে কি করে ?"

আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধা জাগাইবার জন্য তিনি বলিতেন, "জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান লোকের ইতিহাস। বিশ্বাসই ভিতরের দৈবীশক্তিকে জাগ্রত করে। বিশ্বাসবলে মানুষ যা খুশী করতে পারে। কেবল তখনই মানুষ অকৃতকার্য হয় যখন সে অনন্ত শক্তি বিকাশের চেষ্টা বর্জন করে। যে মুহূর্তে একটা মানুষ বা একটা জাত নিজের উপর বিশ্বাস হারায় সেই মুহূর্তে সে মরে। প্রথমে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর, তারপর ভগবানে বিশ্বাস। একমুঠো শক্তিমান লোক জগৎটাকে টলমল করে ফেলতে পারে। আমাদের চাই অনুভব করবার হৃদয়, চিন্তা করবার মস্তিষ্ক, আর কাজ করবার হাত।"

স্বামীজীর কথা ছিল, "জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" পর্যন্ত সর্বকার্যের জন্য মঠের সাধুদিগকে মনের দিক ও শিক্ষার দিক হইতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। রন্ধন, সঙ্গীত, উদ্যানরচনা, পশুপালন ইত্যাদির সহিত শরীর-চর্চার উপরও তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। স্বাস্থ্য-রক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় তজ্জন্য তাঁহার উপদেশ ও আগ্রহপূর্ণ বহু পত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেন, "আমি চাই ধর্মপথের একদল কর্মঠ সৈনিক ; অতএব বাবারা, তোমরা তোমাদের পেশীগুলোকে দৃঢ় করার কাজে লেগে যাও। সন্ন্যাসীদের পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধন ভাল বটে, কিন্তু কর্মীদের পক্ষে প্রয়োজন সুগঠিত দেহ—লৌহবৎ দৃঢ় পেশী ও ইস্পাতের মতো শক্ত স্নায়ু।" সাধুদের পক্ষে অধ্যয়নের প্রয়োজনও তিনি সর্বতোভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিতেন এবং স্বয়ং সকলকে লইয়া শাস্ত্রাধ্যয়নাদি করিতেন। অন্যান্য বিষয়ও তাঁহাদের জানা আবশ্যক ; কারণ সমাজ-কল্যাণ-সাধনে যাঁহারা ব্রতী হইবেন, তাঁহাদের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে একদিকে যেমন জটিল ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক ধর্মীয় সমস্যাদি সমাধান করা সম্ভব নহে, অপরদিকে তেমনি দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী বিধিব্যবস্থা ও নিয়মাদির প্রচলনবিষয়ে সক্রিয় হওয়াও সুসাধ্য নহে। বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য যে সন্ন্যাসজীবনের মূলভিত্তি—ইহা তাঁহার প্রতিকথায় প্রকাশ পাইত। তিনি বলিতেন, "ব্রহ্মচর্য প্রতি শিরায় শিরায়

আগুনের মতো জ্বলবে"; "সন্ন্যাসীর জীবন অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে একটা তুমুল সংগ্রাম; সুতরাং যদি জয়ের আশা করতে চাও তবে কঠোর তপস্যা, আত্মনিগ্রহ ও ধ্যানধারণায় লাগিয়া যাও।"

মনে রাখিতে হইবে—স্বামীজীর প্রকল্পিত সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের প্রত্যেকের জীবন উৎসর্গিত হইবে "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ"। কিন্তু প্রস্তুতি ও কার্যক্ষেত্রে কর্মব্যাপৃতির মধ্যে তিনি একটা পার্থক্য করিতেন। মঠজীবনের প্রথমাবস্থায় যথেষ্ট সাবধানে চলা আবশ্যক। দেওঘরে যাইবার পূর্বে তিনি নবাগত ব্রহ্মচারীদের উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আহারসংযম ব্যতীত চিত্তসংযম অসম্ভব। অতিভোজন থেকে অনেক অনর্থ হয়। ওতে শরীর ও মন দুইই জাহান্নমে যায়। তা ছাড়া প্রথম অবস্থায় হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খাওয়া বিঘ্নকর। গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা ভাল নয় বটে, তবে প্রথম প্রথম নিষ্ঠাবান হওয়া খুব ভাল এবং দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করা দরকার। তারপর যা খুশী করো—ইচ্ছা করলে পুরো সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পার, আবার মঠ ছেড়ে চলেও যেতে পার। তবে একটা কথা ভুলো না যে, যখন দেখবে সন্ন্যাস-আদর্শ থেকে পেছিয়ে পড়ছ, এ কঠোর জীবনের পক্ষে তুমি অনুপযুক্ত, তখন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করা বরং ভাল, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম কলুষিত করা অনুচিত। সকালে উঠবে, ধ্যানজপ করবে, আর খুব তপস্যা লাগাবে, স্বাস্থ্য আর সময়মত খাওয়া-দাওয়ার উপর খুব নজর রাখবে। আর কথাবার্তা কইবে শুধু ধর্মসম্বন্ধে। শিক্ষাবস্থায় এমনকি খবরের কাগজ পড়া বা গৃহস্থদের সঙ্গে মেশাও ভাল নয়।"

সাধুজীবন যাহাতে সাংসারিক জীবনের প্রভাবে কলুষিত না হয়, তজ্জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "সন্ন্যাসীদের কার্যে—যথা মঠ ও মণ্ডলী পরিচালনা, জনসমাজে ধর্মপ্রচার ও অনুষ্ঠানপ্রণালীর প্রবর্তন, ত্যাগ ও ধর্মমতামত সম্বন্ধীয় স্বাধীন চিন্তার সীমানিরূপণ ইত্যাদিতে···কামকাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মতামত দেবার কিছুমাত্র অবসর থাকা উচিত নয়। সন্ন্যাসী ধনীলোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না—তার কাজ গরিবকে নিয়ে। সন্ন্যাসীর কর্তব্য খুব যত্নের সঙ্গে প্রাণপণে গরিবদের সেবা করা এবং এরূপ সেবা করতে পারলে পরমানন্দ অনুভব করা। আমাদের দেশের সকল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ভিতর ধনীলোকের তোষামোদ করা এবং তাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করার ভাব প্রবেশ করাতে সেগুলি উৎসন্ন যেতে বসেছে।" ('বাণী ও রচনা', ১০।১৯২)।

বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিয়া তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কোন গৃহস্থ সাধুদের বিছানায় বসিতে পারিবেন না এবং উভয় শ্রেণীর ভোজনাদি পৃথকভাবে হইবে।

একটি ঘটনা এই বিষয়ে খুবই শিক্ষাপ্রদ। একসময়ে স্বামী যোগানন্দের আদেশে নিষ্কলঙ্কচরিত্র ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল (পরবর্তী কালের স্বামী ধীরানন্দ) কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন এবং তজ্জন্য শ্রীমায়ের আত্মীয়াদের ও ভক্তমহিলাদের সহিত মিশিতে হইত। স্বামীজী কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে এই ব্যবস্থা দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া স্বামী যোগানন্দকে দৃঢ়ভাবে স্বীয় বিরুদ্ধমত জানাইয়া দিলেন—শ্রীমায়ের সেবায় কাহারও অবনতি ঘটিতে পারে কিংবা উক্ত ব্রহ্মচারী দুর্বলচিত্ত ইত্যাদি কারণে নহে, প্রত্যুত একটা সাধারণ নিয়ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে, যাহাতে অদৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ঐরূপ পরিবেশমধ্যে পড়িয়া আদর্শচ্যুত না হয়। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, স্বামীজী যদিও সাধারণ নিয়মের প্রয়োগ হিসাবে ঐরূপ সেবাকার্যে আপত্তি জানাইয়াছিলেন, তথাপি স্বামী যোগানন্দ যখন বলিলেন, ব্রহ্মচারীর দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিবেন, তখন আর কিছু না বলিয়া নীরব হইলেন, ব্রহ্মচারীও তখনকার মতো ঐ কার্যে নিযুক্ত রহিলেন।

আর তিনি জোর দিতেন আজ্ঞাবহতার উপর। এক সময়ে তিনি কাজের অব্যবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "তোদের দেশে কি করে কাজ করব বল? এখানে সকলেই কর্তা হতে চায়, কেউ কারুকে মানতে চায় না। বড় কাজ করতে গেলে সরদারের হুকুম চোখ বুজে মানতে হয়। আমার গুরুভাইরা যদি আজ আমায় বলে, আজ থেকে শেষদিন পর্যন্ত আমায় মঠের নর্দমা সাফ করতে হবে, ঠিক জানিস আমি দ্বিরুক্তি না করে এখন তাই করতে থাকব। যে হুকুম তামিল করতে পারে, সেই সরদার হয়।"

পরার্থে আত্মোৎসর্গের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "শোন্, শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের জন্য এসেছিলেন, আর জগতের জন্য প্রাণটা দিয়ে গেলেন। আমিও প্রাণটা দেবো, তোদেরও সকলকে দিতে হবে। এখন যা হচ্ছে দেখছিস, এ শুধু আরম্ভ। তবে ঠিক জানিস, এই যে আমার হৃদয়ের রক্তপাত করে যাচ্ছি এর ফলে এমন সব বীর উৎপন্ন হবে, ভগবানের কাজের জন্য এমন সব মহারথী বেরুবে যারা সমস্ত পৃথিবীটা ওলট-পালট করে ফেলবে।" আর বলিতেন, "কিছুতেই যেন ভুলিসনি যে, জগতের সেবা ও ঈশ্বরপ্রাপ্তিই হচ্ছে সন্ন্যাসীর

শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাতেই লেগে থাকবি। সন্ন্যাসমার্গের মতো কোন পথে এত সাক্ষাৎ ফল হয় না। সন্ন্যাসী ও পরমাত্মার মাঝখানে অন্য কোন দেবতা নেই। সন্ন্যাসী বেদের মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৮১০ পৃঃ)।

নিয়ম সম্বন্ধে, স্বামীজীর কিছু কিছু নিজস্ব ও নৈর্ব্যক্তিক ধারণা ছিল। তিনি যখন মঠের জন্য কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তখনও আমরা তাঁহার একটা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। স্বামী শুদ্ধানন্দের (বা তদানীন্তন সুধীর-এর) স্মৃতিলিপি ('বাণী ও রচনা', ৯।৩৪২-৪৪) হইতে জানা যায়, মঠ যখন আলমবাজারে অবস্থিত ছিল, তখন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষভাগে স্বামী নিত্যানন্দ একদিন স্বামীজীকে বলিলেন, "এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।" স্বামী নিত্যানন্দ তখন মাত্র কয়েক দিন পূর্বে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা পাইয়াছিলেন। স্বামীজী স্বশিষ্যের অভিপ্রায় অনুমোদনপূর্বক বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, একটা নিয়ম করা ভাল বই কি। ডাক সকলকে।" সকলে আসিয়া বড় ঘরটিতে বসিলে স্বামীজী বলিলেন, "একজন কেউ লিখতে থাক, আমি বলি।" তখন এ উহাকে সামনে ঠেলিতে লাগিলেন —কেহই স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইলেন না। সুধীর অনেকটা বেপরোয়া ছিলেন; তিনিই অগত্যা সম্মুখে আসিয়া লিখিতে বসিলেন। ইনি তখন সবে নূতন আসিয়াছেন। স্বামীজী ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একবার শূন্যের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি থাকবে?" সন্ন্যাসিবৃন্দের মধ্যে একজন উত্তর দিলেন, "হাঁ"। তারপর নিয়মগুলি বলিবার পূর্বে স্বামীজী কহিলেন, "দেখ, এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে; কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কুনিয়ম রয়েছে—সুনিয়মের দ্বারা সেই কুনিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে—যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।"

"তারপর নিয়মগুলি লেখানো হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ-ধ্যান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজ নিজ শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন হইবে ও অপরাহ্নে সকলে মিলিয়া একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থাদি শুনিতে হইবে—এই

ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে একটু একটু করিয়া ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট হইল। মাদকদ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। সমুদায় লেখানো শেষ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'দেখ, একটু দেখে-শুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ—দেখিস যদি কোন নিয়মটা নেতিবাচকভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে ইতিবাচক করে দিবি'!" স্বামীজীর নীতিবাদ ছিল ইতিমূলক ; কারণ শুধু নেতির দ্বারা চরিত্র গঠিত হয় না, উহাতে মানুষকে দুর্বল করে মাত্র।

এই নিয়মগুলি এখনও 'আলমবাজার মঠের নিয়মাবলী' নামে পরিচিত ও প্রচলিত। পরে মঠ নীলাম্বরবাবুর বাটীতে উঠিয়া আসিলে আর এক প্রস্থ বিস্তারিত নিয়মাবলী রচিত হয়; উহা বেলুড় মঠের নিয়মাবলী নামে পুস্তিকাকারে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাকে নিয়মাবলী বলিলেও বস্তুতঃ ইহা শুধু বিধিনিষেধাত্মক পুস্তিকা নহে ; প্রত্যুত উহাতে মঠ-জীবন-পরিচালন, ভাবের উৎকর্ষসাধন, ঈশ্বর-লাভের উপায় নির্দেশ, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচার ইত্যাদির সহিত ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনের একটি সুপরিকল্পিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সমাজতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের কথাও আসিয়া পড়িয়াছে। উহার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি এই :

মঠস্থাপনের উদ্দেশ্য—নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ-সাধনে শিক্ষিত হওয়া। পুরুষদের মঠের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের জন্যও পৃথক্ মঠস্থাপন আবশ্যক। স্ত্রী-মঠের সহিত সন্ন্যাসীদের কোন প্রকার সংস্রব থাকিবে না, পুরুষের মঠেও সন্ন্যাসিনীদের সংস্রব থাকিবে না।

মঠে সর্বদা বিদ্যাচর্চা চলিবে এবং ত্যাগ ও তপস্যার ভাব সর্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে। প্রচারকার্যও অবিরাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

অনুরূপ মঠ পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন দেশে ইহলৌকিক অভাব ও কোন দেশে আধ্যাত্মিক অভাব অতীব প্রবল। যেখানে যেরূপ অভাব বর্তমান আছে, তাহার দূরীকরণপূর্বক তদ্দেশবাসীর ধর্মলাভের পথ সুগম করিতে হইবে। ভারতে অন্নাগমের উপায় প্রদর্শন করা প্রথম কর্তব্য।

সমাজ-সংস্কারের উপর মঠের দৃষ্টি থাকিবে না। সামাজিক কুরীতির উদ্ঘোষণে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া সমাজশরীরকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করাই মঠের কর্তব্য।

শিষ্যের আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও নিষ্কাম কর্মের মধ্যে এক বা দুই বা সমস্ত অবলম্বনে যে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রস্তুত এবং সচ্চরিত্র, ঈর্ষাশূন্য ও গুরু ও অধ্যক্ষের আদেশ পালনে তৎপর সে মঠের অঙ্গীভূত হইতে পারিবে।

সন্ন্যাসের জন্য আকাঙ্ক্ষাশূন্য সচ্চরিত্র বালক বা যুবকও মঠে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস ও চরিত্রগঠন করিতে পারিবে।

ধর্মের মধ্যদিয়া না হইলে ভারতবর্ষে কোন ভাব চলে না; অতএব অর্থোপার্জন, জ্ঞানচর্চা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি সমস্তই ধর্মভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের মূল নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ হওয়া। এই ভেদ নাশ না হইলে কল্যাণের আশা নাই।

মঠটি বিশ্বজনীন কল্যাণার্থ প্রকল্পিত; সুতরাং উহাকে কখনও বাবাজীদের ঠাকুরবাড়ীতে পরিণত করা চলিবে না। ঠাকুরবাটীর দ্বারা দুই-চারি জনের কিঞ্চিৎ উপকার হয়; কিন্তু এই মঠের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে।

এই মঠের প্রত্যেকের ভাবা উচিত যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্যে তিনি যেন শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করেন। মঠটি শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাব অবলম্বনে পরিচালিত হইবে—তাঁহার নামে কোন নূতন সম্প্রদায় গঠন করা চলিবে না। আমাদের সনাতন শাস্ত্র বেদই একমাত্র শাস্ত্ররূপে পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইবে ও গীতা যে প্রকার পুরাকালে ছিল সেই প্রকার ঠাকুরের উক্তিগুলি বেদমন্ত্রের আধুনিক সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যারূপে গৃহীত হইবে। সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত ধর্মীয় বিবাদ বিসংবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ধর্মমতকেই উপযুক্ত মর্যাদা দিয়াছেন। ঐ প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্রগঠনই এই যুগের উদ্দেশ্য এবং তাহার জন্যই সকলের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।

সাধনপ্রণালীর কোন সর্বজনীন নিয়ম নাই; তবে লোকসাধারণের জন্য কিঞ্চিৎ ভক্তি ভজন ও কর্মপরিণত জ্ঞান—"অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর" (শ্রীরামকৃষ্ণ)—শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের উদ্দেশ্য। ইহার একটিতেও যিনি ন্যূনতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র পূর্ণরূপে শ্রীরাম-কৃষ্ণের অনুগামী নহে। নিজের মুক্তিসাধন অপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণসাধনে যত্নপর তিনি মহত্তর কার্যে ব্যাপৃত। মঠে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের পৃথক্

পৃথক্ শিক্ষা ব্যবস্থা থাকিলেও সকল বিভাগের অঙ্গদিগকে কিছু না কিছু কর্ম-বিভাগের কার্য করিতে হইবে।

নবীন সমাজের আদর্শ হইবে সমকালে ও একাধারে অতি উদারতা ও মহা প্রবলতার সমাবেশ—সমুদ্রের ন্যায় গভীর, আকাশের ন্যায় বিশাল, অথচ মহাস্রোতস্বতীর ন্যায় বেগবান।

বৈচিত্র্য জগতের প্রাণ, এবং এই বৈচিত্র্যরূপ জাতি—গুণগত ও ক্রিয়াসম্ভূত জাতি—কখনও লুপ্ত হইবে না; কিন্তু ভোগাধিকার-তারতম্যই মহা অনিষ্টের কারণ। আচণ্ডাল যাহাতে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের অধিকারে সমতালাভ করিতে পারে তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

ভারতের পুনরভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিল; পুনর্বার সকলকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিতে হইবে। উচ্চজাতিকে নিম্নজাতির স্তরে অবনত না করিয়া নিম্নজাতিকে শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা উন্নত করিয়া এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। আবার যাহারা সংস্কারচ্যুতির ফলে আর্যধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে আর্যসংস্কৃতির গণ্ডিমধ্যে লইয়া আসিতে হইবে। এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা—যখন "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" পুনর্বার হইয়া যাইবে, যখন মানবসন্তান যোগবিভূতিতে ভূষিত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে এবং চৈতন্যময়ী-শক্তি জড়-শক্তির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবে, যখন রোগ-শোক আর মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে পারিবে না এবং একমাত্র প্রেমই সর্বকার্যের প্রেরয়িতা হইবে।

বেলুড় মঠই সকল মঠের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইবে এবং শাখা-মঠগুলিকেও ইহার নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হইবে।

মঠ বিশ্বজনীন কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ভারতের চিন্তাধারা ততদিন পর্যন্ত বহির্জগতে সম্পূর্ণ কার্যকরী হইবে না, যতদিন না ভারত স্বীয় সামাজিক জীবনকে সুসংবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সরল করিতে সক্ষম হয়। অতএব জগতেরই কল্যাণের জন্য প্রথমে ভারতের প্রতি অধিক দৃষ্টিদান আবশ্যক।

এই নবীন সন্ন্যাসের সহিত ভাবাদর্শের দিক হইতে স্বামীজী যেমন অনেক অভিনবত্ব যোগ করিয়া দিলেন, আচারের দিক হইতেও তেমনি অনেক নূতনত্বের সমাবেশ করিলেন। মঠে গুরুপূজার সহিত হিন্দু দেবদেবীর পূজাও প্রবর্তিত হইল। শুধু তাহাই নহে, প্রধান ধর্মগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের পূজাও মঠের

অঙ্গীভূত হইল। অথচ তিনি প্রাচীনের মর্যাদা অস্বীকার করিলেন না, তাঁহার সঙ্ঘ ভগবান শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত রহিল —মূল সন্ন্যাসবিধি ও দার্শনিক মতবাদের দিক হইতে তিনি শঙ্করাচার্য-প্রদর্শিত পন্থাই স্বীকার করিয়া লইলেন।

ভারতের তথা বিশ্বের কল্যাণার্থ স্বামীজীর দ্বারা যেসকল যোজনা প্রকল্পিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ছিল কেন্দ্রস্থানীয়। এখান হইতে এবং ইঁহাদেরই দ্বারা নবীন আদর্শ ও নূতন কার্যধারা প্রসারিত ও রূপায়িত হইবে। এই জন্যই বিষয়টি একটু বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইল।

পুনর্বার মার্কিন মুলুকে

কয়েক মাস যাবৎই স্বামীজী ভাবিতেছিলেন, আবার বেদান্তপ্রচারের উদ্দেশ্যে এবং বন্ধুদের সহিত মিলিবার আশায় ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাইবেন। বন্ধুগণও এইজন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। তাছাড়া ভারতে প্রত্যাগমনের কাল হইতেই তিনি বিবিধ রোগে ভুগিতেছিলেন; তাই বন্ধুরা ও চিকিৎসকগণ মনে করিতে-ছিলেন, সমুদ্রযাত্রা ও শীতপ্রধান স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা আছে। ২৯শে নভেম্বর (১৮৯৮) স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, "শীঘ্রই ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় আপনার সহিত মিলিত হইতে পারি;" কিন্তু সে আশা তখনই পূর্ণ হয় নাই। ২রা ফেব্রুয়ারি (১৮৯৯) আবার লিখিয়াছিলেন, "মার্চ নাগাদ আবার (কাজে) ঝাঁপিয়ে পড়ছি—এপ্রিল নাগাদ ইউরোপ যাত্রা;" কিন্তু তখনও যাত্রা হয় নাই। অবশেষে ১৪ই জুন (১৮৯৯) জানাইলেন, "এ মাসের ২০শে আবার ইংলণ্ড যাচ্ছি; এবারকার সমুদ্রযাত্রায় কিছু উপকার হবে, আশা করছি।"

বিদেশ যাত্রার সময় সঙ্গী হইলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। গুরুভ্রাতারা স্বামীজীকে পুনর্বার বিদেশে গমনের জন্য যখন পীড়াপীড়ি করিতে-ছিলেন, তখন তিনি এই সর্তে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন যে, স্বামী তুরীয়ানন্দকে (বা হরি মহারাজকে) তাঁহার সঙ্গে দিতে হইবে—বিদেশের কার্যভার স্কন্ধে লইবার জন্য। স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন স্বামীজীরই আদেশে স্বামী সারদানন্দের সহিত কাথিয়াওয়ারে প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন। নিজে তিনি কঠোরী সাধু, পাশ্চাত্ত্য জীবন-ধারার সহিত অপরিচিত এবং পরিচিত হইতেও পরাঙ্মুখ। স্বামীজী পূর্বেও এইরূপ প্রস্তাব করিলে তিনি অসম্মতি জানাইয়াছিলেন—মানসিক প্রবৃত্তিহীনতার জন্য ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার স্বল্পতাবশতঃ। কিন্তু স্বামীজীর দৃষ্টিতে ঐ অনিচ্ছা ও অপারগতাই গুণরূপে দেখা দিয়াছিল। তিনি জানিতেন স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রাচ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণোচিত তাপসজীবনযাপনে অভ্যস্ত ও প্রস্তুত। স্বামীজী এইরূপ জীবনই পাশ্চাত্ত্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন। অতএব উভয় গুরুভ্রাতার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য ছিল। ফলে এই

দাঁড়াইল যে, স্বামীজী যখন এইবারেও এই প্রস্তাব স্বামী তুরীয়ানন্দের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তুরীয়ানন্দ উহা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিলেন; স্বামীজীর কোন যুক্তিই তিনি শুনিলেন না। অগত্যা স্বামীজী শেষ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তিনি শিশুর ন্যায় প্রিয়তম গুরুভ্রাতার গলা জড়াইয়া ও বক্ষে মস্তক রাখিয়া সাশ্রু নয়নে বলিলেন, "হরিভাই, ঠাকুরের কাজের জন্য আমি বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমার এ কার্যে সাহায্য করবে না? কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?"[১] আদেশ যখন আর্তির আকারে আসে, তখন কাহার না মন টলে? স্বামী তুরীয়ানন্দ সম্মত হইলেন। তবু তিনি স্বীয় অক্ষমতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিলেন না। স্বামীজী শুধু বলিলেন, "কিছুই করতে হবে না, শুধু জীবন দেখালেই চলবে (লিভ দি লাইফ)।"

নিবেদিতার সমস্যা ছিল আরেক প্রকারের। নিবেদিতা স্বামীজীর উৎসাহ, উপদেশ ও আদেশে আরব্ধ বিদ্যালয়ের কার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ তখনও প্রস্তুত হইতেছিল না। তিনি স্বয়ং ভারতীয় রীতিতে ভারতীয় ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া ও ভারতের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া ভারতীয়দের প্রীতি-শ্রদ্ধার অধিকারিণী হইলেও বালিকাদের অল্পবয়সে বিবাহের ফলে তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছিল; আর ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষা-পরিচালনার উপযুক্ত অর্থও তাঁহার ছিল না। বাঙ্গালীরা প্রশংসা করিলেও অর্থদানে কৃপণ ছিলেন। লাগিয়া-পড়িয়া থাকিলে ভবিষ্যতে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী —ইহা নিবেদিতা ও স্বামীজী উভয়েই প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন। কিন্তু তাহাতে তো উপস্থিত সমস্যার সমাধান হইবে না। অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বামীজী স্থির করিলেন, বিদ্যালয় আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া নিবেদিতা তাঁহার সহিত মার্কিন দেশে গেলে টাকার সন্ধান মিলিবে। ঐ অর্থের সাহায্যে কুমারীদের ও বিধবাদের জন্য আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সহিত এই জাতীয় আশ্রম পরিচালিত হইলেই মাত্র তদানীন্তন অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সম্ভাবনা ছিল।

স্থির হইল, তিন জনই একসঙ্গে একই জাহাজে ইংলণ্ড হইয়া আমেরিকায় যাইবেন। যাত্রার দিন ২০শে জুন নির্ধারিত হইল, কলিকাতায় ঐদিন তাঁহারা গোলকুণ্ডা জাহাজে উঠিবেন। এই ব্যবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন; কারণ

১। ইংরেজী জীবনীর মতে ইহা দার্জিলিং-এর ঘটনা (৬৪৬)।

স্বামীজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা তখন যেরূপ ভয়াবহ, তাহাতে তাঁহাকে একা ছাড়িয়া দিতে কেহই সাহস পাইতেছিলেন না।

যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। স্বামীজী পুনর্বার বিদেশে চলিয়া যাইবেন শুনিয়া অনেকেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন; যাত্রার এক মাস পূর্ব হইতে মঠে নিত্য বহু দর্শনার্থীর সমাগম হইত। স্বামীজীও মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গিয়া বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাক্ষাৎ বা যাত্রার আয়োজন সম্পন্ন করিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে মঠে ফিরিবার পথে সাধনমার্গ সম্বন্ধে কথা উঠিলে স্বামীজীর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ বলিয়াছিলেন, "গীতার কর্ম মানে তো লোকে বলে—বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, সাধনভজন; আর তা ছাড়া সব অকর্ম।" স্বামীজী তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "খুব ভাল কথা, ঠিক কথা। কিন্তু সেটাকে আরও বাড়িয়ে নে না। তোর প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতি চিন্তার জন্য তোর প্রতি কাজের জন্য দায়ী কে? তুই তো?" আর তিনি বলিয়াছিলেন, ভগবানই হৃদয়ে থাকিয়া মানুষকে পরিচালিত করিতেছেন, ইহা সত্য হইলেও, এই বোধ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আসে না। "কর্ম করে চিত্ত শুদ্ধ হলে পর যখন দেখবি তিনিই সব করাচ্ছেন, তখন ওটা বলা ঠিক; নইলে সব মুখস্থ, মিছে!" আর বলিয়াছিলেন, "সাধন-ভজন না করলে কর্মযোগও হবে না। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই; নইলে প্রাণমন কি করে তাঁতে দিয়ে রাখবি?...জ্ঞান—বিচার বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পূজাভাব চাই।" ('বাণী ও রচনা', ৯।৪১৫-১৮)।

ঐ সময় সম্ভ্রান্ত ধনিগৃহ হইতেও তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিত। এইরূপ শেষ নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গিয়াছিলেন তিনি ১৭ই জুন মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে। মহারাজ স্বামীজীর 'রাজযোগ'-গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং এই সুযোগে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

যাত্রার পূর্বদিন ফটো তোলা হইল এবং রাত্রে মঠে সাধুব্রহ্মচারীরা একটি বিদায়সভার আয়োজন করিলেন। স্বামীজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দ সাধুদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও আসিলেন; মঠের পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি অভিনন্দনপত্র ও গোলাপ-ফুলের তোড়া সমাদরের সহিত অর্পিত হইল। স্বামীজীকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকেও অভিনন্দন দেওয়া হইল। স্বামী

সারদানন্দ সভার উদ্বোধন করিলেন; স্বামী অখণ্ডানন্দও কিছু বলিলেন। তারপর অভ্যর্থিত সকলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। স্বামীজী উত্তরদানপ্রসঙ্গে ইংরেজীতে প্রধানতঃ সন্ন্যাস সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিলেন :

"প্রথমতঃ আমাদের আদর্শ কি, তাহা বুঝিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ উহা কার্যে পরিণত করার উপায়গুলি কি, তাহাও বুঝিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদিগকে পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে, কারণ সন্ন্যাসী বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ত্যাগ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করার এখন সময় নাই, আমি সংক্ষেপে উহার লক্ষণ নির্দেশ করিতে চাই—মৃত্যুকে ভালবাসা। সাংসারিক ব্যক্তিগণ বাঁচিতে ভালবাসে, সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে। …মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ কি? তাৎপর্য এই—আমাদিগকে মরিতেই হইবে —ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই। তবে আমরা কোন মহৎ সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন? আমাদের সকল কার্য—আহার বিহার অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি—সবগুলিই যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখ করিয়া দেয়।…সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড-সত্তাস্বরূপ—তুমি তো ইহার নগণ্য অংশমাত্র; সুতরাং এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটি কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কার্য—না করাই অস্বাভাবিক। উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি স্মরণ নাই?—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ (শ্বে. উ. ৩।১৬)।

এইরূপে তোমাদিগকে আস্তে আস্তে মরিতে হইবে। মৃত্যুতেই স্বর্গ—মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত, আর ইহার বিপরীত বস্তুতে সমুদয় অকল্যাণ ও আসুরিক ভাব নিহিত।

"তারপর এই আদর্শটিকে কার্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে যে, অসম্ভব আদর্শ রাখিলে চলিবে না। অতি মাত্রায় উচ্চ আদর্শ জাতিকে দুর্বল ও হীন করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংস্কারের পর এইটি ঘটিয়াছে। অপরদিকে আবার অতি মাত্রায় 'কাজের লোক' হওয়াও ভুল।…আমাদিগকে আদর্শও খাট করিলে চলিবে না, আবার যেন আমরা কর্মকেও অবহেলা না করি।…আমাদের দেশের প্রাচীন ভাব এই—কোন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া।

কিন্তু এখন···আমি অমুকের চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিলাভ করিব—এ ভাবটিও ভুল। ···তোমাদিগকে গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পর-মুহূর্তেই যাইয়া এই মঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।··· তোমাদিগকে খুব সামান্য কাজ—যেমন পায়খানা সাফ—পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে—শুধু এখানে নহে, অন্যত্রও।

"তারপর তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই মঠের উদ্দেশ্য মানুষ প্রস্তুত করা।···তোমাদিগকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। কেবল শাস্ত্রপাঠে কি হয়? এমন কি ধ্যান-ধারণাতেই বা কতদূর হইবে?··· তোমাদিগকে এই নূতন প্রণালী—মানুষ-প্রস্তুতকরণ-রূপ নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। মানুষ তাহাকেই বলা যায় যে এত বলবান যে, তাহাকে বলের অবতার বলা যাইতে পারে, আবার যাহার হৃদয়ে রমণীসুলভ কোমলতা আছে—তাহাদের দুর্বলতা নহে।···কিন্তু···স্বাধীনচিন্তা যেমন আবশ্যক তদ্রূপ আজ্ঞাবহতাও অবশ্য চাই।·· তোমাদিগকে তোমাদের সম্প্রদায়ের উপর গভীর শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই।···বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ লতা ও কুকুরের ন্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও।"

এই বক্তৃতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছিলেন: "যাইবার আগের দিনে মঠে স্বামীজীর লেকচার হইয়াছিল। লেকচার শুনিয়া সকলের ধমনীতে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হইল; সকলেরই অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য মনে হইল যে, আমরা মানুষ। স্বামীজী খুব এনথুসিয়েষ্টিক (উৎসাহপূর্ণ) ভাবে বলিলেন, 'বাবা সব, তোরা মানুষ হ—এই আমি চাই; ইহার কিছু সফল হইলেও আমার জন্ম সার্থক হইবে।' সকলকে বলিলেন, 'তোমাদিগকে অধিক আর কি বলিব? তোমরা সকলে সেই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য যত্নবান হও—জীবনে কর্মের ও বৈরাগ্যের সমাবেশ কর।' তাহার পরদিবস কলিকাতায় আসিলেন।"

শচীনবাবুর বিবরণ হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, যাত্রার দিন দ্বিপ্রহরে শ্রীমা সারদাদেবী স্বামীজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মঠের অন্যান্য সাধুবৃন্দকে নিজ বাসস্থানে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন ও প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। "বেলা তিনটার সময় প্রিন্সেপ ঘাটে যাইবেন স্থির হইল। তাহার জন্য কোন গাড়ী যাইলে ভাল হয়, এরূপ কথাবার্তা হইতেছিল—কোন

স্থিরতা হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে গর্গের[২] ব্রুহাম ও আরব পেয়ার্স (অশ্বযুগল) শ্যামবাজার স্টেবল হইতে আনাইয়াছিলাম। স্বামীজী দয়া করিয়া তাহাতে গেলেন। স্বামীজী এবারে ভয়েজের (সমুদ্রযাত্রার) পোষাক বদলাইয়াছেন—আসাম সিল্ক-এর কোট এবং দশ বার টাকা দামের কেবিন সু (জুতা), আর নাইট ক্যাপ। হরি মহারাজেরও এই ব্যবস্থা। কিন্তু তোমাকে সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহাকে ভাল দেখাইতেছিল না। ঘাটে প্লেগ-এর এগজামিনেশন (পরীক্ষা) হইয়াছিল—খুব ষ্ট্রিক্ট এগজামিনেশন (পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা)। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক সমবেত ছিলেন। বেলা পাঁচটার সময় লঞ্চ আসিল ; আমাদের নয়নাভিরাম স্বামীজী তাহাতে উঠিলেন, সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরি মহারাজের মুখের অ্যাস্পেক্ট (চেহারা) খুব সিরিয়াস (চিন্তাকুল) হইয়াছিল। মঠের সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ) মহারাজ মহুলা হইতে আসিয়াছিলেন। লঞ্চ ছাড়িবার সময় সকলেরই চোখ ছল ছল করিতে লাগিল—কাহারও কাহারও বা চোখ জলে ভরিয়া গেল। তৎপর সেই পঞ্চাশ জন লোক সিমালটেনিয়াসলি (একসঙ্গে) স্বামীজীর উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। সেই গঙ্গাতীরে সেই দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাইয়াছিল। অপরাপর সাহেবেরা অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল। তাঁহাদের তিন জনেরই ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেজ। সঙ্গে আর একজন যাইলেন—শরৎ মহারাজের ভাই।…তাঁহার সেকেণ্ড ক্লাস টিকেট। ক্রমে লঞ্চ ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা গেল সকলে রুমাল প্রভৃতি ঘুরাইতে লাগিলেন। ক্রমে যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, সকলে গাড়ীতে উঠিলেন—সকলেরই মুখ বিষণ্ণ—বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে।”

উপরের উদ্ধৃতিতে স্বামী তুরীয়ানন্দের চিন্তাকুলতা বা অপ্রফুল্লতার কথা আছে। ইহার কারণ আমরা পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—তিনি স্বামীজীর পীড়াপীড়িতেই যাইতে রাজী হইয়াছিলেন। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন আমেরিকাবাসী-দিগকে ধার্মিক হিন্দুজীবন দেখাইতে, আর স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন স্বামীজীরই ভাষায়—জ্বলন্নিব ব্রহ্মতেজসা—প্রথম জীবনে একনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী ও পরে তপস্যা-পরায়ণ সন্ন্যাসী। তিনি স্বামীজীর কাতর অনুরোধ ও স্নেহের আবদারে

২। মহিষাদল-এর রাজা। ইঁহাদের উপাধি গর্গ। স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতেও শ্রীমায়ের বাড়ীতে ভোজনের কথা উল্লিখিত আছে।

যাইতে সম্মত হইলেও পাশ্চাত্ত্য জীবন বিনাদ্বিধায় মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না—তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন গঙ্গাজল ; প্রচারের সুবিধার জন্য বেদান্তদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থও লইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী নিষেধ করিয়া কহিয়াছিলেন, "বিদ্যের চচ্চড়ি আর পাঁজিপুঁথি তারা যথেষ্ট দেখেছে, ক্ষাত্রশক্তির পরিচয় খুব করে পেয়েছে ; এখন দেখাতে চাই 'ব্রাহ্মণ'।"[৩]

স্বামীজীর এই সমুদ্রযাত্রার বিবরণ তাঁহার স্বরচিত 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে সবিস্তার লিপিবদ্ধ আছে। আমরা পাঠককে উহা হইতেই ভ্রমণ বিষয়ে সবিশেষ জানিতে বলিয়া এখানে শুধু মোটামুটি একটা বিবরণ দিব।

২৪শে জুন রাত্রে জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে পৌঁছিল। পরদিবস প্রাতে দেখা গেল, বহু ভক্ত স্বামীজীর সন্দর্শনার্থ তীরে উপস্থিত হইয়াছেন—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রভৃতি সুপরিচিত অনেকেই আছেন। ইঁহারা পূর্বেই তারযোগে স্বামীজীর আগমনবার্তা অবগত হইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন যে, স্বামীজীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে পুনর্মিলনের এই সুযোগে বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট জানা গিয়াছিল, কলিকাতার প্লেগ যাহাতে মাদ্রাজে সংক্রামিত না হয়, তজ্জন্য গোলকুণ্ডার কোন ভারতীয় যাত্রীকে মাদ্রাজে নামিতে দেওয়া হইবে না—শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে অন্য কথা! মাদ্রাজবাসীরা মাননীয় পি· আনন্দ চার্লুর সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করিয়া স্বামীজীর তীরে অবতরণের অনুমতির জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন ; কিন্তু উহা নিষ্ফল হইয়াছিল। এই সমস্তের বিবরণ স্বামীজী স্বীয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন :

"চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে-নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েছি। ভেতরে স্থির জল···। দুজন ইংরেজ পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর, একজন মান্দ্রাজী জমাদার, এক ডজন পাহারাওয়ালা জাহাজে উঠল। অতি ভদ্রতাসহকারে আমায় জানালে যে, কালা আদমীর কিনারায় যাওয়ার হুকুম নাই, গোরার আছে। কালা যেই হোক না কেন, সে যে রকম নোংরা থাকে, তাতে তার

৩। ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, স্বামী তুরীয়ানন্দের গমনের পূর্বেও স্বামীজীর মধ্যে আমেরিকানরা সনাতন ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখে নাই। একটা বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণেরই জন্য স্বামীজী গুরুভ্রাতাকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন। স্বামীজীর কথার রীতিই ছিল এইরূপ।

প্লেগবীজ নিয়ে বেড়াবার বড়ই সম্ভাবনা, তবে আমার জন্য মাদ্রাজীরা বিশেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত করেছে, বোধ হয় পাবে। ক্রমে দুচারটি ক'রে মাদ্রাজী বন্ধুরা নৌকায় চড়ে জাহাজের কাছে আসতে লাগলো। ছোঁয়াছুঁয়ি হবার জো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাসিঙ্গা, বিলিগিরি, নরসিংহাচার্য, ডাক্তার নঞ্জনরাও, কিডি প্রভৃতি সকল বন্ধুদেরই দেখতে পেলুম। আঁব, কলা, নারিকেল, রাঁধা দধ্যোদন, রাশীকৃত গজা, নিমকি ইত্যাদির বোঝা আসতে লাগলো। ক্রমে ভিড় হ'তে লাগলো—ছেলে, মেয়ে, বুড়ো—নৌকায় নৌকা। আমার বিলাতী বন্ধু মিঃ শ্যামিএর, ব্যারিস্টার হয়ে মাদ্রাজে এসেছেন, তাঁকেও দেখতে পেলেম। রামকৃষ্ণানন্দ আর নির্ভয় (নির্ভয়ানন্দ) বার কতক আনাগোনা করলে। তারা সারাদিন সেই রৌদ্রে নৌকায় থাকবে—শেষে ধমকাতে তবে যায়। ক্রমে যত খবর হ'ল যে আমাকে নাবতে হুকুম দেবে না, তত নৌকার ভিড় আরও বাড়তে লাগলো। শরীরও ক্রমাগত জাহাজের বারাণ্ডায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবসন্ন হয়ে আসতে লাগলো। তখন মাদ্রাজী বন্ধুদের কাছে বিদায় চাইলাম, ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আলাসিঙ্গা 'ব্রহ্মবাদিন' ও মাদ্রাজী কাজকর্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করবার অবসর পায় না; কাজেই সে কলম্বো পর্যন্ত জাহাজে চ'লল। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়লে। তখন একটা রোল উঠল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজার খানেক মাদ্রাজী স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল—জাহাজ ছাড়তেই, তাদের এই বিদায়সূচক রব! মাদ্রাজীরা আনন্দ হ'লে বঙ্গদেশের মতো হুলু দেয়।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৮৫-৮৬)।

চারিদিন মৌসুমী তরঙ্গভঙ্গে দোল খাইতে খাইতে জাহাজ কলম্বো বন্দরে পৌঁছাইল। স্বামীজী লিখিয়াছেন: "কলম্বোর বন্ধুরা নাববার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল, অতএব ডাঙ্গায় নেবে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাশুনা হ'ল। স্যর কুমারস্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর স্ত্রী ইংরেজ, ছেলেটি শুধু-পায়ে, কপালে বিভূতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্ প্রমুখ বন্ধু-বান্ধবেরা এলেন। অনেক দিনের পর মুড়গ্‌তন্নি খাওয়া হ'ল, আর কিং-কোকোনাট। ডাব কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস্ হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁর বৌদ্ধ মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল দেখলাম। কাউণ্টেসের (কাউণ্টেস্ ক্যানোভারার) বাড়ীটি (স্ত্রী-মঠ বিদ্যালয়) মিসেস্ হিগিন্স-এর অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজানো। কাউণ্টেস্ ঘর থেকে টাকা এনেছেন, আর মিসেস্ হিগিন্স ভিক্ষে ক'রে করেছেন।

কাউণ্টেস্ নিজে গেরুয়া কাপড় বাঙলার শাড়ীর মতো পরেন।·· আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে মাদ্রাজ ফিরে গেল। আমরাও কুমারস্বামীর বাগানের নেবু, কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং-কোকোনাট), দুবোতল সরবৎ ইত্যাদি উপহার সহিত আবার জাহাজে উঠলাম। ২৫শে জুন (?)[৪] প্রাতঃকাল জাহাজ কলম্বো ছাড়লো।" (ঐ, ৯১-৯২)।

সিংহলের পর মৌসুমী বায়ুর প্রাবল্য এতই বৃদ্ধি পাইল যে, শুধু যে জাহাজের কম্পন বাড়িল ইহাই নহে, ছয় দিনের পথ অতিক্রম করিতে এগার দিন লাগিয়া গেল। সকোত্রা দ্বীপ পর্যন্ত ঝড়ের বাড়াবাড়ি খুবই ছিল, তারপর উহা কমিতে থাকে। ৮ই জুলাই সন্ধ্যায় জাহাজ এডেনে উপস্থিত হইল এবং ১৪ই জুলাই সুয়েজ বন্দরে পৌছাইল। অতঃপর পথে নেপলসে একবার থামিয়া মার্সেলে উপস্থিত হইল এবং ৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌছাইল।

জাহাজে স্বামীজীর একটি কাজ ছিল, 'উদ্বোধনে' প্রকাশের জন্য স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা। জাহাজের টাল-মাটালের মধ্যে উহা সর্বদা সম্ভবপর হইত না। তথাপি সুবিধা হইলেই তিনি লিখিতে বসিতেন। এইভাবে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়, তাহাতে একদিকে যেমন ভ্রমণের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা দেখিতে পাই, অপর দিকে তেমনি পাই গভীর ঐতিহাসিক জ্ঞান ও দেশ-বিদেশের তুলনামূলক সমাজ-চিত্র। এতদ্ব্যতীত কবিত্বপূর্ণ ও হাস্যরসাত্মক লিপিকৌশলে গ্রন্থখানি অতীব মনোজ্ঞ। ইহাই 'উদ্বোধন'-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়া অধুনা 'পরিব্রাজক' নামে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইতেছে।

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য জাহাজে নিয়মিত ব্যায়াম করিবেন; তাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, কোন দিন ব্যায়াম করিতে ভুল হইলে তিনি যেন স্মরণ করাইয়া দেন। প্রথম দুই-চারিদিন তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করিলেন, কিন্তু পরে দেখা গেল, নিবেদিতার সহিত নানাপ্রকার আলোচনায় তন্ময় হইয়া ব্যায়াম করা রোজই বন্ধ থাকে, অথচ নিবেদিতা কিছু বলিতে পারেন না। অবশেষে হরি মহারাজ (তুরীয়ানন্দজী) ব্যায়ামের কথা

৪। বাঙ্গলা ও ইংরেজী জীবনীর মতে ২৮শে জুন। ইহাই ঠিক মনে হয়। 'রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ'-এর (২৮১ পৃঃ) মতেও Coasting Ceylon, June 28, 1899. (কলম্বোতে কাউণ্টেস্ ক্যানোভারা একটি কনভেণ্ট ও বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন।)

স্মরণ করাইয়া দিলে স্বামীজী বলিলেন, "হরিভাই ; আজ থাক, জাহাজে বেশ ভালই আছি। আর দেখ, নিবেদিতার সঙ্গে একটু কথা বলছি। ও বিদেশী মেয়ে, সব ছেড়েছুড়ে আমার কাছে এসেছে এইসব কথা শুনবার জন্য। বেশ ভাল মেয়ে, খুব সমঝদার, এর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই।"

স্বামীজীর সহিত নিবেদিতার বহু বিষয়েই আলোচনা হইত—ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন, ভারতের আধুনিক অবনতি ও ভবিষ্যৎ উন্নতি ইত্যাদি। 'ক্র্যাডল টেলস অব হিন্দুইজম' (শিশুদের জন্য হিন্দুদের উপকথা) নামক গ্রন্থের উপাদান নিবেদিতা স্বামীজীর নিকট হইতে প্রধানতঃ এই সময়েই সংগ্রহ করেন। গল্প ছাড়িয়া স্বামীজী যখন তাঁহার জীবনের আদর্শ ও সেইজন্য কঠোর সাধনার কথা বলিতে থাকিতেন, নিবেদিতা তখন রুদ্ধশ্বাস হইয়া একমনে সব শুনিতেন, ধারণা করিবার চেষ্টা করিতেন, নবীন প্রেরণা পাইতেন এবং হৃদয়ে উহা গাঁথিয়া রাখিতেন। ভবিষ্যতে সেই সবই হিন্দু ধর্ম ও কৃষ্টিবিষয়ক নিবেদিতার সুচিন্তিত অমূল্য গ্রন্থরাজিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই কালের কথা স্মরণ করিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছেন : "এই দেড় মাস ব্যাপী সমুদ্রযাত্রাটিকেই আমি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া মনে করি। এইকালে স্বামীজীর সহিত মিশিবার যে-কোন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই আমি গ্রহণ করিয়াছি, এবং অন্য কাহারও সহিত একপ্রকার মিশিতাম না বলিলেই হয়। একাকী লেখা ও সূচীকর্ম লইয়াই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতাম। এইরূপে আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার চরিত্র-মনের সংস্পর্শলাভে ধন্য হইতে পারিয়াছিলাম। এ সম্পদের কি আর তুলনা হয় ? এই সমুদ্রযাত্রার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নানাবিধ ভাব ও গল্পের একটা অবিরাম স্রোত চলিয়াছিল। কেহই জানিত না, কখন স্বামীজীর উপলব্ধির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে আমরা নূতন নূতন সত্যের জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা শুনিতে পাইব।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১৬০-৬১ পৃঃ)।

একদিন এক ইওরোপীয়ের মুখে স্বামীজী শুনিলেন যে, কোন কোন অসভ্য জাতি নিত্য নরমাংস ভোজন করে। অমনি তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন, "এটা সত্য নয়। ধর্মভাবের প্রেরণায়—পূজাদেওয়া বলিস্বরূপে অথবা যুদ্ধে—প্রতিহিংসাবশে, এই দুই স্থল ছাড়া কোথাও কোন জাতি নরমাংস ভোজন করে না। বুঝতে পাচ্ছ না, ওটা যে দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীবদের রীতিই নয়।

এরকম করলে যে সামাজিক জীবনেরই মূলোচ্ছেদ করা হবে।" "এই কথাগুলি যখন বলা হয়, তখন ক্রপটকিনের 'পরস্পরের সাহায্য'-সম্বন্ধীয় মূল্যবান পুস্তকখানি বাহির হয় নাই। স্বামীজীর বিশ্বমানবের প্রতি প্রেম এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেশ-কাল-অবস্থা অনুসারে বিচার করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই তাঁহাকে এরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করিয়াছিল'।" (ঐ, ১৬২ পৃঃ)।

গঙ্গার মোহনা অতিক্রম করিয়া জাহাজ সমুদ্রের নীল জলে প্রবেশ করিলে স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, "নমঃ শিবায়! নমঃ শিবায়! ত্যাগবৈরাগ্যভূমি পরিত্যাগ করে ভোগৈশ্বর্যভূমিতে পদার্পণ করতে চললাম।" (ঐ, ১৬৩ পৃঃ)

"আমরা একদিন তাঁহার জনৈক প্রতিপক্ষের বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম। আমি (নিবেদিতা) বলিলাম, 'তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে তাঁর দেশের উর্ধ্বে স্থাপন করছেন না কি?' স্বামীজী সানন্দে উত্তর দিলেন, 'সেটা এশিয়ারই লক্ষণ এবং বড় উঁচু জিনিস। শুধু এ ব্যাপারটাকে ঠিক ঠিক দেখবার মতো মাথা তাঁর নেই, আর তাঁর অপেক্ষা করবার ধৈর্য নেই।' ইহা বলিয়াই তিনি আপন-মনে মা-কালীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি আবৃত্তি করিলেন :

'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়,
নাম দেয় দয়াময়ী।···
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা'।

"তিনি বলিলেন, 'যারা এরকম করে, আমি তাদের দলে নই। আমি ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলেই ভালবাসি, নৈরাশ্যকে তার নিজের জন্যই ভালবাসি, দুঃখদারিদ্র্যকে সে দুঃখস্বরূপ বলেই ভালবাসি। ক্রমাগত লড়াই কর। লড়াই করতে থাকো ; প্রতিপদেই পরাজয় হয়, ক্ষতি নেই। ঐটেই আদর্শ—ঐটেই আদর্শ'।" (ঐ, ১৬৯ পৃঃ)।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বামীজী যদিও কার্যে পরিণত বেদান্তের অবশ্যম্ভাবী সহকারী হিসাবে গ্রহণীয় শৌর্য, বীর্য, সাহস ইত্যাদির কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেন এবং যদিও কবিতায় এবং অপর কোন কোন স্থলে শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীর কথা তেজঃপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করিতেন, তথাপি ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থসমূহে এই কালী-উপাসনা সম্বন্ধে যেরূপ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে এবং যেপ্রকারে উহা প্রায় সর্বজনানুবর্তনীয়রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ভগিনী নিবেদিতার নিজস্ব আধ্যাত্মিক অধিকারের অনুরূপ হইলেও স্বামীজী উহাকে

ঐরূপে সর্বজনগ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতেন এইরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই ; বস্তুতঃ শৌর্য-বীর্যাদির সার্বজনীন অত্যাবশ্যকতা স্বীকার করিলেও সকলেরই পক্ষে কালী-উপাসনা স্বীকরণীয় হইতে পারে না। মেরীকে লিখিত স্বামীজীর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুনের পত্রে আছে : "কালী-উপাসনা ধর্মের কোন অপরিহার্য সোপান নয়। ধর্মের যাবতীয় তত্ত্বই উপনিষদ্ থেকে পাওয়া যায়। কালী-উপাসনা আমার বিশেষ খেয়াল ; আমাকে এর প্রচার করতে তুমি কোন দিন শোননি, বা ভারতেও তা প্রচার করেছি বলে পড়োনি। সকল মানবের পক্ষে যা কল্যাণকর, আমি তাই প্রচার করি। যদি কোন অদ্ভুত প্রণালী থাকে, যা শুধু আমার পক্ষেই খাটে, তা আমি গোপন রেখে দিই বা সেখানেই তার ইতি। কালী-উপাসনা কি বস্তু, সে তোমার কাছে কোন মতেই ব্যাখ্যা করব না, কারণ কখন কারও কাছে তা করিনি।"

প্রসঙ্গাগত কালী-উপাসনার কথা ছাড়িয়া আমরা পুনর্বার স্বামীজীর সমুদ্র-যাত্রার কালে ফিরিয়া যাই। স্বামীজীর ভারতীয় কার্যধারার অন্যতম মূলসূত্র হিসাবে নিবেদিতা একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এডেনের কাছাকাছি আসিয়া এক প্রাতঃকালে নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : "ভারতের কল্যাণের জন্য আপনি যেসকল উপায় নির্ধারণ করেছেন এবং অপরে তৎসম্বন্ধে যেসকল উপায় নির্দেশ করে, এ দু-এর মধ্যে মোটামুটি কি কি বিষয়ে পার্থক্য আছে বলে আপনি মনে করেন ?" নিবেদিতা দেখিলেন, এই বিষয়ে স্বামীজীর মনের কথা টানিয়া বাহির করা কঠিন। "বরং তিনি অন্যমতাবলম্বী নেতাদের কাহারও কাহারও চরিত্রের এবং কার্যপ্রণালীর প্রশংসাই করিলেন।" নিবেদিতাও ভাবিলেন, ঐ প্রশ্নটি চুকিয়া গেল ; কিন্তু সন্ধ্যার সময় তিনি হঠাৎ আপনা হইতেই বলিতে লাগিলেন :

"যেসব লোক তাদের নিজেদের কুসংস্কারগুলোকে আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আমি তাদের কারও সঙ্গে একমত নই। যারা মিসর দেশের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত থাকে, তাদের যেমন ঐ দেশের প্রতি একটা স্বার্থ-জড়িত অনুরাগ থাকে, তেমনি কারও কারও ভারতের প্রতিও এমন একটা অনুরাগ থাকতে পারে, যার সবটাই স্বার্থজড়িত। এরকম অনুরাগলাভ শক্ত কথা নয় ! লোকের স্বতই ইচ্ছা হতে পারে যে, পঠিত বইগুলি থেকে, চর্চায় এবং কল্পনারাজ্যে যে ভারতের চিত্র তার মনের মধ্যে অঙ্কিত হয়েছে, সেই অতীত-

যুগের ভারতকেই সে আবার প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। আমার ইচ্ছা, সেই প্রাচীন ভারতের যেসকল সদ্‌গুণ ছিল, সেগুলো ফের বেঁচে উঠুক, এবং সেই সঙ্গে বর্তমান যুগের যেসকল ভাল জিনিস, তাও থাকুক ; কেবল এই মিশ্রণ-ব্যাপারটি বেশ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হওয়া চাই। নূতন ভারতকে আপনা-আপনি ধীর-ভাবে গড়ে উঠতে হবে—বাইরের কোন শক্তির সাহায্যে নয়। সেজন্য আমি শুধু উপনিষদ্ প্রচার করি। ভাল করে দেখলে দেখতে পাবে, আমি উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কিছু থেকে প্রমাণ প্রয়োগ করিনি। আবার উপনিষদ্ থেকেও একমাত্র বলের—শক্তির—ভাবটুকুই গ্রহণ করেছি। ঐ একটিমাত্র শব্দে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের সার নিহিত। বুদ্ধ অহিংসা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, 'বল' কথাটা দ্বারা ঐ ভাবটিই আরও উত্তমরূপে প্রকাশ পায়। কারণ, ঐ অহিংসার পেছনে একটা মারাত্মক দুর্বলতা রয়েছে। দুর্বলতা হতেই হিংসার ভাব—বাধা দেওয়ার ভাব আসে। একবিন্দু সাগরজল ছিটকে গায়ে লাগলে আমি তাতে ভয় পেয়ে পালিয়েও যাই না, বা তাকে শাস্তি দেবার কথাও মনে আসে না। আমি ওকে গ্রাহ্যই করি না, কিন্তু মশার কাছে ঐটুকুই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। আমি চাই, যে যতই শত্রুতা দেখাক না কেন, আমরা সব তুচ্ছ জ্ঞান করব। বল ও নির্ভীকতা! আমার নিজের আদর্শ সেই অদ্ভুতকর্মা সাধু, যাঁকে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সৈন্যেরা মেরে ফেলে, কিন্তু যিনি মর্মান্তিক ছুরিকাঘাত পেয়েও চিরাভ্যস্ত মৌন ভঙ্গ করে শুধু এই বলেছিলেন, 'তবু তুমিও সেই—তত্ত্বমসি'।

"জিজ্ঞেস করতে পার, এই প্রাচীন-আধুনিকের সম্মিলন-ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়? তিনিই ওর পন্থাস্বরূপ—সেই অদ্ভুত, অহংজ্ঞানরহিত পন্থা! তিনি নিজেকেই নিজে জানতেন না। তিনি ইংলণ্ড বা ইংরেজদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানতেন যে, তারা এক অদ্ভুত রকমের লোক—দূরে, মহাসমুদ্রের ওপারে বাস করে। কিন্তু তিনি সেই অসাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন—আমি তার ব্যাখ্যাকার মাত্র। তিনি কখনও কারও নিন্দা করতেন না। একবার আমি আমাদের দেশের বীভৎস-আচার-বিশিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের তীব্র সমালোচনা করছিলাম।···আমার কথা সব শেষ হলে তিনি শুধু বললেন, 'হাঁ, সব বাড়ীরই একটা করে মেথর ঢুকবার দুয়ার থাকে। এও সেই রকম আর কি!'

"এতদিন আমাদের দেশের ধর্মের মহাদোষ কি ছিল জান? সে ধর্ম মাত্র দুটি

কথা জানত—ত্যাগ ও মুক্তি। এ জগতে শুধু কি মুক্তিই দরকার? গৃহস্থদের জন্য কিছুই চাই না?···শিক্ষার ভেতর দিয়ে এ জাতির মধ্যে বল সঞ্চারিত হবে—এইটিই উপায়।" (ঐ, ১৮৫-৮৮ পৃঃ)।

"আমি দেখতে পাচ্ছি, ভারত তরুণ ও সজীব চেতন বস্তু। ইউরোপও তরুণ ও সজীব। এদের কেউই এমন অবস্থায় পৌছায়নি যে, এদের অনুষ্ঠানগুলোকে নিরাপদে সমালোচনা করা চলে। এরা যেন দুটি বিরাট পরীক্ষা-ব্যাপার—তার কোনটিই এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।···এখন আমাদের ভারতীয় পরীক্ষা-ব্যাপারটিকে তার নিজের ভাবেই সাহায্য করতে হবে। যে সকল আন্দোলনে কোন ব্যক্তি বা কাজকে সাহায্য করতে গিয়ে তাদের নিজস্ব ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা না করা হয়, সে সকল আন্দোলন ঐ হিসাবে নিরর্থক।" (ঐ, ১৯৩-৯৪ পৃঃ)।

এই সব কথার আলোচনা প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একবার জনকয়েক লোক হোটেণ্টটদিগের জড়োপাসনার নিন্দায় মাতিয়া গিয়া ঐ বিষয়ে স্বামীজীর মত জানিতে চাহিলে স্বামীজী বলিলেন, "আমি জড়োপাসনা কাকে বলে জানি না।" সমালোচকেরা তখন বুঝাইয়া দিলেন—হোটেণ্টটরা প্রথমে পূজার্হ বস্তুটির অর্চা করে, তারপর তাহাকে প্রহার এবং পুনর্বার ধন্যবাদজ্ঞাপন—ক্রমান্বয়ে এইরূপ করিতে থাকে। স্বামীজী তবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমি এর নিন্দা করব!" পরক্ষণেই তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "দেখছ না, এটা জড়োপাসনা নয়? তোমাদের হৃদয় কি পাষাণ! তোমরা দেখতে পাও না যে ছোট ছেলেরা ঠিকই করে! তারা সবই চৈতন্যময় দেখে। ঐহিক জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের ঐ বালকসুলভ দৃষ্টি চলে যায়। কিন্তু শেষে এক উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা আমরা আবার ঐ অবস্থায় পৌছাই। ছোট ছেলেরা গাছপালা, ইট, কাঠ, পাথর, সব জিনিসে একটা জীবন্ত শক্তি দেখতে পায়। আর সত্যই কি এদের পেছনে এক জীবন্ত শক্তি বর্তমান নেই? এ প্রতীকোপাসনা, জড়োপাসনা নয়। দেখতে পাচ্ছ না?" (ঐ, ১৯৫-৯৬ পৃঃ)।

যাহাদের বা যে দেশের জন্য ধর্মপ্রচারাদি করা হইবে, তাহাদের নিজস্ব দৃষ্টি অবলম্বন না করিতে পারিলে এবং সহানুভূতিসহ ও প্রীতির সাহায্যে তাহাদের চিরাবলম্বিত পথে তাহাদের উন্নতির প্রচেষ্টাকে পরিচালিত না করিলে মঙ্গল না হইয়া বরং অমঙ্গলেরই সূত্রপাত হইতে পারে। এই হিসাবেই স্বামীজী একবার এক বিদেশী ধর্মপ্রচারককেও সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—যদিও উক্ত প্রচারক

নিজের বুদ্ধি ও বোধের অনুযায়ী ভারতীয় ধর্মই শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন:

একবার আলমোড়ায় এক স্বনামধন্যা ইংরেজ মহিলা স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি ভারতে হিন্দুধর্মের প্রচারিকা হিসাবে আত্মপরিচয় দেন বলিয়া স্বামীজী পূর্বে তাঁহার সমালোচনা করিয়াছিলেন। অতএব তিনি জানিতে চাহিলেন, কোথায় তিনি ভ্রম করিয়াছেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন, "তোমরা ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করেছ; তোমরা আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছ এবং আমাদের নিজেদেরই ঘরে আমাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল পরিয়েছ; তোমরা দেশের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছ। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তোমরা আমাদের শেষ যে সম্বলটুকু আছে—আমাদের ধর্ম—তাও তোমরা লুটে নিয়ে আত্মসাৎ করতে চাও আর আমাদের ধর্মগুরু সাজতে চাও!" উক্ত মহিলা তখন সাগ্রহে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি শিখিতেই আসিয়াছেন, শিখাইতে নহে। এইভাবে স্বামীজীকে শান্ত করিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার একটি সভায় সভাপতিত্বের জন্য সম্মত করাইয়াছিলেন। ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ১৯ পৃঃ)।

৩১শে জুলাই অর্ণবপোত লণ্ডনে পৌঁছিলে দেড় মাসের সমুদ্রভ্রমণ সমাপ্ত হইল। জাহাজ লণ্ডনের টিলবেরি ডকে প্রবেশ করিলে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। স্বামীজী দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, ইঁহাদের মধ্যে মার্কিন দেশ হইতে আগতা দুইটি ভক্তিমতী মহিলাও আছেন— শ্রীযুক্তা ফান্কি ও শ্রীমতী ক্রিষ্টিন। ইঁহারা সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ২০শে জুন কলিকাতা হইতে পাশ্চাত্ত্যযাত্রা করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে। অতএব তাঁহার দর্শনের জন্য অতিমাত্র আগ্রহান্বিতা হইয়া তাঁহারা স্বীয় বাসস্থান সুদূর ডেট্রয়েট হইতে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে স্বামীজীর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে ফান্কি লিখিয়াছিলেন, "তিনি খুব রোগা হইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন ঠিক একটি বালক এবং আচরণেও তিনি ছিলেন তাই। সমুদ্রযাত্রার ফলে তিনি তাঁহার পূর্বের শক্তি-সামর্থ্য অনেকটা ফিরিয়া পাইয়াছেন দেখিয়া তিনি বেশ খুশী ছিলেন।"

তখন গ্রীষ্মকাল; তাই লণ্ডন মহানগরীর পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই শহর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। কাজ তখন কিছুই হইবার ছিল না।

তাই বাকি বন্ধুরা নগরের উপকণ্ঠে উইম্বলডনে অনেকটা শান্ত ও নির্জন পরিবেশ মধ্যে একখানি প্রাচীন ধরনের বড় বাড়ী তাঁহার জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামীজী বিশ্রামলাভের জন্য সদলবলে সেখানে উঠিয়া ৩রা আগস্ট শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখিলেন (দি লাইমস, উডসাইড্‌স, উইম্বলডন হইতে): "তুরীয়ানন্দ ও আমার সুন্দর বাসস্থান মিলেছে। সারদানন্দের ভ্রাতা মিস নোবল-এর বাসস্থানে আছে…। সমুদ্রযাত্রায় বেশ কিছু স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছে। তা ঘটেছে ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম ও মৌসুমী ঝড়ে ঢেউ-এর উপর স্টীমারের ওলটপালট থেকে। অদ্ভুত, নয় কি? আশা করি এটা বজায় থাকবে।" প্রায় ঐ সময়েই মেরীকেও লিখিয়াছিলেন, "এবারে কোন ব্যস্ততা নেই, টানাহেঁচড়া নেই, চুপটি ক'রে এক কোণে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাবার প্রথম সুযোগের অপেক্ষায় আছি। বন্ধুরা প্রায় সকলেই লণ্ডনের পল্লী অঞ্চলে কিংবা অন্যত্র চলে গিয়েছেন, আর আমার শরীরও বিশেষ সবল নয়।" ইহার পর ১০ই আগস্ট তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন: "আমার শরীর জাহাজে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু ডাঙায় আসিয়া পেটে বায়ু হওয়ায় একটু খারাপ।…এখানে বড় গোলযোগ—বন্ধুবান্ধব সব গরমির দিনে বাইরে গেছে। তার উপর শরীর তত ভাল নয়—খাওয়া দাওয়ায়ও গোলমাল। অতএব দু-চার দিনের মধ্যেই আমেরিকায় চললুম।" এই সব পত্রাংশ ও প্রাচীন জীবনীগুলি পাঠ করিলে এরূপ ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে যে, স্বামীজী লণ্ডনে কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সাহায্যকারীর অভাব ও স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য দ্রুত আমেরিকায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ পূর্ব হইতেই আমেরিকার বন্ধুরা তাঁহাকে সে দেশে ফিরিয়া পাইবার জন্য সাতিশয় আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং তিনিও পূর্ব হইতেই লণ্ডনের তৎকালীন অবস্থা পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া মার্কিন দেশেই কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই জন্যই পোর্ট সৈয়দ হইতে স্টার্ডিকে লিখিত তাঁহার ১৪ই জুলাই-এর পত্রে আছে: "তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, উপস্থিত লণ্ডনে আমার বন্ধুদের অনেকেই নেই; তা ছাড়া মিস ম্যাকলাউড যাবার জন্য আমায় খুবই পীড়াপীড়ি করছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডে থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না। অধিকন্তু আমার আয়ু ফুরিয়ে এল—অন্ততঃ আমাকে এটা সত্য ব'লে ধরে নিয়েই চলতে হবে। আমার বক্তব্য এই যে, আমরা যদি আমেরিকায় সত্যিই কিছু করতে চাই, তবে এখনি আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত প্রভাবকে যথাবিধি

নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলেও অন্ততঃ একমুখী করতেই হবে। তারপর মাস-কয়েক পরেই আমি ইংলণ্ডে ফিরে আসার অবকাশ পাব এবং ভারতবর্ষে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত একমনে কাজ করতে পারবো। আমার মনে হয়, আমেরিকার কাজকে গুছিয়ে আনার জন্য তোমার আসা একান্ত প্রয়োজন।…তুমি যদি আমেরিকায় নাও আসতে পারো, তবু আমার যাওয়া উচিত—কি বলো ?"

উইম্বলডনে স্বামীজী দুই সপ্তাহ কাটাইলেন বিশ্রামের জন্য ও আমেরিকাগামী জাহাজে জায়গা পাইবার জন্য। নিবেদিতার পিতৃগৃহ কাছেই ছিল—উইম্বলডনের ২১নং হাই স্ট্রীটে। সুতরাং স্বামীজীর সহিত নোবল পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। এই সূত্রে নিবেদিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রিচমণ্ড স্বামীজীর খুব অনুরক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "যে-কোন ব্যক্তির পক্ষেই স্বামীজীকে শুধু দেখার এবং তাঁর কথা শোনার অপেক্ষামাত্র ছিল। এবং তারপরেই সে বলিতে পারিত, 'বিহোল্ড দি ম্যান—এই দেখ সেই পুরুষপ্রবর'।" ১৬ই আগস্ট স্বামীজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ডেট্রয়েট-নিবাসিনী মহিলাদ্বয় গ্লাসগো হইতে মার্কিনগামী জাহাজে উঠিলেন। নিবেদিতা কয়েকটি কারণে দিন কয়েকের জন্য স্বগৃহে থাকিয়া গেলেন। এবারে উইম্বলডনে সমাগত ব্যক্তিদের সহিত বার্তালাপ ছাড়া স্বামীজী অন্য কোন প্রকার কার্যে লিপ্ত হন নাই।

অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে দশ দিন লাগিয়াছিল। এই কয়দিনের কথা বলিতে গিয়া শ্রীযুক্তা ফাঙ্কি লিখিয়াছিলেন : "সমুদ্রে এই যে দশটি দিন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয়। প্রতিদিন সকালে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, সংস্কৃত কবিতার আবৃত্তি ও অনুবাদ হইত, পুরাণের গল্প বলা হইত এবং বৈদিক স্তোত্রের আবৃত্তি হইত। সমুদ্র শান্ত ছিল এবং রাত্রে চন্দ্রের শোভা ছিল সুমনোহর। সন্ধ্যাগুলি ছিল অতি চমৎকার—আচার্যদেব যখন ডেকের উপর পদচারণ করিতেন, তখন চন্দ্রালোকে তাঁহার মূর্তি বড়ই মহিমময় মনে হইত ; তিনি মধ্যে মধ্যে থামিয়া আমাদের নিকট প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করিতেন, আর সোৎসাহে বলিতেন, 'এইসব মায়ার খেলাই যদি এত সুন্দর হয়, তো ভাব দেখি, এর পশ্চাতে যে সত্তা রয়েছে, তা কতই মনোহর !' একটি সন্ধ্যা বড়ই উপভোগ্য ছিল। তখন পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে ; উহাকে তখন বড়ই কোমল ও সোনালি বোধ হইতেছিল—রাত্রিটি যেন রহস্যাবৃত ও মায়াবিজড়িত ! তিনি অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সে সৌন্দর্য উপভোগ

করিলেন, তারপর অকস্মাৎ আমাদের দিকে ফিরিয়া ঊর্ধ্বে আকাশ ও নিম্নে সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বলিলেন, 'ওই ওখানে যখন কবিত্বের সার ছড়িয়ে রয়েছে, তখন কবিতা আবৃত্তির আবার কোন প্রয়োজন ?' নিউ ইয়র্কে পৌছিয়া মনে হইল, বড় শীঘ্র যাত্রা শেষ হইয়া গেল ; আর বোধ হইতে লাগিল, এই যে দশটি দিন আচার্যদেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটাইয়াছি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতার কোন সীমা থাকিতে পারে না।"

নিউ ইয়র্কে পৌছিয়াই স্বামীজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রথমে শ্রীযুক্ত লেগেট ও তাঁহার পত্নীর আবাসস্থলে গেলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের সহিত হাডসন নদীর তীরে কাটস-কিল পর্বতে তাঁহাদের রমণীয় বাটী 'রিজলী ম্যানর'-এ উপনীত হইলেন। ঐ নির্জন পল্লীনিকেতনটি নিউ ইয়র্ক হইতে দেড় শত মাইল দূরে। এখানে থাকিয়া তিনি "অতঃপর কোথায় কার্য করিতে হইবে এই বিষয়ে ভগবানের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা" করিতে লাগিলেন, আর "এই ইঙ্গিত যে আসিবেই, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ২০৩ পৃঃ)।

স্বামীজী রিজলী ম্যানরে ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাস ছিলেন। লেগেট-দম্পতি তাঁহার জন্য একটি ছোট আলাদা বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেখানে স্বামী তুরীয়ানন্দও থাকিতেন। স্বামীজী যখন নিউ ইয়র্কে উপনীত হন, তখন স্বামী অভেদানন্দ সেখানে ছিলেন না, প্রচারকার্যে অন্যত্র ব্যাপৃত ছিলেন। পরে স্বামীজীর তার পাইয়া রিজলী ম্যানরে আসেন ও দশ দিন সেখানে কাটাইয়া যান। ভগিনী নিবেদিতাও একমাস পরে সেখানে আসিয়াছিলেন, আর আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্তা ওলি বুল। এতদ্ব্যতীত লেগেটদের বন্ধুরাও কেহ কেহ ঐ সময়ে রিজলী ম্যানরে আসিয়া থাকিতেন এবং স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া ধন্য হইতেন। লেগেট-দম্পতি তাঁহার সর্বপ্রকার সুব্যবস্থায় সর্বদা যত্নপর থাকিতেন এবং স্বামীজীও তাঁহাদিগকে খুবই ভালবাসিতেন। শ্রীযুক্তা লেগেট ছিলেন তাঁহার 'মা'। তিনি স্বামী অভেদানন্দের নিকট শুনিয়া সুখী হইয়াছিলেন যে, নিউ ইয়র্কের বেদান্ত-সমিতির নিজস্ব স্থায়ী বাড়ী হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ ১৫ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ 'বেদান্ত সোসাইটি রুমস'-এর (বেদান্ত-সমিতির কক্ষগুলির) দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এদিকে স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দের কার্যারম্ভের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। যতদিন তাহা না পাওয়া যায়, ততদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর নিকট থাকিয়া ঐ দেশে কিরূপে কার্যপরিচালনা করিতে হইবে ও

কিরূপ জীবনযাপন করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। ঐ কালের কথা উল্লেখ করিয়া জনৈকা মার্কিন-দেশীয় ব্রহ্মচারিণী লিখিয়াছিলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ যেদিন ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় পদার্পণ করেন, সে দিন হইতে তিনটি সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রকার ব্যাধি হইতে দ্রুত মুক্তিলাভ করিতেছেন এবং ভারত হইতে ইংলণ্ড পর্যন্ত সমুদ্রভ্রমণের ফলে যে স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছিল তাহার পরিণামস্বরূপ নিত্য অধিকতর দৈহিক শক্তি লাভ করিতেছেন। তাঁহার আগমনের পর হইতে যে কয়জন বাছা বাছা লোক তাঁহার বাণী শুনিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই চিত্তে তাঁহার আনীত সত্যের মহতী বাণী গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। আর তাহাতে ছিল ভগবদ্বাণীর এমন এক বিশালতর প্রকাশ ও নিকটতর অনুভূতি যাহা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য খণ্ডে পূর্বে তাঁহার শ্রীবদনে শ্রুত হয় নাই। স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত যাঁহারই আলাপ হয়, তিনিই তাঁহাকে ভালবাসেন, এবং একজন বাঞ্ছনীয় প্রচারকরূপেই সকলের দ্বারা গৃহীত হন। ইঁহাদের উপস্থিতিতে আমরা কৃতার্থ ও আনন্দিত।...অতিথিবৎসল বন্ধুদের গৃহে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্রাম উপভোগ করিতেছেন; স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দও সেখানে আছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, তিনি তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় জয় করিয়াছেন এবং বেদান্ত-জিজ্ঞাসুদের আন্তরিক স্বাগত-সম্ভাষণের মধ্য দিয়া তাঁহার জন্য তাঁহার ভাবী কার্যক্ষেত্র রূপপরিগ্রহ করিতেছে।" (ইংরেজী জীবনী, ৬৬২ পৃঃ)।

স্বামী তুরীয়ানন্দের কার্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গেল। তিনি প্রথম প্রথম নিউ ইয়র্কের স্বল্প দূরে মণ্ট ক্লেয়ারে বালক-বালিকাদিগকে হিতোপদেশ ও অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থ অবলম্বনে গল্প শুনাইতেন এবং এইভাবে ধর্মশিক্ষা দিতেন। অধিকন্তু নিউ ইয়র্কের 'বেদান্ত-সমিতির কক্ষগুলিতে'ও তিনি নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিয়া স্বামী অভেদানন্দকে সাহায্য করিতেন। পরে ডিসেম্বর মাসে তিনি ক্যাম্ব্রিজে (ম্যাসাচুসেট্স) গিয়া অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বেদান্তকার্যে নিযুক্ত হন। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি ক্যাম্ব্রিজ কনফারেন্সে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কনফারেন্সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য স্থানের যে বুধমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গুরুভ্রাতাকে সাফল্যমণ্ডিত দেখিয়া স্বামীজীর আনন্দের সীমা ছিল না।

এদিকে রিজলী ম্যানরে বসিয়া তিনি নিজেও ঘরোয়াভাবে বেদান্তপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। এই কালের কয়েকটি ঘটনা শ্রীমতী ম্যাকলাউড লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৪৪-৪৫ পৃঃ)। তিনি ছিলেন শ্রীযুক্তা লেগেটের ভগিনী এবং আলোচ্যকালে সেখানেই বাস করিতেছিলেন :

"তিনি (স্বামীজী) বিশেষ করিয়া চকোলেট আইসক্রিম পছন্দ করিতেন আর বলিতেন, 'আমি তো নিজেই চকোলেট, তাই চকোলেট ভালবাসি।' একদিন আমরা স্ট্রবেরী খাইতেছিলাম, তখন একজন বলিয়া উঠিলেন, 'স্বামীজী, আপনি কি স্ট্রবেরী পছন্দ করেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'কখন তো চেখে দেখিনি!' 'কখন খান নি! সে কি? রোজই তো খাচ্ছেন!' তিনি বলিলেন, 'তোমরা তো সেগুলিকে ক্রীম দিয়ে ঢেকে দাও; ক্রীম মাখানো পাথরের নুড়িও বেশ লাগবে'।"

সন্ধ্যায় রিজলী ম্যানরের হলে আগুনের চারিদিকে বসিয়া সকলে তাঁহার কথা শুনিতেন। একবার তিনি তাঁহার চিন্তাধারা একটু খুলিয়া বলিলে উপস্থিত একজন মহিলা বলিয়া উঠিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনার এ কথায় সায় দিতে পারি না।" তিনি উত্তর দিলেন, "বটে? তাহলে একথাটা আপনার জন্যে নয়।" অমনি একজন বলিয়া উঠিলেন, "ও! কিন্তু আমার তো মনে হয়, আপনি ও কথাটা ঠিকই বলেছেন।" "আঃ! তাহলে কথাটা আপনারই জন্যে বলা হয়েছে।" ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় তিনি অপরের নিজস্ব ভাবকে কতটা মান্য দিয়া চলিতেন, আর অধিকারিভেদেই তাঁহার উপদেশের পার্থক্য ঘটিত।

এক সন্ধ্যায় তিনি বেশ একটা প্রেরণার ভাব লইয়া বাগ্মিতাপূর্ণ বার্তালাপে নিরত ছিলেন—তাঁহার স্বর ছিল বড়ই কোমল এবং উহা আসিতেছিল যেন কোন এক সুদূর দেশ হইতে; তাঁহার আশে-পাশে বসিয়া প্রায় দ্বাদশজন শ্রোতা সে বাক্যসুধা পান করিতেছিলেন। রাত্রিসমাগমে যখন সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইতে পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন—এমনি এক উচ্চ ভিন্ন স্তরে তখন তাঁহাদের মনগুলি বিরাজিত ছিল! পরে শ্রীযুক্তা লেগেট তাঁহার একজন মহিলা অতিথির কক্ষে যাইয়া দেখিলেন, তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন; ইনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদিনী। শ্রীযুক্তা লেগেট প্রশ্ন করিলেন, "এর মানে কি?" সেই মহিলা তাহাতে উত্তর দিলেন, "ঐ ব্যক্তিটি আমায় শাশ্বত জীবনের অধিকারিণী করেছেন; আমার সব শোনা হয়ে গেছে; আর আমি তাঁর কথা মোটেই শুনতে চাই না।"

নিবেদিতা লিখিয়াছেন : ১৮ই অক্টোবর আহারের সময় শ্রীযুক্তা ওলি বুল এই বলিয়া স্বামীজীকে ঠাট্টা করিতেছিলেন যে, কবিতা-রচনাই তাঁহার জীবনে সর্বাধিক বিফল প্রচেষ্টা, আর এই কাজটার দিকে ঝুঁকিয়া তিনি নিজের সুনামের ক্ষতি করিয়াছেন। ওলি বুল আরও বলিলেন যে, তাঁহার নিজের স্বামী বিখ্যাত বেহালা-বাদক হইলেও তিনি ঐ বিষয়ে সমালোচনা শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, সমালোচনা হইবেই ; কেননা তিনি নির্দোষ সঙ্গীত রচনায় সমর্থ ছিলেন না। কিন্তু রাস্তা তৈরী করার বিদ্যার বিরুদ্ধে সমালোচনা তাঁহার নিকট অসহ্য ছিল, আর ঐ বিষয়ে তাঁহার চাটুবাদেও তিনি উৎফুল্ল হইতেন। তারপর উপস্থিত সকলেই স্বামীজীকে লইয়া ঠাট্টা আরম্ভ করিলেন, এবং বলিতে থাকিলেন যে, তিনি ধর্মগুরুর কাজে বড়ই অপটু অথচ ছবি-আঁকা বিদ্যা লইয়া তাঁহার একটা বৃথা অহঙ্কার আছে। এমন সময় স্বামীজী হঠাৎ মন্তব্য করিলেন, "দেখুন,.একটা জিনিস আছে, যাকে বলে প্রেম, আর একটা আছে, যাকে বলে একত্বানুভূতি। একত্ব জিনিসটা প্রেমের চেয়েও বড়। আমি ধর্মকে ভালবাসি না—আমি ওর সঙ্গে এক হয়ে গেছি ; ঐ হল আমার জীবন (বা সত্তা), আর যেটার মধ্যে কারো জীবন কেটে গেছে, যাতে সে সত্যিকারের কিছু সাফল্য পেয়েছে, তাকে সে ভালবাসে না; মানুষ তেমন জিনিসকেই ভালবাসে যা তখনও পর্যন্ত তার সঙ্গে এক হয়ে যায়নি। আপনার স্বামী সর্বদা সাধন করে করে যে সঙ্গীতবিদ্যা অর্জন করেছিলেন, তাকে তিনি ভালবাসতেন না, কিন্তু যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় তখনও তেমন কোন পারদর্শিতা অর্জন করেননি, তাকে তিনি ভালবাসতেন। এই হল ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে ভেদ এবং এরই জন্য ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়।" ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৮৪ পৃঃ)।

৫ই নভেম্বর স্বামীজী ও অন্যান্য অতিথিরা লেগেটদের নিকট বিদায় লইলেন। রিজলী ম্যানর হইতে নিউ ইয়র্কে আসার পর স্বামীজীর প্রথম কার্যারম্ভ হয় ৮ই নভেম্বর, মঙ্গলবার, সেখানকার বেদান্ত সোসাইটির একটি প্রশ্নোত্তর বৈঠকে সভাপতিরূপে। ১০ই নভেম্বর সোসাইটির পুস্তকাগারে তাঁহার একটি সংবর্ধনার আয়োজন হইয়াছিল, এবং সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার পুরাতন বন্ধুরা তাঁহার সহিত মিলনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পুস্তকাদিদ্বারা ও তাঁহার নামে আকৃষ্ট অনেক নূতন জিজ্ঞাসুও আসিয়াছিলেন। সভায় তাঁহার পুরাতন বন্ধুগণ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং উহার সমুচিত

উত্তর দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃদয় এইসকল বন্ধুবর্গের প্রতি সর্বদাই অতীব প্রেমপুর্ণ।

এই সকল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সর্বদাই যেন একটি বিষয়ে সচেতন ছিলেন—তাঁহার মর্ত্যলীলা অবসানপ্রায়। কে যেন অন্তর হইতে তাঁহাকে উহা জানাইয়া দিতেছিল এবং তাঁহার কথাবার্তায়ও প্রায়ই আশু চিরবিদায়ের সুর বাজিয়া উঠিত। একদিন তিনি স্বামী অভেদানন্দকে বলিয়াছিলেন, "দেখ ভাই, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—বড় জোর আর তিন-চার বছর বাঁচব।" অভেদানন্দ আপত্তি জানাইলেন, "অমন কথা বলতে নাই, স্বামীজী। তোমার তো দ্রুত স্বাস্থ্যোন্নতি হচ্ছে। এখানে কিছুদিন থাকলে তোমার পুর্বের স্বাস্থ্য ও বল পুরোপুরি ফিরে পাবে। তাছাড়া আমাদের যে এখনও অনেক কাজ বাকি—এতো সবে শুরু।" স্বামীজী তবু অতি তাৎপর্যপুর্ণ ভাষায় বলিলেন, "আমার কথা বুঝতে পারছ না, ভাই! আমার অনুভব হচ্ছে, আমি যেন বেজায় বেড়ে যাচ্ছি। আমার অন্তর এত বেড়ে যাচ্ছে যে, সময়ে সময়ে মনে হয়, এ শরীরে তাকে এঁটে রাখা সম্ভব হবে না! আমি প্রায় ফেটে যাবার মতো হয়েছি। এই হাড়-মাসের খাঁচা আমাকে নিশ্চয়ই আর বেশী দিন ধরে রাখতে পারবে না।"

১৫ই নভেম্বর (১৮৯৯) শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিত পত্রেও অনুরূপ সুর শুনিতে পাই: "কিছু সময়ের জন্য অথবা চিরদিনের মতো আমি গা-ঢাকা দিতে চাই। অভিশপ্ত হোক আমার প্রসিদ্ধির দিনটি!"

নিউ ইয়র্কে স্বামীজী কি কি করিয়াছিলেন বা অন্য কোথাও গিয়াছিলেন কিনা—ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক কিছু জানা নাই। তাঁহার পত্রগুলি পড়িয়া অনুমান হয়, তিনি একবার শ্রীযুক্তা হুইলারের আমন্ত্রণে মণ্টক্লেয়ারে ও শ্রীযুক্তা ওলি বুলের আমন্ত্রণে ক্যাম্ব্রিজে গিয়াছিলেন। হয়তো কাছাকাছি আরও দুই-একটি স্থানে গিয়াছিলেন। তারপর ক্যালিফর্নিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ২১শে নভেম্বর নিউ ইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া ২৩শে নভেম্বর চিকাগো পৌছেন ও সেখানে দিন কয়েক হেল-পরিবার-মধ্যে কাটান। নিবেদিতাও তখন সেখানে থাকিয়া স্বীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। স্বামীজীর ৩০শে নভেম্বরের (১৮৯৯) পত্রে প্রকাশ, মাদাম কালভে তখন চিকাগোয় আসিয়াছিলেন, আর ঐ ৩০শে রাত্রেই স্বামীজী ক্যালিফর্নিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন।

দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায়

আমেরিকায় এই শেষ দফায় ঠিক ঠিক কাজ আরম্ভ করার আগে স্বামীজী ঈশ্বরের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। সে দৈবনির্দেশ অত্যাশ্চর্যরূপে আসিয়াছিল। স্বামীজী-যখন মাত্র দুই শত অধিবাসীর ক্ষুদ্র গ্রাম 'স্টোন রিজ'-এ (আলস্টার কাউণ্টি, নিউ ইয়র্ক স্টেট) শ্রীযুক্ত লেগেটের প্রাসাদ রিজলী ম্যানরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন এক অপরিচিতা মহিলার নিকট হইতে পত্র আসিল যে, শ্রীমতী জোসেফিন ম্যাকলাউড ও শ্রীযুক্তা বেটি লেগেটের একমাত্র সহোদর ভ্রাতা লস এঞ্জেলিসে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এই সংবাদ ভগিনীদের জানানো আবশ্যক বিবেচনায় ঐ মহিলা পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়াই বেটি লেগেট জোসেফিন বা 'জো'-কে বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছে, তোমার যাওয়া উচিত।" জো-ও বলিলেন, "নিশ্চয়।" দুই ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রার ব্যবস্থা হইয়া গেল। চার মাইল দূরবর্তী স্টেশনে যাইবার জন্য জো যখন ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, তখন স্বামীজী হাত তুলিয়া সংস্কৃতে শুভকামনা জানাইলেন ও বলিলেন, "গোটা কয়েক ক্লাসের ব্যবস্থা করে ফেলো, তাহলেই আমি হাজির হব।"

জো সোজা লস এঞ্জেলিসে পৌঁছিয়া নগরের উপকণ্ঠে একুশ নম্বর রাস্তার উপরে গোলাপপুষ্পাচ্ছাদিত একখানি ক্ষুদ্র বাটীর একটি কক্ষে দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতা টেলর রোগশয্যায় শায়িত এবং তাঁহার শয্যার উপর দিকে ঝুলিতেছে স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। জো তাঁহার ভ্রাতাকে দশ বৎসর যাবৎ দেখেন নাই; অতএব এক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত গল্পগুজব করিলেন এবং তাঁহার অবস্থা সম্পূর্ণ নিরীক্ষণান্তে গৃহকর্ত্রী শ্রীযুক্তা এস. কে. ব্লজেটের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "আমার ভাই খুবই অসুস্থ।" ব্লজেট সায় দিলেন, "তাই বটে।" "আমার মনে হচ্ছে, ও বাঁচবে না।" ব্লজেট সায় দিলেন, "তাই তো বোধ হয়।" জো জানিতে চাহিলেন, "সে এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে পারবে তো?" ব্লজেট বলিলেন, "নিশ্চয়।" তারপর জো জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভায়ের বিছানার উপর দিকে ঐ যে ছবি, এটা কার?" সেই সপ্ততিবর্ষীয়া বৃদ্ধা প্রশ্ন শুনিয়া গাম্ভীর্যভরে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,

"পৃথিবীতে ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন তবে এই ব্যক্তিই তিনি।" জো প্রশ্ন করিলেন, "এঁর সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?" তখন ব্লজেট তাঁহাকে বলিলেন যে, স্বামীজী যখন চিকাগো ধর্মমহাসভায় মার্কিনবাসীদিগকে 'ভগিনীগণ ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং সভাশেষে যখন দলে দলে মহিলারা সাগ্রহে বেঞ্চি ডিঙ্গাইয়া তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছিল, তখন ব্লজেট মনে মনে বলিয়াছিলেন, "দেখ বাছা, এই দুর্দম ভাবোচ্ছ্বাস যদি তুমি সামলাতে পার, তবে তুমি সত্যই ঈশ্বর।" জো তখন বলিলেন, "আমি এঁকে জানি।" "তুমি তাঁকে জান?" "হাঁ, আমি তাঁকে নিউ ইয়র্কের ক্যাট্স কিল পাহাড়ে দুইশ লোকের গ্রাম স্টোন রিজে দেখে এসেছি।" "তাহলে তো তুমি তাঁকে জান!" জো উত্তর দিলেন, "আপনি তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ করুন না কেন?" "আমার এই কুটীরে?"—ব্লজেট জিজ্ঞাসা করিলেন অতি বিস্মিতভাবে। জো তাঁহাকে বলিলেন, "তিনি আসবেন।" তিন সপ্তাহের মধ্যেই টেলরের দেহান্ত হইল এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যে স্বামীজী ঐ গৃহে উপস্থিত হইলেন।[১] স্বামীজী এবং জো উভয়েই ব্লজেটের অতিথিরূপে ঐ গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

এই ঠিকানা (৯২১ ওয়েস্ট ২১ নং স্ট্রীট, লস্ এঞ্জেলিস) হইতে ২৭শে ডিসেম্বর স্বামীজী শ্রীমতী মেরীকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন: "এখানে এখন ঠিক উত্তর ভারতের মতো শীত, কেবল মাঝে মাঝে কয়েকটা দিন একটু গরম; গোলাপ ফুলও আছে আর আছে চমৎকার পামগুলি। ক্ষেতে বার্লি ফলেছে, গোলাপ ও অন্যান্য নানা জাতের ফুল ফুটেছে আমার কুটিরের চার পাশে। গৃহস্বামিনী মিসেস ব্লজেট চিকাগোর মহিলা—স্থূলাঙ্গী, বৃদ্ধা এবং খুবই রসিকা ও বাকচতুরা। চিকাগোতে তিনি আমার বক্তৃতা শুনেছেন এবং খুব মাতৃস্বভাবা।" আর শ্রীমতী ম্যাকলাউডের স্মৃতিলিপিতে আছে ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৪৪-৪৭ পৃঃ): "এই ছোট কুটিরটিতে তিনখানি শয়ন-ঘর, একখানি রান্নাঘর, একখানি খাবারঘর ও একটি বৈঠকখানা ছিল। প্রতিদিন সকালে আমরা শুনিতাম, স্বামীজী রান্নাঘরের অদূরে স্নানের ঘরে

১। "স্বামীজী ডিসেম্বরের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই ক্যালিফর্নিয়ায় উপস্থিত হন এবং পর বৎসর ৭ই জুনের পূর্বে নিউ ইয়র্কে ফিরেন নাই।" (ইংরেজী জীবনী, ৬৬৩ পৃঃ)।

সংস্কৃত আবৃত্তি করিতেছেন। তিনি অবিন্যস্তকেশে বাহিরে আসিয়া প্রাতরাশের জন্য প্রস্তুত হইতেন। শ্রীযুক্তা ব্লজেট সুস্বাদু প্যান কেক (মালপো জাতীয় পিঠা) প্রস্তুত করিতেন এবং আমরা রান্নাঘরের টেবিলে বসিয়া উহা খাইতাম; স্বামীজীও আমাদের সহিত বসিতেন, আর তিনি শ্রীযুক্তা ব্লজেটের সহিত কত মধুরালাপই না করিতেন; কত রসিকতা ও পালটা জবাবই না চলিত! ব্লজেট বলিতেন পুরুষদের শয়তানীর কথা, আর তিনি শুনাইতেন মেয়েদের ততোধিক বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। শ্রীযুক্তা ব্লজেট কদাচিৎ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন; তিনি বলিতেন, 'আমার কাজ হচ্ছে আপনারা ফিরলেই আপনাদের রুচিকর খাবার দেওয়া'।"

এই অঞ্চলে স্বামীজীর বক্তৃতাদির আলোচনা আরম্ভের পূর্বে আমরা আনুষঙ্গিক দুই-চারিটি বিষয় জানিয়া লইব। ক্যালিফর্নিয়ায় আসার পূর্বে ১৫ই নভেম্বর (১৮৯৯) তিনি শ্রীযুক্তা বুলকে জানাইয়াছিলেন, "যেসব গল্প শুরু করেছিলাম, তা শেষ করতেই হবে। প্রথমটি মার্গো (মার্গারেট বা নিবেদিতা) আমাকে ফেরত দিয়েছে বলে মনে হয় না।" এগুলি কিসের গল্প এবং তাহাদের গতি কি হইয়াছিল জানা নাই। স্বামীজীর দুই-চারিটি গল্প তাঁহার গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। হয়তো নিবেদিতার লিখিত গল্পের সহিত বাকিগুলির কোন সম্পর্ক ছিল। স্বামীজীর পরবর্তী ২৭শে ডিসেম্বরের পত্রে জানা যায়, তিনি আর গল্প লিখিতে পারেন নাই; তবে "অন্য কিছু কিছু" লিখিতেছেন। আবার নিবেদিতাকে লিখিত ১৫ই ফেব্রুয়ারির (১৯০০) পত্রে আছে: "তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে সুখী হলাম। ভাল বিবেচনা কর তো তুমি নিজে ওগুলি আবার নূতন করে লেখো···আর যদি বিক্রি করে কিছু লাভ হয়, তোমার কাজের জন্য নাও।"

এই সময়ে আরও জানা যায়, একটা নূতন ধরনের চিকিৎসার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছিল। ২৩শে ডিসেম্বরের পত্রে আছে: "সত্যি আমি চৌম্বক চিকিৎসা-প্রণালীতে (ম্যাগনেটিক হিলিং) ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছি। মোট কথা এখন আমি বেশ ভালই আছি।···এখন আমি রোজ খাবারের আগে বা পরে যে-কোন সময়েই হোক মাইলের পর মাইল বেড়িয়ে আসি।" এই চিকিৎসা কতকটা আমাদের দেশের দলাই-মলাই-এর মতো। স্বামীজীর পত্রে আছে: "হাত ঘষে সে চিকিৎসা করে—ভিতরকার চিকিৎসা পর্যন্ত; তার

রোগীরা আমাকে বলেছে।" (২৭শে ডিসেম্বর)। "চিকিৎসক রগড়ে রগড়ে আমার ইঞ্চি কয়েক চামড়া তুলে ফেলেছে।" (২২শে ডিসেম্বর)।

পত্রগুলিতে আর একটি সংবাদ আছে তাঁহার বক্তৃতাদির সাফল্য সম্বন্ধে। প্রথমে তিনি অনেকটা নিরাশ ছিলেন; কিন্তু পরে সে ভাব কাটিয়া গিয়াছিল এবং তিনি তাঁহার আদরের বেলুড় মঠের জন্য কিছু অর্থসংগ্রহও করিতে পারিয়াছিলেন। ধীরামাতাকে (ওলি বুলকে) লিখিত ২২শে ডিসেম্বরের পত্রে আছে: "আমি প্যাসাডেনায় খেটে চলেছি, এবং আশা করছি যে, এখানে আমার কাজের কিছু ফল হবে। এখানে কেউ কেউ খুব উৎসাহী। 'রাজযোগ' বইখানি সত্যই এই উপকূলে চমৎকার কাজ করেছে।...বক্তৃতার ফলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। এটা একটা নিশ্চয় লাভ! কিছু লেখার কাজও করছি। এখানকার বক্তৃতাগুলি একজন সাঙ্কেতিক লেখক টুকে নিয়েছিল; স্থানীয় লোকেরা তা ছাপতে চায়।"

১২ই ডিসেম্বরের পত্র হইতে জানা যায় যে, বালী-বেলুড়ের মিউনিসিপ্যালিটির সহিত ঐ সময়ে ট্যাক্স প্রদান সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হয়। ইহার প্রতীকার-কল্পে স্বামীজী এই সময় হইতেই একটি দেবোত্তর ট্রাস্ট সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হন। আমরা এইসব কথা পরে বলিব। সম্প্রতি এখন আমরা তাঁহার বক্তৃতাদির আলোচনা করিয়া পুনর্বার তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয়লাভে ফিরিয়া আসিব। সম্প্রতি 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় (১৩৭২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র এবং অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ —এই চারি মাসে) 'দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় স্বামীজী' এই শিরোনাম অবলম্বনে ব্রহ্মচারিণী ঊষার লিখিত ঐ বিষয়ক ইংরেজী প্রবন্ধের[২] যে বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছে, উহাতে প্রবন্ধলেখিকা বহু মূল গ্রন্থ, স্মৃতিলিপি ইত্যাদির একত্র সমাবেশ করায় এই সময়ের ঘটনাবলীর পারম্পর্যাদি সহজবোধ্য হইয়াছে। আমরাও অনেকস্থলে আমাদের কার্যের সুবিধার জন্য বক্তৃতার ও ঘটনাবলীর পরম্পরাদি সম্বন্ধে এই অনুবাদের সাহায্য লইতেছি।

স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর মতে (৬৬১-৬৪) লস এঞ্জেলিসে আসার পরই তাঁহার নামে আকৃষ্ট ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। "বস্তুতঃ সেখানে থাকা-কালে লস এঞ্জেলিস

২। 'বেদান্ত অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট', ১৫৮ সংখ্যা (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৬২)।

ও তথা হইতে দশ মাইল দূরবর্তী প্যাসাডেনা—এই দুই স্থানের একটিতে বা অপরটিতে জনসাধারণের আগ্রহপূর্ণ অনুরোধে প্রত্যহ একটি করিয়া বক্তৃতা দিতে হইত। মনে হইত যেন স্বামীজী তাঁহার পূর্বকার কার্যোৎসাহ প্রায় সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে, আবহাওয়াও তাঁহার পক্ষে সবিশেষ স্বাস্থ্যানুকূল ছিল এবং তাঁহার কার্যও হইয়াছিল উচ্চতম রকমের।" আইডা অ্যানসেল—যিনি স্বামীজীর বহু বক্তৃতায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন ও সেগুলি সাঙ্কেতিক লিপিতে লিখিয়া লইয়াছিলেন, এবং যিনি পরে স্বামী তুরীয়ানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক উজ্জ্বলা নামে পরিচিতা হইয়াছিলেন, তিনি স্বামীজীকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি ক্যালিফর্নিয়ায় তাঁহার সর্বোচ্চ শিক্ষাদানকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

স্বামীজীর সর্বপ্রথম বক্তৃতা হয় ৮ই ডিসেম্বর তারিখে লস এঞ্জেলিসের ২৩৩নং দক্ষিণ ব্রডওয়েতে অবস্থিত ব্ল্যানচার্ড হলে—'বেদান্ত-দর্শন' সম্বন্ধে। পরবর্তী বক্তৃতা হয় দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অ্যামিটি চার্চে—বিষয় ছিল 'ব্রহ্মাণ্ড'। ইহার পরের যে বক্তৃতার সংবাদ পাওয়া যায় তাহার তারিখ ২রা জানুয়ারি, ১৯০০ ; অর্থাৎ মধ্যবর্তী অনেকগুলি বক্তৃতার সংবাদই এখন অপরিজ্ঞাত। এই ২রা জানুয়ারির বক্তৃতা হয় ব্ল্যানচার্ড হলে এবং উহার বিষয় ছিল 'ভারতের ইতিহাস'। পর দিবসের লস এঞ্জেলিস 'ইভিনিং এক্সপ্রেস' পত্রিকায় এই বক্তৃতার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা বড়ই অসন্তোষজনক ছিল, সাংবাদিক তাঁহার মূল বক্তব্য ধরিতে না পারিয়া একটা অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস বিবৃতি দিয়াছেন এবং এইরূপে স্বামীজীর প্রতিভাকে খর্ব করিয়াছেন। পত্রিকায় মুদ্রিত বিবরণমধ্যে এই কথাগুলিও আছে : "ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে, বরং ধর্মদ্বারা ঐক্যবদ্ধ জাতিপুঞ্জের এক বিশাল মহাদেশ। ভারতে পৌঁছিবার সহজ পথের অনুসন্ধানে নিরত কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখনও ভারতে লোকের বাস ছিল। ভারতের লোকসংখ্যা বিশ কোটি এবং সমস্ত দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বিভক্ত। বৃষ্টিপাত প্রচুর, তাই জমি উর্বর।" দেশ সমৃদ্ধ হইলেও অধিকাংশ লোক নিরামিষাশী ও তাহারা রক্ষণশীল—প্রাচীন রীতিনীতি সব বজায় রাখিয়াছে। উহারা জাতিভেদ মানে ; কিন্তু একই জাতের অন্তর্ভুক্ত রাজা-প্রজা সকলের মধ্যে একটা সাম্যভাবও বিদ্যমান।

৪ঠা জানুয়ারি 'কর্ম ও তার রহস্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয় লস এঞ্জেলিসের পাইন হলে। এই বক্তৃতায় স্বামীজী বলেন, কর্মের উপায় ও উদ্দেশ্য উভয়ই সমভাবে গুরুত্বপুর্ণ; আর মানুষই সে কর্মোপায়—মানুষ সৎ ও পবিত্র হইলে পৃথিবীও সত্বগুণ ও পবিত্রতায় ভরিয়া উঠিবে। উক্ত বক্তৃতার টাইপরাইটারে মুদ্রিত প্রতিলিপি দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার বেদান্ত-সমিতিতে সংরক্ষিত আছে।

৫ই জানুয়ারি তারিখে ৩৩০।১।২ দক্ষিণ ব্রডওয়েতে 'আমরা নিজেরাই'—বিষয়ে যে বক্তৃতা হয় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হয় পরদিবস 'লস এঞ্জেলিস টাইমস' পত্রিকায়। সংবাদপত্রের বিবরণের সহিত 'বাণী ও রচনা'য় 'সুবিদিত রহস্য' আখ্যায় যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে উহা মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, উভয় বক্তৃতা মূলতঃ অভিন্ন। ৭ই জানুয়ারি, রবিবারে ঐ একই স্থানে যীশুখৃষ্ট বিষয়ে স্বামীজী যে বক্তৃতা দেন, উহাই তাঁহার গ্রন্থাবলীতে 'ঈশদূত যীশুখৃষ্ট' নামে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। ৮ই জানুয়ারির 'লস এঞ্জেলিস টাইমস' পত্রিকার মতে উক্ত বক্তৃতাকালে ঘরটি একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল, শ্রোতাদের ঠাসা-ঠাসি করিয়া বসিতে হইয়াছিল। ৮ই জানুয়ারির বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'মনের শক্তি'। বক্তৃতার একস্থলে তিনি বলেন, "মানুষের অন্তরে প্রচণ্ড শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। রাজযোগ-বিজ্ঞানের প্রয়োগে এই শক্তির বিকাশসাধন সম্ভব, এবং এই প্রকারে মানুষ পুর্ণতার দিকে স্বীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করিতে পারে।" বক্তৃতাশেষে তিনি ঘোষণা করেন যে, যাঁহারা আন্তরিকভাবে এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে উৎসুক, তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত।

'নব-চিন্তাধারা'র (নিউ থট) অন্যতম শাখা 'সত্য-নিলয়' (হোম অব ট্রুথ)-এর একটি প্রশাখা লস এঞ্জেলিসে অবস্থিত ছিল। স্বামীজী সেখানে পর্যায়ক্রমে আটটি বক্তৃতা করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'ইউনিটি' নামক সাময়িক পত্রিকায় বলা হইয়াছিল, ঐ পর্যায়ে যেসব বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহার প্রত্যেকটিই ছিল 'অতীব চিত্তাকর্ষক'। এই পত্রিকার মতে স্বামীজীর চরিত্রে মুক্তস্বভাব শিশুর সৌন্দর্য ও মনোহারিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির পাণ্ডিত্য ও আর্চবিশপের মর্যাদা। লস এঞ্জেলিসের সংবাদপত্রগুলিতে স্বামীজী ও তাঁহার ভাষণসমূহ সম্বন্ধে যেমন একটা ভাসা-ভাসা ভাব দেখা যাইত 'ইউনিটি'তে তদপেক্ষা অধিকতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়

পাওয়া গিয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছিল যে, মার্কিনবাসীকে যীশুখৃষ্টের প্রচারিত ধর্মাপেক্ষা উন্নততর কোন ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যে স্বামীজী তদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ধর্ম বলিতে প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র বস্তুকেই বুঝায়, এবং "আমরা যাহা বিশ্বাস করি বলিয়া মুখে প্রকাশ করি, তাহাকে ব্যাবহারিক জীবনে কার্যে পরিণত করাই আমাদের পক্ষে সর্বাধিক কল্যাণকর।" ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টমাসের দিন স্বামীজী হোম অব ট্রুথ-এ 'পৃথিবীতে খৃষ্ট প্রচার' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হোম-এ প্রদত্ত আর একটি বক্তৃতার নাম ছিল 'ব্যাবহারিক আধ্যাত্মিকতার ইঙ্গিত'। স্বামীজীর বক্তৃতার রীতি ছিল এই যে, তিনি শ্রোতাদের চিন্তাধারায় হঠাৎ একটি ধাক্কা দিয়া তাহাদিগকে চিরাভ্যস্ত আরামপ্রদ আত্মপ্রসাদ ও কুসংস্কারের আবর্ত হইতে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিতেন ; ইহার নাম ছিল তাঁহার ভাষায় 'একটি ক্ষুদ্র বোমা ফেলা'। পূর্বোক্ত বক্তৃতায়ও তিনি ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেদিন স্বামীজী বলিয়াছিলেন—সমাজ-ব্যবস্থানুসারে "রাস্তার রমণী রূপধারী খৃষ্টকে, কারাগারের তস্কররূপধারী খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হইতেছে—যাহাতে তোমরা ভাল থাকিতে পার।" সমাজের ভারসাম্য রক্ষার উপায়ই এই ; তবু সমাজের দৃষ্টিতে এইসব অপরাধীরা ঘৃণ্য হইলেও "সকল চোর ও হত্যাকারী, সকল অসাধু, দুর্বলতম ও সর্বাধম দুরাত্মা, শয়তান—ইহারা সকলেই আমার দৃষ্টিতে খৃষ্ট। ঈশ্বর-খৃষ্ট, পিশাচ-খৃষ্ট –উভয় খৃষ্টই আমার নিকট পূজ্য। সৎ ও সাধুর চরণে প্রণাম, দুরাত্মা ও শয়তানের চরণেও প্রণাম। তাহারা সকলেই আমার শিক্ষক, সকলেই আমার আধ্যাত্মিক গুরু, সকলেই আমার ত্রাণকর্তা।...ভ্রষ্টাচারিণী স্ত্রীলোককে আমি ঘৃণা করিতে বাধ্য হই, কারণ উহাই সমাজের নির্দেশ! যে নারীর পেশার ফলে অপর নারীদের সতীত্ব রক্ষিত হয়, সেই রমণী আমার নিকট 'ত্রাণকর্ত্রী'। কাহাকে দোষারোপ করিব? কাহাকে প্রশংসা করিব? ঢালের দুই দিকই যে দেখা দরকার।"

ইংরেজী জীবনীর মতে স্বামীজী 'হোম অব ট্রুথ'-এর আনুকূল্যে একমাস যাবৎ অনেকগুলি বক্তৃতা করেন ও *ক্লাস পরিচালনা* করেন ; অধিকন্তু ঐ একমাস তিনি 'হোম'-এই বাস করেন। বক্তৃতায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত থাকিত। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় বক্তৃতাদির কথা সম্পূর্ণ সমর্থিত হইলেও লস এঞ্জেলিসের 'হোম অব ট্রুথে' বাসের কথা প্রমাণিত হয় না। তবে ইহা সত্য যে,

তিনি স্যান ফ্রান্সিস্কোর 'হোম অব ট্রুথে' বাস করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা পরে বলিব। পূর্বোক্ত 'হোম'-এ তিনি বাস না করিলেও সেখানকার একটি ঘটনা ইংরেজী জীবনী হইতে প্রদান করিতেছি। হোমে গেলে স্বামীজী শ্রীমতী স্পেন্সার-এর মাতার নিকট মেজেতে বসিয়া গল্পগুজব করিতেন; বৃদ্ধা অন্ধ ছিলেন। স্পেন্সার স্বামীজীর শিষ্যাস্থানীয়া ছিলেন; সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে খোলাখুলি প্রশ্ন করিতে কোন বাধা ছিল না। বৃদ্ধা অন্ধ মাতার সহিত স্বামীজী কেন এরূপ আগ্রহ সহকারে কথা বলেন ইহা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া তিনি একদিন স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলে স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন, জন্মের ন্যায় মৃত্যুও এক রহস্যময় ব্যাপার; তাই মরণোন্মুখী বৃদ্ধা মাতা তাঁহার মনকে সহজেই আকর্ষণ করেন। দেহ যখন ধ্বংসাভিমুখ হয় তখন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ হইতে থাকে ও জীবাত্মা ক্রমে পরলোকে প্রয়াণ করে। যেসব মন বাহ্য প্রপঞ্চে ডুবিয়া থাকে তাহাদের নিকট এই অবস্থা বড়ই দুঃখপ্রদ ও জঘন্য; কিন্তু স্বামীজীর অধ্যাত্ম দৃষ্টির সম্মুখে উহা ছিল বিশেষ অনুধাবনযোগ্য ও অর্থপূর্ণ।

ফলতঃ 'হোম অব ট্রুথ'-এ বক্তৃতাদিব্যপদেশে উপস্থিত থাকিলেও স্বামীজীর বাসস্থান ছিল ব্লজেটেরই গৃহ। ম্যাকলাউডও লিখিয়াছেন, "আমরা কয়েক মাস শ্রীযুক্তা ব্লজেটের অতিথি ছিলাম।" অবশ্য পরে আমরা দেখিব এই "কয়েক মাস" কথাটিও নির্বিচারে গ্রহণ করা চলে না। বস্তুতঃ স্বামীজী ঐ বাটীতে দুই মাসের অধিক ছিলেন না।

অদূরবর্তী প্যাসাডেনা শহরে কবে তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ হয় জানা নাই; তবে উহা নিশ্চয়ই ২২শে ডিসেম্বরের পূর্বে, কারণ ঐ দিনের পত্রে তিনি ওলি বুলকে প্যাসাডেনার কার্যের কথা জানাইয়াছিলেন। আবার সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিবরণ হইতে জানা যায়, এই কার্য বেশ কিছুকাল চলিয়াছিল। ১৫ই জানুয়ারির (১৯০০) প্যাসাডেনার 'ইভিনিং স্টার' নামক দৈনিক পত্রিকা 'স্বামী বিবেকানন্দ প্যাসাডেনার একজন প্রসিদ্ধ অতিথি' এই শিরোনামায় লিখিয়াছিল, "চিকাগো বিশ্বমেলার অন্তর্গত ধর্মমহাসম্মেলনে সর্বাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন বোধ হয় স্বামী বিব কানন্দ, যিনি হিন্দো ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন, যাহার মনোমুগ্ধকর ও অনুপম ব্যক্তিত্ব ও স্বদেশের ধর্মপরিবেশনের দ্বারা চিকাগোর জনসাধারণের মধ্যে খুব উৎসাহ সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বামী বিব কানন্দ আজ প্যাসাডেনায়

অতিথিরূপে উপস্থিত আছেন এবং অন্ত প্রাতে 'গ্রীন'-এর অভ্যাগতদের সম্মুখে বক্তৃতা করিবেন।"

দুই দিন পরে ঐ পত্রিকাই ঘোষণা করিয়াছিল যে, পূর্বরাত্রে স্বামীজী শেক্সপীয়র ক্লাবে অল্পসংখ্যক শ্রোতার সম্মুখে 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এইসব বক্তৃতায় কোন প্রবেশমূল্য ছিল না, এবং ঐ পত্রিকার মতে, স্থানীয় লোকেরা ব্যবস্থা করিতে পারিলে ও স্বামীজীর পরিকল্পিত 'শিল্প বিত্থালয়ের প্রতিষ্ঠার্থ' চাঁদা সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকিলে স্বামীজী পরবর্তী সপ্তাহে সানন্দে বক্তৃতা দিবেন। এই সকল বিবরণ ও বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায়, তিনি ১৫ই, ১৭ই, এবং ১৯শে জানুয়ারি 'গ্রীন' নামক এক হোটেলে (৯৯ দক্ষিণ রেমণ্ড অ্যাভিনিউ) ভাষণ দেন। প্রথম দিনের বিষয় ছিল 'ভক্তিযোগ' বা 'প্রেমের ধর্ম'। ১৬ই ও ১৭ই জানুয়ারি তারিখে তিনি শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা দেন। উহা তখন লিঙ্কন অ্যাভিনিউ ও ফেয়ার ওকস অ্যাভিনিউতে ষ্টিকনী মেমোরিয়াল বিল্ডিং নামক ছোট একটি বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। সে বাড়ী আর নাই, যদিও ক্লাবটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দেও অন্যত্র বিত্থমান ছিল। ১৭ই জানুয়ারি তারিখে শেক্সপীয়র ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ লস এঞ্জেলিস টাইমস-এ প্রকাশিত হয়। পত্রিকার মতে স্বামীজী "শিবের উৎপত্তি ও উমার পবিত্র ভাবের নিকট তাঁহার আত্ম-সমর্পণের উপাখ্যান বলেন। উমা এখনও সমগ্র ভারতের জননী; তাঁহার পূজা, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে, যে-কোন স্ত্রী-পশুকে হত্যা করা চলে না, (কারণ স্ত্রীমূর্তি-মাত্রই উমার এক একটি রূপ)।" স্বামীজী মৃদুস্বরে সহজবোধ্য ভাষায় শ্রোতাদিগকে সুকঠিন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ শুনাইয়াছিলেন এবং শ্রোতারাও অখণ্ড মনোযোগ সহকারে উহার অনুধাবন করিয়াছিলেন। ১৮ই জানুয়ারি তিনি 'ভারতীয় নারী' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২৭শে জানুয়ারি শেক্সপীয়র ক্লাবে বেদান্তদর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল; কিন্তু ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য ব্যক্তিদের অনুরোধে স্বামীজী 'আমার জীবন ও ব্রত' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এই বিষয়ে ইহাই ছিল মার্কিন দেশে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারত সম্বন্ধে ও ভারতের আদর্শ ত্যাগ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ স্থাপন, আমেরিকায় স্বামীজীর আগমন এবং ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক মানের উন্নতিসাধন ও শিক্ষার প্রসারের পরিকল্পনাদি বিষয়ে অনেক কথা বলেন।

২৮শে জানুয়ারি তিনি প্যাসাডেনার রেমণ্ড অ্যাভিনিউ ও চেস্টনাট স্ট্রীটে অবস্থিত ইউনিভার্সালিস্ট গীর্জায় 'বিশ্বজনীন ধর্ম উপলব্ধির পন্থা' বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন উহার জনপ্রিয়তা তাঁহার দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় প্রদত্ত সর্বোত্তম বক্তৃতা 'ঈশদূত যীশুখৃষ্ট'-এর সহিত তুলিত হইতে পারে। গীর্জাটি শেক্সপীয়র ক্লাবের তদানীন্তন গৃহ হইতে অতি সামান্য দূরে অবস্থিত ছিল। বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, সকল মানুষকে একটিমাত্র ধর্মের আওতায় আনিবার চেষ্টা পূর্বে ব্যর্থ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বরং বৈচিত্র্য স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, ঐ ধর্মগুলি পরস্পরের বিরোধী নহে, প্রত্যুত একে অন্যের পরিপূরক। "বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ এবং প্রত্যেকটি ধর্মের মধ্যেই মহান সত্যের অংশ বিদ্যমান।" "আমাদের নীতি হবে বর্জন নয়, গ্রহণ"; "অতীতে যে সকল ধর্ম ছিল, আমি সেগুলি সমর্থন করি এবং সেই সব ধর্মের উপাসনা-পদ্ধতি যাই হোক না কেন, আমি তার প্রত্যেকটি নিয়েই ঈশ্বরারাধনা করি। আমি মুসলমানদের মসজিদে যাব, খৃষ্টানদের গীর্জায় প্রবেশ করে ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হব, বৌদ্ধদের মন্দিরে প্রবেশ করে বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের শরণ নেব। প্রত্যেকের অন্তর যে আলোকে আলোকিত হয়, সেই আলোক প্রত্যক্ষ করার জন্য যে হিন্দু ধ্যানমগ্ন, আমি বনে গিয়ে তার পাশে বসে ধ্যানে ডুবে যাব। শুধু এই সব করেই ক্ষান্ত হব না, ভবিষ্যতে যা-কিছু আসতে পারে তার জন্যও হৃদয় উন্মুক্ত রাখব।" মনে হয় এখানেই স্বামীজী বিশ্বজনীন ধর্মের স্বরূপের ও সারমর্মের সর্বোৎকৃষ্ট বাঙ্ময় রূপ দিয়া গেলেন।

শেক্সপীয়র ক্লাবে 'প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যগুলি' সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়া তিনি ৩১শে জানুয়ারি (১৯০০) রামায়ণ ও ১লা ফেব্রুয়ারি মহাভারতের বিষয়ে বলেন। ইংরেজী জীবনীর মতে এই বক্তৃতা পর্যায়মধ্যে 'জড় ভরতের উপাখ্যান' ও 'প্রহ্লাদের কাহিনী'ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত প্যাসাডেনার 'ইভিনিং স্টার'-এর বিবরণানুসারে ৩০শে জানুয়ারি 'আর্যজাতি' ও ২রা ফেব্রুয়ারি 'বৌদ্ধ ভারত' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারি শেক্সপীয়র ক্লাবে স্বামীজী তাঁহার অন্যতম বিখ্যাত ভাষণ 'জগতের মহত্তম আচার্যগণ' প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় হিন্দু-দর্শনের দুইটি কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়— অবতার-তত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডের কল্পান্তিক পুনরাবর্তন-তত্ত্ব। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যেমন তরঙ্গাকারে বা চক্রাকারে চলিতে থাকে, জাতিবিশেষের আধ্যাত্মিক

জীবনেও তেমনি তরঙ্গাকার গতি—উত্থানান্তে পতন ও পতনান্তে উত্থান—দেখিতে পাওয়া যায়। ঊর্ধ্বে উন্নীয়মান তরঙ্গের শীর্ষদেশে থাকেন এক জ্যোতির্ময় ঈশ্বরদূত—তিনিই শক্তিরূপে ঢেউটিকে তোলেন, জাতিকে উন্নীত করেন।

অতঃপর আমরা ঐ সময়ে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় লইতে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ শ্রীমতী ম্যাকলাউড (জো) ও শ্রীযুক্তা ব্লজেটের স্মৃতিলিপিদ্বয়ে ফিরিয়া যাই ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৪৬, ৩৭২-৭৫ পৃঃ): স্বামীজী যেদিন 'ঈশদূত যীশুখৃষ্ট' (ম্যাকলাউডের মতে 'জেসাস অব ন্যাজারেথ') সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, সেদিন ম্যাকলাউডের মনে হইয়াছিল, স্বামীজী যেন আপাদমস্তক এক শুভ্র দিব্যজ্যোতিতে আবৃত—তিনি খৃষ্টের মাধুর্য ও প্রভাবের মধ্যে এমনি ভাবে আপনাকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বাসগৃহে ফিরিবার কালে জো একটিও কথা বলিলেন না; কারণ তাঁহার ভয় হইয়াছিল, স্বামীজীর মনোমধ্যে তখনও যে ভাবতরঙ্গ চলিতেছিল, উহা বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, "আমি বুঝেছি, কি করে এটা করতে হয়।" জো জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনটা কি করে করা হয়?" "কেমন করে তারা 'মাল্লিগাটনি-স্যুপ'[৩] তৈরী করে; তারা ওর ভেতর বে-গাছের একটা (লাল রঙের) পাতা ছেড়ে দেয়।" এই মাত্র যিনি অত্যুচ্চ তত্ত্বকথা শুনাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন এবং অশেষ প্রশংসা অর্জন করিলেন, তিনি কেমন করিয়া মুহূর্তমধ্যে বন্ধুসকাশে আপনার বিরাট ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া সাধারণ স্তরে নামিয়া আসিতে পারেন, ইহা দেখিয়া জো সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ যেন ছিল স্বামীজীর একটা নিজস্ব বিশেষত্ব—মুহূর্তমধ্যে স্বকীয় মহত্ত্বকে আবৃত করিয়া তিনি সাধারণ মানুষের সহিত সাধারণভাবে মিশিতেন। আর একটি জিনিস ম্যাকলাউড লক্ষ্য করিয়াছিলেন—স্বামীজীর নিকট যে কেহ আসিত সে একটা শান্তি ও শক্তি লইয়া ঘরে ফিরিত—তিনি যেন আপন আধ্যাত্মিক তেজোবীর্য অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতেন। ম্যাকলাউডকে কেহ যদি প্রশ্ন করিত, "তোমার মতে আধ্যাত্মিকতা যাচাই করার উপায় কি?"—তবে তিনি দ্বিধাহীন উত্তর

৩। ইহার টনি (tawny—পাঁশুটে) রং করার জন্য ঐ পাতা ব্যবহৃত হয়। এই স্যুপ দক্ষিণ ভারতীয় তরল খাদ্য 'মলগুতন্নি'র (বা লঙ্কা-জলের) পাশ্চাত্ত্য অনুকল্প। 'ল'-কারটি ল ও র অক্ষরের মাঝামাঝি রূপে উচ্চারণীয়।

দিতেন, "সাধুর উপস্থিতিতে মনে যে সাহস—ভরসার উদয় হয়।" "স্বামীজী বলিতেন, 'ত্রাণকর্তাদের উচিত শিষ্যদের পাপতাপ গ্রহণ করা এবং শিষ্যদিগকে মুক্ত হৃদয়ে সানন্দে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া। এখানেই পার্থক্য—ত্রাণকর্তাদিগকে অপরের ভার লইতে হয়'।"

প্যাসাডেনায় যাওয়ার ঠিক পুর্ববর্তী ঘটনাটি ম্যাকলাউডের বর্ণনায় এইরূপ আছে: "একদিন তিন জন মহিলা শ্রীযুক্তা ব্লজেটের নিকট আসিয়া স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। স্বামীজী যাহাতে ইঁহাদের সহিত নির্জনে কথা বলিতে পারেন এই অভিপ্রায়ে আমি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলাম। অর্ধঘণ্টা পরে স্বামীজী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'এই মহিলারা হচ্ছেন তিন বোন; আর এঁদের ইচ্ছা যে আমি প্যাসাডেনায় তাঁদের বাড়ীতে দেখা করতে যাই।' আমি বলিলাম, 'যান না।' তিনি বলিলেন, 'ঠিক হবে তো?' আমি বলিলাম, 'ঠিক হবে, আপনি যান।' এই মহিলারা ছিলেন—শ্রীযুক্তা হ্যান্সবরো, শ্রীমতী মীড, ও শ্রীযুক্তা ওয়াইকফ। ওয়াইকফের বাড়ীতে এখন হলিউডের বিবেকানন্দ-ভবন অবস্থিত।" এই তিন সহোদরা পরে মীড-ভগিনীত্রয় নামে পরিচিতা হইয়াছিলেন। আমাদিগকে পরেও ইঁহাদের উল্লেখ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্তা ব্লজেট লিখিয়াছেন যে, স্বামীজী যে কয়দিন তাঁহার বাড়ীতে ছিলেন, সেই দিনগুলির স্মৃতি তাঁহার নিকট ছিল বড়ই মধুর। স্বামীজীর মধ্যে এমন একটা সরল শিশুসুলভ আনন্দোৎফুল্ল স্বাচ্ছন্দ্য ছিল যাহা মাতৃহৃদয়কে সহজে স্পর্শ করিত এবং যে কেহ তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতেন তাঁহারই চিত্ত সুখ ও পবিত্রতায় পুর্ণ না হইয়া থাকিতে পারিত না। তিনি ছিলেন ঋষি ও দার্শনিক —জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার; অথচ পাশ্চাত্ত্যবাসীদের ন্যায় তাঁহার বিন্দুমাত্র ব্যবসায়বুদ্ধি ছিল না। একই পরিবারের সকলে যেমন স্বাভাবিকভাবে একে অন্যের খুঁটিনাটি কাজে সাহায্য করে এবং প্রয়োজনস্থলে ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া দেয়, স্বামীজীর প্রতি ব্লজেটের ব্যবহারেও সেইরূপ ভাবই ফুটিয়া উঠিত।

বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে যখন শ্রোতারা স্বামীজীকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিত, তখন তিনি কোন প্রকারে তাঁহাদের নিকট অব্যাহতি পাইয়া, বিদ্যালয়শেষে ছেলেরা যেমন খুশী মনে দ্রুত স্বগৃহে ফিরিয়া যায়, স্বামীজীও তেমনি ব্লজেটের রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া বলিতেন, "এখন রান্নাবান্না করা যাক!" ঋষি ও দার্শনিক তখন অদৃশ্য হইয়া ব্লজেটের সম্মুখে একটি সরল মধুর স্বভাব শিশু

খেলিয়া বেড়াইত। এদিকে জো সেখানে আসিয়া দেখিতেন, স্বামীজী বক্তৃতার ভাল পোশাক না বদলাইয়াই হাতা-কড়া-বেড়ি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তাই শাসনের স্বরে বলিতেন, পোশাক বদলাইয়া আসিতে হইবে।

ব্রজেট জোকে লিখিয়াছিলেন: "তুমি যে দিনগুলিকে চা-পার্টির দিন বলতে, সেগুলি কি আনন্দময়ই না ছিল! আমরা কতই না হাসতাম! সেদিনের কথা মনে আছে কি যেদিন স্বামীজী কেমন করে জড়িয়ে জড়িয়ে পাগড়ি বাঁধেন তাই আমাকে দেখাচ্ছিলেন, আর তুমি তাড়াতাড়ি করতে বলছিলে, কারণ বক্তৃতা-গৃহে যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন বললাম, 'স্বামীজী, আপনার কোন তাড়া নেই; আপনি হচ্ছেন—ফাঁসিকাঠে ঝুলতে যাচ্ছিল যে আসামী, তারই মতো। লোকের ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়ে গেছে, ফাঁসির জায়গার কাছে যাবার জন্য, এমন সময় আসামী হেঁকে বললে—"কিচ্ছু তাড়াতাড়ি নেই; আমি ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত দেখবার মতো কিচ্ছু নেই।" আমি আপনাকে ঠিক বলছি স্বামীজী, আপনি ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত দেখবার মতো কিচ্ছু নেই।' এতে তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে, পরে প্রায়ই বলতেন, 'আমি ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত দেখবার মতো কিচ্ছু নেই,' আর বালকের ন্যায় হাসিতেন।"

মনে হয় বেটি লেগেটও ঐ সময় ব্রজেটের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন।[৪] অন্তত: ব্রজেট আর দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহার কথা তুলিয়াছেন। শ্রোতারা সমবেত হইয়াছেন, কিন্তু স্বামীজী অবনত মস্তকে ধ্যানে মগ্ন—মুখের ভাবে মনে হয়, মন যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি শ্রীযুক্তা লেগেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিষয়ে বলব?" ইহাতে একদিকে যেমন লেগেটের বুদ্ধিমত্তার উপর তাঁহার আস্থা প্রকাশ পায়, অপরদিকে তেমনি দেখা যায়, অসংখ্য শ্রোতাকে বক্তৃতা দ্বারা মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিলেও, তিনি অনেক সময় আপনভোলা বালকের ন্যায় অপরের উপদেশাদির উপর নির্ভর করিতেন।

প্রত্যূষে যখন ম্যাকলাউড ও তাঁহার ভগিনী বেটি লেগেট তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই, এমন সময় স্বামীজী স্নান সারিতে যাইতেন এবং স্নানকালে সুললিত-স্বরে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতেন। ব্রজেটের নিকট সে ভাষা অবোধ্য হইলেও

৪। প্যাসাডেনার পিকনিক পার্টির দুইখানি ফটোতে বেটি লেগেটের ছবিও আছে।

ভাবটা তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিত এবং পরে তিনি বলিয়াছিলেন, ঐ মহাপুরুষের যত স্মৃতি তাঁহার মনে ছিল, তন্মধ্যে ঐ প্রাতঃকালীন স্তোত্রপাঠই ছিল সর্বাধিক পবিত্র ও উদ্দীপনাপূর্ণ। আর তাঁহার মনে পড়িত রান্নাঘরের স্মৃতিগুলি—স্বামীজীর সাবলীল, সরল ব্যবহার ও দ্বিধাহীন অবাধ চিন্তার স্রোত—কত স্বাভাবিক, কত সুখপ্রদ, কত অধ্যাত্মরসে ভরপুর!

আর এক সকালে ব্লজেট খবরের কাগজে পড়িয়াছিলেন যে, কে একজন তাহার স্ত্রী বা সন্তানের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে। অমনি তিনি ক্ষেপিয়া গিয়া সামাজিক বিধিগুলির অজস্র নিন্দা করিতে লাগিলেন—সামাজিক ব্যবস্থাই এমন কুৎসিত যে, ইহার ফলে পাগল, মাতাল, আহাম্মক, বদমায়েস নরনারীরও সন্তান হইয়া সমাজকে বিপর্যস্ত করিতে পারে; আইন-এর সাহায্যে এই বিকট অবস্থার প্রতিরোধ করা আবশ্যক। স্বামীজী সব শুনিয়া ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিলেন, রাতারাতি জোর করিয়া সমাজসংস্কার হয় না; উহা ধীরে ধীরে হইতেছে এবং হইতে থাকিবে; এককালে অসভ্যেরা যষ্ট্যাঘাতে স্ত্রী-সংগ্রহ করিত; ক্রমে সে প্রথা পরিবর্তিত হইয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা পর্যন্ত আসিয়াছে। ইহাই উন্নতির স্বাভাবিক পথ।

বয়োধিক্যের ভয়ে ও গৃহকার্যের ঝামেলায় ব্লজেট স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে সাধারণতঃ যাইতে পারিতেন না। তবে একটি বক্তৃতাকক্ষের ঘটনা তিনি লিখিয়াছিলেন। সে সভাকক্ষে অতিসাহসী অথচ বিবেচনাহীন এক মহিলা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "স্বামীজী, আপনার দেশে কারা সাধুদের খাওয়ায়? আর আপনি তো জানেনই, তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।" চকিতে স্বামীজীর উত্তর আসিল, "মহাশয়া, ঠিক তারাই যারা আপনাদের দেশে ধর্ম-যাজকদের খাওয়ায়—অর্থাৎ মেয়েরা।" শ্রোতারা হাসিতে ফাটিয়া পড়িল, সে ভদ্রমহিলা কোথায় ভাসিয়া গেলেন, স্বামীজীর বক্তৃতাও নির্বিবাদে চলিতে লাগিল। আর একবার চিকাগো নগরে স্বামীজী ম্যাসোনিক মন্দিরে বক্তৃতা দিতেছিলেন, এমন সময় এক সুবিখ্যাত ধর্মযাজক প্রশ্ন করিলেন, "সন্ন্যাসী মহাশয়, আপনি তো সাম্প্রদায়িক মতবাদে বিশ্বাস করেন—করেন না কি?" স্বামীজী ঝটিতি উত্তর দিলেন, "ঠিক কথা, আমি বিশ্বাস করি, আর আপনাদের পক্ষে তা আবশ্যক। গাছের বীজ পুঁতে তাকে রক্ষা করার জন্য আপনারা তার চারদিকে একটু ছোট্ট বেড়া তুলে দেন, যাতে শুয়োর, ছাগল প্রভৃতি চারা-গাছটিকে নষ্ট

না করে। কিন্তু বীজ যখন শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন আর সে বেড়ার দরকার হয় না।”

অন্য সূত্রে জানা যায়, ১৮ই জানুয়ারি শেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া স্বামীজী শ্রোতাদের বলেন, কি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইবে, তাহা তিনি জানেন না; অতএব শ্রোতারাই যেন বিষয় নির্বাচন করিয়া দেন। সুযোগ পাইয়া একটা চ্যালেঞ্জের ভাব লইয়া একজন শ্রোতা বলিলেন, “আপনাদের দর্শনশাস্ত্র কি ফল প্রসব করেছে, আমরা তা জানতে চাই; আপনাদের ধর্ম ও দর্শন আপনাদের নারীসমাজকে কি আমাদের মহিলাদের চেয়ে উন্নততর করেছে?” একটি ক্ষিপ্র উত্তর দিয়া স্বামীজী এইরূপ অপ্রিয় তুলনামূলক বক্তৃতা এড়াইয়া যাইতে চাহিলেন; তিনি বলিলেন, “দেখুন, এ প্রশ্নটা একেবারে ব্যক্তিগত; আমি তো এদেশের ও আমাদের দেশের স্ত্রীলোকমাত্রকেই শ্রদ্ধাপ্রীতির চক্ষে দেখি।” প্রশ্নকর্তা তবু বলিলেন, “বেশ, আপনি আমাদিগকে আপনাদের নারীসমাজ—তাদের আচার ও শিক্ষা সম্বন্ধে এবং তারা পরিবারে কিরূপ স্থান পায় সে বিষয়ে বলবেন কি?” স্বামীজী সে প্রস্তাব সানন্দে স্বীকার করিয়া ভারতের সামাজিক ব্যবস্থা, আধ্যাত্মিক আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মান ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে ভারতীয় নারীর স্থান কোথায় এবং পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সহিত ভারতীয় নারীর আদর্শের পার্থক্য কোথায় ইত্যাদি বিষয়ে এক মনোজ্ঞ নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। এই বক্তৃতাটি মার্কিন মহিলাদিগকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল এবং পরে উহা ‘ভারতীয় নারী’ নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

যে মীড-ভগ্নীত্রয়ের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের পূর্ণ নাম ছিল, শ্রীযুক্তা ক্যারী মীড ওয়াইকফ, শ্রীযুক্তা এলিস মীড হ্যান্সবরো, এবং শ্রীমতী হেলেন মীড। ইঁহাদের ভ্রাতা উইলিয়ম এক ব্যাঙ্কে কাজ করিতেন এবং সমাজে বেশ গণ্যমান্য ছিলেন। হলিউডের বেদান্ত-সমিতির সভ্যদের নিকট এলিস পরবর্তী কালে শান্তি নামে এবং ক্যারী সিস্টার (ভগিনী) ললিতা বা শুধু সিস্টার নামে পরিচিতা হন। শান্তি স্বামীজীর ‘রাজযোগ’ পূর্বেই পড়িয়াছিলেন। স্বামীজী পশ্চিম উপকূলে আসার পর কাগজে একদিন তাঁহার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি অপর দুই ভগ্নীর সহিত উহা শুনিতে যান, এবং বক্তৃতান্তে স্থির করেন যে, তিনি স্বামীজীর কার্যে সাহায্য করিবেন। সিস্টারও ঐ বক্তৃতায়

মুগ্ধ হন; তিনি বলিতেন, স্বামীজীর বক্তৃতাকালে এমন নীরবতা বিরাজ করিত যে, একটি পিন পড়িলেও শোনা যাইত। ভগ্নীত্রয় স্বামীজীর সহিত ব্লজেটের বাড়ীতে দেখা করিয়া তাঁহাকে প্যাসাডেনায় বক্তৃতা দিতে রাজী করাইবার পর শান্তি তৎসম্পর্কিত অবশিষ্ট কার্যভার স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন। শান্তি এখন হইতে স্বামীজীর সেক্রেটারী হইলেন এবং হেলেন সাঙ্কেতিক অক্ষরে তাঁহার অনেকগুলি বক্তৃতা লিখিয়া লইলেন। স্বামীজীর 'আমার জীবন ও ব্রত' ভাষণটিরও সাঙ্কেতিক লিপি তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তি ও হেলেন উভয়কেই স্বামীজী ভারতে যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সাহস হয় নাই; অধিকন্তু শান্তি তাঁহার কন্যা ডরোথিকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই। স্বামীজী ভগ্নীত্রয়কে বলিতেন 'থ্রি গ্রেসেস্'[৫]। তাঁহারা তখন দক্ষিণ প্যাসাডেনার ৩০৯ নং মণ্টেরে রোডে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে একত্রে থাকিতেন।

স্বামীজীকে স্বগৃহে পাইবার জন্য তাঁহাদের প্রচুর আগ্রহ থাকিলেও প্রথম দিকে তিনি কোন উৎসাহ দেখান নাই। পরে একদিন প্রাতঃকালে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া ঐ বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইলে ভগ্নীত্রয় সবিস্ময়ে দেখিলেন, স্বামীজী সেখানে তল্পিতল্পা নামাইতেছেন আর বলিতেছেন, "আমি তোমাদের কাছে থাকতে এলাম। এ বেশ ভদ্রমহিলার মতোই কাজ করা হল।" কে যে ভদ্রমহিলা—ঠিক বুঝা গেল না। এ বাড়ীতে স্বামীজী ঠিক কবে হইতে কত দিন ছিলেন, সঠিক জানা যায় না; তেমনি অজ্ঞাত তাঁহার দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় বিভিন্ন স্থানে থাকার ও যাতায়াতের বিবরণ। মীড-ভগ্নীগণের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল ২৭শে জানুয়ারির (১৯০০) পূর্বে। এদিকে স্বামীজী ব্লজেটের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন ৬ই ডিসেম্বর (১৮৯৯)-এর মধ্যে, আর শ্রীমতী ম্যাকলাউডের মতে তিনি সেখানে ছিলেন কয়েক মাস। ইংরেজী জীবনীর মতে (৬৬৪) তিনি হোম অব ট্রুথে প্রায় একমাস কাটান ও শ্রীমতী স্পেন্সারের গৃহে বাস করেন কিছুকাল। ১৪ই জানুয়ারি (১৯০০) তারিখের 'লস এঞ্জেলিস টাইমস' পত্রিকার মতে তিনি ঐ সময়েরই কাছাকাছি দক্ষিণ প্যাসাডেনার শ্রীযুক্ত জে. সি. নিউটনের গৃহে অতিথি ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী, ম্যাকলাউড, শান্তি বা অপর কাহারও পত্র বা স্মৃতিলিপিতে এইসব

৫। গ্রীক পুরাণোক্ত তিনজন রূপলাবণ্যময়ী সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী; ইঁহারাও সহোদরা।

কথার সমর্থন পাওয়া যায় না। ২৭শে ডিসেম্বর তিনি যে ব্লজেটের বাড়ীতেই ছিলেন, ইহা ঐ তারিখের পত্রেই জানা যায়। আর সিস্টার ললিতা (ওয়াইকফ) স্বামী প্রভবানন্দকে বলিয়াছিলেন, স্বামীজী মীডদের গৃহে ছিলেন ছয়-সপ্তাহ। ব্রহ্মচারিণী উষার (বা বর্তমান প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণার) মতে তিনি ২০শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোন একদিন প্যাসাডেনা ছাড়িয়া উত্তর ক্যালিফর্নিয়ায় চলিয়া যান; কাজেই এই মতে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের কোন সময়ে তিনি মীড-গৃহে আসিয়া থাকিবেন। এইরূপ ধরিলে ম্যাকলাউডের মতে ব্লজেট-গৃহে কয়েকমাস থাকার কথা ছাড়িয়া দিতে হয়, নতুবা সিস্টার-এর ছয়-সপ্তাহকে কমাইয়া ধরিতে হয়। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? স্বামীজীর পত্রাবলীর ঠিকানাগুলি পর পর অনুধাবন করিলে দেখা যায় ১৫ই ফেব্রুয়ারির (১৯০০) একখানি পত্র ভিন্ন অপর কয়খানিতেই লস এঞ্জেলিস লিখিত আছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারির পত্রে আছে কেয়ার অব মিস মীড, ৪৪৭ নং ডগলাস বিল্ডিং, লস এঞ্জেলিস, ক্যালিফর্নিয়া, আর ২০শে ফেব্রুয়ারির পত্রে আছে প্যাসাডেনা। ১৫ই ফেব্রুয়ারির পত্রে আরও আছে, "তোমার পত্র প্যাসাডেনায় আমার নিকট পৌছল। দেখছি, জো তোমায় চিকাগোতে ধরতে পারেনি; তবে নিউ ইয়র্ক থেকে তাদের এ পর্যন্ত কোন খবর পাই নি।" এই সব মিলাইয়া আমাদের অনুমান হয় এই যে, লস এঞ্জেলিস ও প্যাসাডেনায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া বক্তৃতা করিতে হইত বলিয়া স্বামীজী সুবিধামত উভয় স্থানেই সপ্তাহের দুই-চারিদিন কাটাইতেন। পরে ম্যাক-লাউড ও শ্রীযুক্তা লেগেট চলিয়া গেলে তিনি ব্লজেটের বাড়ী হইতে স্থায়িভাবে প্যাসাডেনায় যান। মনে রাখিতে হইবে, স্বামীজীর যত চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্যান ফ্রান্সিস্কো হইতে লিখিত প্রথম চিঠির তারিখ ২রা মার্চ, ১৯০০। ইহার পূর্বে তিনি ওকল্যাণ্ডে কিছু দিন ছিলেন; অতএব ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হইবার পূর্বেই তিনি প্যাসাডেনা ছাড়িয়াছিলেন—এইরূপ অনুমান অন্যায় নহে।

অতঃপর দেখা যাক, মীড-ভগিনীরা স্বামীজী সম্বন্ধে আমাদিগকে কি নূতন কথা বলিতে পারেন। শান্তির স্মরণ ছিল যে, স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দুই স্তরের ঐশ্বরিক অনুভূতি আছে। প্রথমটি হল, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'; এবং দ্বিতীয়টি 'ব্রহ্মই সব হয়েছেন'।" সিস্টার ললিতা সারাদিন স্বামীজীর নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন—রান্না করা, ঘর গুছানো, এবং বহুপ্রকার গৃহস্থালীর কাজ। স্বামীজী তাই বলিয়াছিলেন, "মহাশয়া, আপনি এত বেশী কাজ করেন

যে, আমি তাতে ক্লান্তি বোধ করি। তবে কয়েকজনকে (বাইবেলোক্ত কর্মপরায়ণা) মার্থা হতেই হবে, আর আপনিও একজন মার্থা।” স্বামীজী রান্নাঘরের কাজে সিস্টারকে সাহায্য করিতেন। তিনি ঝাল পছন্দ করিতেন। সম্বরা প্রস্তুত করার সময় ধোঁয়া উঠিয়া ভগ্নীদের চোখ জ্বালা করিত বলিয়া স্বামীজী পূর্ব হইতেই সাবধান করিয়া দিতেন, “ঠাকুরদা আসছেন; ভদ্রমহিলাদের স্থান ত্যাগের আজ্ঞা হয়।”

সিস্টারের এক বন্ধু একদিন ঐ বাড়ীতে আসিয়া অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিলেন। স্বামীজী বৈঠকখানায়ই বসিয়া নীরবে ধূমপান করিতেছিলেন—গল্পে যোগ দিলেন না। যাইবার সময় আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ভদ্রলোক কি ইংরেজীতে কথা বলিতে পারেন?”

সন্ধ্যাকালে মীডদের বাটীর পশ্চাতে একটি ছোট বাগানে বসিয়া স্বামীজী ধ্যান করিতে ভালবাসিতেন। তখনকার দিনে ঐ বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলটি স্বাভাবিক অবস্থায়ই ছিল। সিস্টারের একটি কুকুর সঙ্গে লইয়া স্বামীজী সেখানে বেড়াইতে যাইতেন। ভক্তেরা তাঁহার জন্য বনভোজনের ব্যবস্থা করিলে তিনি তাহাতেও যোগ দিতেন। এইরূপ এক উপলক্ষে বাহিরে যাইবার সময় যে ফটো তোলা হয়, উহাতে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের সাধুদের জন্য পরিকল্পিত টুপি মাথায় পরিয়াছেন; তাঁহার আশে-পাশে কয়েকজন মহিলা আছেন—সিস্টার তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মানা, আর শান্তি দক্ষিণে উপবিষ্টা।

মীড-ভগ্নীদিগকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন; তাঁহার বিভিন্ন পত্রে তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখা যায়। বেটি লেগেটকে তিনি লিখিয়াছিলেন, “ঈশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুন; ভগ্নী তিনটি দেবদূতী নয় কি? এখানে-সেখানে এই ধরনের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার জীবনের সকল নিবর্থকতাকে সার্থক করে তোলে”; স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছিলেন, “অকৃত্রিম, পবিত্র ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বন্ধু” এরা; আর মীডদের গৃহত্যাগকালে তাঁহাদের বলিয়াছিলেন, “তোমরা তিন বোন চিরতরে আমার মনের অংশবিশেষ হয়ে গেছ।”

স্বামীজীর প্যাসাডেনা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মীডদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় নাই। প্যাসাডেনায় থাকাকালেই স্বামীজী ওকল্যাণ্ড-এর ইউনিটেরিয়ান গীর্জায় বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন। শান্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা আছে কিনা? আর বলেন, “আমার সঙ্গে যাবার

ইচ্ছা থাকলে কারো জন্য যাওয়া বন্ধ করো না।” এই ভাবেই শান্তি উত্তর ক্যালিফর্নিয়ায় গিয়াছিলেন এবং স্যান ফ্রান্সিস্কোতে যে দুইজন মহিলা সর্বদা স্বামীজীর কার্যে নিযুক্তা ছিলেন, তন্মধ্যে শান্তি ছিলেন প্রধানা। গৃহস্থালীর কাজের সহিত শান্তি তাঁহার সেক্রেটারীর কাজও করিতেন। স্বামীজীর ১৭ই মার্চের (১৯০০) পত্রে আছে: “মিসেস হ্যান্সবরো, তিন বোনের মাঝেরটি, এখানে আছে, এবং আমাকে সাহায্য করতে সে শুধু কাজই করছে, কাজই করছে।” দুই মাস পরে শান্তি বুঝিলেন, তাঁহার মন কন্যা ডরোথির জন্য খুব ব্যাকুল হইয়াছে। এদিকে স্বামীজী তখন ক্যাম্প আর্ভিং-এ যাইবেন এবং শান্তিকে সঙ্গে যাইবার জন্য খুব আগ্রহ দেখাইয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে ধ্যান শেখাব।” সুতরাং শান্তি গেলেন। ক্যাম্পে সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন উজ্জ্বলা বা আইডা অ্যানসেল। উজ্জ্বলার মতে শান্তি সর্বদা স্বামীজীর কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। একদিন সকালে শান্তি রন্ধনকার্যে ব্যাপৃতা আছেন; এদিকে ক্লাসের সময় সমাগত। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “শান্তি, ধ্যান করতে যাবে না?” উত্তরে শান্তি বলিলেন, “হাঁ যাব, তবে আগে এই ঝোলটা ফোটাতে হবে; এটা শেষ করেই যাচ্ছি।” শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, “আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার গুরুদেব বলতেন, প্রয়োজন হলে ধ্যান ছেড়েও সেবা করা চলে।” ক্যাম্পে স্বামীজী যখন অসুস্থ ছিলেন, তখনও শান্তি নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাই শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে একসময়ে লিখিয়াছিলেন, “ভগ্নীটি এত দরদ দিয়ে আমার সেবা করেছে যে, তুমি তা অনুমান করতে পারবে না।”

শান্তি বলিয়াছিলেন—স্বামীজীর স্বভাব এতই সরল ছিল যে, তিনি সকলের সহিত তাহাদেরই মতো হইয়া মিশিতেন, নিজের বিরাট ব্যক্তিত্বকে তখনকার মতো মুছিয়া ফেলিতেন। শান্তিকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “তোমার শ্রদ্ধা বলে কিছু নেই।” পরে এই কথা শান্তির মুখে শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, “হাঁ, ঠিকই বলেছিলেন তিনি; কিন্তু তোমার শ্রদ্ধা নেই দেখে তিনি খুশীই হয়েছিলেন। সমতা থাকলেই ঠিক ভালবাসা জন্মে; যেখানে উঁচু নীচু বোধ থাকে না, সেখানেই পূর্ণ মিলন ঘটে।”

সিস্টারের ভক্তিও ছিল অনুপম। তিনি পরে স্বামী তুরীয়ানন্দের কার্যে

প্রচুর সহায়তা করেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আরও ত্রিশ বৎসর পরে তিনি নিজ আবাসস্থল ও যথাসর্বস্ব বেদান্ত-সমিতিকে দান করেন। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ প্যাসাডেনায় ৩০৯ নং মণ্টেরে রোডের বাড়ীখানিও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে বেদান্ত-সমিতির হস্তগত হইয়া এখনও স্বামীজী ও মীড-ভগ্নীত্রয়ের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

স্বামীজী নিজ জীবনে ও কার্যে পাশ্চাত্ত্য সমাজের সম্মুখে ত্যাগ ও ভগবত্তন্ময়তার আদর্শ কতভাবেই না তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। গ্রীণ একার, সহস্রদ্বীপোদ্যান, ক্যাম্প আর্ভিং এবং আরও পরে শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা ইহার নিদর্শন। কর্মব্যস্ত পাশ্চাত্ত্য জগৎ সব ছাড়িয়া ভগবানকে ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যের প্রবর্তনের দ্বারা এবং ধ্যানের উৎসাহ জাগাইয়া সে দেশের লোককে পুনর্বার প্রকৃতিস্থ বা আত্মস্থ করার প্রয়োজন ছিল—স্বামীজী করিয়াছিলেনও তাহাই।

উত্তর ক্যালিফর্নিয়ায়

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ক্যালিফর্নিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বামীজীর অবস্থানকাল সঠিক নির্ণয় করা প্রায় অসাধ্য। যেটুকু তথ্য আমরা পাইয়াছি তদবলম্বনে একটা মোটামুটি কাল-নির্ণয় করিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়, যদিও ইহা অনেকাংশেই প্রমাণসহ নাও হইতে পারে। স্বামীজী ৬ই ডিসেম্বরের (১৮৯৯) কাছাকাছি লস এঞ্জেলিসে ব্লজেটের বাড়ীতে উপস্থিত হন। সেখানে থাকিয়াই তিনি ২২শে ডিসেম্বরের কিঞ্চিৎ পূর্বে প্যাসাডেনায় বক্তৃতাদি আরম্ভ করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারির কিছু পূর্বে, সম্ভবতঃ ঐ মাসের প্রারম্ভে ম্যাকলাউড চিকাগো হইয়া নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া যান, এবং তিনি চলিয়া যাইবার পরই স্বামীজী মীডদের আতিথ্য স্বীকার করেন। সেখান হইতে তিনি ফেব্রুয়ারির শেষে ওকল্যাণ্ডে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন ('বাণী ও রচনা', ৮।৯৭-৯৮) এবং ইহার ফলে স্থানীয় জনসমাজে আরও বক্তৃতা শুনিবার ও উপদেশ লাভ করিবার আগ্রহ সবিশেষ বর্ধিত হইয়াছিল (ঐ, ৮।১০৫)। অতএব ইহাদের অনুরোধে তিনি মার্চের প্রারম্ভে স্যান ফ্রান্সিস্কোতে (উত্তর ক্যালিফর্নিয়ায়) যান। এই ক্রম ও কালবিভাগ মানিয়া লইলে স্বামীজী ব্লজেটের বাড়ীতে ছিলেন দুই মাস; মীডগৃহে প্রথমতঃ মাঝে মাঝে থাকিয়া পরে একটানা দুই সপ্তাহ; এবং ওকল্যাণ্ডে ছিলেন এক সপ্তাহ।

ইংরেজী জীবনীতে আছে: "স্বামীজী যখন লস এঞ্জেলিস ছাড়িয়া যান, তখন তাঁহাকে ওকল্যাণ্ডের মাননীয় (ধর্মযাজক) ডাঃ বেঞ্জামিন ফে মিলস-এর আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়, এবং ইঁহারই ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ অব ওকল্যাণ্ড নামক গীর্জায় তিনি এক পর্যায়ে আটটি বক্তৃতা প্রদান করেন; বক্তৃতাগুলিতে শ্রোতৃসংখ্যা অনেক সময় দুই সহস্রে উঠিত। পরদিন সকালে তিনি দেখিতেন, সব সংবাদপত্রেই তাঁহার নাম বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। বক্তৃতাবলী স্থানীয় একটি ধর্মমহাসভার উপলক্ষে প্রদত্ত হয়। উক্ত সভাটি মাননীয় বি. এফ. মিলস-এর গীর্জায় অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়া ক্যালিফর্নিয়ার বহুশত ধর্মযাজক স্বামীজীর সহিত মিলিবার, তাঁহার সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবার এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহার মত গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।"

এই বর্ণনার ধারা দেখিয়া মনে হয়, ওকল্যাণ্ডের ঐ সব বক্তৃতাকালে স্বামীজী প্যাসাডেনা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। তাহা হইলে বলিতে হইবে বক্তৃতাগুলি হইয়াছিল মার্চ মাসে। এদিকে আইডা অ্যানসেলের (উজ্জ্বলার) স্মৃতিকথায় ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ') অনুরূপ বিবরণ পাই। অ্যানসেল তখন 'ক্যালিফর্নিয়া স্ট্রীট হোম অব ট্রুথ'-এ শ্রীমতী বেল-এর নেত্রীত্বাধীনে বাস করিতেন এবং সাঙ্কেতিক লিপিতে তাঁহার বক্তৃতা লিখিয়া লইতেন। স্বামীজী যখন ঐ অঞ্চলে আসেন, তখন শ্রীমতী বেল-এর প্রাতঃকালীন ক্লাসে স্বামীজীর 'রাজযোগ' পঠিত হইত। "স্বামীজী যখন লস এঞ্জেলিসে ছিলেন, তখন তিনি মাননীয় বি. এফ. মিলস-এর আমন্ত্রণ স্বীকারপূর্বক ওকল্যাণ্ডের ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দিতে সম্মত হন। শ্রীমতী বেল ও অপর বন্ধুদের সহিত আমি ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে গেলাম এবং আমরা যাহা শুনিলাম তাহাতে চমকিত ও আশ্চর্যান্বিত এবং স্বামীজীর মূর্তি দর্শনে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইলাম।" অ্যানসেলের মত মানিতে গেলে বলিতে হয়, স্বামীজী ওকল্যাণ্ডে ফেব্রুয়ারির প্রারম্ভে বক্তৃতাকালে মিলস-এর গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন; পরে প্যাসাডেনায় ফিরিয়া গিয়া পুনঃ ফেব্রুয়ারির শেষে স্যান ফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হন। অপর দিকে স্বামীজীর পত্রাবলীর অনুসরণক্রমে সমীচীনতর মত এই দাঁড়ায় যে, তিনি ফেব্রুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে ওকল্যাণ্ডে যান ও সেখান হইতে সোজা স্যান ফ্রান্সিস্কোতে উপনীত হন।

অ্যানসেল অতঃপর শ্রীমতী বেল বা অপর বন্ধুদের সহিত স্বামীজীর প্রায় প্রতি বক্তৃতায় যাইতেন এবং নিজের ব্যবহারের জন্য বক্তৃতার সাঙ্কেতিক লিপি গ্রহণ করিতেন। লিপিগুলি অনেকাংশে অসম্পূর্ণ হইলেও প্রামাণিক। কাহাকেও না দিয়া তিনি সেগুলি নিজ সকাশে রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরাধিক পরে পাঠোদ্ধারপূর্বক উহাদের অনেকগুলি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেগুলি এখন স্বামীজীর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর অঙ্গীভূত হইয়াছে। অ্যানসেলের সহিত বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এমন একজন কুলীন বংশোদ্ভূতা মহিলা সোৎসাহে তাঁহাকে স্বামীজী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ওঃ! তিনি যেন একটি মনোরম কনকমূর্তিসদৃশ!" আর স্বামীজীর বৌদ্ধিক উৎকর্ষের ভূয়সী প্রশংসা উচ্চারিত হইয়াছিল মাননীয় ধর্মযাজক মিলস-এর মুখে। 'হিন্দুমতে মুক্তিসাধনা'-বিষয়ক বক্তৃতার প্রারম্ভে প্রাগুক্ত ধর্মসভায় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের

নিকট স্বামীজীকে পরিচিত করিয়া দিবার সময় শ্রীযুক্ত মিলস বলিয়াছিলেন, "ইঁহার মনীষা বিরাট, এমন কি ইঁহার সহিত তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাপকবর্গকেও শিশুসদৃশ বলিয়া বোধ হয়।" স্যান ফ্রান্সিস্কো হইতে লিখিত স্বামীজীর ৪ঠা মার্চের পত্রে শ্রীযুক্ত মিলস এবং ওকল্যাণ্ডের বক্তৃতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য পাওয়া যায়: "রেভারেণ্ড বেঞ্জামিন ফে মিলস আমায় ওকল্যাণ্ডে আহ্বান করেছিলেন এবং আমার বক্তব্য প্রচারের জন্য একটি শ্রোতৃমণ্ডলীর আয়োজন করেছিলেন। তিনি সস্ত্রীক আমার গ্রন্থাদি পাঠ ক'রে থাকেন এবং বরাবরই আমার খবরাখবরাদি রেখে আসছেন।"

ইংরেজী জীবনীর মতে ওকল্যাণ্ডে স্বামীজীর বক্তৃতার প্রচণ্ড প্রভাব হইয়াছিল। ইহাতে ঐ রাজ্যের (স্টেটের) নেতৃস্থানীয় বুধমণ্ডলীর মধ্যে প্রবল আলোড়ন আরম্ভ হয়। ফেব্রুয়ারির শেষভাগে ক্যালিফর্নিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, নিকটবর্তী স্যান ফ্রান্সিস্কো মহানগরীতে গণ্যমান্য অধিবাসীদের বহুল অনুরোধ-ক্রমে স্বামীজী সেখানে যান এবং মে মাস পর্যন্ত কঠোর শ্রম করেন। স্যান ফ্রান্সিস্কো হইতে লিখিত স্বামীজীর যে পত্রসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রথমখানির তারিখ ২রা মার্চ, ১৯০০ এবং ঠিকানা ১২৫১ পাইন স্ট্রীট। দ্বিতীয়-খানির তারিখ ৪ঠা মার্চ ও ঠিকানা ১৫০২ জোনস স্ট্রীট। অতঃপর ১২ই মার্চের পত্রে আছে: "এখন আমার একটা স্থায়ী ঠিকানা হয়েছে—১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্রান্সিস্কো।" প্রথম দুইখানি পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন যে, ঐ মহানগরীতে বহু শ্রোতা তাঁহার কথা শুনিতে চায়; ক্ষেত্র পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল—কেননা অনেকেই পূর্বে তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িয়াছিল; তবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। আর লিখিয়াছিলেন: "আমি ৩০০০ শ্রোতাকে শোনাবার মতো উঁচু গলায় বক্তৃতা দিতে পারি; ওকল্যাণ্ডে আমায় দুবার তাই করতে হয়েছিল। আর দু ঘণ্টা বক্তৃতার পরেও আমার সুনিদ্রা হয়।"

স্যান ফ্রান্সিস্কোতে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ', উহার স্থান ছিল, গোল্ডেন গেট হল, এবং উহাতে তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। এইরূপে বহু ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকিলে, তাহাদিগকে ক্লাসের মাধ্যমে নিবিড়তররূপে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি টার্ক স্ট্রীটের উক্ত বৃহত্তর স্থানটি স্বীয় আবাসের জন্য স্থির করিলেন। এখানে নিয়মিতরূপে রাজযোগ শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ধ্যানাভ্যাস করানো

হইত ; অধিকন্তু এই সকল ব্যক্তিগত সাধনপদ্ধতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গীতা ও বেদান্ত-দর্শন অবলম্বনে কতকটা ঘরোয়া ও কতকটা সাধারণভাবে বক্তৃতা হইত। আর মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রতি রবিবার রেড মেনস হল, গোল্ডেন গেট হল বা ইউনিয়ন স্কোয়ার হলে জনসাধারণের জন্য বক্তৃতা হইত। অধিকন্তু ওয়াশিংটন হলে তিনি সপ্তাহে তিনটি সান্ধ্য-ভাষণ দিতেন। পরে তিনি সোশ্যাল হলে ভক্তিযোগ বিষয়ে ধারাবাহিকরূপে গোটাকয়েক বক্তৃতা দেন। এই সঙ্গে একদিন অন্তর প্রতি সন্ধ্যায় তিনি অ্যালামেডায় এবং ওকল্যাণ্ডে ভাষণ দিতেন। স্যান ফ্রান্সিস্কোতে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত ভাষণগুলির মধ্যে কয়েকটির বিষয় ছিল : 'জগতের প্রতি বুদ্ধের বাণী', 'আরবদেশের ধর্ম ও ঈশদূত মহম্মদ', 'বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম', 'বিশ্বের প্রতি খৃষ্টের বাণী', 'জগতের নিকট কৃষ্ণের বাণী', 'বিশ্বের কাছে মহম্মদের বার্তা', 'মন, তাহার শক্তি ও সম্ভাবনা', 'মনের উৎকর্ষ-সাধন', 'একাগ্রতা', 'প্রকৃতি ও মানুষ', 'আত্মা ও পরমাত্মা', 'লক্ষ্য', 'প্রাণায়াম-বিজ্ঞান', 'পূজ্য ও পূজক', 'ভারতীয় কলা ও বিজ্ঞান' এবং 'আনুষ্ঠানিক পূজা'। 'ভারতীয় কলা ও বিজ্ঞান'-এর বক্তৃতাটি হয় ওয়েণ্টে হলে। অ্যালামেডার টুকার হলে তিনি ১৩ই, ১৬ই এবং ১৮ই এপ্রিলে যথাক্রমে 'রাজযোগ', 'একাগ্রতা ও প্রাণায়াম' ও 'ধর্মের সাধনা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই অসম্পূর্ণ তালিকা হইতেও বুঝিতে পারা যায়, স্বামীজী তখন কিরূপ পরিশ্রম করিতেছিলেন এবং কত বিচিত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ইংরেজী জীবনীতে দুঃখ করা হইয়াছে যে, বক্তৃতাগুলি হারাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, আইডা অ্যানসেলের ব্যক্তিগত ঔৎসুক্য ও আগ্রহের ফলে অনেকগুলিরই সারমর্ম এখন আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এইখানে আমরা অ্যানসেলের স্মৃতিকথায় ফিরিয়া যাই। টার্ক স্ট্রীটের ঘরগুলিতে শ্রীযুক্তা এলিস হ্যান্সবরো (শান্তি) ও শ্রীযুক্তা এমিলি অ্যাস্পিনল (কল্যাণী) গৃহস্থালীর কাজ চালাইতেন ও সর্ববিষয়ে স্বামীজীকে সাহায্য করিতেন। সকালের ধ্যান-ধারণার ক্লাসগুলি এখানেই হইত। প্রথমে একটু ধ্যানের পর কিছুক্ষণ ধরিয়া উপদেশ চলিত, তারপর প্রশ্নোত্তর ও সর্বশেষে সাধনা, বিশ্রাম ও আহারাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইত। স্বামীজী আহারের পরিমাণ ও গুণাগুণ বিষয়ে বিবেচনাপূর্বক মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে বলিতেন। ক্লাসে প্রশ্নোত্তরের অবকাশ তো ছিলই ; আবার যাঁহারা একটু আগে আসিতেন তাঁহারা ব্যক্তিগত-

ভাবে মিশিবারও সুযোগ পাইতেন। খাবার ঘরে বসিয়া যখন গল্পগুজব চলিত, তখন পাশ্চাত্ত্য-জীবনে যে একটা অনাবশ্যক দ্রুততার ভাব দেখা যায় উহা লইয়া তিনি ঠাট্টা করিতেন। দেখিয়া তিনি হাসিতেন যে, গাড়ী ধরিতে লোকে অযথা দৌড়ায়, যেন আর গাড়ী মোটে আসিবে না। তিনি নিজে ধীর স্থির ভাবেই চলিতেন—একটা রাজোচিত স্থৈর্য তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। ক্লাস বা লেকচার একটু দেরীতে আরম্ভ হইলেও ক্ষতি ছিল না—আর কতক্ষণে শেষ হইবে তাহারও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। এইসব গল্প-গুজবের সময় তাঁহার গায়ে থাকিত ধূসর রঙ-এর ফ্ল্যানেলের জামা, তিনি স্মিতমুখে আসন-পিঁড়ি হইয়া চেয়ারে বসিতেন ও ধূমপান করিতে করিতে কথা বলিতেন ও হাসিঠাট্টা করিতেন; বক্তৃতার প্রাক্‌মুহূর্তে গেরুয়া আলখাল্লা পরিয়া ক্লাসঘরে উপস্থিত হইতেন—গুরুতর কথার ফাঁকে রঙ্গরস তখনও চলিতে থাকিত, শুধু মুখ হইতে পাইপটি সরিয়া যাইত। বাহিরে সাধারণ বক্তৃতাকালেও এই ভাব পরিলক্ষিত হইত—তখনও গম্ভীর পরিবেশমধ্যে হাস্যরসের অবতারণার সাহায্যে তিনি স্বীয় বক্তব্য বিষয় সহজবোধ্য করিয়া তুলিতেন। এক রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় হোম অব ট্রুথ-এ বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। তিনি জন কয়েক বন্ধুকে বলিলেন, "আজ রাত্রে আমার বক্তৃতায় এসো, আমি গোটা কয়েক বোমা ফাটাতে যাচ্ছি।" ভাষণটি মনোযোগপূর্বক শুনিবার মতো ছিল, কিন্তু উহার যুক্তিগুলি ছিল ভীতিপ্রদ অথচ অকাট্য। তিনি সহজ, সরল ও সবল ভাষায় তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিলেন, তাঁহার মতে তাঁহাদের স্বরূপটি ঠিক কি প্রকার। আর সে মতটি বড় শ্রুতিমধুর ছিল না; কিন্তু স্বীকার করিয়া লইবার ক্ষমতা থাকিলে—আর অ্যানসেলের মতে সে ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল—স্বামীজীর ঐ কথাগুলি খুবই শুভপ্রদ ছিল। অ্যানসেলের মতে ঐ বক্তৃতাকালে কেহই কক্ষত্যাগ করেন নাই। স্বামীজী একথা বেশ জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে, মানসিক শক্তি অর্জনের নিমিত্ত সন্ন্যাসী ও গৃহী সকলেরই ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করা আবশ্যক।

ঐ বক্তৃতার পূর্বে শ্রীযুক্তা স্টীল একটি নৈশভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। স্বামীজীকে সেখানে বেশ প্রফুল্ল ও সহজভাবে কথাবার্তা বলিতে দেখা গিয়াছিল। উপস্থিত সকলে আশা করিয়াছিলেন, তিনি আহারের পূর্বে ভগবানের নিকট প্রার্থনাদি করিবেন; কিন্তু সকলে দেখিয়া অবাক্ হইলেন যে, তিনি সোজা খাইতে আরম্ভ করিলেন, আর আহারের পূর্বে ধন্যবাদ না দিয়া পরে দেওয়া

উচিত ইত্যাদি মন্তব্য করিয়া শ্রীযুক্তা স্টীলকে বলিলেন, "মহাশয়া, আমি আপনাকেই ধন্যবাদ দেব, কেননা আপনিই খেটেখুটে সব করেছেন।" শ্রীযুক্তা স্টীল কিছু অত্যুৎকৃষ্ট খেজুরেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বামীজী ঐগুলি তৃপ্তি-সহকারে খাইলেন। বক্তৃতার পরে উক্ত মহিলা যখন বক্তৃতার প্রশংসা করিলেন তখন স্বামীজী কহিলেন, "মহাশয়া, এ আপনার খেজুরের দৌলতে।"

এক সান্ধ্য বক্তৃতায় স্বামীজী নরক সম্বন্ধে হিন্দুদের বিচিত্র ধারণার কথা শুনাইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে ভক্তেরা তাঁহাকে 'ক্ষুদ্র ইটালি' নামক স্যান ফ্রান্সিস্কোর একটি পাড়ায় শ্রীযুক্ত লুইস জুল-এর রেস্তরায় লইয়া যাইতেন কিংবা নগরের উপকণ্ঠে একটা কাফেতে উপস্থিত হইতেন। কোনটাতে যাওয়া হইবে তাহা স্থির হইত আবহাওয়ার অবস্থা ও স্বামীজীর রুচি অনুসারে। সে রাত্রিটি খুবই ঠাণ্ডা ছিল ; ওভারকোট থাকা সত্ত্বেও স্বামীজী কাঁপিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন, "এ যদি না নরক হয় তো নরক কাকে বলে জানি না।" কিন্তু নারকীয় শৈত্যসত্ত্বেও স্বামীজী সেদিন আইসক্রিম খাইতে চাহিলেন—আইসক্রিম তিনি খুবই ভালবাসিতেন। সুতরাং সে রাত্রে কাফেতে যাওয়া হইল। কাফে হইতে বিদায় লইবার মুহূর্তে বিপণি-স্বামিনীর টেলিফোনে ডাক আসিল। তিনি অতিথিদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাহিরে যাইতেছেন, এমন সময় স্বামীজী ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, দেরী করবেন না যেন ; না হলে এসে পাবেন খালি এক তাল চকোলেট আইসক্রিম"—অর্থাৎ তাঁহারা ঠাণ্ডায় জমিয়া আইসক্রিম হইয়া যাইবেন !

আর একবার কাফের পরিচারিকা ভুলে আইসক্রিম না আনিয়া আইসক্রিম সোডা লইয়া হাজির হইল। স্বামীজী সোডা পছন্দ করিতেন না, তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা বদলানো চলে কিনা। পরিচারিকা বদলাইতে যাইতেছে আর ম্যানেজার ক্রোধে তাহার দিকে কটমট করিয়া তাকাইতেছে দেখিয়া—কে শুনিতেছে না শুনিতেছে অত কথা গ্রাহ্য না করিয়া—স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও মেয়েটাকে যদি আপনি গালাগালি করেন তো এখানে আপনার যত আইসক্রিম সোডা আছে সব খেয়ে শেষ করব।"

স্বামীজী মাঝে মাঝে ক্যালিফর্নিয়া হইতে চলিয়া যাইবার কথা ভাবিতেন। ৩০শে মার্চ তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছিলেন, তিনি পরবর্তী সপ্তাহে যাইবেন ; কিন্তু যাওয়া হয় নাই। আবার ২৩শে এপ্রিল মেরীকে লিখিয়াছিলেন :

"আজই আমার যাত্রা করা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে যাত্রার পুর্বে ক্যালি-ফর্নিয়ার বিশাল রেডউড বৃক্ষরাজির নীচে তাঁবুতে বাস করার লোভ আমি সংবরণ করতে পারলাম না। তাই তিন-চারদিনের জন্য যাত্রা স্থগিত রাখলাম। ...আগামী কাল বনের দিকে যাত্রা করছি। উফ! চিকাগো যাবার আগে ফুসফুস ওজনে (ozone) ভরে নেবো।...কাজ শেষ ক'রে ফেলেছি। রেল-ভ্রমণের ধকলের আগে শুধু কয়েকদিনের—তিন কি চারি দিনের—বিশ্রামের জন্য বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করছেন।" অবশ্য এই অভিপ্রায়ানুযায়ীও তাঁহার যাওয়া হয় নাই; তিনি ক্যালিফর্নিয়া ছাড়িয়াছিলেন আরও একমাস পরে। আপাততঃ আমরা ঐ "তাঁবুতে বাস"-এর (ক্যাম্পের) কথাই বলি। স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত তিনি টার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতেই ছিলেন। অতঃপর উপসাগরের অপর তীরে অ্যালামেডা শহরে থাকিয়া কিছুকাল বক্তৃতাদি করেন। রেডউড বৃক্ষরাজি-মধ্যস্থ ক্যাম্পে তিনি ২রা মের পুর্বে যান নাই। নিবেদিতা ও ব্লজেটকে লিখিত ঐ তারিখের পত্রদ্বয় হইতে জানা যায় এই কালে তিনি অসুস্থ, এমন কি শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ঐ তারিখেই 'পল্লী-অঞ্চলে' যান।

স্যান ফ্রান্সিস্কোর কয়েক মাইল উত্তরে ম্যারিন কাউন্টিতে 'ক্যাম্প টেলর' নামক এক পল্লী-অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে অনেকে বিশ্রামাদির জন্য গিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত জুল-এর ক্যাম্প আর্ভিং উহারই উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল এবং জুল ঐ গ্রীষ্মকালে শ্রীমতী বেলকে ঐ ক্যাম্প ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছিলেন। ক্যাম্পটি যে একফালি জমির উপর অবস্থিত ছিল, উহার একদিকে ছিল রেল লাইন ও অপরদিকে একটি সমুদ্র-খাড়ি। ক্যাম্পের এক প্রান্তে অনেকগুলি বৃক্ষ চক্রাকারে সন্নিবেশিত থাকায় উহা স্বামীজীদের ধ্যান ও প্রার্থনাদির জন্য ব্যবহৃত হইত। রান্নার ব্যবস্থা ছিল অপর প্রান্তে; সেখানে তক্তা পাতিয়া একটা টেবিল ও উহার উভয় পার্শ্বে বেঞ্চির মতন করা হইয়াছিল; বাসনগুলি গাছে পেরেক পুতিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইত, আর গাছের গায়ে তাক বসাইয়া উহাতে প্লেটগুলি সাজাইয়া রাখা হইত। ২১শে এপ্রিল হইতেই ক্যাম্প আরম্ভ হইয়াছিল। স্বামীজী শান্তির সহিত ঐ ক্যাম্পে আসার কালে বেশ একটু অসুবিধায় পড়িয়া-ছিলেন। শান্তির নিজের ইচ্ছা ছিল, তিন মাস বাহিরে থাকার পর লস এঞ্জেলিসে কন্যার নিকট ফিরিয়া যাইবেন; কিন্তু স্বামীজীর নির্বন্ধাতিশয় তাঁহাকে ক্যাম্পে

টানিয়া লইয়া চলিল। অ্যালামেডা হইতে ক্যাম্পে যাইতে হইলে তুই জায়গায় খেয়া পার হইতে হইত—প্রথম অ্যালামেডা হইতে উপসাগর অতিক্রম করিয়া স্যান ফ্রান্সিস্কোতে আসা এবং দ্বিতীয় সেখান হইতে উত্তরে ম্যারিন কাউন্টিতে যাওয়া। অ্যালামেডা হইতে ডকে যাইবার জন্য তুইটি রেল লাইন ছিল—একটি চওড়া, অপরটি সরু : তুইটির মধ্যে সামান্য ব্যবধান ছিল। আসিতে বিলম্ব হওয়ায় স্বামীজী ও শান্তি এক লাইনের ট্রেন ধরিতে না পারিয়া অপর লাইনের ট্রেন ধরিলেন। গাড়ীতে বসিয়া তাঁহারা ভাবিতেছেন, প্রাতঃকালীন আহার প্রথম খেয়ার জাহাজে হইবে অথবা দ্বিতীয় জাহাজে, এমন সময় দেখা গেল, তাঁহাদের গাড়ীর সঙ্গে ইঞ্জিন নাই। অতএব তাঁহারা বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন ও সেখানেই প্রাতরাশ শেষ করিলেন। স্বামীজী গম্ভীরভাবে শান্তিকে বলিলেন, "আমরা ট্রেন ধরতে পারলাম না, কারণ তোমার মন টানছিল লস এঞ্জেলিসের দিকে ; আর তুনিয়ায় তো এমন কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই যে মানুষের মনকে টেনে রাখতে পারে!" পৌঁছাইতে দেরী হইলেও তাঁহারা পুনর্বার যাত্রা করিয়া সেই দিনই ক্যাম্পে গেলেন।

স্বামীজীর ২রা মে ক্যাম্প টেলরে পৌঁছাইবার অব্যবহিত পরবর্তী দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া অ্যানসেল লিখিয়াছিলেন : "আমি (এখন) চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখি, তিনি সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে দণ্ডায়মান, সম্মুখে প্রজ্বলিত ধুনির কাষ্ঠ হইতে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইরেছে, আর মস্তকোপরি রহিয়াছে দ্বিতীয়ার চন্দ্রমা। এক সুদীর্ঘ বক্তৃতাপর্বের পরে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু সেখানে আসিয়া সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমাদের জীবনের আদি ও অন্তে অরণ্যবাস ; কিন্তু উভয় অবস্থার মধ্যে কত বিপুল অভিজ্ঞতা!' পরে সামান্য একটু বক্তৃতার পরে যখন আমরা দৈনন্দিন নিয়মানুযায়ী ধ্যানের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, তখন তিনি বলিলেন, 'তোমরা যে কোন বিষয় অবলম্বনে ধ্যান করতে পার ; কিন্তু আমি ধ্যান করব সিংহের হৃৎপিণ্ডের উপর—ওতে শক্তি আসে।' ইহার পরে ধ্যান হইতে আমরা যে শান্তি, শক্তি, দৈব আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব।"

পরদিবস সারাদিন বৃষ্টিতেই কাটিল। প্রাতরাশের পরে স্বামীজী যখন শ্রীমতী বেলের তাঁবুতে বসিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার জ্বর ছিল। সে রাত্রে তাঁহার অসুখ এতই বাড়িয়াছিল যে, তিনি স্বীয় গুরু-

ভ্রাতাদের নামে একখানি উইল সম্পাদিত করিয়াছিলেন। শান্তি ও কল্যাণী তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেও নিজে ভিজিতে ভিজিতে শান্তি স্বামীজীর তাঁবুর উপর আর একখণ্ড ক্যামবিস চাপাইয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁবুর ভিতরে জল না পড়ে। পরদিন স্বামীজী অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। যদিও বিশ্রামলাভেরই জন্য তাঁহাকে ক্যাম্পে আনা হইয়াছিল, তথাপি তিনি প্রত্যহ শ্রীমতী বেলের তাঁবুতে বসিয়া দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনা করিতেন ও জিজ্ঞাসুদের সমস্যা মিটাইতেন। তিনি বলিতেন যে, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে আন্তরিক মিলনের আশা পোষণ করেন। টমাস অ্যা কেম্পিস-এর 'ঈশানুসরণ' গ্রন্থের প্রতি তাঁহার খুব শ্রদ্ধা ছিল এবং ভারতবর্ষে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণকালে প্রায়শঃ দুইখানি পুস্তক তাঁহার নিত্যসহচর ছিল—গীতা ও ঈশানুসরণ। দ্বিতীয় পুস্তক হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি স্যান ফ্রান্সিস্কোতে এক বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন : "সব আচার্য নির্বাক হউন, সমস্ত শাস্ত্র নীরব থাকুক ; প্রভু শুধু তোমার বাণী আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হউক।"

সকালের কথাবার্তা ও ধ্যানের পর স্বামীজী রান্না করিতেন বা ঐ কার্যে সাহায্য করিতেন। তিনি হামানদিস্তা লইয়া মাটিতে বসিয়া দেখাইয়া দিতেন ভারতবর্ষে কিভাবে মশলা গুঁড়ানো হয়। সকলে দেখিতেন, ঐভাবে মশলা আরো মিহি হয়। কিন্তু তিনি ঝাল ব্যবহার করিতেন বেশী, তাহার উপর আবার লাল লঙ্কা চিবাইয়া খাইতেন। মজা করিয়া তিনি একদিন উজ্জ্বলাকে (অ্যানসেলকে) একটি লঙ্কা খাইতে দিয়া বলিলেন, "খেয়ে দেখ ; এতে তোমার ভাল হবে।" উজ্জ্বলা বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী বিষ দিলেও খাইতাম ; তাই খাইলাম, কিন্তু ফল হইল অতীব যন্ত্রণাদায়ক, যদিও তাহাতে স্বামীজীর মজাই হইল। সেদিন অপরাহ্ণে তিনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'তোমার উনানটা জলছে কেমন' ?"

ঐ স্থানে মেক্সিকো দেশীয় বা মার্কিন দেশীয় একটি রেড ইণ্ডিয়ান ছেলে কিছু কাজ করিতেছিল। সে একদিন স্বামীজীদের প্রাতরাশের সময় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছিল। স্বামীজী ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে তিনি তাহার সহিত ঐ বিষয়ে কথা বলিতে গেলে সে জানাইল যে, তাহাকে কফি দেওয়া হয় নাই ; অথচ "কালা আদমী কফি ভালবাসে, সাদা আদমী কফি ভালবাসে, লাল আদমী কফি ভালবাসে।" কথাগুলি স্বামীজীর নিকট বেশ

মজাদার মনে হইয়াছিল; তিনি বালকটিকে কফি দিতে বলিয়াছিলেন এবং সারা বিকালবেলা বারবার সহাস্যে ঐ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন।

বিকালে সকলে বেড়াইতে যাইতেন এবং সন্ধ্যায় ধুনি জ্বালিয়া ধ্যান করিতেন। গল্প বলা ও প্রশ্নোত্তর শেষ করিয়া স্বামীজী এক একদিন এক একটি বিষয়ে ধ্যান করিতে বলিতেন। স্তোত্রপাঠের পূর্বে একদিন ধ্যানের বিষয় ছিল 'স্থির ও নির্ভয়'। একদিন সকালে তিনি 'পরম সত্য, একত্ব, মুক্তি' বিষয়ে এক উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দিয়াছিলেন, আর ঐদিন সন্ধ্যায় ধ্যানের বিষয় ছিল, 'আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'।

উজ্জ্বলাকে মাঝে মাঝে কুমারী বেল-এর আদেশানুযায়ী স্যান ফ্রান্সিস্কো যাইতে হইত। সেখানে তিনি সাঙ্কেতিক লিপিতে বেলের বক্তৃতা লিখিতেন এবং জন কয়েককে সঙ্গীত শিখাইতেন। এইজন্য পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু অর্থ পাইতেন। এক শনিবারে তিনি যাইতে প্রস্তুত হইলে স্বামীজী বলিলেন, "যাচ্ছ কেন?" উজ্জ্বলা বলিলেন, "স্বামীজী, আমাকে যেতেই হবে; আমাকে গান শেখাতে হবে।" স্বামীজী কহিলেন, "তবে যাও, আর পাঁচ লক্ষ ডলার রোজগার করে তা আমার ভারতীয় কাজের জন্য পাঠিয়ে দিও।" তিনি উজ্জ্বলার সঙ্গে রেললাইন পর্যন্ত গেলেন, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া লাইনের উপরে উঠিলেন ও রুমাল নাড়িয়া ট্রেন থামাইলেন। সেখানে কোন স্টেশন ছিল না; যাত্রীরা চাহিলে ট্রেন থামিত। এখন মজার ব্যাপার হইল এই যে, স্বামীজী চলিতেন ও দাঁড়াইতেন রাজার হালে, আর তাঁহার দৃষ্টি বোধ হয় টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথার নীচে নামিত না। ট্রেনের ইঞ্জিন যখন উজ্জ্বলাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তখন তিনি শুনিলেন, ট্রেনের খালাসী ড্রাইভারকে বলিতেছে, "আরে, এই আকাশ-সঞ্চালকটি (স্কাই পাইলট) আবার কে?" উজ্জ্বলা ভাবিয়া পাইলেন না 'আকাশ-সঞ্চালক' কথাটার মানে আবার কি? পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্মাচার্যদিগকে ইহারা এইরূপ শব্দে অভিহিত করে, কারণ এইসব আচার্যের দৃষ্টি ও চলন-বলন সবই সর্বদা উচ্চাভিমুখ, বিশেষতঃ স্বামীজীর বেলায় ঐসব ছিল অতি সুস্পষ্ট।

স্বামীজী ঠিক কোন্ দিন ক্যাম্প আর্ভিং ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, জানা নাই। ইংরেজী জীবনীর মতে তিনি সেখানে তিন সপ্তাহ (২রা মে হইতে ২২শে মে?) ছিলেন। তাঁহার দেহের অবস্থা দেখিয়া স্থির হইল যে, তিনি স্যান ফ্রান্সিস্কোতে

কিছুদিন স্বীয় শিষ্য ডাঃ ডি. এম. লোগান-এর বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার দ্বারা ও ডাক্তার উইলিয়ম ফস্টার-এর দ্বারা চিকিৎসিত হইবেন। কিন্তু চুপ করিয়া থাকা তাঁহার ধাতে ছিল না; সুতরাং ২৪শে, ২৬শে, ২৮শে ও ২৯শে মে তারিখে তিনি গীতা-বিষয়ে চারিটি ভাষণ দিলেন—৬নং গ্রীয়ারী স্ট্রীটে এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় ও ৭৭০ নং ওক স্ট্রীটে ডাক্তার লোগানের নূতন বাড়ীর হলঘরে। প্রবচনগুলি ঘরোয়াভাবেই হইল। অতঃপর দেখা যায় যে, তিনি ১৭ই জুন (মে ?) লস্ এঞ্জেলিস হইতে লিখিতেছেন, "শীঘ্রই চিকাগো যাচ্ছি।" ইহার পরবর্তী দুইখানি পত্র নিউ ইয়র্ক হইতে লিখিত—২০শে ও ২৩শে জুন তারিখে। ১৭ই জুনের পত্রের ঠিকানা ১৯২১ ওয়েস্ট ২১ নং স্ট্রীট, লস এঞ্জেলিস দেখিয়া মনে হয়, পশ্চিমপ্রান্ত পরিত্যাগের পুর্বে স্বামীজী আর একবার সেখানে গিয়া বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, হয়তো বা দিন কয়েক সেখানে ছিলেন। এইসব পত্রাবলী ও ঘটনাদির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা চলে যে, স্বামীজী উত্তর ও দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় প্রায় সাড়ে ছয়মাস ছিলেন। কিন্তু ১৭ই জুন বলিয়া যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, উহা ভুল, কারণ ইংরেজী জীবনীর মতে (৬৭২ পৃঃ) স্বামীজী ৭ই জুন নিউ ইয়র্কে উপস্থিত ছিলেন।

উজ্জ্বলা তাঁহার স্মৃতিকথায় টম অ্যালান ও তাঁহার স্ত্রী এডিথ-এর (যথাক্রমে অজয় ও বিরজার) স্মৃতিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ওকল্যাণ্ডে স্বামীজী যখন বক্তৃতা আরম্ভ করেন তখন বিরজা অসুস্থ থাকায় অজয় একাই বক্তৃতা শুনিতে যান। তিনি ইহাতে এতই মুগ্ধ হন যে, গৃহে ফিরিয়া সহধর্মিণীকে বলেন, "আমি এমন একজনকে দেখেছি যিনি মানুষ নন, দেবতা।" বিরজা দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া অজয় বলিলেন, তিনি দুইটি অত্যাশ্চর্য কথা শুনিয়া আসিয়াছেন: ভাল আর মন্দ হইল একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ; যদিও হোম অব ট্রুথ-এর মতে সবই মঙ্গলময়—অমঙ্গল বলিয়া কিছু নাই। আর একটা কথা ছিল এই যে, গরু কখন মিথ্যা বলে না, কিন্তু সে গরুই থাকিয়া যায়; মানুষ মিথ্যা বলে, আবার সে-ই দেবতা হইতে পারে। তখন হইতেই অজয় বক্তৃতাকালে স্বামীজীর 'ঘোষণাকারী'র পদ লইলেন এবং সুস্থ হইয়া বিরজাও বক্তৃতায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। বাসস্থানে ফিরিবার কালে স্বামীজী একদিন বিরজাকে দ্বারে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বলিলেন, "মহাশয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা থাকলে আমার বাসস্থানে আসবেন; ওখানে টাকা দিতে হয় না।" "কবে

আসব ?" "কাল সকালে নয়টায়।" তদবধি বিরজা সেখানে যাইতেন ও উপদেশ লাভ করিতেন।

একবার স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমি এমন একজনের শিষ্য যিনি নিজের নামও লিখতে পারতেন না[১], অথচ আমি 'তাঁর জুতো খোলারও অধিকারী নই'। কতবারই না মনে হয়েছে, আমি যদি আমার বুদ্ধিমত্তাকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিতে পারতুম!" অমনি জনৈকা মহিলা বলিলেন, "আপনার বুদ্ধিমত্তাকেই তো আমরা আপনার গুণাবলীর মধ্যে সর্বাধিক পছন্দ করি।" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "মহাশয়া, এর কারণ এই যে, আপনি আমারই মতো আহাম্মক!"

স্বামীজী যখন কিছুদিনের জন্য অ্যালামেডার হোম অব ট্রুথ-এ ছিলেন, সেসময় বিরজা রান্নাঘরে স্বামীজীকে সাহায্য করিতেন ও ঐ উপলক্ষ্যে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করিতেন। রান্নাঘরে কাজের সময় সাধারণভাবে গল্পগুজব চলিলেও উহারই মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বা তুচ্ছ কথার মধ্যদিয়া উচ্চ তত্ত্ব বিরজার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া যাইত। একদিন কি একটা ভাজিবার সময় খানিকটা মাখন বিরজার পোশাকের উপর পড়িয়া গেল। ঐ সবুজ পোশাকটি তাঁহার খুবই পছন্দসই ও গর্বের বস্তু ছিল; তাই বিরজা আপসোস করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজী ঐ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তিসহ আপন কাজে ব্যস্ত রহিলেন। একবার একখানি কাঠের থালায় কিছু আচার লইয়া আসার সময় খানিকটা রস গড়াইয়া স্বামীজীর হাতে পড়িয়া গেল। অমনি তিনি আঙ্গুলগুলি মুখে পুরিয়া রস চুষিতে লাগিলেন। বিরজার মতে ইহা অশোভন ব্যবহার; কাজেই তিনি বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "ও কি স্বামীজী!" স্বামীজী কিন্তু বলিলেন, "এই তুচ্ছ বাহ্য ব্যবহার! তোমাদের দেশে ঐ এক হাঙ্গামা! তোমাদের সব সময় দৃষ্টি, কিসে বাইরের দিকটা ভাল দেখায়!"

টম (অজয়) যেদিন প্রথম স্বামীজীর সহিত বক্তৃতা-মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হন, সেদিন টমের মনে হইয়াছিল, স্বামীজী যেন চল্লিশ ফুট উচ্চ, আর তিনি

১। প্রথম দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা এইরূপ ছিল; পরে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল, তিনি নিরক্ষর ছিলেন না; তাঁহার হস্তলিপি বেলুড় মঠে সংরক্ষিত আছে। তবে ইহাও সত্য যে, তিনি পাঠশালার পড়াও শেষ করেন নাই, এবং পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিতে তিনি 'অশিক্ষিত' ছিলেন।

নিজে মাত্র ছয় ইঞ্চি! ইহার পর হইতে স্বামীজীকে শ্রোতাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিবার কালে তিনি মঞ্চে না উঠিয়া নীচে দাঁড়াইতেন। একবার স্বামীজী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করার আগে অজয়কে বলিয়া রাখিলেন, "আমি যখন ভারত সম্বন্ধে বলতে থাকি, তখন কোথায় থামব জানি না; কাজেই তুমি দশটার সময় আমার মনোযোগ আকর্ষণ করো।" অজয় তাই হলের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইলেন এবং দশটা বাজিবামাত্র পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া উহাকে পেণ্ডুলামের মতো চেন ধরিয়া দোলাইতে লাগিলেন। একটু পরেই স্বামীজী ঐ সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমি ওদের বলে রেখেছিলাম, দশটার সময় আমাকে থামাতে; ওরা এখনি ঘড়ি দোলাতে শুরু করেছে, অথচ আমি আমার বক্তব্য এখনও আরম্ভই করিনি!" স্বামীজী তবু থামিলেন। সেদিন হইতে অজয় সারা জীবন ঐ ঘড়িটি সঙ্গে রাখিতেন।

অ্যালান (অজয়) ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। পূর্বে তিনি নৌবহরে ইঞ্জিনিয়ারের কাছে নিযুক্ত ছিলেন এবং এখনও চলাফিরা করিতেন সৈনিকেরই কায়দায়। একদিন অজয় স্বামীজীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "মিস্টার অ্যালান, আমরা দুইজনই একজাতের লোক—আমরা যোদ্ধার জাত।" অজয় যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন দেশে তাঁহার সর্বাপেক্ষা উত্তম শিষ্য লাভ হইয়াছিল, স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডে। ওদের ধরা শক্ত; কিন্তু একবার ধরতে পারলে তারা তোমারই হয়ে গেল।"

স্বামীজী যেখানেই যাইতেন, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন; তাঁহার আকৃতিতে এমন একটা আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল যে, তাহা সকলেরই চোখে পড়িত। মার্কেট স্ট্রীট ধরিয়া তিনি যখন চলিতেন তখন সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিত অথবা ফিরিয়া প্রশ্ন করিত, "এই হিন্দু রাজাটি কে?" এইভাবেই তিনি একদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট মঞ্চে দাঁড়াইয়া জাহাজ-ভাসানো দেখিয়াছিলেন। অজয় একটা বড় ইস্পাতের কারখানায় কাজ করিতেন। স্বামীজী জাহাজ-ভাসানো দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে অজয় জন কয়েক বন্ধুসহ স্বামীজীকে যথাস্থানে লইয়া গেলেন। জাহাজ নির্মাতাদের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভিন্ন কাহাকেও মঞ্চোপরি চড়িতে দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল; আর যে সেতু অবলম্বনে ঐ মঞ্চে যাওয়া হইবে, তাহার মুখে দুই ব্যক্তি পাহারায় নিযুক্ত ছিল। স্বামীজী

ঠিক করিলেন দূরে না দাঁড়াইয়া মঞ্চে চড়িয়া ভালভাবে জাহাজ-ভাসানো দেখিবেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে গম্ভীরভাবে আগাইয়া গেলেন; রক্ষীরা বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এ যেন একটি শিশুর জন্মলাভ সদৃশ।"

ক্রিস্টিনা অ্যালবার্স লিখিয়াছেন: "আমি স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন পাই ক্যালিফর্নিয়ার স্যান ফ্রান্সিস্কোতে—১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক বক্তৃতার সময়। স্বামীজী বক্তৃতার প্রায় কুড়ি মিনিট আগে আসিয়া জনকয়েক বন্ধুর সহিত গল্প-গুজব করিতে লাগিলেন। আমি সেখান হইতে অল্পদূরে বসিয়াছিলাম এবং বিশেষ আগ্রহসহকারে শুনিতেছিলাম; কারণ আমার অনুভব হইতেছিল যে, আমাকে দিবার মতো অনেক কিছু তাঁহার আছে। কথাবার্তা সাধারণ গোছের হইলেও আমার বোধ হইতেছিল যেন এক অবর্ণনীয় শক্তি তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য তখন খারাপ ছিল, এবং তিনি যখন প্ল্যাটফর্মে যাইবার জন্য উঠিলেন, মনে হইল যেন তাঁহাকে কষ্ট করিয়া চলিতে হইতেছে; তাঁহার গতি ছিল মন্থর ও ভারী। আমি লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার চোখের পাতা ফুলিয়া আছে এবং চেহারায় একটা দৈহিক যন্ত্রণার ছাপ রহিয়াছে। ভাষণ আরম্ভের পূর্বে তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; আর আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল আর আমার মনে হইল তাঁহার গোটা চেহারাই যেন বদলাইয়া গিয়াছে।

"তিনি ভাষণ আরম্ভ করিলেন; আবার একটা পরিবর্তন ঘটিল—এই মহাপুরুষের আত্মিক শক্তি মূর্তিগ্রহণ করিয়া নয়নসমক্ষে আবির্ভূত হইল। আমি তাঁহার বক্তৃতার বিপুল শক্তি অনুভব করিলাম—শব্দগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশাপেক্ষা যেন হৃদয়ে উপলব্ধি জাগাইতেছিল অধিকতর। উহা আমাকে এমন একটা সত্তাসাগরে, এমন একটা উচ্চতর অস্তিত্বানুভূতির মধ্যে টানিয়া ডুবাইয়া দিল যে, বক্তৃতাশেষে তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেও যেন কেমন কষ্টবোধ হইল। তারপর তাঁহার ঐ নয়নযুগল—আহা! কি চমৎকার! তাহারা যেন দ্রুত গতিমান তারকাসদৃশ—অনুক্ষণ তাহা হইতে আলোক বিকিরিত হইতেছে! তারপর ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে স্মৃতি আমার মনে আজও নবীন, আর চিরকাল নবীনই থাকিবে।" ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ৩৯৩ পৃঃ)।

বিরজাদেবীর স্মৃতিকথায় (ঐ, ৩৯৮-৪০২) প্রায়শঃ অ্যানসেলের স্মৃতিকথায়

বিবৃত ঘটনাবলীরই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। বিরজা (শ্রীযুক্তা এডিথ অ্যালান) স্বামীজীর প্রথম দর্শন পান ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চের একেবারে গোড়ার দিকে—যখন স্বামীজী রেডমেনস হল, ইউনিয়ন স্কোয়ার, স্যান ফ্রান্সিস্কোতে 'ভারতীয় আদর্শাবলী' সম্বন্ধে এক পর্যায়ে তিনটি বক্তৃতা দেন। বিরজা কতকটা অনিচ্ছার ভাব লইয়াই গিয়াছিলেন ; শরীরও সুস্থ ছিল না। কিন্তু ক্রমে তিনি স্বামীজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্টা হন। তিনি বলেন, স্বামীজী টার্ক স্ট্রীটে একমাস থাকাকালে তিনি স্বামীজীকে রন্ধনকার্যে সাহায্য করিতেন। ইহার পর স্বামীজী যখন অ্যালামেডায় হোম অব ট্রুথ-এ যান, তখনও তিনি ঐকার্যে সহায় হইতেন। হোম অব ট্রুথ-এর বাড়ীটি বেশ বড় ছিল ; উহা চারিদিকে উদ্যানে পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া স্বামীজী মনের আরামে ধূমপান করিতে করিতে সেখানে বেড়াইতেন। বাড়ীর প্রশস্ত গাড়ী-বারান্দায় বসিয়া তিনি বিরজাদেবী প্রভৃতি যে কয়জন উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত গল্পগুজব করিতেন। হোম অব ট্রুথ-এ ধূমপান নিষিদ্ধ হইলেও স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ কর্তৃপক্ষ তাঁহার বিষয়ে আপত্তি করিতেন না।

এইভাবে লস এঞ্জেলিস, প্যাসাডেনা, ওকল্যাণ্ড, স্যান ফ্রান্সিস্কো, অ্যালামেডা, ক্যাম্প আর্ভিং প্রভৃতি স্থানে কয়েক মাস বেদান্ত-প্রচারে অতিবাহিত করিয়া স্বামীজী জুনের প্রথমেই চিকাগো হইয়া নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হন। এই কালমধ্যে আরও এক প্রকার ঘটনার একটু উল্লেখ আবশ্যক। স্বামীজীর জীবনী ও পত্রাবলী হইতে এবং অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে, স্বামীজী যেখানেই বেদান্ত-প্রচারের জন্য দীর্ঘকাল থাকিতেন, সেখানেই স্থায়িভাবে পঠন-পাঠন ও চর্চা চলিতে থাকুক, ইহা তিনি চাহিতেন। অতএব নিউ ইয়র্কের ন্যায় অন্যত্রও বেদান্ত-সমিতি গড়িয়া উঠিবে ইহা স্বাভাবিক। ইংরেজী জীবনীর মতে লস এঞ্জেলিস ও প্যাসাডেনায় স্বামীজীর অবর্তমানেও নিয়মিতভাবে বেদান্ত-সভা বসিত এবং তাঁহার উত্তর ক্যালিফর্নিয়ায় অবস্থানকালে স্যান ফ্রান্সিস্কো, ওকল্যাণ্ড ও অ্যালামেডায় "অনেকগুলি বেদান্তকেন্দ্র" গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বামীজীর পত্রাবলীতে তাঁহার স্টকটন নামক নগরে যাওয়ারও সংবাদ পাওয়া যায় ('বাণী ও রচনা', ৮।১১৮, ১২৮); কিন্তু সেখানে কিরূপ কার্য হইয়াছিল জানা নাই। পত্রাবলীতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে ও অন্যান্য সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ কালে স্থাপিত কেন্দ্রগুলি দুইটি কার্যে

নিরত ছিল—বেদান্তচর্চা ও ভারতীয় কার্যের জন্য অর্থসংগ্রহ। স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত ২৫শে জুলাই-এর (১৯০০) পত্রে আছে: "সমিতিগুলির কাজ আবার একটু শুরু করে দাও এবং মিসেস হ্যান্সবরোকে বলো, তিনি যেন সময়মত সব চাঁদা আদায় করেন, আর টাকা তুলে ভারতে পাঠিয়ে দেন; কারণ সারদা জানিয়েছে, তাদের বড় টানাটানি চলছে।" ১৩ই আগস্টের পত্রে আছে: "তুমি স্যান ফ্রান্সিস্কোতে 'কিমাসীত, প্রভাষেত, ব্রজেত, কিম্' লিখো। আর মঠে টাকা পাঠাবার কথাটায় গাফিলা হয়ো না। লস এঞ্জেলিস স্যান ফ্রান্সিস্কো হ'তে যেন অবশ্য অবশ্য টাকা মাসে মাসে যায়।"

স্যান ফ্রান্সিস্কোতে তিনি ১৪ই এপ্রিল (১৯০০) যে বেদান্ত-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন উহা নিউ ইয়র্কের সমিতির ন্যায় স্থায়িত্বলাভ করিয়া এখনও জীবিত আছে ও বহু দিকে বিস্তারিত হইয়াছে। স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল এই সমিতিটি বেদান্তচর্চায় অনুপ্রেরণা দিবে এবং ভারতীয় কার্যের জন্য অর্থসংগ্রহে সাহায্য করিবে। এই উভয় কার্যই সমিতিদ্বারা সুসম্পাদিত হইয়াছিল ও হইতেছে। এই সমিতি স্থাপনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা শান্তি (মিসেস হ্যান্সবরো) তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন: "স্যান ফ্রান্সিস্কোতে স্বামীজীর বক্তৃতাবলী ও ক্লাস শেষ হইল ১৪ই এপ্রিল।···যে রাত্রে উহা শেষ হইল, সে রাত্রে ডাঃ লোগান উপস্থিত ছিলেন। ওলবার্গ-দম্পতিও ছিলেন; অ্যালান-দম্পতি ছিলেন কিনা আমার মনে নাই। আমরা শ্রীযুক্ত চ্যাম্বার্সকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, তিনি যেন বক্তৃতাশেষে সেরূপ সকলকে অপেক্ষা করিতে আহ্বান করেন, যাঁহারা স্বামীজীর উপদেশাদির অনুধ্যান চালাইয়া যাওয়া বিষয়ে আগ্রহশীল। তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন এবং অপর সকলে চলিয়া গেলে তিনি লস এঞ্জেলিসে কিভাবে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা আমাকে বর্ণনা করিতে বলিলেন। তারপর আমরা এখানে একটি সমিতি গঠনের বিষয়ে আলোচনা করিলাম; কিন্তু সে রাত্রে কাজ শেষ হইল না। [চারি রাত্রি পরে ১০নং গ্রীয়ারী স্ট্রীটে, ডাঃ লোগানের আফিসে ঐ কার্য সম্পন্ন হয়।] সমিতি স্থাপনের কার্য সম্পূর্ণ হইবার পুর্বে এবং ক্যাম্প টেলর হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামীজী সেখানে কয়েকটি ক্লাস চালাইয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত ওলবার্গের স্মৃতিকথাতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়: "রেডমেনস বিল্ডিং-এর সোশ্যাল হল-এ ১৪ই এপ্রিল (১৯০০) তারিখে স্বামীজীর রাজ-

(ভক্তি ?) যোগবিষয়ক শেষ বক্তৃতার পরে আমি তাঁহার নিকট গিয়া স্যান ফ্রান্সিস্কোতে একটি বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে জানিতে চাহিলাম। তাঁহাকে খুবই খুশী বলিয়া মনে হইল এবং তিনি কহিলেন, "না হবে কেন ?" সম্মত হইয়া তিনি তখনই উহা আরম্ভ করিবার পরামর্শ দিলেন। হলের গায়ে একটি ছোট কামরা ছিল এবং যাঁহারা এই বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন, তাঁহারা সেই সদ্য আহূত সভায় উপস্থিত থাকিলেন। শ্রীযুক্তা হ্যান্সবরো এখানে একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের কথা উত্থাপন করিলে সকলে একবাক্যে সম্মতি জানাইলেন। তখন সভার কার্য নিয়মানুরূপে আরম্ভ হইল এবং শ্রীযুক্তা ডাক্তার প্লাম্ব প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। ডাক্তার লোগান সেখানে উপস্থিত ছিলেন; মার্কেট স্ট্রীট ও (১০নং) গ্রীয়ারী স্ট্রীটের মোড়ে তাঁহার যে আফিস আছে, তিনি উহাতে বেদান্ত-ক্লাসের বৈঠকের অনুমতি দিলেন। পরে স্বামীজী সেখানে বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ক্লাসগুলির আয়তনবৃদ্ধির পরে ডাক্তার লোগান তাঁহার ওক স্ট্রীট ও স্টেইনার স্ট্রীটে সদ্যোনির্মিত বাটীর সর্বনিম্ন তলটি বৈঠকের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজী সেখানে গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পরে তিনি প্যারিসে চলিয়া যান।"

সমিতিটি প্রথমে 'বেদান্ত-ক্লাস' নামে অভিহিত হইলেও পরে বেদান্ত-সমিতি নামেই পরিচিত হয়। সমিতির গঠন-কার্য সমাপ্ত হইলে নিয়মিতভাবে পাঠ ও বক্তৃতাদি চলিতে থাকে ও তৎসহ বৈষয়িক ব্যবস্থাদিও হইতে থাকে। প্রথম দিনের অধিবেশনে (১৪ই এপ্রিল) পঁচিশ জন উপস্থিত ছিলেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল "স্বামীজীকে তাঁহার ভারতীয় কার্যের জন্য সাহায্য করা এবং বেদান্ত-দর্শন চর্চা করা।"

শ্রীযুক্তা হ্যান্সবরো লিখিয়াছেন যে, লস এঞ্জেলিস-এর (প্যাসাডেনার) বেদান্তকেন্দ্র-স্থাপনকালে স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন: "শেক্সপীয়র ক্লাব-এর কক্ষগুলিতেই প্যাসাডেনার সমিতি সংস্থাপিত হয়।...আমরা উহার গঠনকার্য পূর্ণোদ্যমে চালাইয়া যাইতে লাগিলাম। প্রতিষ্ঠার জন্য আহূত সভায় তিনি (স্বামীজী) উপস্থিত ছিলেন।" কিন্তু স্যান ফ্রান্সিস্কোর সমিতির (বা ক্লাসগুলির) উদ্বোধনার্থ আহূত সভার কার্য যথারীতি আরম্ভ হওয়ার কালে স্বামীজী স্বীয় বাসস্থানে চলিয়া যান। ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া হ্যান্সবরো লিখিয়াছেন: "এখানে উল্লেখ করা চলে যে, আমিই স্যান ফ্রান্সিস্কোতেও একটি কেন্দ্র স্থাপনের

প্রস্তাব করি। এই জন্য আমরা দুইটি সভার আয়োজন করি, কারণ প্রথম সভায় খুঁটিনাটি সব বিষয় শেষ হয় নাই। এই প্রথম সভায় আমি স্বামীজীকে পরামর্শ দিই যে, সভার কার্য আরম্ভ হওয়ার পুর্বে তাঁহার চলিয়া যাওয়া ভাল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন ?' আমি উত্তর দিলাম যে, আমি তাঁহার সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতে চাই যাহা আমার মতে তাঁহার না শোনাই বরং উচিত। তিনি রাজী হইলেন ও বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। থাকিলে যে স্বামীজীর কোন অসুবিধা হইত তাহা নহে; বরং আমি তাঁহার সম্বন্ধে ঠিক যেভাবে বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাঁহার সম্মুখে ঠিক সেভাবে বলিতে আমারই বাধিত। উপস্থিত দলটিকে আমি তখন জানাইলাম, কিভাবে লস এঞ্জেলিসের বিধিব্যবস্থা হইয়াছিল ·· এবং আমরা স্যান ফ্রান্সিস্কোর প্রতিষ্ঠান-গঠন-কার্যে অগ্রসর হইলাম।"

পুর্বে উল্লিখিত গীতা-বিষয়ক বক্তৃতাগুলি ডাক্তার লোগানের ৭৭০নং ওক স্ট্রীটের বাড়ীতে হয় এবং সেখানেই নবপ্রতিষ্ঠিত সমিতির উদ্যোগে টিকেট বিক্রয়াদি যাবতীয় ব্যবস্থা হয়। সমিতির লিপিবদ্ধ কার্যবিবরণে ২৯শে মে (১৯০০) তারিখে এইরূপ লিখিত আছে: "ডাক্তার প্লাম্ব (স্বামীজীর সর্বশেষ বক্তৃতান্তে) স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি হইতে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ স্বামীজীকে অর্পণ করিলে স্বামীজী ঐ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।···তারপর স্বামীজী উপস্থিত সকলকে বলিলেন যে, তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দ নামক এক অতীব আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন সন্ন্যাসীকে তাঁহাদের জন্য পাঠাইবেন। অতঃপর তিনি সকলের নিকট বিদায় লইলেন।"

এ পর্যন্ত এই কথাটি আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, স্বামীজীর কার্যের অন্ততঃ দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—সর্বত্র আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ও ভারতের অভাব মোচনার্থ স্বদেশে বিবিধ কার্যারম্ভ ও তজ্জন্য অর্থসংগ্রহ। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলেও এই উভয় ধারা সমভাবে চলিয়াছিল। তবে এই টাকাকড়ির দিকটা তিনি বন্ধুবান্ধবদের হাতে ছাড়িয়া নিজে প্রচারের দিকেই মন দিতেন। অবশ্য ক্যালিফর্নিয়ায় প্রথমাগমনকালে স্বামীজী লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, আগ্রহশীল শ্রোতার অভাব না থাকিলেও সেখানে অর্থপ্রাপ্তির আশা অল্প। তাঁহার ঐ কালের পত্রগুলিতে এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। পরে তিনি অর্থ সম্বন্ধে অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন; আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচারেও ফললাভ হইয়াছিল ততোধিক—তাঁহার পত্রে ইহারও আভাস আছে। অধিকন্তু

ক্যালিফর্নিয়ায় স্বামীজীর কার্যের ফলাফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী অভেদানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "সেবারে তিনি (স্বামীজী) মার্কিন দেশের সর্বত্র গিয়াছিলেন ; এবং ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, 'ক্যালিফর্নিয়াই হচ্ছে ঠিক জায়গা যেখানে বেদান্ত প্রসারলাভ করবে, ওদেশের লোকদের সহানুভূতি আছে আর তাদের দিল খোলা'।"

প্রথমাবস্থায়ও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অর্থের যাহাই হউক না কেন, বেদান্ত প্রচারের এই উপযুক্ত ভূমিতে উদ্যমসহকারে দীর্ঘকাল যাবৎ কার্যপরিচালনা আবশ্যক। তাই তিনি ২৭শে ডিসেম্বর (১৮৯৯) শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন, "আমি শীঘ্রই ক্যালিফর্নিয়ায় কাজ শুরু করে দিচ্ছি। ক্যালিফর্নিয়া ছেড়ে যাবার সময় আমি তুরীয়ানন্দকে ডেকে পাঠাব এবং তাকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে কাজে লাগাব। আমার এটা নিশ্চিত ধারণা, এখানে একটা বড় কর্মক্ষেত্র আছে।" তিনি হয়তো এই পত্রের অল্প পরেই এই পণ্ডিত, কার্যক্ষম, অনুরক্ত ও গুরুগতপ্রাণ গুরুভ্রাতাটিকে ডাকিয়া পাঠাইতেন ; কিন্তু এই কালে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকায় তুরীয়ানন্দের যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, স্থায়িভাবে বেদান্তপ্রচারের ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন স্থানের ভক্তদের মধ্যে আগ্রহ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কুমারী মিনি সি. বুক নামিকা এক মহিলা স্বামীজীর উপদেশাদি শ্রবণে আকৃষ্টা হইয়াছিলেন। স্বামীজীর ক্যালিফর্নিয়া ত্যাগের কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি ক্যালিফর্নিয়ার স্যাণ্টা ক্লারা কাউণ্টির অন্তর্গত স্যান অ্যাণ্টোন উপত্যকায় আশ্রম স্থাপনের জন্য ১৬০ একর ভূমি দান করিতে উদ্যতা হইলেন এবং স্বামীজীও ঐ দান গ্রহণে সম্মত হইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উহা হ্যামিণ্টন পর্বতের সানুদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০০ ফুট উচ্চে এক পর্বত ও অরণ্যানীবেষ্টিত নির্জন স্থানে অবস্থিত ছিল। রেল স্টেশন তথা হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে এবং লোকালয় দ্বাদশ মাইল দূরে ছিল। স্বামীজী স্বয়ং স্থানটি দেখিতে পারেন নাই। তবে লোকমুখে বর্ণনা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, উহা বেদান্তসাধনের পক্ষে অনুকূল হইবে।

ক্যালিফর্নিয়ার কথা শেষ করিবার পূর্বে স্বামীজীর প্রচলিত জীবনীগুলিতে প্রদত্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্থান-কালাদি অজ্ঞাত থাকিলেও উহা পশ্চিমোপকূলে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একদিন নদীতীরে ভ্রমণকালে

তিনি দেখেন জনকয়েক যুবক একটি সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া নদীস্রোতে ভাসমান কয়েকটি ডিমের খোলার দিকে গুলি ছুঁড়িতেছে ; কিন্তু লক্ষ্যভেদে কেহই সমর্থ হইতেছে না। দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে স্বামীজীর মুখে মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল। ইহা যুবকদের চক্ষু এড়াইল না। অভিমানে আঘাত পড়ায় তাহাদের একজন চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিল, "ওহে বাপু, কাজটা যত সহজ মনে করছ অত সহজ নয়! এসো দেখি একবার এদিকে! দেখি তোমার কেমন তাগ!" স্বামীজী দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের কাছে গেলেন ও একজনের হাত হইতে বন্দুক লইয়া নিশানা ঠিক করিয়া পর পর বারোটি খোলা গুলিবিদ্ধ করিলেন। যুবকরা চমৎকৃত হইয়া ভাবিল, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল অভ্যাস করিয়াছে। কিন্তু স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন যে, বন্দুকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কোনকালেই নাই—তিনি ধর্মপ্রচারক ; তবে আদতে ব্যাপারটা কিছুই নয়—উহার ভিতরকার তত্ত্ব হইতেছে মনঃসংযম।

আমেরিকা হইতে বিদায়

শ্রান্ত ক্লান্ত ও রুগ্ন স্বামীজী যখন ক্যালিফর্নিয়ার কাজ বন্ধ করিতে উদ্যত, প্রায় সেই সময়েই তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত লেগেট ও বন্ধুর সহধর্মিণী লণ্ডন হইতে সানুনয় অনুরোধ জানাইলেন, যাহাতে তিনি প্যারিসে তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ-পূর্বক নিজের স্বাস্থ্যোদ্ধারে যত্নপর হন। অধিকন্তু ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস-প্রদর্শনীর সহযোগে সেখানে যে ধর্মেতিহাস-মহাসম্মেলনের আয়োজন চলিতেছিল, উহার বৈদেশিক-প্রতিনিধি-সমিতির পক্ষ হইতেও তাঁহাকে ঐ সম্মেলনে ভাষণ দিবার জন্য আহ্বান জানানো হইয়াছিল। এই উভয় অনুরোধ রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ২৯শে মে স্যান ফ্রান্সিস্কোর শেষ বক্তৃতা হইয়া যাওয়ার পর কোন একদিন নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিলেন। ইংরেজী জীবনীর মতে তিনি পথে চিকাগো ও ডেট্রয়েটে নামিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় কতদিন ছিলেন, তাহা বলা হয় নাই। এদিকে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত-সমিতির সহকারী সেক্রেটারী ঐ সমিতির জুন মাসের যে কার্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে আছে: "৭ই জুন স্বামী বিবেকানন্দ ক্যালিফর্নিয়া হইতে নিউ ইয়র্কে আসেন এবং ১২০ পূর্ব ৫৮নং স্ট্রীটে অবস্থিত বেদান্ত-সমিতির গৃহে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের সহিত অবস্থান করেন। ঐ সময় ভগিনী নিবেদিতাও ঐ মহানগরে ছিলেন।" নিবেদিতার মতে স্বামীজী বেদান্ত-সমিতিতে ৪ঠা জুন বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়া প্রশ্ন করেন, "কি বিষয়ে বলব?" জনৈক শ্রোতা উত্তর দেন, "বেদান্ত-দর্শন"। ঐ বিষয়েই বক্তৃতা হয়। নিবেদিতার মত ঠিক হইলে স্বামীজীর হাতে রাস্তায় নামিবার মতো সময় মোটেই ছিল না; কারণ আমেরিকার পশ্চিমকূল হইতে ট্রেনে পূর্বকূলে আসিতে বেশ কিছু সময় লাগে। আমাদের বিশ্বাস, নিবেদিতার তারিখ ভুল ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৯৩ পৃঃ); কারণ স্বামীজীর পত্রে চিকাগো যাওয়ার উল্লেখ আছে, আর বেদান্ত-সমিতির বিবরণানুসারে বেদান্ত-দর্শনের বক্তৃতা হয় ১০ই জুন। ২৩শে এপ্রিল (১৯০০) তিনি মেরীকে জানাইয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই চিকাগো যাইবেন। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি চিকাগোতে নামিয়া তিন-চারিদিন ছিলেন, কিন্তু সেবারে ডেট্রয়েটে নামেন নাই—ডেট্রয়েটে গিয়াছিলেন আরও পরে। চিকাগো-গমনের আর

একটি প্রমাণ আমরা পাই স্বামী নিখিলানন্দের গ্রন্থে ('বিবেকানন্দ এ বায়োগ্রাফি', আমেরিকান সংস্করণ, ১৫৫ পৃঃ) : আমেরিকা মহাদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাড়ি দিয়া নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া আসিতে স্বামীজী ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তিনি পথে চিকাগোতে নামেন। সেখানে তিনি হেল পরিবারের অতিথি হইয়া পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের সহিত মেলামেশা ও গল্পগুজব করেন। চিকাগো হইতে যাত্রার দিন প্রাতে মেরী স্বামীজীর ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তিনি বিমর্ষ। মনে হইল, তিনি রাত্রে শয্যা মোটেই ব্যবহার করেন নাই। মেরী ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, তিনি সত্যই সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন। তারপর অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "ওঃ, মানুষের ভালবাসার বাঁধন কাটানো কতই না কঠিন!" তিনি জানিতেন যে, তাঁহার স্নেহের ভগিনীদের সহিত তাঁহার এই শেষ সাক্ষাৎকার। তারপর ৭ই জুন তিনি নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন।

এই শেষবারে নিউ ইয়র্কের ঘটনাবলী বলার পুর্বে নিউ ইয়র্কেরই একটু পুরাতন ইতিহাস বিবৃত করা অত্যাবশ্যক। উহা স্বামীজীর স্যান ফ্রান্সিস্কো থাকা-কালেই ঘটিয়াছিল এবং উহা তাঁহার বিশেষ মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছিল। আমরা জানি স্বামীজী স্বয়ং নিউ ইয়র্কের বেদান্ত-সমিতি স্থাপন করেন এবং ইংলণ্ড হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকায় ফিরিয়া উহার ভিত্তি দৃঢ়তর করেন। পরে সেখানে যথাক্রমে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ কার্য পরিচালনা করেন। আরও পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ ঐ কার্যে স্বামী অভেদানন্দকে সাহায্য করিতে থাকেন। ইহার পুর্বেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর এই সমিতি আইনানুসারে রেজেস্ট্রীকৃত হয়। সমিতি নবরূপ ধারণ করার পরে শ্রীযুক্ত লেগেট উহার পরিচালন-কমিটির সভাপতি হন। তিনি ধনী, স্বামীজীর বন্ধু, হৃদয়বান ও বেদান্তানুরাগী। কাজেই বেদান্তপ্রচারে উৎসাহহেতু তিনি ও স্বামীজীর অপর বন্ধুগণ যেমন যেমন নিউ ইয়র্কের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি স্বামী অভেদানন্দের সহিত মতানৈক্য এমন কি মনকষাকষি আরম্ভ হইল। তখন স্বামীজীর বন্ধুরা বিবাদ মিটাইবার জন্য স্বামীজীর সাহায্য চাহিলেন। তিনি ঐ সময়ে বহু দূরে পশ্চিমাঞ্চলে বক্তৃতাদিতে ব্যস্ত, সব ব্যাপার জানেন না, শরীরও বিশেষ অসুস্থ। অতএব হঠাৎ কিছু করিতে পারিলেন না বা করিতে সম্মত হইলেন না। ফলে শ্রীযুক্তা

বুল প্রভৃতি অনেকেই বিরক্ত হইলেন। এইসব ঘটনাপরম্পরাই আমরা স্বামীজীর নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশগুলিতে পাই।

"বেদান্ত সোসাইটির জন্য মিঃ লেগেট চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন জেনে আমি খুবই আনন্দিত। সত্যি, তিনি এত সহৃদয়!" (১৭ই মার্চ, ১৯০০)। "মিঃ লেগেট দেখছি বেদান্ত-সমিতিটাকে চালু করে দিয়েছেন। চমৎকার!" (১লা এপ্রিল, ১৯০০)। এই পর্যন্ত বেশ। তাহার পরই হাঙ্গামা শুরু হইল। ৮ই এপ্রিল স্বামীজী ধীরামাতাকে (ওলি বুলকে) লিখিলেন: "এই সঙ্গে অভেদানন্দের একখানি সুদীর্ঘ চিঠি পাঠালাম।···সে আমার আদেশের অপেক্ষা করছে। আমি তাকে বলেছি যে, সে যেন সব বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং আমি না আসা পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে থাকে। আমার বোধ হয় নিউ ইয়র্কের বর্তমান পরিস্থিতিতে ওরা আমাকে ওখানে চায়; আপনিও কি তাই মনে করেন? তাহলে শীঘ্রই আসব।···অভেদানন্দ এ যাবৎ ভাল কাজ করেছে। আর আপনি জানেন, আমি আমার কর্মীদের কাজে মোটেই হস্তক্ষেপ করি না। যে কাজের লোক তার একটা নিজস্ব ধারা থাকে এবং তাতে কেউ হাত দিতে গেলে সে বাধা দেয়।···অবশ্য আপনি কার্যক্ষেত্রেই রয়েছেন এবং সব জানেন। কি করা উচিত, এ বিষয়ে আমায় উপদেশ দিবেন।" আবার ১০ই এপ্রিল তিনি ম্যাকলাউডকে লিখিলেন: "নিউ ইয়র্কে একটা জটলা হচ্ছে দেখছি। অভেদানন্দ আমায় একখানি চিঠিতে জানিয়েছে যে, সে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যাবে। সে ভেবেছে, মিসেস বুল ও তুমি তার বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কিছু লিখেছ। উত্তরে আমি তাকে ধৈর্য ধরে থাকতে লিখেছি, আর জানিয়েছি যে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড আমাকে তার সম্বন্ধে শুধু ভাল কথাই লিখেন।···মিঃ লেগেটকে আমার নাম করে বেদান্ত সোসাইটির ব্যাপারটার যথোচিত সমাধান করতে বলো। এইটুকু শুধু আমি বুঝেছি যে, প্রতি দেশেই সেই দেশের নিজস্ব ধারা আমাদের মেনে চলতে হবে। সুতরাং তোমার কাজ যদি আমায় করতে হত, তাহলে আমি সমস্ত সভ্য ও সমর্থকদের এক সভা আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করতাম, তাঁরা কি করতে চান, কোন সংহতি চান কিনা, যদি চান তবে তা কিরূপ হওয়া আবশ্যক ইত্যাদি। তুমি কিন্তু কাজটি নিজের চেষ্টায় কর—আমি রেহাই চাই। একান্তই যদি মনে কর যে, আমি উপস্থিত থাকলে সাহায্য হবে, তবে আমি দিন পনরর মধ্যে আসতে পারব।"

আমরা বিষয়টির বিশদ আলোচনা করিতেছি এইটুকু দেখাইবার জন্য যে, স্বামীজী সর্বদা অধ্যাত্মজগতে বাস করিলেও তাঁহার প্রতিটি লৌকিক ব্যবহার সুচিন্তিত ছিল। নিউ ইয়র্কের ঐরূপ পরিস্থিতিতে তিনি যেভাবে চলিতেছিলেন, ও অপরকে যেরূপ উপদেশ দিতেছিলেন, উহা অপেক্ষা উত্তম পরামর্শ আর কেহ দিতে পারিতেন কি? কিন্তু জগৎ নিজ ধারায়ই চলে—সুপরামর্শ কুপরামর্শের বড় একটা ধার ধারে না। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। উভয় পক্ষের বিবাদ বাড়িতেই থাকিল। উহার পরিণতির পরিচয় পাই স্বামীজীর ১৮ই এপ্রিলের পত্রে। ম্যাকলাউডকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "মিঃ লেগেট সভাপতির পদ ত্যাগ করেছেন শুনে বড়ই দুঃখিত হলাম। আসল কথা, আর বেশী গোল পাকাবার ভয়ে আমি চুপ করে আছি। তুমি তো জানই—আমার সব কড়া ব্যবস্থা; একবার যদি আমার খেয়াল চাপে, তো এমন চেঁচাতে শুরু করব যে, অভেদানন্দের মনের শান্তিভঙ্গ হবে। আমি তাকে শুধু এইটুকু লিখে জানিয়েছি যে, মিসেস বুল সম্বন্ধে তার সব ধারণা একেবারে ভুল।"

স্বামীজী শ্রীগুরুর নিকট লব্ধ ভগবদ্বার্তাকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন কথায় ও কাজে। কিন্তু জগতের কঠিন বহিস্তরকে ভেদ করিয়া সে বার্তা বিশ্বহৃদয়কে স্পর্শ করিতে অযথা বিলম্ব হইতেছে আর তাঁহার স্বল্পায়ু এই দুঃসাধ্য কার্যে হয়তো বা বৃথা নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে—এইরূপ বিরুদ্ধ পরিস্থিতি সময়ে সময়ে স্বামীজীর চিত্তকে কি গভীরভাবে আলোড়িত করিত এবং উহাকে বৈরাগ্যপূর্ণ করিয়া তুলিত, তাহার একখানি সুস্পষ্ট আলেখ্য উল্লিখিত পত্রে সংরক্ষিত হইয়াছে। দীর্ঘ পত্রের সবটুকু উদ্ধৃত না করিয়া আমরা অংশ-বিশেষমাত্র তুলিয়া দিলাম:

"কর্ম করা সব সময়ই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন চির দিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়। আমার সমুদয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।...লড়াইয়ে হার-জিত দুইই হল—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব্ শিব পার করো মেরী নেইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভো! যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক্ হয়ে শুনত, আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-

ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজ-কর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধিমাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চির-পরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদবোধ হচ্ছে। জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর-গভীর আহ্বান!—যাই প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক (সংসারের ভালমন্দ সংসারীরা দেখুক), তুই (ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়।'—যাই প্রভু, যাই।···

"শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস! তুমি বুঝতে পারছ, কেন আমি অভেদানন্দের কাজে হাত দিচ্ছি না। আমি কে, জো, যে কারু কাজে হাত দেবো? অনেক দিন হ'ল, নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার ইচ্ছা' বলবার আর অধিকার নেই। এই বৎসরের গোড়া থেকেই আমি ভারতের কোন কাজে আদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি—তা তো তুমি জানই। তুমি ও মিসেস বুল অতীতে আমার জন্য যা করেছ, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। তোমাদের চিরকল্যাণ, অনন্ত কল্যাণ হোক! তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেরূপ গা ভাসান দিয়েছি।···আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি বলব! যা-কিছু দেখছি, শুনছি, সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে, কেননা নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, উপাদেয়-হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে!···ওঁ তৎ সৎ!"

জগতের আবিলতা দর্শনে পবিত্র হৃদয়ে যে ত্যাগ ও অনাসক্তির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া উত্থিত হয়, ইহা যেন তাহারই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বামীজীর নিজেরই বাণী—ত্যাগ ও সেবার সমভাবে ও সমকালে রূপায়ণের বার্তাও কি এখানে প্রতিধ্বনিত হয় নাই? আধ্যাত্মিক ভাবপ্রণোদিত কার্যের মধ্যে কর্তব্য-পরায়ণতা ও অনাসক্তি, স্বোদ্দেশ্যসাধন ও অপরের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সমভাবে থাকা আবশ্যক। কিন্তু একথা কি সত্য নহে যে, জাগতিক কার্যের পশ্চাতে অনেক স্থলেই মানযশপ্রতিপত্তি প্রভৃতি স্বার্থের তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকে? সাধারণ নেতা উত্তমোত্তম কার্যব্যবস্থাবলম্বনে সে সঙ্ঘর্ষকে ভদ্রতার সীমামধ্যে আবদ্ধ রাখিতে প্রয়াসী হন; আর যুগনায়ক মানুষের অন্তস্তলে প্রবেশপূর্বক সেখানে প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করেন। স্বামীজী তাই উক্ত বিবাদস্থলে বৈরাগ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে, তিনি বৈরাগ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া অপরের উপর উহা বলপূর্বক চাপাইয়া দেন নাই, অপরের প্রসঙ্গেও উহার কথা তুলেন নাই; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন শুধু নিজেরই সম্বন্ধে—যেন নিজেরই সব দোষ, সব নিষ্ফলতা! ইহা তো অন্তর্জগতের কথা। বাস্তব জগতে ঐ বিবাদ তখন কিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহার সংবাদ পাই ম্যাকলাউডকে লিখিত স্বামীজীর ২০শে এপ্রিলের (১৯০০) পত্রে:

"অভেদানন্দের সঙ্গে যে ছোটখাট একটা মতান্তর হয়েছে, তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। তুমি তার যে পত্রখানা পাঠিয়েছ, তাও পেয়েছি। এ পর্যন্ত সে ঠিকই বলেছে, 'স্বামীজী আমাকে লিখেছেন: মিঃ লেগেট বেদান্তে উৎসাহী নন এবং আর সাহায্য করবেন না। তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও।' টাকা-পয়সার কি করা যাবে, তার এ প্রশ্নের উত্তরে—তোমার ও মিসেস লেগেটের ইচ্ছানুসারে তাকে আমি লস এঞ্জেলিস থেকে নিউ ইয়র্কের সংবাদ লিখেছিলাম। হ্যাঁ, কাজ তার নিজের রূপ নেবেই, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার ও মিসেস বুলের মনে ধারণা যে, এ ব্যাপারে আমার কিছু করা উচিত। কিন্তু প্রথমতঃ অসুবিধা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। সেটা যে কি নিয়ে সে কথা তোমরা কেউই আমাকে কিছু লেখনি। অন্যের মনের কথা জেনে নেবার বিদ্যা আমার নেই। তুমি শুধু সাধারণভাবে লিখেছ যে, অভেদানন্দ নিজের হাতে সব কিছু রাখতে চায়। এ থেকে আমি কি বুঝব? অসুবিধাগুলি কি কি? প্রলয়ের সঠিক তারিখটি সম্বন্ধে আমি যেমন অন্ধকারে, তোমাদের মতভেদের কারণ সম্বন্ধেও আমি তেমনি অন্ধকারে। অথচ মিসেস বুলের ও তোমার চিঠিগুলিতে যথেষ্ট বিরক্তিভাব। এই সব জিনিস আমরা না চাইলেও কখন কখন জটিল হয়ে পড়ে। এগুলি স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করুক।"

এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া স্বামীজীর সহিত বন্ধুদের মনোমালিন্য

ঘটিতেছিল—যদিও তিনি ঐ জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী ছিলেন না। শ্রীযুক্তা বুলও ঐ ব্যাপারে স্বামীজীর উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ পূর্বোদ্ধৃত পত্রেই আছে : "অভেদানন্দের ব্যাপার থেকে নিশ্চয়ই এ সবের উৎপত্তি।" আবার নিবেদিতার সহিত মনোমালিন্যের ফলে স্টার্ডি ও শ্রীযুক্তা জনসন স্বামীজীর প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, এইরূপ কথাও উক্ত পত্রে উল্লেখ করিয়া তিনি আরও লিখিয়াছিলেন : "স্টার্ডি ও মিসেস জনসন মার্গটের জন্য বিচলিত হয়ে আমার কঠোর সমালোচনা করেছে। এখন আবার অভেদানন্দ মিসেস বুলকে বিচলিত করেছে এবং তার ধাক্কাও আমাকে সামলাতে হচ্ছে। এই হ'ল জীবন! তুমি ও মিসেস লেগেট চেয়েছিলে আমি তাকে স্বাধীন ও আত্মনির্ভর হ'তে লিখি—এ-কথা লিখি যে, মিঃ লেগেট তাকে আর সাহায্য করবেন না। আমি তাই লিখেছি। এখন আমি আর কি করতে পারি? রাম-শ্যাম কেউ যদি তোমার কথা না শোনে, তাহ'লে তার জন্য কি আমাকে ফাঁসি যেতে হবে? এই বেদান্ত সোসাইটি সম্বন্ধে আমি কি জানি? আমি কি সেটা আরম্ভ করেছিলাম? তাতে কি আমার কোন হাত ছিল? তদুপরি, ব্যাপারটা যে কি, সে সম্বন্ধে দু-কলম লেখবার মনও কারও হয়নি।"

স্বামীজীর পত্রে এই ব্যাপারে এই শেষ কথা। তবে পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে আমরা জানি যে, আমেরিকান বন্ধুদের প্রীতি তিনি হারান নাই। স্বামী অভেদানন্দকেও তিনি সমরূপেই ভালবাসিতেন; অতঃপর নিউ ইয়র্কে গিয়া তিনি বেদান্ত-সমিতিতেই উঠিয়াছিলেন। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, পূর্বের উদ্ধৃতিতে স্বামীজী যদিও ঐ সমিতি-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সমস্ত ব্যক্তিগত দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি উহার অর্থ ইহা নহে যে, সমিতি-প্রতিষ্ঠার সহিত তাঁহার কোন দিন কোন সম্পর্ক ছিল না। আমরা জানি প্রথম বারে আমেরিকায় অবস্থানকালে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি স্বহস্তে যে সমিতি গঠন করেন, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবরে উহাই আইনানুসারে বিধিবদ্ধ সমিতিতে পরিণত হয়। স্বামীজীর কথার অর্থ এই যে, এই দ্বিতীয় পরিণতির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না—শ্রীযুক্ত লেগেটকে ঐ রেজেস্ট্রীকৃত সমিতির সভাপতি করা, কিংবা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা ইত্যাদি বৈষয়িক ব্যবস্থার সহিত সত্যই তিনি কোন কালে জড়িত ছিলেন না।

এইভাবে কৃতিত্বের দাবী যিনি অস্বীকার করেন বা দায়িত্ব এড়াইয়া চলেন,

তাঁহাকে 'যুগনায়ক' বলা চলে কোন্ অর্থে? কথাটা বুঝিবার জন্ম আমরা নিবেদিতার সাহায্য লইব: "আমি এও দেখতে পাচ্ছি যে, পরবৈরাগ্য ও মন্দ-বৈরাগ্যের প্রকাশের মধ্যে তফাত অনেকখানি; আর এ বিষয়ে আমাদের উভয়ের জনৈক বন্ধুর অজ্ঞতা দেখে আমি হাসি। ঐ উপায়ে তিনি (স্বামীজী) কেমন করে যে কোন দলের সঙ্গে মিশতে পারেন, কেমন করে উদাসীন ব্যক্তির ন্যায় আলোক বিকিরণ করেন বা না করেন, কেমন করে নিজের সম্বন্ধে লোকের মতামতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন—এসব সত্যই এক বিরাট ব্যাপার। এই বিষয়ে স্বামীজীর মহত্ত্ব যে কি তা আমি ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম যখন কোন এক শহরে লোকেদের সর্বপ্রকার আদর-আপ্যায়নে তৃপ্ত হয়ে এমন শহরে গিয়ে পড়লাম যেখানকার লোকদের কৃত্রিমতা দেখে আমার পিত্তি চটে গেল। আবার এই যে লোকগুলির হাত থেকে আমি পারলে তখনি পালিয়ে যেতে চাইলাম, তারাই যখন শেষ পর্যন্ত মায়ের বাছা বাছা সহায়ক হয়ে দাঁড়াল, তখনই স্বামীজীর কাজের ধারা সুপ্রমাণিত হল। আর তাঁর দায়িত্বশূন্যতা কী চমৎকার! সর্বপ্রকার কার্যকরী শক্তির অধিনায়কপদ এমনভাবে গ্রহণ করা এবং এমন সব চমকপ্রদ পরিকল্পনা রচনা করা যাতে ভাগ্যদেবতাকেও নিজ আয়ত্তে আনতে পারা যায়—এর চেয়ে আর কিছুই অধিক লোভজনক নহে। স্বামীজী কিন্তু শুধু অপেক্ষা করে বসে থাকেন, শুধু তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে চলেন; এমনি করেই চলতে থাকে। আমি তাঁর বিরাটত্ব সবে বুঝতে আরম্ভ করেছি।" ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৯৩ পৃঃ)।

পশ্চিম উপকূলের কার্যসমাপনান্তে স্বামীজী যখন নিউ ইয়র্কে আসিলেন, নিউ ইয়র্কের কাজ তখন বেশ চলিতেছিল, যদিও পরিচালক-কমিটির রূপ-পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। লেগেটের সভাপতিত্ব ত্যাগের পর কলম্বিয়া কলেজের অধ্যাপক ডাঃ হার্শেল সি. পার্কার সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে রেভারেণ্ড ডাক্তার আর. হিবার নিউটন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক চার্লস আর. ল্যানম্যান-এর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। স্বামী তুরীয়ানন্দ এপ্রিল মাস হইতে বেদান্ত-সমিতিতে বক্তৃতা দিতেছিলেন এবং শিশুদিগকে লইয়া ধর্মবিষয়ক গল্পগুজব করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে ক্যালিফর্নিয়ায় যাইবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তুরীয়ানন্দকে মিস্ বুকের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে 'শান্তি-আশ্রম' স্থাপনপূর্বক উহার দায়িত্ব গ্রহণে

সম্মত করানো সহজসাধ্য ছিল না—তিনি পুনঃ পুনঃ ঐরূপ দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে এবং তুরীয়ানন্দ সাক্ষাৎ কর্মক্ষেত্রে না নামিয়া ধ্যানধারণাদিরই দিকে ঝুঁকিতেছেন দেখিয়া স্বামীজী অবশেষে বলিলেন, "এটা মায়ের ইচ্ছা যে, তোমাকে ওখানে কার্যভার নিতে হবে।" তুরীয়ানন্দ তখন সহাস্যে বলিলেন, "বরং বল, এটা তোমার ইচ্ছা! মা তো আর অমন করে তোমাকে তাঁর মনের কথা বলতে আসেননি! মায়ের কথা আমরা শুনব কেমন করে?" তখন স্বামীজী আবেগভরে উত্তর দিলেন, "হাঁ ভাই! আমরা পরস্পরের কথা যেমন পরিষ্কার শুনতে পাই, মায়ের কথা ঠিক তেমনি শোনা যায়! তাঁর কথা শুনতে হলে চাই শুধু সূক্ষ্ম নাড়ী!" স্বামীজী এই কথাগুলি এমন হৃদয়াবেগে বলিয়াছিলেন যে, তুরীয়ানন্দের পক্ষে উহা মায়ের আদেশরূপে মানিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। অতএব তিনি 'শান্তি-আশ্রম' প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব লইতে সম্মত হইলেন। যাত্রার দিন তখনও দেরী ছিল। ইত্যবসরে স্বামীজী স্বয়ং নিউ ইয়র্কে কাজ আরম্ভ করিলেন।

জীবনীকারদের মতে নিউ ইয়র্কে স্বামীজী পর পর চারিটি রবিবারে বক্তৃতা করেন ও চারিটি শনিবার সকালে গীতা-ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার প্রচারের ফলে ভারতীয় কৃষ্টি, ধর্ম ও দর্শন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত মতবাদের প্রতি যে সকল প্রখ্যাতনামা মনীষী শ্রদ্ধাবান ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েক-জনের নাম এই: কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক সেথ লো, কলম্বিয়া কলেজের অধ্যাপক এ. ভি. জ্যাকসন, সিটি অব নিউ ইয়র্ক কলেজের অধ্যাপক টমাস আর. প্রাইস ও ই. এনগালসম্যান এবং নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড বথিয়েল, এন. এম. বাটলার, এন. এ. ম্যাকল্যাউথ, ই. জি. সিলার, ক্যালভিন টমাস ও এ. কন।

পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারেও স্বামীজী তাঁহার পুরাতন শিষ্য-শিষ্যা ও বন্ধু-বর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন এবং তাঁহারাও তাঁহার স্নেহপ্রীতির দাবী রাখিতেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁহাদের গৃহেও পদধূলি দিতেন। শিষ্যাদের মধ্যে শ্রীমতী ওয়াল্ডোর (হরিদাসীর) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। ইঁহার গৃহে বসিয়া তিনি দীর্ঘকাল ভাবী কর্মসূচী ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিতেন। বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্তা অ্যানি স্মিথ বা স্বামীজীর মা-স্মিথ। শ্রীযুক্তা স্মিথ চিকাগো মহাসভার কালে স্বামীজীর গুণে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে চিকাগো-সমাজের

অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচিত করিয়া দেন। পরে নিউ ইয়র্কেও তিনি অনুরূপ সাহায্য করেন। অ্যানি স্মিথের জন্ম হইয়াছিল ভারতবর্ষে। পরে তিনি প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া আমেরিকায় সুনাম অর্জন করেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে তিনি এক সময়ে লস এঞ্জেলিসে ও প্যাসাডেনায় চারি বৎসর অতিবাহিত করেন এবং ঐ অঞ্চলে বেদান্ত-দর্শনের প্রসার দর্শনে বলেন, "স্বামীজীর প্রোথিত বীজ প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে সর্বত্র উদ্গত হইতেছে; কারণ তিনি হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন দেশের সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নব প্রেরণা জাগাইয়াছিলেন।"

স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের কার্যের অধিকতর পরিচয়লাভের জন্য আমরা পুনর্বার নিউ ইয়র্কের বেদান্ত-সমিতির সহকারী সেক্রেটারীর রিপোর্টের সাহায্য লইব। ৭ই জুন তারিখে স্বামীজীর আগমনবার্তা লিপিবদ্ধ করার পর তিনি লিখিয়াছেন:

"পরবর্তী শনিবারে, ৯ই জুন, স্বামী বিবেকানন্দ সকালের ভগবদ্গীতার ক্লাসটি স্বয়ং পরিচালনা করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে ঐ কার্য হইতে অব্যাহতি দিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দই সাধারণতঃ ঐ ক্লাসে পড়াইতেন। ১০ই জুন রবিবার সকালে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত-সমিতির কক্ষে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। স্বামীজীর পুরাতন ছাত্র ও বন্ধুদের দ্বারা ঘরগুলি একেবারে ঠাসা ভরতি হইয়া গিয়াছিল। পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁহার জন্য একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়, যাহাতে প্রাচীন বন্ধুবৃন্দ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পান; তাছাড়া এমন অনেক বিদ্যানুরাগী ছিলেন যাঁহারা 'রাজযোগের' সুবিখ্যাত লেখককে দেখিবার জন্য দীর্ঘকাল লালায়িত ছিলেন এবং আচার্যবরের মুখে দুই-চারিটি স্নেহমাখা কথা শুনিয়া ও তাঁহার সহিত প্রীতি-পূর্ণ করমর্দন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বেদান্ত-সমিতির আদর্শ ও আমেরিকার কার্যাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

"পরবর্তী শনিবার সকালে, ১৭ই জুনও তিনি ক্লাসের ভার লইলেন ও 'ধর্ম মানে কি?'—এই বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। সন্ধ্যায় 'ভারতীয় নারীর আদর্শ' বিষয়ে ভাষণপ্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা হিন্দু-নারীদের অনাড়ম্বর জীবন ও পবিত্র ভাবরাশির অতি সুন্দর ও সহানুভূতিপূর্ণ বিবরণ দিলেন। ছাত্রীরা তাঁহাদের হিন্দু ভগিনীদের দৈনন্দিন জীবন ও চিন্তারাশি সম্বন্ধে জানিবার জন্য সর্বদাই আগ্রহান্বিতা ছিলেন; সুতরাং এই বক্তৃতায় তাঁহারা খুবই আনন্দিতা হইলেন।

এই আগ্রহদর্শনে ভগিনী নিবেদিতা বেশ খুশী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশ লোক পূর্বে যতটা জানিতেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তিনি তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা স্পষ্টতররূপে ভারতীয় জীবনপ্রণালী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

"২৩শে জুন স্বামী বিবেকানন্দ গীতাপাঠ পরিচালনা করিলেন এবং ২৪শে জুন রবিবারে 'শক্তিপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। সন্ধ্যায় ভগিনী নিবেদিতা পুনর্বার 'প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা' বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। তিনি বিষয়টির সহিত সুপরিচিতা ছিলেন বলিয়া তাঁহার বক্তৃতাটি খুবই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। তাঁহার আগমন ও বার্তালাপও ছিল বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।...

"স্বামী বিবেকানন্দ ৩০শে জুন সকালের ক্লাসটি পরিচালনা করেন এবং পরদিন ১লা জুলাই রবিবার সকালে 'ধর্মের উৎস' বিষয়ে ভাষণ দেন। পূর্ব পূর্ব বারেরই মতো ঘরগুলি ঠাসা ভরতি ছিল এবং সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বক্তৃতাশ্রবণ একটা সৌভাগ্যের বিষয়। ৩রা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ ইয়র্ক ছাড়িয়া গেলেন। স্বামীজী গেলেন ডেট্রয়েটে পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলিত হইতে, আর তুরীয়ানন্দ গেলেন ক্যালিফর্নিয়ায় 'শান্তি-আশ্রম' স্থাপন করিতে এবং স্যান ফ্রান্সিস্কোতে যে বেদান্ত-সমিতি ছিল, উহার কার্যভার গ্রহণ করিতে।

"১০ই জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ ডেট্রয়েট হইতে ফিরিলেন এবং জুলাই-এর প্রথমার্ধ বেদান্ত-সমিতির ভবনেই কাটাইলেন। ২০শে জুলাই তিনি প্যারিস যাত্রা করিলেন।"[১]

শ্রীমতী মিনি বুক ২৫শে জুন পূর্ব পরিকল্পিত 'শান্তি-আশ্রমে'র জমি রেজেস্ট্রী করিয়া দিলে স্বামী তুরীয়ানন্দের তথায় গমনের শেষ বাধা তিরোহিত হইল। ঐ প্রদেশে যাইবার পূর্বে তিনি স্বামীজীর উপদেশ চাহিলে স্বামীজী স্বীয় অভিজ্ঞতাসম্ভূত সকল জ্ঞাতব্য কথাই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে বলিলেন, "যাও হরি ভাই, ক্যালিফর্নিয়ায় আশ্রম কর, বেদান্তের ধ্বজা উড়াও। এখন হতে ভারতের স্মৃতি পর্যন্ত মন থেকে মুছে ফেল। কেমন করে জীবন যাপন করতে হয়, এটাই এদের সব চেয়ে বেশী করে দেখাও, তারপর সব মা জগদম্বা

১। নিবেদিতার মতে তিনি ১৫ই জুলাই সকালে গীতা-ক্লাসে অহিংসাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং ২৪শে জুলাই সকাল ১১টায় 'মাতৃপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন (ঐ, ২৯৭-৯৮ পৃঃ)।

দেখবেন।" মনে গাঁথিয়া রাখার মতো গভীর অর্থপূর্ণ কথা! স্বামী তুরীয়ানন্দ উহা গ্রহণ করিয়া পশ্চিম প্রান্তে চলিলেন।

লস এঞ্জেলিসে পৌছাইয়া তিনি প্রথমে স্বামীজীর আরব্ধ কার্য পরিচালনে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু শুধু নগরে বেদান্তপ্রচারের জন্য তো তিনি আসেন নাই—তাঁহাকে যে 'শান্তি-আশ্রম' স্থাপনপূর্বক ঐকান্তিক বেদান্ত-সাধনার সূত্রপাত করিতে হইবে। অতএব ঐ উদ্দেশ্যে প্রস্তুতির জন্য তিনি ২৬শে জুলাই স্যান ফ্রান্সিস্কোতে উপনীত হইলেন ও ২রা আগস্ট দ্বাদশজন শিক্ষার্থীর সহিত স্যান অ্যান্টোন উপত্যকায় পৌছাইয়া পরিকল্পনানুযায়ী তাহাদিগকে সেখানে বেদান্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে স্বামীজী শেষবারের মতো মার্কিন দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং এই কার্যের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিল না; তাই আমাদিগকে আর এই প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

এদিকে স্বামীজী ৩রা জুলাই নিউ ইয়র্ক পরিত্যাগান্তে ডেট্রয়েটে আগমনপূর্বক শ্রীমতী ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেলের (পরবর্তীকালের ভগিনী ক্রিস্টিনের) গৃহে উঠিলেন ও পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের সহিত তিন দিন আনন্দে কাটাইলেন। তাঁহার ডেট্রয়েটে অবস্থানকাল আমরা তিন দিন বলিয়াই স্থির করিলাম; কারণ যদিও বেদান্ত-সমিতির রিপোর্টে ৩রা তারিখ নিউ ইয়র্ক হইতে যাত্রা ও ১০ই তারিখ ডেট্রয়েট হইতে ফিরিয়া আসার বিবরণ দেখিয়া ইংরেজী জীবনীতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, স্বামীজী ডেট্রয়েটে সাতদিন ছিলেন, তথাপি মনে রাখিতে হইবে, ট্রেনে ডেট্রয়েট যাতায়াতে বেশকিছু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল; আর স্বামীজীর ১৮ই জুলাই-এর পত্রে আছে, "ডেট্রয়েটে মাত্র তিনদিন ছিলাম।" ১০ই জুলাই নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া আসার কথা অবশ্য স্বামীজীর ১১ই জুলাই-এর পত্রে সমর্থিত হয়: "ডেট্রয়েটে গিয়েছিলাম, গতকাল ফিরে এসেছি।" যাইবার বা ফিরিবার পথে তিনি অন্য কোথাও নামিয়াছিলেন কিনা জানা নাই।

স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে নিউ ইয়র্কের অবশিষ্ট দিনগুলির খবর এইরূপ পাওয়া যায়: "প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে কালী (অভেদানন্দ) পাহাড়ে চলে গেছে। সেপ্টেম্বরের আগে ফিরতে পারবে না। আমি একেবারে একা···, আমি তাই ভালবাসি।" (১৮ই জুলাই)। "এ চিঠি তোমার কাছে পৌঁছবার আগেই—যে-রকম স্টীমার মিলবে সেই-মতো আমি হয়তো ইওরোপে—লণ্ডনে বা প্যারিসে—পৌঁছে যাব। এখানে আমার কাজটা সহজ ক'রে নিয়েছি। মিঃ হুইটমার্শের

পরামর্শে মিস ওয়াল্ডোর হাতে কাজগুলি দেওয়া হয়েছে।” (২০শে জুলাই)। “আমি কাল প্যারিস যাত্রা করছি, যোগাযোগ সব ঠিক হয়ে এসেছে। কালী এখানে নেই। আমি চলে যাচ্ছি ব'লে সে একটু ভাবিত হয়ে পড়েছে—কিন্তু এছাড়া উপায় কি?” (২৫শে জুলাই)।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইংরেজী জীবনীতে মুদ্রিত বেদান্ত-সমিতির রিপোর্টে স্বামীজীর ২০শে জুলাই প্যারিস যাত্রার কথা আছে; বাঙ্গলা জীবনীতে ২২শে জুলাই-এর উল্লেখ আছে (৮৪২)। অথচ স্বামীজীর ২৪শে জুলাই-এর পত্রে আছে, তিনি “আগামী বৃহস্পতিবারে (অর্থাৎ ২৬শে জুলাই) ফরাসী জাহাজ ‘লা শ্যাম্পেন’-এ যাত্রা করিবেন। ২৫শে জুলাই-এর পত্রেও এই কথাই সমর্থিত। (‘বাণী ও রচনা,’ ৮।১৪৭)। অতএব বেদান্ত-সমিতির বিবরণে ২৬-এর স্থলে ২০ হয়তো মুদ্রাকর-প্রমাদ ভিন্ন অধিক কিছুই নহে। তিনি প্যারিসে উপস্থিত হন ১লা আগস্ট।

আমেরিকার প্রসঙ্গ শেষ করিবার পুর্বে আমরা ইংরেজী জীবনী (৬৭৫-৮২) হইতে জনৈক ভক্তের স্মৃতিলিপির অনুবাদ দিতে চাই। প্রত্যক্ষদর্শী শিষ্য (শিষ্যা?) প্রধানতঃ ক্যালিফর্নিয়ার ঘটনা ও পরিবেশ অবলম্বনে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব অঙ্কিত করিলেও ছবিগুলি স্বামীজীর আমেরিকাজীবনের সহিত পরিচয়-লাভের পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত বলিয়া আমরা এখানেই উপস্থিত করিলাম। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, স্মৃতিলিপির দুই-একটি ঘটনা ক্যালিফর্নিয়ার প্রসঙ্গে পুর্বেই বর্ণিত হইয়া থাকিলেও লেখকের (লেখিকার?) চিন্তাধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা সবটাই তুলিয়া ধরিলাম।

“স্বামী বিবেকানন্দ যখন ক্যালিফর্নিয়ার শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তখন হইতে দশ বৎসরেরও অধিক কাটিয়া গিয়াছে; অথচ মনে হয়, এ যেন গতকালের কথা! অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও শ্রোতারা প্রথম হইতেই তাঁহার আপনার হইয়া যাইত ও শেষ পর্যন্ত তাঁহারই থাকিত। তাহারা নির্বিবাদে তাঁহার চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিত। শ্রোতাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকিতেন যাঁহারা বাধা দিতে চাহিতেন না, যাঁহারা ইহাতে আনন্দিত হইতেন ও এরূপ এক অভিনবত্ব বোধ করিতেন যে, একজন জ্যোতির্ময় পুরুষের সান্নিধ্যে আগমনের ফলে তাঁহারা তাঁহাদের মনের সুগুপ্ত স্থানসমূহে আলোক-পাতের সুযোগ পাইতেছেন। জন কয়েক থাকিতেন যাঁহারা পারিলে বাধা

দিতেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিরোধশক্তি আচার্যপ্রবরের অকাট্য যুক্তি, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও শিশুসুলভ সরলতার সম্মুখে হতবল হইয়া পড়িত। সত্য কথা বলিতে কি, কেহ কেহ আপত্তি জানাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেন, কিন্তু অমনি স্বীকৃতির মৃদুহাস্যসহ অথবা বিভ্রান্তিজনিত দুর্বলতাবশতঃ বসিয়া পড়িতেন।

"স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব একটা তীব্র প্রত্যক্ষানুভূতি লইয়া মনের উপর আপনার ছাপ মারিয়া দিত। জ্বলন্ত নয়নদ্বয় ও মুখভঙ্গীর ও অঙ্গবিন্যাসের লালিত্য, ঝঙ্কারময় শ্রুতিমধুর অপূর্ব সংস্কৃত-শ্লোকাবৃত্তি, যাহা জনচিত্তকে অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাব বিষয়ে সচেতন করিয়া দিত, এবং তাহার পরে যে সস্মিত আত্মবিশ্বাস-পূর্ণ অনুবাদ প্রদত্ত হইত—এই সমস্ত মিলিয়া হিন্দুসন্ন্যাসীর সুমনোহর বেশের পরিপ্রেক্ষিতে যে ছবি ফুটিয়া উঠিত, সেই সমস্তের কথা কি কেহ ভুলিতে পারে?

"বক্তা হিসাবে তিনি ছিলেন অনুপম; অন্যান্য বক্তারা নোটের সাহায্যগ্রহণ করেন, তিনি তাহা কখনও করিতেন না; এবং যদিও তিনি অনুরোধক্রমে অনেক বক্তৃতাই একাধিকবার করিতেন, তথাপি ঐগুলি কখনও পুনরাবৃত্তিমাত্র হইত না। তিনি বক্তৃতাকালে যেন নিজেরই খানিকটা সত্তা বিলাইয়া দিতেন, যেন কোন অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিস্তর হইতেই কথা বলিতেছেন। বেদান্ত-দর্শনের অতিগম্ভীর তত্ত্বগুলিও যখন শুষ্ক মতবাদের আওতা হইতে মুক্তিলাভ করিত, তখন তাঁহার ব্যক্তিত্ব হইতে নিঃসৃত কি একটা সজীব পদার্থের শক্তিতেই যেন উহা সংঘটিত হইত। তাঁহার উক্তিগুলি ছিল সক্রিয় অথচ গঠনমূলক, যাহার ফলে চিন্তা উদ্বোধিত হইয়া সমন্বয়সাধনের পথে পরিচালিত হইত। ফলতঃ তিনি শুধু বক্তাই ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন উচ্চতম শ্রেণীর আচার্য।

"প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে তিনি প্রশ্ন করিতে উৎসাহ দিতেন এবং জিজ্ঞাসা-কারীকে বুঝাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি হইত না। একবার জনকয়েক ব্যক্তি তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে থাকিলে একজনের মনে হইল, ইঁহারা নিজের প্রশ্ন লইয়া স্বামীজীর পশ্চাতে নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়া আছেন, এবং বাক্যেও তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন। অথচ স্বামীজীর অমায়িক উত্তর আসিল, 'আপনাদের যত ইচ্ছা প্রশ্ন করতে থাকুন—যত বেশী পারেন, ততই ভাল। আমি তো এরই জন্যে এখানে এসেছি, আর আপনারা যতক্ষণ না বুঝছেন, ততক্ষণ আপনাদের অব্যাহতি নেই।' ইহাতে উত্থিত প্রশংসাধ্বনি এত দীর্ঘকালব্যাপী হইয়াছিল যে, পুনর্বার কথা বলিতে আরম্ভ করার পূর্বে ঐ ধ্বনি

থামিবার জন্য তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিতে হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাঁহার উত্তরগুলি লোকেদের মনে বিশ্বাস জাগাইয়া দিত। পুনর্জন্মবাদ-বিষয়ক এক বক্তৃতার পরে যখন একজন প্রশ্ন করিলেন, 'স্বামীজী, আপনার নিজের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে কি ?"—তখন তিনি ঝটিতি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'হাঁ, পরিষ্কার, এমন কি ছেলেবেলা থেকে।'

"পালটা জবাবে তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত এবং আবশ্যকক্ষেত্রে ক্ষুরধার, অথচ তিনি বিরোধস্থলেও মেজাজ খারাপ করিতেন না, বরং আমোদই পাইতেন। তাঁহার কাজই ছিল শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া এবং সুকঠিন বিষয়েও তিনি এরূপ সাফল্যলাভ করিতেন যাহা অপর কোন বক্তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁহার বাহাদুরি এইখানেই যে, তিনি সূক্ষ্মবিষয়গুলিকেও জনপ্রিয় করিতে ও সাধারণবুদ্ধি মানুষেরও বুঝিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারিতেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল সকলেরই কাছে সহজ-বোধ্য। তিনি কহিয়াছিলেন, 'ভারতের লোকেরা আমাকে বলে যে, জনসাধারণের নিকট অদ্বৈতবাদ প্রচার করা আমার পক্ষে অন্যায় ; কিন্তু আমি বলি, আমি একটি শিশুকে পর্যন্ত বুঝিয়ে দিতে পারি। উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিখাতে হ'লে যত কম বয়সে আরম্ভ করা যায় ততই মঙ্গল।'

"একবার এক বক্তৃতাশেষে তিনি স্বীয় পরবর্তী বক্তৃতার ঘোষণাচ্ছলে বলিলেন : 'আগামী রাত্রে আমি 'মন—উহার শক্তি ও সম্ভাবনা' বিষয়ে বক্তৃতা দেব। আপনারা শুনতে আসবেন, আপনাদের কাছে বলবার মতো আমার অনেক কিছু আছে ; আমি একটু-আধটু বোমা ফাটাবো !'—এই বলিয়া তিনি সস্মিতবদনে একবার শ্রোতাদের দেখিয়া লইলেন এবং তারপর হাত নাড়িয়া বলিলেন, 'ঠিক আসবেন কিন্তু, এতে আপনাদের ভাল হবে !' পরের রাত্রে দাঁড়াইবারও স্থান ছিল না। তিনি প্রতিজ্ঞারক্ষা করিলেন—বোমা তিনি ঠিকই ফাটাইলেন, এবং অপর সকলের তুলনায় তিনিই সর্বাধিক জানিতেন, কি করিয়া অব্যর্থভাবে বোমা ছুঁড়িতে হয় ! এই বক্তৃতাকালে তিনি মনের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মচর্য কি প্রকার ফলপ্রসূ হইয়া থাকে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন। পবিত্রতা অর্জনের সাধন হিসাবে তিনি এই মতবাদটি বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রত্যেক নারীতে মাতৃবুদ্ধি করিতে হইবে। বিষয়টি উপস্থাপিত করিয়া তিনি একটু থামিলেন এবং শ্রোতাদের অস্ফুট প্রশ্নাবলীর উত্তরদানকল্পেই যেন

বলিয়া চলিলেন, 'হাঁ, ঠিক কথা, এটা একটা মতবাদমাত্র। আমি এখানে দাঁড়িয়েছি আপনাদিগকে এই মনোরম মতবাদটি জানাতে; কিন্তু আমি যখন আমার নিজের মায়ের কথা ভাবি, তখন ঠিক জানি তিনি অপর সব নারী থেকে ভিন্ন। একটা ভেদ আছে বই কি! এটা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এই প্রভেদটা আমাদের চোখে ঠেকে শুধু এই জন্য যে, আমরা নিজেদের দেহ বলে ভাবি। এই মতবাদের সত্যতা ধ্যানসহায়ে অনুভবযোগ্য। এই সকল সত্য প্রথমে শুনতে হয়, তারপর ঐ বিষয়ে ধ্যান করতে হয়।'

"তাঁহার মতে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়েরই পক্ষে পবিত্রতা আবশ্যক, এবং এই বিষয়ে তিনি খুব জোর দিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'সেদিন এক হিন্দু যুবক আমাকে দেখতে এসেছিল; সে এ দেশে দু বৎসর যাবৎ আছে এবং কিছুদিন ধরে অসুখে ভুগছে। কথাপ্রসঙ্গে সে আমাকে বলল যে, ব্রহ্মচর্য-বিষয়ক মতটি সম্পূর্ণ ভুল, কেননা এদেশের চিকিৎসকরা তাকে ও-মত অগ্রাহ্য করতে উপদেশ দিয়েছেন। আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম সে যে ভারতের লোক সেই ভারতেই যেন ফিরে যায় এবং তার যে পূর্বপুরুষরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরে ব্রহ্মচর্য পালন করে আসছেন, তাঁদেরই কথা যেন শোনে।' তারপর অসীম বিরক্তির রেখাঙ্কিত বদনমণ্ডলখানি ফিরাইয়া তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন, 'এদেশের ডাক্তারদের বলছি, কে আপনাদের বলেছে যে ব্রহ্মচর্য-পালন প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ? আপনারা কি যে বলছেন, তা নিজেরাই জানেন না। আপনারা পবিত্রতা-শব্দটির অর্থ জানেন না। আপনাদের বলবার মতো সেরা কথা যদি এইটুকুই হয়, তবে আমি বলি, আপনারা তো পশু, পশু, আর আপনাদের নৈতিকতা একটা বেরালের নৈতিকতার চেয়ে বেশী নয়।' কথাটি বলিয়া তিনি শ্রোতাদের প্রতি এমন এক বিজয়ী বীরের ন্যায় দৃষ্টিপাত করিলেন যেন সে দৃষ্টিতে তিনি সকলকেই একটা চ্যালেঞ্জ জানাইতেছেন। কাহারও বাক্যস্ফূর্তি হইল না, যদিও সেখানে অনেক চিকিৎসকই ছিলেন।

"তাঁহার সকল বক্তৃতায়ই বোমা ফাটিত; শ্রোতৃবৃন্দকে সবলে তাহাদের চিরাভ্যস্ত খাত হইতে ছুঁড়িয়া ফেলা হইত, তথাকথিত 'নবচিন্তা-ধারার' শিক্ষা-নবীশদিগের নিদারুণ অথচ শিক্ষাপ্রদ তীব্র সমালোচনা করা হইত। তিনি সহাস্যবদনে খৃষ্টানদের সাম্প্রদায়িক মতের স্পষ্টতঃ বিরোধী বৈদান্তিক অত্যাশ্চর্য মতগুলি বলিয়া যাইতেন—তারপর এক ক্ষণের জন্য নীরব থাকিতেন—আর

দন্তদ্বারা নিম্নাধর চাপিয়া ধরিয়া যেন রুদ্ধশ্বাসে উহার ফল নিরীক্ষণ করিতেন। কত কতবারই না এরূপ ঘটিত! আর তাহার ফলও হইত কত মনোরম! আপনারা পারেন তো একবার কল্পনা করিয়া দেখুন দেখি যে, তিনি যখন নিম্নোক্তরূপে স্বীয় জ্বালাময়ী বিধিগুলি উচ্চারণ করিয়া যাইতেন, তখন প্রচলিত খৃষ্টধর্মের উপদেশাবলীর এতদধিক বিরুদ্ধাচরণ সম্ভবপর ছিল কিনা: 'অনুতাপ করবেন না, অনুতাপ করবেন না।...কিছু না করে যদি থাকতে না পারেন তো থুথু ফেলুন, কিন্তু তবু এগিয়ে চলুন। অনুশোচনা করে করে নিজেকে অবনত করে ফেলবেন না। আপনাদের প্রকৃত আত্মাকে পবিত্র নিত্য মুক্ত স্বরূপকে জেনে পাপের বোঝা বলে কিছু থাকলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিন। যে বলে আপনারা পাপী, সেই তো বস্তুতঃ ভগবদ্বাণীর বিরোধী।...' তিনি আরও বলিতেন, 'সংসার তো একটা ভ্রান্ত-সংস্কারমাত্র! আমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভাবছি ওটা সত্য! মুক্তির উপায় বলতে সেই মোহাচ্ছন্নতা থেকে অব্যাহতি পাবার উপায়কেই বুঝায়।...বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের একটা লীলা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহা শুধু লীলাকৈবল্য। তাঁর ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে কোন অভিপ্রায় থাকতে পারে না। ঈশ্বরের লীলা বুঝতে হলে ঈশ্বরকে জানতে হবে। তাঁর খেলার সাথী হলে তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন।...আর আপনারা যাঁরা দার্শনিক, তাঁদের আমি বলি—জগতের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাটাই অযৌক্তিক, যেহেতু তাতে করে ভগবচ্ছক্তিতে সীমা টেনে দেওয়া হয়, আর আপনারা তা মানতে প্রস্তুত নন।' ইহার পর তিনি অদ্বৈতবাদের প্রধান কথাগুলির এক অতি চমৎকার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

"এই বিষয়ক ভাষণগুলির পরে সাধারণতঃ যেসব প্রশ্ন উঠিত তন্মধ্যে এই একটি প্রশ্ন প্রায়ই থাকিত: 'কিন্তু স্বামীজী, ভগবানের সঙ্গে নিজের একত্ববোধের পরে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিতার (বা ব্যক্তি-সত্তার—ইণ্ডিভিজুয়্যালিটির) কি হবে?' তিনি এই প্রশ্নে হাসিয়া ফেলিতেন, আর কৌতুকভরে উহা লইয়া একটু ব্যঙ্গ করিতেন। তিনি শব্দটিকে হাস্যপূর্ণ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে টানিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে বলিতেন, 'আপনারা এদেশের লোকেরা আপনাদের স্ব-ত-ন্ত্র ব্য-ক্তি-তা (ইন্-ডি-ভি-জু-য়্যা-লি-টি) হারাতে এতই ভয়বিহ্বল! কেন বলুন তো? আপনারা তো এ যাবৎ অখণ্ড ব্যক্তিতার অধিকারীই হননি; যখন ভগবানকে জানবেন তখনই মাত্র তা পাবেন—যখন আপনাদের পূর্ণস্বরূপের

অনুভূতি হবে, তখনই মাত্র বাস্তবিক ব্যক্তি-সত্তা লাভ হবে, তার আগে নয়। ভগবানের অনুভূতি হলে, রাখা উচিত এমন কোন কিছু যে আপনাদিগকে হারাতে হবে, তা তো নয়!…এখানে আর একটা জিনিস আমি সদা সর্বদা শুনে আসছি ; আর তা হচ্ছে এই যে, আমাদিগকে প্রকৃতির সঙ্গে নির্বিবাদে চলতে হবে।' তিনি বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, 'প্রকৃতির সঙ্গে নির্-বি-বা-দ (হার-ম-নি)! সেকি? আপনারা কি জানেন না যে, জগতে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, প্রকৃতিকে পরাস্ত করে? এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। গাছপালা প্রকৃতির সঙ্গে নির্বিবাদে থাকে—সে স্তরে আছে সম্পূর্ণ মিল—কোন বাধা নেই, আবার কোন উন্নতিও নেই। উন্নতি যদি আমাদের করতে হয় তো প্রতিক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ করতে হবে। একটা অদ্ভুত রকমের কিছু ঘটে ; অমনি প্রকৃতি বলে, "কাঁদ!" আমরাও তখন কাঁদি—'।

"শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজন বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু আমরা যাদের ভালবাসি, তাদের জন্য কাঁদব না, এ যে বড় শক্ত কথা, আমার তো মনে হয় শোক না করাটা আমাদের পক্ষে দারুণ নির্মমতারই পরিচয় দেওয়া হবে!' তিনি উত্তর দিলেন, 'মহাশয়া, আপনি ঠিক বলেছেন, এ যে কঠিন, এটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাতে হল কি? সব বড় কাজই তো কষ্টসাধ্য। পাবার মতো কোন কিছুই তো সহজে আসে না। কিন্তু কোন কিছু পাওয়া কঠিন বলে যেন আদর্শটিকে নামিয়ে ফেলবেন না। মুক্তির পতাকা উচ্চে তুলে ধরুন। মহাশয়া, আপনি কাঁদতে চান বলেই যে কাঁদেন তা তো নয় ; বরং আপনি কাঁদেন এজন্য যে, প্রকৃতি আপনাকে কাঁদতে বাধ্য করে। প্রকৃতি যখন বলবে, "কাঁদ," তখন আপনি বলবেন, "না, আমি কাঁদব না।" শক্তি, শক্তি, শক্তি!—দিন-রাত নিজেকে এই কথাই শোনাবেন। আপনি শক্তিময়ী, পবিত্র, মুক্ত! আপনাতে নেই কোন দুর্বলতা, কোন পাপ, কোন দুঃখ!'

"এই জাতীয় বার্তা তাঁহার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সহিত মিলিয়া তাঁহাকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যদের সমশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল। এইসকল বক্তৃতার কালে মনে হইত যেন আমরা এমন এক মহাপুরুষের সান্নিধ্যের ফলে ঊর্ধ্ব অধ্যাত্ম-লোকে উপস্থিত হইয়াছি, যাঁহার নিকট বিশ্বপ্রপঞ্চ একটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার মাত্র এবং যাঁহার নিকট প্রপঞ্চাতীত অদ্বিতীয় চৈতন্যই একমাত্র সত্যবস্তু!

"স্বামীজী এমন একটা অদম্য হাস্যরসের অধিকারী ছিলেন, যাহার ফলে তাঁহার ক্লাস ও বক্তৃতাগুলি আনন্দময় হইয়া উঠিত এবং অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি-সৃজনকারী উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া দূরীভূত হইত। একবার তাঁহার বক্তৃতাশেষে তাঁহাকে যখন অবিশ্বাস্য হইলেও একজন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'স্বামীজী, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?' তখন তিনি যেমনি উত্তর এড়াইয়া গিয়া প্রসন্নোজ্জ্বল সহাস্যমুখে বলিলেন, 'বলেন কি? আমাকে—আমার মতো একজন মোটা লোককে দেখে কি তাই মনে হয় নাকি?' অমনি তাহার ফলে ভগবদনুভূতির মহিমা সম্বন্ধে শ্রোতাদের মধ্যে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত গভীর আনন্দোচ্ছ্বাস উত্থিত হইল, তাহা দেখিলেই আমাদের পূর্বের মন্তব্যটি বুঝিতে পারা যাইত।

"আর একবার তিনি অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময় প্রথম লাইন-এর বেঞ্চিতে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ ব্যক্তি স্থির সঙ্কল্প লইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্খলিতপদে মধ্যবর্তী পথ ধরিয়া হাতের লাঠিটি প্রতিপদ-বিক্ষেপে সজোরে মেঝেতে ঠুকিতে ঠুকিতে হল-এর বাহিরে চলিয়া গেলেন; তাঁহার চোখের ভাব ঠিক মুখেরই ভাষার মতো স্পষ্ট বলিয়া দিতেছিল, 'এ জায়গা থেকে আমাকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে হবে।' পরিস্থিতিটিতে স্বামীজীর বেশ আমোদ হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়, কারণ তিনি বক্তৃতামধ্যে থামিয়া গিয়া যখন ঐ ব্যক্তিটিকে দেখিতেছিলেন, তখন তাঁহার আনন হাস্যোৎফুল্ল দেখাইতেছিল। দর্শকদের মনোযোগ একবার সহাস্য আমোদপ্রিয় স্বামীজীর দিকে ও একবার বিরক্তিতে ভরা যে বৃদ্ধটি তাঁহাকে শেষবারের মতো ছাড়িয়া যাইতেছেন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল।

"স্বামীজীর চরিত্রের এই খেয়ালী কৌতুকভরা দিকটা যে কোন মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। কতিপয় থিয়োসফিস্ট ও নবভাবুক-শিক্ষার্থী প্রধানতঃ অলৌকিকতারই অনুসন্ধানে ফিরিতেন। ইঁহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, আপনি কি কখনও কোন এলিমেণ্ট্যালকে (সূক্ষ্ম ভৌতিক জীববিশেষকে) দেখেছেন?' ঝটিতি উত্তর আসিল, 'হাঁ, নিশ্চয়; ও তো ভারতে আমরা রোজ প্রাতরাশকালে খাই।' তিনি নিজের বিষয়েও ঠাট্টা করিতে ছাড়িতেন না। এক সময়ে কতকগুলি ছবি দেখিতে দেখিতে স্বামীজী স্থূলকায় কয়েকজন সন্ন্যাসীর চিত্রের নিকটে আসিয়া বলিলেন,

'ধার্মিক লোকেরা মোটাই হয়, এই দেখ না আমি কেমন মোটা!' আবার সাধুদের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণের শক্তি বিষয়ে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি ছেলেবেলায় যখন রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়াতাম, তখন এক সাধু ঐ পথে যেতে যেতে আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, "বাবা, তুমি একদিন খুব বড়লোক হবে।" আজ দেখুন তো আমি কি হয়ে গেছি!' এই একটু গর্বের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার মুখ কৌতুকে বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সরল কুতূহল-প্রিয় স্বভাব এমনি ছিল যে, শ্রোতারা হাসিঠাট্টার কালে তাঁহার সহিত সমপ্রাণ হইয়া যাইতেন। আর একবার তিনি বলিয়াছিলেন, 'খৃষ্টানদের নরকের ধারণা আমাকে মোটেই সন্ত্রস্ত করতে পারে না। আমি দান্তের 'ইনফার্নো' তিনবার পড়েছি, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে আমি ওতে সন্ত্রাসজনক কিছু পাইনি। হিন্দুদের রকমারি নরক আছে। যেমন ধরুন, কোন পেটুক যখন মরে তখন তার চারদিকে অত্যুত্তম খাদ্যসকল রাশি রাশি সাজানো থাকে। তার ভুঁড়িটা হয় হাজার মাইল লম্বা আর তার মুখ সূচ্যগ্রপরিমিত। একবার ভেবে দেখুন তো!' এই বক্তৃতাকালে বায়ুচলাচলের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় তাঁহার খুব গরম বোধ হইতেছিল। বক্তৃতার পর হলের বাহিরে আসিয়া তিনি অতি শীতল উত্তর বায়ুর সম্মুখীন হইলেন। নিজের কোটটি গায়ে আঁটিয়া ধরিয়া তিনি সজোরে বলিলেন, 'বাবা, এ যদি নরক না হয় তো নরক কাকে বলে জানি না।'

"গৃহস্থজীবনের সহিত সন্ন্যাসজীবনের পার্থক্য বিশদভাবে বুঝাইতে গিয়া তিনি বলিলেন, 'একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বিয়ে করেছি কিনা।' এই বলিয়া তিনি থামিলেন ও স্মিতবদনে শ্রোতৃবৃন্দকে দেখিয়া লইলেন, অমনি বহুলোকের একটা চাপা হাসির শব্দ উঠিল। তাহার পর তাঁহার মুখের মৃদুহাস্য একটা ভীতির রূপ ধরিল, আর তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'বলে কি? আমি কোন কিছুরই জন্যে বে করতে রাজী নই; এতো শয়তানের চালবাজি!' নিজের কথাগুলিতে জোর দিবারই জন্য যেন তিনি এখানে থামিলেন; তারপর যে প্রশংসাগুঞ্জন উঠিতেছিল উহা থামাইবার জন্য হাত তুলিয়া তিনি মুখে একটা গুরু গম্ভীরভাব ফুটাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'তবু সন্ন্যাসপ্রথার বিরুদ্ধে কিন্তু আমার একটি মাত্র আপত্তি আছে, আর সেটা এই যে—(বলিয়া তিনি আবার থামিলেন)—ওতে সমাজ তার

সর্বোত্তম লোকগুলি থেকে বঞ্চিত হয়।' শ্রোতারা ইহাতে প্রশংসায় ফাটিয়া পড়িলেও তিনি থামাইবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি তাঁহার রসিকতা শেষ করিয়াছেন—এখন তাঁহার উপভোগের সময়! আর একবার গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষণের মধ্যে অকস্মাৎ তিনি হাস্যরসের অবতারণা করিলেন: 'মানুষের যাই একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হল, অমনি গেল সে মরে! আরম্ভটা হয় তার একটা মস্ত ভুঁড়ি নিয়ে, যা তার মাথার লাইন ছাড়িয়েও সামনে এগিয়ে যায়। তার যখন বুদ্ধিশুদ্ধি হয়, তখন তার ভুঁড়িটা চলে যায়, আর মাথাটা বেড়ে ওঠে। তারপর সে মরে যায়।'

"জগতের সর্বাধিক উন্নত ধর্মচিন্তাকে স্বায়ত্ত করা এবং উহাকে ব্যাখ্যা করার অতুলনীয় শক্তির সহিত তাঁহার যৌবনসুলভ দেহগঠনের এমন একটা অদ্ভুত অসামঞ্জস্য ছিল যে, তাঁহার বয়স সম্বন্ধে বহু বাদ-বিচারের অবকাশ ঘটিত। বিষয়টা নিশ্চয়ই তাঁহার জানা ছিল, কারণ তিনি একবার এক সুযোগে শ্রোতাদের লইয়া বেশ একটু মজা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয়েরই সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষাপূর্বক তিনি নিজের বয়সের কথা তুলিলেন ও বলিলেন, 'আমার বয়স এই মাত্র—' (এই বলিয়া তিনি একটু থামিলেন—ততক্ষণ শ্রোতারা তথ্য জানার আশায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া আছেন)—'কয়েক বৎসর—' দুষ্টামির সহিত তিনি শুধু এইটুকুই বলিলেন। শ্রোতারা সকলে হতাশার নিঃশ্বাস ফেলিলেন। স্বামীজী প্রশংসা-ধ্বনির আশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন—তিনি জানিতেন যে প্রশংসার রোল উঠিতে বাধ্য। শ্রোতারা তাঁহার হাসিঠাট্টা যতটা উপভোগ করিতেন, তিনি নিজেও ততটা করিতেন। একবার একটা বিশেষ মজার কথা বলিয়াই তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। আর অমনি গোটা হলটি জুড়িয়া হাসির রোল উঠিয়াছিল। ঠাট্টার বিষয়টা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি। বড় আপসোসের কথা! 'ভারতের আদর্শাবলী' বিষয়ক বক্তৃতাপর্যায়ে পরিষ্কার বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, গল্পবলার ক্ষমতা তাঁহার আশ্চর্য; সম্ভবতঃ এই ক্ষেত্রে তিনি চরমোৎকর্ষের অধিকারী ছিলেন। স্বীয় অননুকরণীয় ভাষায় পৌরাণিক গল্পগুলি বলার কালে তিনি সেগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতেন, বক্তব্য বিষয়টি তাঁহার অনুপম ব্যাখ্যাপ্রণালীর পূর্ণ সুযোগ আনিয়া দিত এবং চেহারার যেসব বিচিত্র পরিবর্তন তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটা সর্বাধিক আকর্ষণের বিষয় ছিল, এই গল্প বলার কালে উহাও পূর্ণ অবকাশ পাইত। তিনি বলিতেন, 'এইসব গল্প

বলতে আমার ভাল লাগে ; ওরই মধ্যে আছে ভারতের প্রাণ। আমি ছেলেবেলা থেকেই এগুলি শুনে আসছি। এগুলি বলতে আমার কখন ক্লান্তিবোধ হয় না।'

"স্বামীজী যখন মাঝে মাঝে আত্মগোপনের চেষ্টা না করিয়া আপনাকে শ্রোতাদের সম্মুখে স্বীয় অত্যাশ্চর্য অতীন্দ্রিয় ভাবানুভূতির মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন, তখন তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন ; যেমন তিনি একবার বলিয়াছিলেন, 'আমার কাছে সব মুখই ভালবাসার যোগ্য। ইথিয়োপিয়ার একজন লোকের চেহারার মধ্যেও যেমন হেলেনের সৌন্দর্য দেখা সম্ভব, তেমনি সকলের মধ্যে ভগবদ্দর্শনের জন্যও আমাদের সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। সকলে—এমন কি অতি হতচ্ছাড়াও মায়েরই সন্তান। ভাল-মন্দয় মেশানো এই জগৎ ভগবানের লীলামাত্র !'

"ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারকালে তিনি ছিলেন আদর্শ অতিথিবৎসল ব্যক্তি ; তিনি যে শুধু খোলা-মনে বিশ্রম্ভালাপ ও যুক্তি-বিচার করিতেন ও গল্প বলিতেন, তাহাই নহে, মনে হইত তিনি যেন নিজেও উহাতে আনন্দ পাইতেন। আমার প্রথম সাক্ষাৎকারকালে আমি যে একটা সুখময় মানসিক ধাক্কা খাইয়াছিলাম, তাহা কখনও সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। তাঁহার গায়ে ছিল একটা ধূসর রং-এর ড্রেসিং গাউন এবং তিনি আসন করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। তখন তিনি পাইপ হইতে ধূমপান করিতেছিলেন এবং তাঁহার সুন্দর লম্বা চুলের রাশি এলোমেলো চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমি অগ্রসর হইলে তিনি সাদরে হাত বাড়াইয়া দিলেন ও আমায় বসিতে বলিলেন। সেসব সাক্ষাৎকারের শুধু কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশই এখন স্মৃতিতে রক্ষিত আছে। যেটুকু স্পষ্ট স্মরণ আছে তাহা ঐ সন্ন্যাসি-প্রবরের সংস্পর্শ—তিনি মনের উপর যে ছাপ রাখিয়া দিয়াছিলেন ও যে অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছিলেন, সেসব ঘটনা আজও আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কোন অভিজ্ঞতার নিম্নে স্থান লইতে রাজী নহে।

"মনকে কিরূপে অধ্যাত্ম-সাধনার উপযোগী করিতে হয়, তাহার উপদেশ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'যত কম পড়বেন ততই মঙ্গল। বইগুলি অন্য লোকদের খানিকটা বমন ছাড়া তো আর কিছু নয়। যা এক সময় আপনাকে ফেলেই দিতে হবে, তা দিয়ে মনকে বোঝাই করবেন কেন ? গীতা ও বেদান্ত-বিষয়ক আর সব ভাল ভাল বই পড়ুন। তাতেই হয়ে যাবে।' আবার বলিলেন,

'আজকালকার শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া ভুল। কি করে চিন্তা করতে হয়, এটা জানবার আগেই মনটাকে বিভিন্ন বিষয় দিয়ে ভরে দেওয়া হয়। প্রথমে শেখানো দরকার মনঃসংযম। আমাকে যদি আবার নূতন করে পড়াশুনা করতে হত, এবং এ বিষয়ে আমার স্বাধীনতা থাকত, তো আমি প্রথমে মনটাকে সংযত করতে শিখতাম, এবং তারপর ইচ্ছা হলে আমি নানা বিষয় আহরণ করতাম। লোকেদের কোন কিছু শিখতে দীর্ঘকাল কেটে যায় এই জন্য যে, তারা ইচ্ছামত মনকে একাগ্র করতে পারে না।...মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস মুখস্থ করতে আমাকে তিনবার পড়তে হয়েছিল। আর আমার মা যে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ একবার পড়েই মুখস্থ করে ফেলতেন। মানুষ সর্বদা ভোগে এইজন্য যে, তারা মনকে সংযত করতে পারে না। নেহাত অমার্জিত হ'লেও একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক : কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও হয় না ; সে তাকে ছেড়ে অন্য পুরুষদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সেই স্ত্রীটি একটা বিভীষিকাপ্রায় ! কিন্তু সে পুরুষ-বেচারীর এমনি অবস্থা যে, সে ঐ মেয়েটির কথা না ভেবে থাকতে পারে না, কাজেই তাকে ভুগতে হয়।'

"ধার্মিক পরিব্রাজকদের মধ্যে প্রচলিত ভিক্ষাগ্রহণ প্রথার সহিত বৈরাগ্যের কেন বিরোধ হয় না ইহা বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, 'কথাটা মনের ভাব দেখে বিচার করতে হবে। মনে যদি আকাঙ্ক্ষার ভাব থাকে এবং লাভালাভের ফলে উহাতে প্রতিক্রিয়া জন্মে তবে ওটা খারাপ—ইহা নিঃসন্দেহ। ভিক্ষাদান ও ভিক্ষাগ্রহণের মধ্যে স্বাধীনতা থাকা চাই ; তা না হলে ওটা বৈরাগ্য নয়। আপনি যদি ঐ টেবিলের উপর আমার জন্য একশ ডলার রেখে দেন, এবং আশা করেন যে আমি সেজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হব, তাহলে আপনি তা আবার তুলেও নিয়ে যেতে পারেন—আমি ওসব ছোঁবই না। এজগতে আসার আগে, জন্মাবার আগেই আমার জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। যার ভাগে যা আছে, তা সে পাবে—তার জন্মের আগে থেকেই তার জন্য তা ঠিক হয়ে আছে।'

"যখন প্রশ্ন করা হল, 'যীশুখৃষ্টের দৈব জন্ম সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরূপ ?' —তখন তিনি উত্তর দিলেন, 'ও একটা সুপ্রাচীন বিশ্বাস। ভারতে এমন অনেকেই এই জাতীয় দাবী করে গেছেন। আমি এ বিষয়ে অজ্ঞ। তবে আমার নিজের সম্বন্ধে আমি এতে আনন্দই অনুভব করি যে, আমার জনকজননী সাধারণ

মানুষ ছিলেন।' আমি সাহসভরে বলিলাম, 'কিন্তু এইরূপ মতবাদ কি প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী নয়?' তিনি মেঝেতে যে কার্পেট পাতা রয়েছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজ স্লিপারের গোড়ালীতে পাইপের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, 'ভগবানের কাছে প্রকৃতি কতটুকু? এ তো সব তাঁর লীলা!' তারপর পাইপটাকে পরিষ্কার করার জন্য উহার মুখে ফুঁ দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমরা প্রকৃতির দাস, ঈশ্বর প্রকৃতির প্রভু—তিনি যেমন খুশী করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে একই কালে এক বা দ্বাদশ দেহ এবং যেমন খুশী দেহ ধারণ করতে পারেন। আমরা তাঁর সীমা করব কি করে?'

"রাজযোগ-বিষয়ক অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিবার পর তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সহাস্য বদনে কহিলেন, 'কিন্তু কেবল রাজযোগ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আরো তো উপায় আছে।'

"বাড়ীর সামনের একখানি ঘরে সেদিন রাজযোগের ক্লাসটি যে সময়ে আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, আমাদের সাক্ষাৎকার দীর্ঘায়িত হওয়ায় উহা আরম্ভ করিতে পনর মিনিট বিলম্ব হইয়া গেল। যে মহিলা ঐ সব ব্যবস্থা করিতেন তিনি দ্রুতপদে আমাদের ঘরে আসিয়া কথাবার্তায় বাধা দিয়া বলিলেন, 'একি স্বামীজী, আপনি যে যোগের ক্লাসের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছেন! পনর মিনিট দেরী হয়ে গেছে, আর এদিকে ঘর লোকে ভরে গেছে!' স্বামীজী ঝটিতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'ওঃ, আমায় মাপ করবেন, এখন আমরা সামনের ঘরে যাব!' আমি হলের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া সামনের ঘরে গেলাম, আর তিনি গেলেন সামনের ঘর ও আমরা যে ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছিলাম উহার মধ্যবর্তী শয়নকক্ষের ভিতর দিয়া। আমি আসন গ্রহণ করিবার পূর্বেই তিনি স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, তাঁহার চুল ছিল এলোমেলো; কিন্তু এখন উহা বেশ সুবিন্যস্ত ছিল এবং তাঁহার গায়ে ছিল সন্ন্যাসীর আলখাল্লা। যে ঘরে এলোমেলো-চুলে ও ড্রেসিং গাউন পরিয়া তিনি কথা কহিতেছিলেন সে ঘর হইতে উঠিয়া বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হইয়া মন্থরগতিতে সম্মুখের কক্ষে আসার মধ্যে এক মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। দ্রুততা ও কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা সত্য সত্যই তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল। তবু তিনি নিজে যে চালে চলিবেন ঠিক করিয়াছেন, অনেক সময় তাহার হেরফের করানো সুকঠিন ছিল। ধরুন কোন দিন লেকচারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে,

এমতাবস্থায়ও মাঝে মাঝে তাঁহাকে রাস্তার ট্রাম বা বাস ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি চালানো কঠিন হইত। তাড়াতাড়ি করিবার জন্য অনুনয়ের উত্তরে তিনি টানিয়া টানিয়া বলিতেন, 'আপনারা আমায় তাড়া দিচ্ছেন কেন? আমরা এ গাড়ীটা ধরতে নাই যদি পারি তো পরেরটা ধরব।'

"এইসব যোগের ক্লাসে মানুষ ও আচার্য হিসাবে স্বামীজীর যতটা নিকট-সান্নিধ্যে আসা যাইত, বক্তৃতার হলে তাহা সম্ভব হইত না। এখানে সংস্পর্শ হইত নিকটতর ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রভাবও বিস্তারিত হইত অধিকতর প্রত্যক্ষরূপে। সাধুতা, সরলতা ও জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ তিনি যেন এমন এক অন্তস্তলস্পর্শী শক্তি লইয়া কথা কহিতেন যাহার ফলে শ্রোতার মন রাজযোগের সাধনোৎকর্ষের অভিমুখ না হইয়া ঈশ্বর ও বৈরাগ্যের অভিমুখেই অধিকাধিক ধাবিত হইত।

"একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর তিনি আসন করিয়া কোচের উপর বসিতেন এবং শ্রোতাদের মধ্যে যাঁহারা ধ্যানের জন্য বসিয়া থাকিতেন তাঁহাদিগকে ধ্যানের উপদেশ দিতেন। তিনি রাজযোগ সম্বন্ধে প্রবচন দিতেন এবং সাধারণ প্রাণায়ামাদি সম্বন্ধে কার্যকরী শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বক্তব্য কতকটা এইরূপ ছিল: 'আপনাদের ঠিকভাবে বসতে শিখতে হবে তারপর ঠিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হবে। এতে একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়, পরে ধ্যান হয়।...প্রাণায়ামের সময় মনে করবেন যেন আপনাদের দেহগুলি জ্যোতির্ময়।...মেরুদণ্ডের উপর থেকে নীচের দিকে—সহস্রার থেকে মূলাধার পর্যন্ত দেখে যান। ভাবুন, আপনারা সুষুম্নাবর্ত্মে কুণ্ডলিনীকে দেখছেন আর উহা জাগ্রতা হয়ে সহস্রারাভিমুখে উঠে যাচ্ছে।...ধৈর্য ধরুন। মহা ধৈর্যের আবশ্যক।'

"যাঁহারা সন্দেহ বা ভয় প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য তিনি বলিতেন, 'আমি তো এখন আপনাদের কাছেই আছি, আমার উপর একটু বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা করুন।' সম্মতিলাভের জন্য তিনি যখন এইরূপ বলিতেন, তখন সে সানুনয় শক্তির প্রভাব কেহ এড়াইতে পারিতেন না: 'আমরা ধ্যানশিক্ষা করছি এই জন্য যে, আমরা ঈশ্বরচিন্তা করতে পারব। রাজযোগ ঐ উদ্দেশ্যসাধনের একটা উপায়মাত্র। রাজযোগের রচয়িতা মহাযোগী পতঞ্জলি সর্বদা এই কথাই শিষ্যদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। আপনাদের এখন যৌবন—এই হচ্ছে আপনাদের ঠিক সময়। ভগবানের চিন্তা

করবেন ভেবে বুড়ো বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবেন না, কেননা তখন আপনাদের ভগবচ্চিন্তার সামর্থ্যই থাকবে না। অল্পবয়সেই ভগবচ্চিন্তায় শক্তি বাড়ে।'

"কৌচে আসন করিয়া বসিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে ভূষিত থাকিয়া, স্বীয় ক্রোড়োপরি হস্তদ্বয়ের একখানিকে আর একখানিতে রাখিয়া নিমীলিতপ্রায় দৃষ্টিতে যখন তিনি বসিতেন, তখন তাঁহাকে ব্রোঞ্জের মূর্তি বলিলেও চলিত— এমনই নিশ্চল তিনি হইয়া যাইতেন! কেবল অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে সচেতন থাকিয়া তিনি এমন এক আদর্শ তুলিয়া ধরিতেন যাহাতে শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভক্তির উদ্রেক আপনা হইতেই হইত।"

পাশ্চাত্ত্য-কৃষ্টিকেন্দ্র

স্বামীজী আমেরিকা ছাড়িয়া ফরাসী দেশে চলিলেন। ফ্রান্স বা মহানগরী প্যারিস তাঁহার নিকট নূতন নহে; সেখানে তাঁহার এই দ্বিতীয়বার যাত্রা। প্যারিসের গুণাগুণ দুইই তিনি জানিতেন, তবু স্বভাবতই সর্ববিষয়ে গুণের দিকে ঝুঁকিতেন। অতএব ফরাসী সভ্যতা স্বতই তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিত। ফ্রান্স ও প্যারিস সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "এ ইউরোপ বুঝতে গেলে পাশ্চাত্ত্য ধর্মের আকর ফ্রাঁস থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক-আঁধার, ভাল-মন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এখানে—এই পারি নগরীতে। এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি মুক্তা প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক। এই ফ্রাঁস ইউরোপের কর্মক্ষেত্র। সুন্দর দেশ—চীনের কতক অংশ ছাড়া এমন দেশ আর কোথাও নেই। নাতিশীতোষ্ণ, অতি উর্বরা; অতিবৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্মল আকাশ, মিঠে রৌদ্র, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, চিনার বাঁশ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ—সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্যপ্রিয়। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী, দরিদ্র তাদের ঘর-দোর, ক্ষেত-ময়দান ঘ'ষে মেজে, সাজিয়ে গুজিয়ে ছবিখানি ক'রে রাখছে। এক জাপান ছাড়া এ ভাব আর কোথাও নাই। সেই ইন্দ্রভুবন অট্টালিকাপুঞ্জ, নন্দনকানন উদ্যান, উপবন—মায় চাষার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ—একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা এবং সফলও হয়েছে। এই ফ্রাঁস প্রাচীনকাল হ'তে গোলওয়া, রোমক, ফ্রাঁ প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষভূমি; এই ফ্রাঁ জাতি রোমসাম্রাজ্যের বিনাশের পর ইউরোপে একাধিপত্য লাভ করলে, এদের বাদশা শার্লামাঞন ইউরোপে ক্রিশ্চান ধর্ম তলোয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন, এই ফ্রাঁ জাতি হতেই আশিয়াখণ্ডে ইউরোপের প্রচার, তাই আজও ইউরোপী আমাদের কাছে ফ্রাঁকি, ফেরিঙ্গি, প্লাঁকি, ফিলিঙ্গ ইত্যাদি।" ('বাণী ও রচনা', ৬।১৯১-৯২)। আর তিনি লিখিয়াছিলেন, "কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস;···প্যারিসের পর পাশ্চাত্ত্য জগতে আর নগরী নাই;

সব সেই প্যারিসের নকল—অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে যে শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ ;...ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর ;...ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময় কর্পূরের মতো—কস্তুরীর মতো এক মুহূর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয় ;...ফরাসীর নরম শরীর—মেয়েমানুষের মতো ; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা ; তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।" (ঐ, ১২৬)।

স্বামীজী ২৬শে জুলাই বৃহস্পতিবার ফরাসী জাহাজ 'লা শ্যাম্পেন'-এ চড়িয়া ৩রা আগস্ট প্যারিস-এ উপনীত হইলেন[১] এবং সেদিন হইতে অক্টোবরের ২৩ তারিখ পর্যন্ত ফরাসী দেশেই কাটাইলেন।[২] প্যারিসে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমে লেগেটদের বন্ধু জেরাল্ড নোবেল নামক এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠিলেন। লেগেটরা তখন ৬ প্লাস দে-জেতাং এই ঠিকানায় একটি ভাড়া-বাড়ীতে থাকিতেন। স্বামীজী নোবেলের বাড়ী হইতে সেখানে যাতায়াত করিতেন, মাঝে মাঝে রাত্রিবাসও করিতেন। ৪ঠা আগস্ট রাত্রে তিনি নোবেল, নিবেদিতা ও শ্রীমতী ম্যাকলাউড-এর সহিত আইফেল টাওয়ার-এর উপরে বসিয়া নৈশভোজন করেন। টাওয়ারের চারিদিকে তখন প্রদর্শনী বসিয়াছে এবং সেখানে বসিয়া আহার করা ও সব দেখা তখন এক অতিবাঞ্ছিত ব্যাপার। স্বামীজীর ১৪ই আগস্ট-এর পত্রে যে ঠিকানা আছে (বুলেভার হ্বান্স স্ময়ান, বা সম্ভবতঃ Boulevard Haussmann), নোবেল হয়তো সেখানে থাকিতেন। ২৪শে আগস্ট বিকালে স্বামীজী লেগেটদের বাড়ীতে একটি বক্তৃতা দেন। ৩১শে আগস্ট তিনি জুল বোয়ার বাড়ী দেখিয়া আসেন ও সেখানে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিস কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর লেগেটদের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজকালে তিনি রাজকুমারী ডরিয়া, ডরিয়ার ভ্রাতা ডিউক অব নিউ ক্যাসল এবং লেডি

১। এই অধ্যায়ের তারিখগুলি 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর (১৯৬৭) মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইল।

২। ১৩ই আগস্টের পত্রে আছে, "শীঘ্রই ইংলণ্ড যাত্রা"। কিন্তু অন্য কোথাও ইংলণ্ড যাত্রার উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ, তিনি ইংলণ্ডে যান নাই বলিয়া মনে হয়।

অ্যাঙ্গলসির সহিত পরিচিত হন। অন্যত্র বিখ্যাত ভাস্কর অগাস্ট রডিন-এর সহিতও তাঁহার আলাপ হয়।

১লা সেপ্টেম্বরের একখানি পত্রে যে পণ্ডিতের বাড়ীর বর্ণনা আছে, তিনি হয়তো জুল বোয়া। পত্রে আছে: "কাল যার কাছে থাকব তার বাড়ী দেখে এসেছি। সে গরীব মানুষ—পণ্ডিত; তার ঘরে একঘর বই, একটা ছ-তলার ফ্ল্যাটে থাকে। তায় এদেশে আমেরিকার মতো লিফ্ট নেই—চড়াই-ওতরাই। ওতে কিন্তু আমার কষ্ট হয় না। সে বাড়ীটির চারিধারে একটি সুন্দর পার্ক। সে লোকটি ইংরেজী কইতে পারে না, সেইজন্য আরও যাচ্ছি। কাজে কাজেই ফরাসী কইতে হবে আমায়।" অক্টোবর মাসে লিখিত দুইখানি চিঠির ('বাণী ও রচনা', ৮।১৬১-৬৪) প্রথমখানিতে আছে, "এখানে আমি খুব সুখী ও পরিতৃপ্ত আছি। অনেক বছর পরে ভাল সময় কাটাচ্ছি। মঁ বোয়ার সঙ্গে আমার এখানকার জীবনযাত্রা বেশ তৃপ্ত—রাশি রাশি বই, চারিদিকে শান্তি—আমাকে পীড়িত করে, এমন জিনিস এখানে নেই।" পরবর্তী ১৪ই অক্টোবরের পত্রে আছে: "মঁ জুল বোয়া নামে একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকের সঙ্গে আছি। আমি তাঁর অতিথি। লেখা থেকে জীবিকা অর্জন করতে হয় তাঁকে; তাই তিনি ধনী নন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক উচ্চ উচ্চ চিন্তার ঐক্য আছে এবং আমরা পরস্পরের সাহচর্যে বেশ আনন্দে আছি। বছর কয়েক আগে তিনি আমাকে আবিষ্কার করেন এবং আমার কয়েকটি পুস্তিকা ইতোমধ্যেই ফরাসীতে অনুবাদ করে ফেলেছেন।"

শ্রীমতী ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথা হইতে ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৪৭ পৃঃ) নোবেল-এর সম্বন্ধে জানা যায়: "আমাদের বাড়ীতে স্বামীজী কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া শ্রীযুক্ত জেরাল্ড নোবেল-এর বাড়ীতে গেলেন। ইনি অবিবাহিত ছিলেন। পরে তিনি শ্রীযুক্ত নোবেল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'শ্রীযুক্ত নোবেল-এর মতো একজন বন্ধু পাওয়ায় জীবন সার্থক হয়ে গেল।' সত্যই তিনি আমাদের এই বন্ধুটিকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। এই ছয় মাস আমাদের গৃহে বহু অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হইত; স্বামীজী প্রায় প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে খাইতে আসিতেন।" শেষের বাক্যটির এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে, শুধু নোবেল-এর বাড়ীতে থাকাকালে নহে, বোয়ার বাড়ীতে অবস্থানকালেও স্বামীজী লেগেটদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন।

স্বামীজীর প্যারিসে আসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মেতিহাস-সম্মেলনে যোগ দেওয়া। স্বামীজীর এক পত্রে আছে ('বাণী ও রচনা', ৮।১৫০): "ধর্মেতিহাস-সম্মেলন হয়ে গেছে। সে কিছুই নয়, জন কুড়ি পণ্ডিতে পড়ে শালগ্রামের উৎপত্তি, জিহোবার উৎপত্তি ইত্যাদি বকবাদ করেছে। আমিও খানিকটা বকবাদ তায় করেছি।" পত্রখানি স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত—কতকটা ঘরোয়াভাবে। তাই ঐ সম্মেলনের বিবরণ তাচ্ছিল্যপূর্ণ দুই কথায় শেষ করিয়াছেন। স্বামীজীর আমেরিকার কার্যের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়বান স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে ঐ ক্ষুদ্র পরিবেশমধ্যে না দেখিয়া বৃহত্তর সভাস্থলাদিতে দেখিবার আশা রাখিবেন, ইহাই ছিল স্বাভাবিক। সে দৃষ্টিতে ঐ কথাগুলির একটা তাৎপর্য থাকিলেও ঐ ধর্মেতিহাস-সম্মেলনকে ঐরূপ দুই কথায় উড়াইয়া দেওয়া চলে না—ইওরোপীয় গবেষণা ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলনভূমির নব-রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঐ সভার ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বামীজীও তাহা জানিতেন, তাই ঐ বিষয়ে একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছিলেন ও একটি প্রবন্ধও ('পারি-প্রদর্শনী', ঐ, ৪৭-৫২) লিখিয়াছিলেন। তদানীন্তনকালে পাশ্চাত্ত্য বুধমণ্ডলীর মধ্যে ভারতেতিহাস-গবেষণা এমন এক স্তরে উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে ভারতীয় কৃষ্টিকে হয় অপর সভ্যতার নিকট সর্বতোভাবে ঋণী অথবা তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনোভাবসম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইত এবং স্বকপোলকল্পিত সর্ব-প্রকার উদ্ভট মতবাদই বিজ্ঞানসম্মত ও প্রমাণসহ সিদ্ধান্ত বলিয়া সম্মানিত হইত। এই বিদ্বেষপরায়ণতার প্রতিকারকল্পেই স্বামীজী একবার নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতেতিহাসের লুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিতে হইলে প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ যেসব মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, ঠিক উহার বিপরীত প্রান্ত হইতে গবেষণা আরম্ভ করা আবশ্যক। ফলতঃ অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ধর্মেতিহাস-সম্মেলনটি সীমাবদ্ধ থাকিলেও স্বামীজী সেদিন প্রচলিত মনোভাবের মস্তকে যে মুষলাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া প্রতীচ্য মনীষাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছিল এবং ক্রমে এইসব অসংবদ্ধ বাতুলপ্রায় মতবাদ অপসারিত করিয়া সত্যের স্বরূপ খুলিয়া দিয়াছিল।

প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্যারিস "মহাদর্শনীতে 'কংগ্রে দ' লিস্তোয়ার দে রিলিজিওঁ' অর্থাৎ ধর্মেতিহাস-নামক সভার অধিবেশন হয়।

উক্ত সভায় অধ্যাত্মবিষয়ক ও মতামত সম্বন্ধী কোনও চর্চার স্থান ছিল না, কেবলমাত্র বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গসকলের তথ্যানুসন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল।…ধর্মসভা না হইবার কারণ এই যে, চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন; ভরসা—প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকারবিস্তার; তদ্বৎ সমগ্র খৃষ্টান জগৎ—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্বমহিমা-কীর্তনের বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল অন্যরূপ হওয়ায় খৃষ্টান সম্প্রদায় সর্বধর্মসমন্বয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছেন; ক্যাথলিকরা এখন ইহার বিশেষ বিরোধী। ফ্রান্স ক্যাথলিক-প্রধান; অতএব যদিও কর্তৃপক্ষদের যথেষ্ট বাসনা ছিল, তথাপি সমগ্র ক্যাথলিক জগতের বিপক্ষতায় ধর্মসভা করা হইল না।" কিন্তু ধর্মসভাবলম্বনে স্বপ্রাধান্য স্থাপন অসম্ভব হইলেও অন্য উপায়ে তো তাহা হইতে পারিত। সে চেষ্টাই ধর্মেতিহাস-সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; কারণ পণ্ডিত হউন আর যাই হউন, পরজাতিবিদ্বেষ হইতে মুক্ত থাকা বড় সহজসাধ্য নহে। সভায় এশিয়া হইতে আগত তিনজনের কথা স্বামীজী লিখিয়াছেন—একজন স্বয়ং তিনি, অপর দুইজন জাপানী।

পাশ্চাত্যদিগের তদানীন্তন মত ছিল—বৈদিক ধর্ম প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ অগ্নিসূর্যাদি জড়বস্তুর আরাধনা হইতে সম্ভূত হইয়াছিল। স্বামীজী এই মতের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ পাঠের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ প্রবন্ধ লিখিতে পারেন নাই, কোন প্রকারে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ইওরোপীয় বুধমণ্ডলী পূর্ব হইতেই তাঁহার পুস্তকাদি পড়িয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

সভায় ওপর্ট-নামীয় এক জার্মান পণ্ডিত স্বীয় প্রবন্ধে বলেন যে, শালগ্রাম স্ত্রী-চিহ্ন ও শিবলিঙ্গ পুং-চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে—ফলতঃ এই উভয় উপাসনা লিঙ্গ-যোনি-পূজারই পরিচায়ক। স্বামীজী এই মতের খণ্ডন করিতে উঠিয়া বলেন, শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে এরূপ কথা পূর্বেও শ্রুত হইয়া থাকিলেও শালগ্রাম সম্বন্ধে এই কথা অতীব অভিনব। প্রকৃতপক্ষে উভয় ধারণাই মিথ্যা। শিবলিঙ্গের পূজার মূল উৎস হইতেছে অথর্ববেদের যূপ-স্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র। "উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে এবং উক্ত স্কম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম, ভস্ম,

সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ যে প্রকার মহাদেবের অঙ্গকান্তি, পিঙ্গল জটা, নীলকণ্ঠ ও বাহনাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপস্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।...লিঙ্গাদি পুরাণে উক্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা করিয়া মহাস্তম্ভের মহিমা ও শ্রীশঙ্করের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরে হইতে পারে যে, বৌদ্ধাদির প্রাদুর্ভাবকালে বৌদ্ধস্তূপসমাকৃতি দরিদ্রার্পিত ক্ষুদ্রাবয়ব স্মারক-স্তূপও সেই স্তম্ভে অর্পিত হইয়াছে।" শালগ্রামের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতু-গর্ভ। স্তূপমধ্যস্থ শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত; তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি-ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রাম-শিলা উক্ত অস্থি-ভস্মাদি-রক্ষণশিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধপুজিত হইয়া বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে। অপিচ নর্মদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধপ্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল। প্রাকৃতিক নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও নেপালপ্রসূত শালগ্রামই যে বিশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য।" সুতরাং স্বামীজীর সুচিন্তিত মত এই যে, শালগ্রামের যৌনব্যাখ্যা অভূতপুর্ব। শিবলিঙ্গের ঐরূপ ব্যাখ্যা অতি অর্বাচীন ও বৌদ্ধধর্মের অবনতিকালে ঐ সম্প্রদায়েই উহার উদ্ভব হয়।

অন্য এক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেন যে, ভারতখণ্ডে বেদ হইতেই বৌদ্ধাদি সর্বপ্রকার ধর্মমতের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং "যে প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাজকুলাদির ইতিহাস ক্রমশঃ প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ঘাটনের সহিত প্রমাণীকৃত হইতেছে, সেই প্রকার ভারতের কিংবদন্তী সব সত্য। বৃথা প্রবন্ধ-কল্পনা না করিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা যেন উক্ত কিংবদন্তীর রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন।" স্বামীজী আরও বলেন যে, ভারতীয় কৃষ্টির উপর গ্রীক-প্রভাব তৎকালে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইলেও উহা প্রমাণসহ নহে। শুধু গোটাকয়েক শব্দের ব্যুৎপত্তি অবলম্বনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অন্যায়। ব্যুৎপত্তি অবলম্বনে জ্যোতিষ-শাস্ত্র গ্রীকদেশ হইতে আগত—এইরূপ কল্পনা না করিয়া বরং দেখানো সহজ যে, বেদ হইতেই ঐ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, আর ব্যুৎপত্তি অবলম্বনেও দেখানো চলে যে, জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় গ্রীক-শব্দগুলি বৈদিক শব্দেরই অপভ্রংশ। সংস্কৃত নাটকও গ্রীস হইতে আসে নাই, উহার বিষয়বস্তু অভিনয়-ভঙ্গী ইত্যাদি বহু বিরুদ্ধ তথ্য ইহাই প্রমাণ করে। আর্যভাস্কর্যও ভারতসম্ভূত। উহার উপর গ্রীক-প্রভাব রহিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া ভ্রান্তিমাত্র। আর তিনি প্রমাণ করেন যে, গীতা বুদ্ধের পূর্ববর্তী, উহা মূল মহাভারতেরই অংশবিশেষ।

বক্তৃতার পর অনেকেই মতামত প্রকাশ করিলেন। অনেকেই বলিলেন, "স্বামীজী যাহা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের সম্মত এবং স্বামীজীকে আমরা বলি যে, সংস্কৃত প্রত্নতত্ত্বের আর সেদিন নাই। এখন নবীন সংস্কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের মত অধিকাংশই স্বামীজীর সদৃশ এবং ভারতের কিংবদন্তী পুরাণাদিতে যে বাস্তব ইতিহাস রহিয়াছে, তাহাও আমরা বিশ্বাস করি।" তথাপি সভার বৃদ্ধ সভাপতি অন্তে সেই পুরাতন মতই সমর্থন করিলেন যে, গীতা মহাভারতের সমসাময়িক নহে। তাঁহার যুক্তি সেই পুরাতন কথা—"অধিকাংশ ইওরোপীয় পণ্ডিত এই বিষয়ে একমত"!

এই সম্মেলন উপলক্ষে অনেক পণ্ডিতের সহিত স্বামীজীর আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন লেগেটদের গৃহে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন ও সেখানে আরও খোলা-মনে ভাবের বিনিময় হইত। স্বামীজী লিখিয়াছিলেন ('বাণী ও রচনা', ৬।১২৫): "মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি-ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী ও যশস্বিনী নর-নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন,…। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ মিস্টার লেগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মনঃসংঘর্ষ সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ ক'রে রাখত!"

এইসব বৈঠক বা ভোজ-সভায় শুধু উচ্চ ধর্ম, দর্শন, শিল্প প্রভৃতির আলোচনাই হইত না; মাঝে মাঝে রঙ্গরসও চলিত। এইরূপ একটি 'খেয়ালীদের কংগ্রেস'-এর বিবরণ স্বামীজীর ৩রা সেপ্টেম্বরের (১৯০০) পত্রে আছে। বাহুল্যভয়ে আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম না। শুধু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই 'কংগ্রেস'-এ সভাপতির পদের জন্য প্রথমে আমেরিকার খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক উইলিয়াম জেমসকে অনুরোধ করা হয়। তিনি অবশ্য সম্মত হন নাই; বস্তুতঃ সভাপতির আসন শূন্য রাখিয়াই সভার কার্য বা রঙ্গরস চলিয়াছিল। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বামীজী, শ্রীযুক্তা ওলি বুল, শ্রীমতী ম্যাকলাউড, ভগিনী নিবেদিতা ও প্যাট্রিক গেডিজ।

ধর্মেতিহাস-সভার অধিবেশন শেষ হইলে স্বামীজী মিসেস ওলি বুলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ১৭ই সেপ্টেম্বর ব্রিটানি প্রদেশের অন্তর্গত লানিয়ঁ হইতে ছয় মাইল দূরে পেরো গাইরেক নামক গ্রামে গমন করিলেন এবং শ্রীমতী বুলের কুটিরে অতিথি হইলেন। এখানে ২৮শে পর্যন্ত বেশ বিশ্রামে কাটিল। সিস্টার নিবেদিতাও ঐ সময়ে এস্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। "ব্রিটানি হইতেই নিবেদিতা স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। যাত্রার পুর্বদিন সন্ধ্যার পর নিবেদিতা তাঁহার লতাপাদপমণ্ডিত ক্ষুদ্র পাঠাগারের দ্বারপ্রান্তে সহসা স্বামীজীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। রাত্রির আহার সমাপনান্তে এক বন্ধুর সহিত তাঁহাদের নিদিষ্ট কুটিরে যাইবার পথে তিনি নিবেদিতাকে আশীর্বাদ জানাইতে সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। নিবেদিতা আহ্বান শুনিয়া বাহিরে উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইলে স্বামীজী বলিলেন, এক অদ্ভুত রকমের মুসলমান সম্প্রদায় আছে। লোকে বলে, তারা এত গোঁড়া যে, কোন শিশু জন্মিবামাত্র তারা এই কথা বলে তাকে রাস্তায় ফেলে দেয়, 'যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে মর, আর যদি আলি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে বেঁচে থাক।' তারা শিশুর প্রতি যা বলে থাকে, আজ রাতে আমি তোমাকে তাই বলছি, কিন্তু ঠিক উলটোভাবে: 'সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ কর, এবং যদি আমি তোমায় সৃষ্টি করে থাকি, তবে সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হও; এবং যদি মা ব্রহ্মময়ী তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে বেঁচে থাক'।" নিবেদিতা অবনত-মস্তকে তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন—এ যে সর্বপ্রকারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতারই মন্ত্র! পরদিন সকালে তিনি যাত্রা করিবেন। সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে, অমনি স্বামীজী উপস্থিত হইলেন—পূর্বরাত্রে বিদায় লইয়া থাকিলেও আবার যেন শেষ দেখার প্রয়োজন ছিল! গ্রামে যানবাহনের অভাব; নিবেদিতা এক কৃষকের পণ্যবাহী গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী চলিতে লাগিল—এদিকে স্বামীজী কুটিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া বিদায়-অভিনন্দন জানাইতে লাগিলেন। গাড়ী দূরে চলিয়া যাইতেছে; নিবেদিতা তবু মুখ ফিরাইয়া বার বার দেখিলেন স্বামীজী একইভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া। প্রতীচীর দৃষ্টিতে ইহা অভিনন্দন, প্রাচীর দৃষ্টিতে আন্তরিক আশীর্বাদ। ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ২০৫-০৬ পৃঃ)।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মাইকেলমাস দিবসে (২৯শে সেপ্টেম্বর) স্বামীজী কয়েকজনের

সহিত সঁ্যা মিশেল-পাহাড়ে সাধুদের একটি মঠ দেখিতে যান। উহা এক সময়ে জেলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেখানে কয়েদীদের জন্য যে-সকল অন্ধকার খাঁচার মতো ঘর ছিল, স্বামীজী সেইগুলি দেখিতেছিলেন। এমন সময় পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকটি শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলেন—স্বামীজী অনুচ্চস্বরে বলিতেছেন, 'আহা কি চমৎকার ধ্যানের জায়গা!' "কেন তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহকে গ্রাহ্য করিতেন না, তাহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি সর্বদাই আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেন, কোথায় সর্বাপেক্ষা উত্তম চিন্তার সহায়তা হয়।" (ঐ, ২১০ পৃঃ)। ঐ স্থান হইতে স্বামীজী ৩০শে তারিখে প্যারিসে ফিরিয়া আসেন। তিনি পুনর্বার জুল বোয়ার সহিত ১৫ই হইতে ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত ওলি বুলের কুটিরে বাস করেন।

প্রতীচ্য সমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে এবং ফরাসী সংস্কৃতি ও তাহার রাজধানী প্যারিসের সৌন্দর্য, ভাবগাম্ভীর্য ইত্যাদির সহিত ইওরোপীয় অন্যান্য দেশের ও তত্তৎ রাজধানীর বিশ্লেষণাত্মক তুলনার ফলে স্বামীজী যেসব মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার লেখনীমুখে বিবৃত হইয়াছে। অতএব এই জীবনীগ্রন্থে আমরা উহার আলোচনায় বিরত রহিলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহা তাঁহার গ্রন্থাবলী 'বাণী ও রচনা'য় (৬।১২৪-৩৬, ৬।১৯১-৯৯) পাইবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের তুলনামূলক বিচারও তাঁহার 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থদ্বয়ে (ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড) রহিয়াছে। উহার আলোচনাও আমরা করিব না। তবে ফরাসী দেশের সহিত সম্পর্ক না থাকিলেও ঐ কালের দুইটি ঘটনা আমরা উল্লেখ করিতে চাই, কেননা উহাদের সহিত স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং স্বামীজীকে বুঝিতে হইলে ঐ দুইটির প্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। প্রথম ঘটনা বেলুড় মঠের জন্য দেবোত্তর ট্রাস্ট ডীড সম্পাদন; দ্বিতীয় ঘটনা রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের জন্য প্রতীক রচনা।

আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, বেলুড় মঠ স্থাপনের পর তত্রত্য মিউনিসিপ্যালিটি স্থির করিলেন যে, উহা মন্দির, সাধুদের আশ্রম বা ধর্মস্থান নহে—প্রত্যুত উহা স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব সম্পত্তি, বাগানবাড়ী! অতএব ট্যাক্স ধার্য হইল। স্বামীজী কষ্টে-সৃষ্টে অর্থসংগ্রহান্তে মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু দৈনন্দিন ব্যয় পরিচালনার মতোই অর্থ অবশিষ্ট ছিল না, অতএব ট্যাক্সের টাকা

আসিবে কোথা হইতে?[৩] একবার উহা বাগানবাড়ী আখ্যা পাইলে ট্যাক্স ক্রমাগত বাড়িতেই থাকিবে। সুতরাং আইনজীবী বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, স্বামীজী যেন শ্রীরামকৃষ্ণের নামে দেবোত্তর ট্রাস্ট করিয়া স্বত্ব ত্যাগ করেন। স্বামীজী সহজেই স্বীকৃত হইলেন। সম্পত্তির উপর স্বত্ব ত্যাগের প্রস্তাব অনেক পুরাতন। ঐজন্য বিভিন্ন উপায়ও স্বামীজী ভাবিয়াছিলেন এবং অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার নিদর্শন তাঁহার পত্রাবলীর বহুস্থানে আছে। কিন্তু শেষ কার্যকর ব্যবস্থা হয় প্যারিসে অবস্থানকালে। আগস্ট মাসে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "ট্রাস্ট ডীড করিয়ে নিলেই আমি বাঁচি;" আবার ১লা সেপ্টেম্বর তাঁহাকেই লিখিয়াছিলেন, "একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে, অর্থাৎ ট্রাস্ট ডীড-ফিড সই করে কলকাতায় পাঠিয়েছি; আমার আর কোন স্বত্ব বা অধিকার রাখি নাই। তোমরা এখন সকল বিষয়ে মালিক, প্রভুর কৃপায় সকল কাজ করে নেবে।" সহি করা অবশ্য আগস্ট মাসেই হইয়া গিয়াছিল, কারণ ২৫শে আগস্টের পত্রে স্বামীজী নিবেদিতাকে লিখিয়াছিলেন, "এদিকে ট্রাস্টের দলিলগুলি দস্তখতের জন্য পড়ে ছিল; সুতরাং আমি ব্রিটিশ কনসালের আফিসে গিয়ে সই করে দিয়েছি। কাগজপত্র এখন ভারতের পথে। এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ কার্যব্যাপারে আমার আর কোন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির পদও আমি ত্যাগ করেছি। এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তারপর উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়বে। এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেবে গেল! আমি এখন নিজেকে বেশ সুখী বোধ করছি।"

স্বামীজীর পত্রের ভাষা হইতে যদিও মনে হয় যে, তিনি এই ট্রাস্ট-সংলগ্ন শেষ কাগজ প্যারিসে বসিয়াই সহি করিয়াছিলেন, তথাপি চরম রূপ লইয়া দলিলখানি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তনের পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি ও উহা রেজেস্ট্রীকৃত হইয়াছিল ৬ই ফেব্রুয়ারি। এই দলিল অনুসারে মঠের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির জন্য ট্রাস্টি নিযুক্ত হইয়া-

৩। শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিত ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯-এর পত্র দ্রষ্টব্য।

ছিলেন : স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ। স্বামীজীর কোন শিষ্যকে ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ট্রাস্টের দলিলটি আইনমত সম্পাদিত হওয়ার পর ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে ট্রাস্টিদের প্রথম সভা আহূত হয় এবং অধিকাংশের সম্মতিক্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সভাপতি নির্বাচিত হন (স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি)। এদিকে মিউনিসিপ্যালিটির সহিত যে মোকদ্দমা চলিতেছিল, কলিকাতা হাইকোর্টের আদেশানুসারে ২৩শে ফেব্রুয়ারি মঠকর্তৃপক্ষ উহাতে জয়লাভ করেন। এই ঘটনাগুলি পরবর্তী হইলেও বর্ণনার সুবিধার জন্য আমরা এখানেই বলিয়া রাখিলাম।

প্রাসঙ্গিক আর একটি বিষয়ও এখানে বলিয়া রাখি। অনেকের ধারণা এই যে, ট্রাস্ট ডীড করিয়া মঠপরিচালনার দায়িত্ব বর্জন করার পুর্বেও স্বামীজী ঐ কার্যে নিরত ছিলেন না, ঐসব কার্য অপরেরা করিতেন, স্বামীজীর কার্য ছিল শুধু বক্তৃতা দেওয়া ; সুতরাং ট্রাস্ট সৃষ্টির পরে যে তিনি কোন কিছুতেই ছিলেন না, একথা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ পর্যন্ত আমরা স্বামীজীর জীবনের যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তিনি যখন যেখানেই থাকুন না কেন, সর্বদা মঠের ও মিশনের কার্যাবলীর খবর রাখিতেন এবং প্রয়োজনস্থলে নির্দেশ ও উপদেশ দিতেন। কি করিয়া হিসাব লিখিতে হইবে, পত্রের নকল রাখিতে হইবে, কার্যব্যবস্থা ও কার্যবিভাগাদি হইবে, স্বাস্থ্যের নিয়ম পরিপালিত হইবে, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি চলিবে, ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনি বিধান দিতেন ও সেগুলি পরিপালিত হইত। আর ভাবরাজির তিনিই ছিলেন একমাত্র উৎস—এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অর্থসংগ্রহও তিনিই করিতেন। বেলুড় মঠ স্থাপন ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা তাঁহারই কীর্তি। মিশনের তিনিই ছিলেন প্রথম প্রেসিডেণ্ট। মঠেরও তিনিই ছিলেন প্রথম অধ্যক্ষ, যদিও প্রেসিডেণ্ট কথাটির প্রয়োগ আরম্ভ হয় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পরে। ট্রাস্টের পরেও সর্ববিষয়ে তাঁহারই ইচ্ছা পরিপালিত হইত—তিনিই ছিলেন কর্তা বা স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভাষায় জেনারেল প্রেসিডেণ্ট।

তারপর মঠ-মিশনের প্রতীকের কথা। এখানেও একদিকে আমরা যেমন

পাই একাধারে ভাবরাশির একত্র সমাবেশের ও ভাবের দ্যোতক প্রতীক-কল্পনার ক্ষমতা, অপরদিকে তেমনি পাই শিল্পিসুলভ গভীর অনুভূতি ও রূপায়ণচাতুর্য। প্রতীকটির অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বামীজী ২৪শে জুলাই, নিউ ইয়র্ক ত্যাগের প্রাক্‌কালে শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন: "সূর্য=জ্ঞান; তরঙ্গায়িত জল=কর্ম; পদ্ম=প্রেম; সর্প=যোগ; হংস=আত্মা; উক্তিটি=হংস (অর্থাৎ পরমাত্মা) আমাদিগকে উহা প্রেরণ করুন (তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ)। এটি হৃৎ-সরোবর। কল্পনাটি তোমার কেমন লাগে? যা হোক, হংস যেন তোমায় এ সমস্ত দিয়ে পরিপূর্ণ করেন।" কল্পনাটি তখন সবেমাত্র রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, ইহার প্রমাণ পাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত ২৫শে জুলাই-এর পত্রে: "বলি হাঁস কেমন?" অর্থাৎ তুরীয়ানন্দ পূর্বে এই প্রতীক দেখেন নাই। প্রতীকটি ঐকালে রচিত হইলেও জনসাধারণে প্রচারিত হইতে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। স্বামীজীকেই প্রথমাবস্থায় উহা ব্যাখ্যা করিতে হইত। এইভাবে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তিনি মেরীকে লিখিয়াছিলেন, "মিশনের শীলমোহরে সাপটি হ'ল রহস্যবিদ্যার (যোগের) প্রতীক; সূর্য জ্ঞানের; তরঙ্গায়িত জল কর্মের; পদ্ম প্রেমের; সকলের মাঝখানে হংসটি হল আত্মার প্রতীক।"

প্রতীকটির শিল্পের দিক আলোচিত হইয়াছিল আরও পরে স্বামীজী যখন ভারতে প্রত্যাবর্তনান্তর বেলুড় মঠে বাস করিতেছিলেন। সেইকালে একদিন কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয় মঠে আসিলে স্বামীজী তাঁহার সহিত শিল্পকলার আলোচনা আরম্ভ করিলেন ও স্বীয় মতপ্রকাশব্যপদেশে বলিলেন, "মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা আইডীয়া (মনোভাব) প্রকাশ করার নামই আর্ট (শিল্প)। যাতে আইডীয়ার প্রকাশ নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত আর্ট বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে তৈরি করা উচিত।" ক্রমে মা কালীর ছবির কথা উঠিল ও স্বামীজী স্বরচিত 'কালী দি মাদার'-এর কথা তুলিয়া বলিলেন, "আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে প্রকাশ করতে পারেন কি?" অতঃপর কবিতাটি আনাইয়া স্বয়ং পাঠ করিলেন। "রণদাবাবু কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু

যেন কল্পনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া 'বাপ্' বলিয়া ভীত-চকিতনয়নে স্বামীজীর মুখপানে তাকাইলেন।" ছবি আঁকিতে পুনরায় অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে, চেষ্টা করব। কিন্তু ঐভাবের কল্পনা করতেই যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।" রণদাবাবু পরে কথা রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু চিত্রখানি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, কাজেই স্বামীজীকেও দেখান নাই। অতঃপর স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের শীলমোহরের ছবিটি আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইলেন ও অনুরোধক্রমে উহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিলেন। "রণদাবাবু চিত্রটির ঐরূপ অর্থ শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত'।" ঐ দিন স্বামীজী ভাবী রামকৃষ্ণ-মন্দিরের পরিকল্পনা লইয়াও আলোচনা করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা পরে বলিব। আলোচনাশেষে স্বামীজী রণদাবাবুকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাজনিত কিছু কিছু বলেন। রণদাবাবু ইহার উত্তরে কহিলেন, "মহাশয়, আমি আপনাকে নূতন কথা কি শোনাব, আপনিই ঐ বিষয়ে আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্প সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি। আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যেসকল ভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।" ('বাণী ও রচনা', ৯।১৮৬-৯২)। ইহার পর আমরা পুনর্বার প্যারিসে ফিরিয়া যাই।

প্যারিসে থাকাকালে স্বামীজীর সহিত যেসব জ্ঞানী ও গুণীর প্রথম পরিচয় বা পুনর্মিলন ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের কয়েকজনের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। প্রদর্শনীর কালে আচার্য জগদীশ বসু মহাশয়ও সহধর্মিণীর সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই স্বদেশবাসীদের পাইয়া স্বামীজী যেমন আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানজগতে আচার্যের কৃতিত্বের জন্যও তেমনি গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।

'ম্যাক্সিম গান'-এর আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত হিরাম ম্যাক্সিম-এর সহিতও তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। প্যারিস হইতে পূর্ব ইওরোপে যাইবার কালে ইনি নানা স্থানে চিঠিপত্র যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে দেশগুলি ভাল করিয়া দেখা যায়। ইহার সম্বন্ধে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন ('বাণী ও রচনা', ৬।১২৩): "ম্যাক্সিম আদতে আমেরিকান; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি।

ম্যাক্সিম তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে, 'আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি, ঐ মানুষ-মারা কলটা ছাড়া?' ম্যাক্সিম চীনভক্ত, ভারতভক্ত, ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বইপত্র পড়ে অনেক দিন হ'তে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ—বেজায় অনুরাগ।...ম্যাক্সিম পাদ্রীদের চীনে ধর্মপ্রচার আদতে সহ্য করতে পারে না। ম্যাক্সিমের গিন্নীটিও ঠিক অনুরূপ—চীনভক্তি, ক্রিশ্চানি-ঘৃণা! ছেলেপুলে নাই, বুড়ো মানুষ—অগাধ ধন।"

পাশ্চাত্ত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্নহার্ড আর সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা মাদামোয়াজেল কালভের সহিত তাঁহার পূর্বেই মার্কিন দেশে আলাপ হইয়াছিল। প্যারিসে আবার আলাপের সুযোগ হইল। ইহারা দুইজনেই ইংরেজী জানিতেন না; তবে ভারতের প্রতি উভয়েরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল।

রিশেলুর ডিউক-এর সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। ফরাসীর প্রাচীন অভিজাত-বংশসম্ভূত ডিউক রিশেলু ছিলেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত সুশিক্ষিত যুবক। স্বামীজীর সহিত আলাপ হইবার পর তিনি স্বামীজীর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হন এবং ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেন। প্যারিস ত্যাগের পূর্বে স্বামীজী ডিউককে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। রিশেলু তাহাতে প্রতিপ্রশ্ন করেন, সন্ন্যাসী হইলে তিনি কি পাইবেন? স্বামীজী উত্তর দেন, "আমি তোমাকে মৃত্যুকে ভালবাসতে শেখাব।" ঐ কথা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বামীজী বলেন যে, তিনি রিশেলুর মনের অবস্থা এমন করিয়া দিবেন যাহাতে তিনি মরণে ভীত না হইয়া হাসিমুখে উহা বরণ করিবেন। অবশ্য রিশেলু শেষ পর্যন্ত রাজী হন নাই; তবে তিনি সারাজীবন স্বামীজীর কথা ভক্তিপূর্বক স্মরণ করিতেন।

স্বামীজী তখন পূর্ব ইওরোপ হইয়া ভারতে ফিরিবার কথা ভাবিতেছিলেন। মাদাম কালভেও সে শীতে না গাহিয়া বিশ্রামের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি স্বামীজীকে তাঁহার অতিথি হইয়া ভ্রমণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বামীজীও সম্মত হইলেন। শ্রীমতী ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথায় আছে ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৪৭ পৃঃ): "প্যারিসে একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় গায়িকা মাদাম এমা কালভে বলিলেন, তিনি শীতকালে মিশরে যাইতেছেন। অতএব আমি যখন প্রস্তাব করিলাম যে, আমি তাঁহার

সহিত যাইব, অমনি তিনি স্বামীজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আপনি আমাদের সঙ্গে আমার অতিথিরূপে মিশরে যাবেন কি ?' তিনি সম্মত হইলেন।" কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করিতেন তাহাই নহে, তাঁহার বিদ্যাও যথেষ্ট ছিল এবং তিনি দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করিতেন। শৈশবে তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন ; উদ্যম ও অধ্যবসায় অবলম্বনে তিনি ক্রমে সৌভাগ্যের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিলেও শৈশবের দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের স্মৃতি তাঁহার জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি ও ভগবদ্ভাব আনিয়া দিয়াছিল।

আর ছিলেন মঁসিয়ে জুল বোয়া, যাঁহার কথা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। তিনি ছিলেন ধর্মীয় কুসংস্কারসকলের ঐতিহাসিক তত্ত্বাবিষ্কারে নিপুণ—মধ্যযুগের ইওরোপে শয়তান-পূজা, জাদু, মারণ, উচাটন, ছিটে-ফোঁটা, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি অতি নিরভিমান ও শান্তপ্রকৃতির সাধারণ অবস্থার লোক হইলেও স্বামীজীকে প্যারিসের নিজ বাড়ীতে যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অপর আর এক ব্যক্তি ছিলেন পেয়র হিয়াসান্থ। ইনি ছিলেন প্রথমে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত কঠোর তপস্যাবান সন্ন্যাসী এবং পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও তপস্যাপ্রভাবে ফরাসী-দেশবাসীদের সম্মানভাজন। কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়সে ইনি এক আমেরিকান মহিলার সহিত প্রণয়াবদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন এবং তপস্বি-বেশ পরিত্যাগপূর্বক গৃহস্থ সাজিয়া নাম লইলেন মঁসিয়ে চার্লস লয়জন। ইনি ছিলেন মিষ্টভাষী ও ভক্তপ্রকৃতির লোক। স্বামীজীর সহিত ইঁহার প্যারিসেই সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্তা ওলি বুল আগস্ট মাসে প্যারিস-প্রদর্শনীর কালে রুশ-দেশীয় অ্যানার্কিস্ট প্রিন্স ক্রপটকিন-এর সহিত স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দেন। ('স্বামী বিবেকানন্দ', ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩৩৯ পৃঃ)। আরও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয়াদি হইয়াছিল নিশ্চয়[৪] ; কিন্তু আমরা সেসব অবগত নহি।

৪। বাঙ্গলা জীবনীতে রাজকুমারী ডেমিডফ-এর উল্লেখ আছে। স্বামীজীর ১০ই সেপ্টেম্বরের (১৯০০) পত্রও দ্রষ্টব্য।

ক্রমে প্যারিস-ত্যাগের দিন সমাগত হইল। তাঁহাদের ভ্রমণধারা এইরূপ রচিত হইয়াছিল : "প্যারিস থেকে রেলযোগে ভিয়েনা, তারপর কনস্টান্টিনোপল, তারপর জাহাজে এথেন্স, গ্রীস, তারপর ভূমধ্য-সাগরপার ইজিপ্ত, তারপর আশিয়া মাইনর, জেরুসালেম ইত্যাদি।" স্বামীজী লিখিয়াছিলেন : " 'ওরিআঁতাল এক্সপ্রেস ট্রেন' প্যারিস হ'তে স্তাম্বুল পর্যন্ত ছোটে প্রতিদিন। তায় আমেরিকার নকলে শোবার বসবার খাবার স্থান। ঠিক আমেরিকার গাড়ীর মতো সুসম্পন্ন না হলেও কতক বটে। সে গাড়ীতে চড়ে ২৪শে অক্টোবর প্যারিস ছাড়তে হচ্ছে।" ২৪শে সন্ধ্যায় ট্রেন ছাড়িল। সঙ্গের সঙ্গী হইলেন, শ্রীমতী ম্যাকলাউড, মাদাম কালভে, মঁসিয়ে জুল বোয়া। কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত আর দুইজন সাথী হইলেন পেয়র হিয়াসান্থ ও তাঁহার পত্নী।

আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র প্যারিস দেখিয়া স্বামীজী আনন্দিত হইয়াছিলেন ; প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখিতে যাইতেছেন ভাবিয়া হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক স্বামীজী শত আনন্দ-উৎসাহ, এমন কি উৎসবের মধ্যেও মাতৃভূমির কথা ভুলিতে পারিতেন না। চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিজয়মণ্ডিত হইলেও রাত্রে বিদেশের অগাধ ঐশ্বর্য ও স্বদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য-বুভুক্ষার কথা স্মরণ করিয়া গৌরব-মুহূর্তেও তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত ও নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। এখনও ফরাসী দেশ হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ে তিনি লিখিলেন : "আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হ'তে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি ? কে তোমার নাম নেয় ? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে ?" এই নিদারুণ খেদের মধ্যেও মরুভূমে মরূদ্যানের ন্যায় একটু আনন্দস্থল তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন : "সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ

বিদ্যুদ্বেগে পাশ্চাত্ত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎ-সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!" ('বাণী ও রচনা,' ৬।১২৪)।

স্বামীজীর নিজের কৃতিত্বও কম ছিল না। স্বদেশের নাম তিনিও পাশ্চাত্ত্য-বিদগ্ধসমাজ-সমক্ষে উচ্চরবে বিঘোষিত করিয়াছিলেন; কিন্তু বিনয়বশতঃ তাহা লেখনীমুখে প্রকাশ করেন নাই। করিবার প্রয়োজনও ছিল না—আজ উহা বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক সত্য। আর তিনি স্বদেশের গৌরবখ্যাপনের তুলনায় নিজের গৌরবকে অতি তুচ্ছ মনে করিতেন। তাই তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রশংসায় মুখর। শুধু মুখর নহেন, আচার্যের পক্ষ লইয়া তিনি অপরের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদে মাতিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইওরোপীয় পণ্ডিতগণ যখন অপর পণ্ডিতের প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠিতেন, তখন স্বামীজী দেখাইয়া দিতেন, তাঁহার স্বদেশ-বাসী তাঁহাদের অপেক্ষাও কত বড়। আচার্য বসুর সহিত অপর বৈজ্ঞানিকের মত-ভেদস্থলে তিনি তাঁহারই সমর্থনে বলিতেন যে, তখনই তাঁহারা বসু মহাশয়ের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণে অসমর্থ হইলেও কালে সূক্ষ্মতর যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইলে ঐ কথাগুলির পূর্ণ সমর্থন পাইবেন। একদিন এক সভায় এক বিশিষ্ট ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের শিষ্য ক্ষুদ্রকায় লিলি বৃক্ষের উপর তাঁহার অধ্যাপক যেসব গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহাই গর্বভরে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। স্বামীজী সব শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ও আর এমন কি! তুমি তো শুধু লিলি গাছ বলছ! ডাক্তার বোস দেখাবেন, লিলি গাছের টব পর্যন্ত প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত।" প্যারিসে আচার্য বসুর সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত এবং "বঙ্গদেশের গৌরবস্তম্ভ" বলিয়া তিনি তাঁহাকে অপরের নিকট পরিচিত করিতেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশের মূল কেন্দ্রগুলির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিয়া এবং পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁহার প্রচারব্রত উদ্‌যাপিত করিয়া স্বামীজী এশিয়া খণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন; পথে ইওরোপ ও এশিয়ার মিলনভূমিও তিনি দেখিয়া লইলেন। ইওরোপের পূর্বপ্রান্তে অথবা তুর্কী ও মিশরে নূতন কিছু পাইবার আশা ছিল না; কারণ উহা প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলনভূমি—ঐ উভয় প্রান্তের

সহিত যিনি পরিচিত এই ভূখণ্ডে তিনি তাহাদের মিলনের রীতি দেখিয়া যাইতে পারেন—এই মাত্র।

পাশ্চাত্ত্য জগৎ তিনি দেখিলেন; কিন্তু দেখিয়া উহার উন্নতিকল্পে কোন্ মন্ত্র শুনাইয়া গেলেন? বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিব না; শুধু প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে পুনরুক্তি হইবে; তথাপি স্বামীজীর কার্যের মূল্যায়নের জন্য এইটুকু পশ্চাদ্দৃষ্টি আবশ্যক।

প্রথমতঃ স্বামীজী দেখিয়াছিলেন, সমস্ত পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারত সম্বন্ধে রহিয়াছে এক দুর্নিবার অজ্ঞতা এবং সেই অজ্ঞতাপ্রসূত ঘৃণা ও বিদ্বেষ। অতএব তাঁহার অন্যতম প্রধান কাজ হইল এই অজ্ঞতার অপসারণ। তাহা করিতে গিয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এই সমস্ত অপবাদের প্রধান প্রচারক মিশনারীকুলের স্বরূপ খুলিয়া বলিতে হইল—কোন বিদ্বেষবশতঃ নহে, প্রত্যুত পাশ্চাত্ত্যেরই কল্যাণের জন্য। তিনি একসময়ে বলিয়াছিলেন, আমেরিকার বালক-বালিকাদিগকে বিদেশ সম্বন্ধে যেসব অনৈতিক মিথ্যাকথা শিখানো হয়, তাহাদের নৈতিক মঙ্গলেরই জন্য উহা বন্ধ করা উচিত। এইরূপে সত্যের আবরণ দূরীভূত হইলে পাশ্চাত্ত্য জগৎ বুঝিতে পারিবে, প্রাচ্যের নিকটও তাহাদের শিখিবার অনেক কিছু আছে। প্রাগ্ বিবেকানন্দ যুগে প্রাচ্যের দর্শন, কৃষ্টি, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে যেসব কথা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের মুখে মুখে ফিরিত বা জনকয়েক খেয়ালী লোকের আত্মপ্রতিষ্ঠার খোরাক জোগাইত বিবেকানন্দের পরবর্তী যুগে তাহা জনসাধারণ সসম্ভ্রমে শিখিতে অগ্রসর হইল। প্রেম-প্রীতিই হইল শিক্ষার প্রকৃত মাধ্যম; স্বামীজী তাই শ্রদ্ধাপূর্ণ আদানপ্রদানের পথ উন্মুক্ত করিলেন। অতএব প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলনের মূলসূত্রও এখানে আবিষ্কৃত হইল।

আবরণাপসারণের পর স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য জগৎকে কি দিলেন? দিলেন তিনি প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা। খৃষ্টধর্মকে তিনি অবজ্ঞা করিলেন না; কিন্তু তিনি দেখাইয়া দিলেন বাইবেলোক্ত ধর্ম, বা বাইবেলের ব্যাখ্যা হইতে লব্ধ ধার্মিক দৃষ্টিই ধর্মের শেষ কথা নহে। খৃষ্টানগণ বাইবেল হইতে ভক্তি ও সমাজ-সেবার যে অনুপ্রেরণা লাভ করেন, ভারতীয় ধর্মে সেসব তো আছেই, ঐ সঙ্গে আরও এমন কিছু আছে যাহা খৃষ্টানদের ধার্মিক জীবনকেও পূর্ণতর করিতে পারে। খৃষ্টানদের ভক্তি সাধারণতঃ ভগবানের সহিত পিতাপুত্রের সম্বন্ধ লইয়া; কিন্তু ভারতীয় ধর্মে ভগবানকে জননী বলা হয়, আবার তাঁহার সহিত দাস্য,

অপত্যস্নেহ, সখ্য, মাধুর্য প্রভৃতি ভাবও অবলম্বন করা চলে। খৃষ্টজগতে যে প্রেমের কথা আছে তাহা বড়ই ফিকা, ভগবান সেখানে সাধারণতঃ দণ্ডদাতা, বিচারকর্তা—দুষ্টের শাসক, শিষ্টের পুরস্কারক ; কিন্তু হিন্দুর ভগবান সচ্চিদানন্দ, রসময়, প্রেমময়, লীলাময়—ভক্তের সঙ্গলাভের জন্য সদা উন্মুখ। তিনি বুঝাইয়া দিলেন, ধর্মপথে অগ্রগতির উপায় হইতেছে ভগবানকে ভালবাসা এবং তাঁহারই দিকে আগাইয়া যাওয়া—ইহা শয়তানকে ফাঁকি দেওয়া নহে। ইহা ইতিমূলক, নেতিমূলক নহে—"সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।"

আবার দর্শনের ক্ষেত্রেও, বিচারভূমিতেও হিন্দুদের যথেষ্ট শিখাইবার মতো জিনিস আছে। বিজ্ঞানের যুগে কেবল বিশ্বাসাবলম্বনে বাইবেলকে বা কোন শাস্ত্রকেই ধরিয়া থাকা চলে না। যুক্তিদ্বারা পরমত খণ্ডন ও স্বমত প্রতিষ্ঠারও আবশ্যক আছে ; আর এই কার্যে অদ্বৈত-বেদান্ত যতখানি সমর্থ অপর কোন মতই সেরূপ নহে। অদ্বৈত মত কোন গতানুগতিকতামাত্রকে মান্য দেয় না, কোন পুরুষবিশেষকে অন্ধবিশ্বাসসহ অনুসরণ করে না, কোন পুস্তকমধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে না, কোন সম্প্রদায়কে ভগবানের আসনে বসায় না। তাহার চরম উদ্দেশ্য হইল সত্যানুভূতি। সে সত্যানুভূতি ভোগের পথে আসে না—আসে ত্যাগের পথে। যীশুখৃষ্ট স্বয়ং ছিলেন ত্যাগী, আর তাঁহার শিক্ষার মর্মকথা ছিল ভগবদনুভূতি ; কিন্তু পরবর্তীযুগে তাঁহার উপদেশে জলাঞ্জলি দিয়া মানুষ ছুটিয়াছে বাইবেল-পুস্তক, খৃষ্টান-সম্প্রদায় ইত্যাদির প্রতি। অদ্বৈত-বেদান্ত শিক্ষা দেয়, মানুষ সকলেই ব্রহ্ম, সাধনার দ্বারা সকলেই সেই ব্রহ্মত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পাপ কিছু মানুষের মজ্জাগত নহে, উহা আগন্তুক মায়িক বস্তু। খৃষ্টানদের পাপবাদ বা অনুতাপবাদ মানুষকে দুর্বল করে, অদ্বৈতের ব্রহ্মবাদ তাহাকে সবল সক্রিয় করে। অদ্বৈতবাদ আকাশের ন্যায় বিশাল ও উদার আবার সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও অনুভূতি-রসপূর্ণ। এই অদ্বৈতবাদ অবলম্বনেই নৈতিকতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি যতকিছু উত্তম ভাব আছে সমস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বেদান্ত মানুষের মর্যাদাবৃদ্ধি করে, একত্ব ও সাম্য-প্রতিষ্ঠিত করে, জগতে শান্তি স্থাপন করে।

অথচ এই অদ্বৈতবাদ বিজ্ঞানের বা খৃষ্টধর্মের বিরোধী নহে ; বরং তাহাদের সমর্থক ও পরিপূরক। বিজ্ঞান শুধু বহির্জগৎ লইয়া ব্যস্ত ; কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্যের আভাস পাই আমরা মানবের অন্তররাজ্যে। আত্মাকে, আত্মানুভূতিকে বাদ

দিয়া যে মানুষ, সে হয় একটা জড়পিণ্ড কিংবা পশু। বিজ্ঞান কি মানুষকে এই জড়ত্বে বা পশুত্বে অবনত করিতে চায়? পাশ্চাত্ত্য জগৎ একটা মস্ত ভুল তখনই করে যখন সে ভাবে শুধু বিজ্ঞানের সাহায্যে একটা নূতন মানবসভ্যতা গড়িয়া তোলা সম্ভব। সে পথে পাশ্চাত্ত্য মনীষা অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছিল। জড়ের রাজ্যে প্রযোজ্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণ ইত্যাদি কিংবা পশুজগতে প্রযোজ্য ক্রমবিকাশবাদের অন্তর্ভুক্ত যোগ্যতমের উদ্বর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন ইত্যাদির মতবাদ অবলম্বনে এককালে শ্বেতাঙ্গসম্প্রদায় সমস্ত জগতে শাসন চালাইতে অগ্রসর হইয়াছিল, নিজ নিজ দেশেও ঐরূপ সমাজগঠনে উদ্যত হইয়াছিল; এখনও তাহারা সে পথ সম্পূর্ণ বর্জন করে নাই। সব দেখিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, ইওরোপ একটা আগ্নেয়গিরির মুখে বসিয়া আছে; সে যদি তাহার চলনের ধারা পরিবর্তন না করে, তবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।

অথচ স্বামীজী ছিলেন মানবপ্রেমিক; মানুষের কোন সৎপ্রচেষ্টাকেই তিনি নিন্দা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি দেখিলেন, ইওরোপীয় সমাজ তখন সমাজতান্ত্রিকতা, সাম্যবাদ ইত্যাদির দিকে ঝুঁকিতেছে। তিনি প্রকারান্তরে ইহার অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাহার নির্দিষ্ট পথ ছিল অন্যরূপ। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অদ্বৈত বেদান্তকে তাহার ভিত্তিরূপে মানিয়া লইতে হইবে, আর সে সাম্য স্থাপনের উপায় হইবে উচ্চস্তরের মানবকে নিম্নগামী করিয়া নহে, প্রত্যুত নিম্নবর্তী সকলকে উন্নত করিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকতর প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া। তিনি সমাজতান্ত্রিকতাকে এইজন্য মানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন যে, সমসাময়িক সমাজে নিপীড়িতের উন্নয়নের এতদপেক্ষা অধিকতর ফলদায়ক কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। কথায় বলে, "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।" এই অর্থেই তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি সমাজতন্ত্রবাদী।"

ধর্মের স্তরেও তিনি দেখাইয়া দিলেন যে, অদ্বৈত বেদান্তের আলোকসম্পাতে বাইবেলের বহু গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে—বস্তুতঃ বাইবেল বুঝিতে হইলে অদ্বৈতের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। খৃষ্ট যখন বলেন, "আমি ও আমার পিতা এক", তখন সে কথার মর্মগ্রহণের জন্য উপনিষদের "সোঽহম্" মহাবাক্য স্মরণ করিতে হয়। আবার বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদির কথাও এই ভাবেই অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সামঞ্জস্য লাভ করে।

এইরূপে খৃষ্টধর্মের পরিপূরক হিসাবে ভারতীয় ভক্তিবাদ ও জ্ঞানমার্গের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধ্যানের কথাও পাশ্চাত্ত্য জগৎকে শুনাইলেন। কর্মব্যস্ততার মধ্যে যেমন জীবনের প্রকাশ দেখা যায়, ধ্যানের মধ্যেও তেমনি তাহার সার্থকতা দৃষ্ট হয়। ভগবানের চিন্তাশূন্য ও স্বস্বরূপের উপলব্ধিবিরহিত জীবন তো নিরর্থক। ধ্যানেরই মধ্যে প্রকৃত কর্ম ও ভক্তির বীজ নিহিত—ধ্যান হইতেই জীবনের প্রকৃত বিকাশ, যেমন ধ্যানস্তিমিত হিমালয় হইতেই গঙ্গাদি পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতীর উৎপত্তি।

খৃষ্টানদের অনুসৃত জনসেবাকেও ভারতীয় ভাবের সাহায্যে অধিকতর আধ্যাত্মিক-ভাব-পরিপুষ্ট করা চলে। কর্তব্যমাত্রই কার্যে পরিণত বেদান্তসহায়ে ভগবৎপূজায় পরিবর্তিত হইতে পারে। সাম্প্রদায়িক আচারানুষ্ঠানাদির মধ্যে ধর্মকে আবদ্ধ রাখার কোন প্রয়োজন নাই। ধর্ম মানুষের জীবনে যে কোন স্তরে, যে কোন অবস্থায় অনুসৃত হইতে পারে। অতএব মধ্যযুগীয় ইওরোপে ধর্মের সহিত সমাজ বা রাষ্ট্রের যেসব বিরোধ দেখা গিয়াছিল, তাহা নিষ্প্রয়োজন। "যত মত তত পথ", অতএব ধর্মের নামে সম্প্রদায়গত বিবাদ-বিসংবাদও শুধু অনাবশ্যক নহে, অন্যায়। আবার রাষ্ট্রের নিকট ধর্মকে আত্মবলিদান দিতে হইবে না। ধর্ম প্রত্যেকের নিজস্ব বস্তু—ইষ্টনিষ্ঠাই ইহার ভিত্তি। ধর্মকে লইয়া দলবদ্ধ হওয়া এবং সেই দলের সংরক্ষণজন্য শক্তিশালী রাজদণ্ডের আশ্রয় লওয়া—ইত্যাদি ব্যবহারের ফলেই ধর্ম রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়া পড়ে এবং ক্রমে উহার অবনতি ঘটে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ আত্মম্ভরী পাশ্চাত্ত্যকে তিনি ইহাও শুনাইয়াছিলেন যে, তাহাদের সমাজব্যবস্থা এখনও যুগ-যুগান্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই; বরং তখনই উহাতে যেসব দুর্বলতা লক্ষিত হইতেছিল, তাহার ফল আশাপ্রদ ছিল না। অপর দিকে ভারতের সমাজ সহস্র বৎসরের প্রতিকূল অবস্থায়ও আপনাকে বাঁচাইতে পারিয়াছে এবং এখনও নবোদ্যমে অগ্রসর হওয়ার শক্তি রাখে। অতএব ভারত হইতে শিখিবার অনেক কিছু আছে। এই শিক্ষিতব্য বিষয়গুলির মধ্যে স্বামীজী ভারতের নারীজাতির আদর্শ মাতৃত্বের কথা বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন যে, ভারতের সমাজ অনেকটা সমাজতন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; এখানে বিবাহবিধি প্রভৃতি সমাজের কল্যাণোদ্দেশে সঙ্কল্পিত হইয়াছে, ব্যক্তির আনন্দবৃদ্ধির জন্য নহে। ভারতীয় সমাজের মূলমন্ত্র ত্যাগ ও সেবা—অধিকার-প্রসার বা ভোগ নহে।

প্রাচীন সংস্কৃতির সন্ধানে

স্বামীজী চলিয়াছেন পশ্চিম হইতে পূর্বে—নবীন সভ্যতার লীলাভূমি হইতে ক্রমে প্রাচীনের নিদর্শনাবলীর অভিমুখে। নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেন ছুটিয়াছে—দৃশ্যরাজি সবই তমসাবৃত। গাড়ীর একটি কামরায় জুল বোয়ার সঙ্গে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় কাটাইয়া স্বামীজী উষার আলোকে চক্ষু মেলিয়া জানিলেন, তাঁহারা ফরাসীর সীমা অতিক্রমান্তে জার্মানীর ভিতর দিয়া চলিতেছেন। জার্মান দেশ তিনি পূর্বেই দেখিয়াছিলেন। এখন সেই সব কথাই মনে পড়িতে লাগিল। শক্তিমান উদ্যমশীল বীরের জাতি জার্মানরা তখন প্রবল বেগে সর্বত্র, বিশেষতঃ আমেরিকার নগরগুলিতে, বংশবিস্তার করিতেছে। সৈন্য-প্রতিষ্ঠায় তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ; অতএব ইওরোপে তাহাদেরই আদেশ বলবত্তম। বিদ্যাতেও তাহারা অগ্রণী; ইওরোপের অপর জাতিগুলির পূর্বেই তাহারা রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া নরনারীসকলকে শিক্ষিত করিয়াছে, এবং তখন তাহার সুফল ভোগ করিতেছে। কষ্টসহিষ্ণু ধৈর্যশালী জার্মানরা তখন চারিদিকে শিল্প ও নগর এবং বিরাট অট্টালিকাদি প্রস্তুত করিতেছে; পণ্য-উৎপাদনে তাহারা ইংরেজকেও পরাভূত করিয়াছে। ট্রেন সারাদিন জার্মান রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়া অপরাহ্নে অস্ট্রিয়া-সীমান্তে উপস্থিত হইল এবং ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যার পর রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে পৌঁছাইল। ইওরোপের পূর্বাংশ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত থাকায় এবং প্রত্যেক রাজ্যে প্রবেশকালে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিনিসপত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকায় পর্যটনকারীকে অনেক অসুবিধা সহ্য করিতে হইত। স্বামীজীরাও ইহা হইতে অব্যাহতি পান নাই। ভিয়েনাতে অধিক বিদেশী যাত্রী ছিলেন না বলিয়া স্বামীজীরা শীঘ্রই শুল্কবিভাগের পরীক্ষা শেষ করাইয়া রাত্রির মতো হোটেলে আশ্রয় লইলেন।

পরদিন (২৬শে অক্টোবর) ভিয়েনা দর্শন আরম্ভ হইল। প্রথম দর্শনীয় স্থান ছিল সানবার্ন-প্রাসাদ। ফ্রান্সের বীর নেপোলিয়েঁা বোনাপার্ট সিংহাসনারূঢ় হইয়া স্বীয় প্রথমা পত্নী জোসেফিনকে পরিত্যাগ করেন ও যুদ্ধে পরাজিত অস্ট্রিয়ার বাদশাহের কন্যা মেরী লুইসের পাণিগ্রহণ করেন। পরে বোনাপার্টের পতন হইলে বোনাপার্ট-পুত্রকে সানবার্ন-প্রাসাদে ফিরাইয়া আনা হয়, এবং সেখানেই

তাহার মৃত্যু হয়। দর্শকেরা ঐ প্রাসাদে গিয়া বোনাপার্ট-পুত্রের শয্যাকক্ষ, পাঠাগার, মৃত্যুগৃহ ইত্যাদি দেখিয়া থাকেন। স্বামীজীরাও দেখিলেন।

ভিয়েনা শহরে অপর দ্রষ্টব্য স্থান মিউজিয়ম—বিশেষতঃ বিজ্ঞানের মিউজিয়ম বিদ্যার্থীর পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। নানা প্রকার লুপ্ত জীব-জন্তুর কঙ্কালাদির সংগ্রহ সেখানে প্রচুর। এছাড়াও আর যাহা কিছু দর্শনযোগ্য ছিল সবই তিনি দেখিলেন। কিন্তু ভিয়েনা তাঁহাকে খুশী করিতে পারিল না—স্বদেশের মতো এখানেও সর্বত্র প্রাচীন রীতিনীতির একটা গতানুগতিক প্রাণহীন অনুবৃত্তি তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সখেদে তিনি লিখিলেন: "ভিয়েনায় তিন দিন—দিক ক'রে দিলে! প্যারিসের পর ইউরোপ দেখা—চর্ব্যচুষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা; সেই কাপড়চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, সেই সব এক ঢঙ, দুনিয়াসুদ্ধ সেই এক কিম্ভূত কালো জামা, সেই এক বিকট টুপি! তার উপর—উপরে মেঘ আর নীচে পিল্ পিল্ করছে এই কালো টুপি, কালো জামার দল; দম যেন আটকে দেয়। ইউরোপসুদ্ধ সেই এক পোশাক, সেই এক চাল-চলন হয়ে আসছে! প্রকৃতির নিয়ম—ঐ সবই মৃত্যুর চিহ্ন! শত শত বৎসর কসরত করিয়ে আমাদের আর্যেরা আমাদের এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন যে, আমরা এক ঢঙে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি ইত্যাদি; ফল—আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হ'য়ে গেছি; প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছি! যন্ত্রে 'না' বলে না, 'হাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' (বাপ-দাদা যেদিক দিয়ে গেছে) সেদিকে চলে যায়, তার পর পচে মরে যায়। এদেরও তাই হবে! 'কালস্য কুটিলা গতিঃ'—সব এক পোশাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—হ'তে হ'তে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' হবে, তার পর পচে মরা!!" ('বাণী ও রচনা', ৬।১৩৩)।

২৮শে অক্টোবর তাঁহারা আবার সেই 'ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস' ধরিয়া ৩০শে অক্টোবর কনস্টাণ্টিনোপল পৌছাইলেন। এই দুই রাত্রি ও এক দিনে তাঁহারা হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া অতিক্রম করিয়া গেলেন—কোথাও থামিলেন না। কনস্টাণ্টিনোপল স্টেশনে নামিয়া মাল খালাস করাইতে তুর্কির কাস্টমস কর্মচারীদের সহিত বেশ খানিকটা বচসা হইয়া গেল—বিশেষতঃ পুস্তক লইয়া। শেষ পর্যন্ত দুইখানি বই রাখিয়া তাহারা সব ফেরত দিল; আর আশ্বাস দিল, হোটেলে ঐ দুইখানি পাঠাইয়া দিবে। ফেরত কিন্তু কোন কালেই পাওয়া গেল না।

হোটেলে বিশ্রামান্তে তাঁহারা নগরদর্শনে বাহির হইলেন। 'পোণ্ট' বা সমুদ্রের খাড়ি-পারে 'পেরা' বা বিদেশীদিগের বাসস্থান হোটেল ইত্যাদি অবস্থিত। সেখান হইতে গাড়ী করিয়া শহর; বাজার ইত্যাদি দেখিয়া হোটেলে ফিরিয়া আবার বিশ্রামলাভ হইল। পরদিন বোটে চড়িয়া তাঁহারা বস্ফোরাস ভ্রমণে বাহির হইলেন। সেদিন হাওয়া ছিল জোর এবং ঠাণ্ডাও প্রচুর। অতএব বোট প্রথম স্টেশনে থামিবামাত্র স্বামীজী ও ম্যাকলাউড নামিয়া পড়িলেন। স্থির হইল, তাঁহারা সমুদ্র-প্রণালীর অপর পারে স্কুটারিতে গিয়া পেয়র হিয়াসান্থের সঙ্গে দেখা করিবেন। ভাষা জানিতেন না; অতএব ইঙ্গিতে বোট ভাড়া করিয়া অপর তীরে গেলেন ও তথা হইতে গাড়ী লইলেন। পথে এক সুফি ফকিরের 'তাকিয়া' দেখিলেন। এই স্থানের দরবেশরা রোগ সারায়। প্রথমে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া কলমা পড়ে, তারপর নৃত্য করে; তখন ভাব হয় এবং ভাবাবেশে রোগীর শরীর মাড়াইয়া দিয়া রোগ আরাম করে। হিয়াসান্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, সেখানে আমেরিকান কলেজ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল। পরে সমুদ্রতীরে আসিয়া নৌকা খুঁজিয়া পাইলেন। মাঝি কিন্তু পর পারে নিজের খুশী মতো জায়গায় নামাইয়া দিল। সুতরাং সেখান হইতে ট্রামে চড়িয়া তাঁহারা বাসস্থানে পৌছাইলেন।

তাঁহাদের পরবর্তী দর্শনীয় স্থান ছিল মিউজিয়ম; উহা প্রাচীন গ্রীক বাদশাহদের যেখানে অন্দর-মহল ছিল, সেখানে অবস্থিত। স্বামীজী শবদেহ-রক্ষার প্রস্তরনির্মিত অপূর্ব আধার (সারকোফ্যাগ) দেখিলেন। তাহার পর তোপখানার উপর হইতে নগরের মনোহর দৃশ্যও দেখিলেন। স্বামীজীর ছেলে-মানুষী ভাব সর্বদাই ছিল; সুতরাং স্বদেশসুলভ ছোলাভাজা দেখিয়া উহা কিনিয়া খাইলেন, সঙ্গীদের সহিত তুর্ক-দেশীয় অন্যান্য সুখাদ্যও আস্বাদন করিলেন। আর তাঁহারা দেখিলেন স্কুটারির কারখানা ও প্রাচীন পাঁচিল—পাঁচিলের মধ্যে ভয়ঙ্কর কারাগার। যেসব ভদ্রলোকের সহিত ঐ নগরে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম জানিতে পারা যায়, যথা উডস-পাশা (বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি), ফরাসীর পররাষ্ট্র সচিবের অধীনস্থ একজন কর্মচারী, জনৈক গ্রীক পাশা, ও একজন আলবানি ভদ্রলোক। দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত স্বামীজী একদিন ভোজন করিয়াছিলেন। স্থানীয় পুলিশের আদেশানুসারে পেয়র হিয়াসান্থের বক্তৃতাদান বন্ধ ছিল; একই প্রকার সম্ভাবনাস্থলে স্বামীজীরও কোন ভাষণ দেওয়া

হইল না। কিন্তু বক্তৃতা না হইলেও ম্যাক্সিমের পরিচয়পত্রের সাহায্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল এবং ঘরোয়া বৈঠকেরও আয়োজন হইয়াছিল ; এইভাবে তিনি স্বীয় বাণী প্রচারের বহু সুযোগ পাইয়াছিলেন। কনস্টাণ্টিনোপলে অনেক ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমানের বাস ছিল। তাহাদের মধ্যে স্বামীজী দেবন্‌মল নামক এক ব্যক্তি ও চোবেজী নামক এক গুজরাতি ব্রাহ্মণের সহিত পরিচয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

নগরের আর একটি ঘটনার কথা স্বামীজী কখনও ভুলেন নাই। একজন বৃদ্ধ তুর্কি হোটেলওয়ালা স্বামীজী ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে তাহার আতিথ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। এই সুদূর প্রবাসে ভিন্ন জাতীয় লোকের এইরূপ সহৃদয়তা বাস্তবিকই স্মরণযোগ্য।

কনস্টাণ্টিনোপলে দিন কয়েক[১] কাটাইয়া তাঁহারা গ্রীসে যাইবার জন্য একদিন সকালে দশটায় ষ্টীমারে উঠিলেন। পথে এক দিন ও এক রাত্রি সমুদ্রেই কাটিল। সমুদ্র খুবই শান্ত ছিল। চলিতে চলিতে তাঁহারা গোল্ডেন হর্ন ও মারমোরা দ্বীপপুঞ্জ দেখিলেন। দ্বীপাবলীর একটিতে গ্রীক ধর্মের একটি মঠও দেখিলেন। এই মঠ এশিয়া ও ইওরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় প্রাচীনকালে এখানে ধর্মশিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। মেডিটেরিন দ্বীপপুঞ্জ প্রাতঃকালে দেখিতে গিয়া সেখানে অধ্যাপক লেপরের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইল। পূর্বে মাদ্রাজে পাচিয়াপ্পার মহাবিদ্যালয়ে তাঁহার সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। সেখানে একটি দ্বীপে তাঁহারা এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন এবং সমুদ্রতীরে উহার অবস্থান দেখিয়া অনুমান করিলেন, ইহা নেপচুন-এর (বরুণের) মন্দির ছিল। সন্ধ্যার পর তাঁহারা এথেন্সে পৌছিলেন। একরাত্রি কোয়র্যাণ্টিন-এ কাটাইয়া পরদিন তাঁহারা নামিবার আদেশ পাইলেন।

পাইরিউস বন্দরটি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ সুন্দর। বিধি-ব্যবস্থা সবই ইওরোপের সদৃশ ; শুধু মাঝে মাঝে ঘাগরা-পরা গ্রীক পুরুষরা জানাইয়া দেয় যে, এ গ্রীস দেশ। বন্দর হইতে সকলে গাড়ী করিয়া পাঁচ মাইল দূরবর্তী এক প্রাচীন প্রাচীর দেখিতে গেলেন। ঐ প্রাচীরটিই পুরাকালে এথেন্স নগরকে বন্দরের সহিত সংযুক্ত রাখিত। ইহার পর তাঁহারা নগরদর্শনে চলিলেন ; দেখিলেন— আকরোপলিস, হোটেল, বাড়ী-ঘর-দোর সব অতি-পরিষ্কার ; রাজবাটীটি ছোট!

১। ম্যাকলাউড-এর মতে নয় দিন ; 'পরিব্রাজক'-এর একটি পাদটীকা অনুযায়ী এগার দিন।

সেই দিনই আবার পাহাড়ের উপর উঠিয়া আকরোপলিস, বিজয়াদেবীর মন্দির, পার্থেনন ইত্যাদি দর্শন করিলেন। পরদিন পুনর্বার মাদামোয়াজেল মেলকার্বির সহিত ঐ সকল ভাল করিয়া দেখিলেন। মেলকার্বি সকলকে ঐ সমস্তের ঐতিহাসিক তথ্য বুঝাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় দিনে তাঁহারা ওলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, থিয়েটার ডাইওনিসিয়াস ইত্যাদি সমুদ্রতট পর্যন্ত দেখিলেন। তৃতীয় দিন গ্রীকদের প্রধান তীর্থস্থান এলুসি দেখিতে গেলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এলুসি-রহস্যের অভিনয় এখানেই হইত। এখানকার প্রাচীন থিয়েটারটি নূতন করিয়া নির্মিত হইয়াছে। এই সকল দর্শনান্তে চতুর্থ দিন সকলে রুশদেশীয় ষ্টীমার 'জার'-এ আরোহণপূর্বক মিশর অভিমুখে যাত্রা করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে সকালে দশটায় ষ্টীমারে আসিয়া জানিলেন, উহা ছাড়িবে বিকাল চারিটায়; সুতরাং এই অবসরে যীশুখৃষ্টের পাঁচ-ছয় শত বৎসরের পূর্বে আবির্ভূত ভাস্কর এজেলাদাস এবং তাঁহার তিন শিষ্যের ভাস্কর্যের কিছু কিছু নিদর্শন দেখিয়া আসিলেন।

মিশরে আসিয়া স্বামীজী কায়রো যাদুঘর দেখিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন, এবং তাঁহার মনে অনুক্ষণ দোর্দণ্ডপ্রতাপ ফ্যারাও সম্রাটগণের অতীত কীর্তিকলাপের কথা উদিত হইতে লাগিল; পার্থিব সমস্ত বস্তুর নশ্বরতার সহিত মানবের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকার অদম্য আকাঙ্ক্ষার ঘোরতর বিরোধ তাঁহাকে মহামায়ার বিচিত্র লীলার কথাই স্মরণ করাইয়া দিল; স্ফিংকস (অর্ধনারী-সিংহ-মূর্তি) ও পিরামিডসমূহ তাঁহার মনকে বেদনাক্লিষ্ট করিয়া শুধু এইটুকুই বুঝাইয়া দিল যে, সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, ভোগ, নাম, যশ সকলই অসার—সকলই অকিঞ্চিৎকর। ফলতঃ অসীম শক্তি লইয়া অনন্তকাল সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচিয়া থাকা ও পরে চিরস্মরণীয় হওয়ার আশার প্রতি বিদ্রূপের হাস্যবর্ষণকারী বালুকাপ্রান্তর মধ্যে অবস্থিত তৎকালীন বিগতগৌরব প্রাণহীন সেই সব বিশাল স্মৃতিচিহ্নগুলি তাঁহার মনে এক অবসাদ আনিয়া দিল এবং তিনি তথা হইতে দূরে—স্বদেশে চলিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। এই ব্যগ্রতার অন্য কারণও ছিল। তাঁহার মন যেন তাঁহাকে বলিয়া দিতেছিল, তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও পরম বন্ধু সেভিয়ার আর বাঁচিবেন না, স্বামীজীর অবিলম্বে স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের পরিকল্পিত ভ্রমণপর্যায় তখনও অসমাপ্ত; ইজিপ্তের পরে জেরুসালেম প্রভৃতি স্থানেও যাইবার কথা ছিল, এমন কি স্বামীজী পুনর্বার

প্যারিসে ফিরিবার আশাও পোষণ করিতেন। তাঁহার ১৪ই অক্টোবরের পত্রে আছে: "ফেরার পথে ভেনিস দেখে আসব। ফিরে আসার পর প্যারিসে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে পারি।" কিন্তু ভালবাসার আকর্ষণে সেসব এক মুহূর্তে পরিত্যক্ত হইল। শ্রীমতী ম্যাকলাউড লিখিয়াছেন: "আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম—দুই দিন ভিয়েনায়, কনস্টান্টিনোপলে নয় দিন, এবং এথেন্সে চারিদিন থাকিয়া পরে ইজিপ্তে যাইবার জন্য। সেখানে দিন কয়েক পরে স্বামীজী বলিলেন, 'আমি যেতে চাই।' 'কোথায় যাবেন?'—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। 'ভারতে ফিরে যেতে চাই।' আমি বলিলাম, 'বেশ তো, যান।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যাব তো?' আমি বলিলাম, 'নিশ্চয়।' কাজেই আমি মাদাম কালভের নিকট গিয়া বলিলাম, 'স্বামীজীর ভারতে ফিরে যাবার ইচ্ছা হয়েছে।' তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়।' তিনি স্বামীজীর জন্য একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকেট কিনিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন।" ('রেমিনিসেন্সেস', ২৪৭ পৃঃ)। ইজিপ্ত ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে আমরা মাদাম কালভের 'স্মৃতিকথা' হইতে (ঐ, ২৬৬-৬৭ পৃঃ) কিছু নূতন তথ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি:

"কি অপূর্ব ছিল সেই তীর্থযাত্রাটি! স্বামীজীর নিকট বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের কোন রহস্যই অজ্ঞাত ছিল না। আমার চারিদিকে যেসব জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা চলিত, আমি সবই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতাম। আমি তাঁহাদের চর্চায় যোগ দিবার চেষ্টা করিতাম না; কিন্তু আমি আমার অভ্যাসানুসারে সময় মতো গান শুনাইতাম। পাণ্ডিত্য ও ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য খ্যাতনামা ফাদার লয়জনের সহিত স্বামীজী নানা বিষয়ে বাদ-বিচার করিতেন। এটা একটা আশ্চর্য লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে, কোন বিচার্য প্রমাণপত্রের তারিখ, খৃষ্টান চার্চের কোন সম্মেলনের দিন-ক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ফাদার লয়জন সঠিক বলিতে না পারিলেও স্বামীজী তাহা হুবহু বলিতে পারিতেন।

"গ্রীসে থাকাকালে আমরা এলুসিস দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে তথাকার রহস্য-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে লইয়া যাইতে যাইতে সেসব স্থানে যেরূপ শোভাযাত্রা হইত তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, প্রাচীন প্রার্থনামন্ত্র আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন এবং যাজককুলের ক্রিয়া-কলাপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

"পরে ইজিপ্তে এক অবিস্মরণীয় রাত্রে নীরব স্ফিংকস-এর মূর্তির ছায়াতলে

বসিয়া তিনি প্রেরণাপূর্ণ অতীন্দ্রিয়রাজ্যের ভাষাবলম্বনে আমাদিগকে পুনর্বার এক সুদূর অতীতে লইয়া গিয়াছিলেন।

"স্বামীজী সর্বদাই আমাদের কৌতূহল উদ্দীপিত রাখিতেন, এমন কি তিনি যখন সহজ ভাবে কথা কহিতেন, তখনও ভাল লাগিত—তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন এক মোহিনী শক্তি ছিল যাহা শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিত। এমন কতবার হইয়াছে যে, রেল-স্টেশনের অপেক্ষাগৃহে বসিয়া তাঁহার কথাবার্তায় বিমুগ্ধ আমরা সময়ের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া ট্রেন হারাইয়াছি। শ্রীমতী ম্যাকলাউড যদিও আমাদের সকলের তুলনায় অধিক বাস্তববাদিনী ছিলেন, তথাপি তিনিও সময় ভুলিয়া যাইতেন, এবং ইহার ফলে আমরা দেখিতাম যে, আমরা লক্ষ্যস্থল হইতে দূরে অতি অসময়ে ও অতীব অবাঞ্ছনীয় স্থানে পড়িয়া আছি।

"একদিন আমরা কায়রোতে পথ হারাইলাম। বোধ হয় আমরা বড় বেশী রকম গল্পগুজবে মাতিয়া গিয়াছিলাম। যাহাই হউক, আমরা দেখিলাম, এমন একটা রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি, যাহা আবর্জনাপূর্ণ ও দুর্গন্ধময়, আর সেখানে অর্ধাবৃতা রমণীরা বাতায়ন পথে ঝুঁকিয়া আছে অথবা দ্বারপ্রান্তে শ্লথদেহে বসিয়া আছে। স্বামীজী এ পর্যন্ত কিছুই লক্ষ্য করেন নাই; কিন্তু অবশেষে একটি জীর্ণ বাটীর নিম্নে একখানি বেঞ্চিতে উপবিষ্টা একদল অতিমুখরা নারী হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে ডাকিতে থাকিলে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। আমাদের দলের এক সঙ্গিনী আমাদিগকে সরাইয়া লইয়া যাইতে ত্বরান্বিতা হইলেন; কিন্তু স্বামীজী ধীরে-সুস্থে আমাদের দল হইতে সরিয়া গিয়া বেঞ্চিতে উপবিষ্টা রমণীদের দিকে আগাইয়া চলিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আহা বাছারা! আহা অভাগিনীরা! ওরা তাদের সৌন্দর্যের পায়ে নিজেদের দেবীত্বকে বলি দিয়েছে! এখন দেখ দিকি তাদের অবস্থা!'

"তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন; নারীগুলি নীরব ও লজ্জিতা হইল। একজন সম্মুখে ঝুঁকিয়া স্বামীজীর আবরণপ্রান্ত চুম্বন করিল এবং স্পেনিস ভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'ইনি ঈশ্বরজানিত মানুষ', 'ইনি ঈশ্বরজানিত মানুষ', 'ইনি ভগবানের লোক!' আর একটি নারী অকস্মাৎ লজ্জা ও ভয়ে অভিভূতা হইয়া স্বহস্তে বদন আবৃত করিল—যেন ঐ পবিত্র নয়নদ্বয় হইতে সে তাহার ক্রমসঙ্কুচিত আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

"শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, সেই চমৎকার ভ্রমণকালেই আমার জীবনে

স্বামীজীকে দেখিবার অন্তিম সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার অল্প পরেই তিনি জানাইলেন যে, তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিতে হইবে। তাঁহার বোধ হইতেছিল, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে এবং তাঁহার অনুভব হইতেছিল যে, তাঁহার স্বদেশেই প্রত্যাবর্তন কর্তব্য—তিনি ছিলেন সে দেশের নেতা ও সে দেশেই তাঁহার যৌবন ব্যয়িত হইয়াছিল।"

মাদাম কালভে ক্যাথলিকদের প্রথানুসারে স্বামীজীকে মঁ পেরে (আমার বাবা) বলিয়া ডাকিতেন। ম্যাকলাউডের নিকটও তিনি ছিলেন গুরু ও নিকট আত্মীয়। মঁ বোয়া তাঁহাকে সাধু, পণ্ডিত ও সহৃদয় বন্ধু বলিয়া আদর করিতেন। অতএব স্বামীজী বিদায় লইবেন জানিয়া সকলেই সাতিশয় দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ধরিয়া রাখিবার তো উপায় ছিল না। স্বামীজী প্রথম যে জাহাজ পাইলেন তাহাতেই চড়িয়া স্বদেশযাত্রা করিলেন। তিনি সম্ভবতঃ পোর্ট টাউফিক হইতে জাহাজ ধরিয়াছিলেন। সেখান হইতে ম্যাকলাউডকে লিখিত ২৬শে নভেম্বরের (১৯০০) পত্রে আছে:

"জাহাজখানি আসিতে দেরী হচ্ছে, তাই অপেক্ষা করছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আজ জাহাজ পোর্ট সৈয়দ খালের মধ্যে ঢুকেছে। তার মানে, সব ঠিক ঠিক চললে সন্ধ্যায় জাহাজ এখানে (পোর্টে) পৌছবে। অবশ্য এ দুদিন যেন নির্জন কারাবাস চলছে;...মিঃ গেজের এজেণ্ট আমায় সব ভুল নির্দেশ দিয়েছিল। প্রথমতঃ আমায় স্বাগত জানানো তো দূরের কথা, কিছু বুঝিয়ে দেবার মতো কেউই এখানে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ আমায় কেউ বলেনি যে, অন্য জাহাজের জন্য আমাকে এজেণ্টের আফিসে গিয়ে গেজের টিকিটখানি পালটে নিতে হবে—আর তা করবার জাগয়া সুয়েজ, এখানে নয়। সুতরাং জাহাজখানির দেরী হওয়ায় এক হিসাবে ভালই হয়েছিল।...আজ রাত্রে কোন একসময়ে জাহাজে উঠব, আশা করি।...মাদাম কালভেকে আমার চিরকৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাবে। তিনি বড় চমৎকার মহিলা।"

অতঃপর জাহাজের কিছু কিছু ঘটনা জানিতে পারি আমেরিকান মিশনারী রীভস ক্যান্ডিল-এর স্মৃতিলিপি ('রেমিনিসেন্সেস', ৪০৩-০৭ পৃঃ) হইতে। আমরা উহার সারাংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি। মনে রাখিতে হইবে ক্যান্ডিল্স ছিলেন মিশনারী; কাজেই স্বামীজীকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করেন নাই। তবে জীবনে কখনও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত মিলন ঘটিয়া থাকিলে, লোকে

তাহা স্বভাবতই দশজনকে বলিতে চায়; ক্যাল্কিন্সও ঠিক ঐভাবেই নিজের পছন্দ ও অপছন্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান মিলাইয়া এই লিপিটি রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার মতামত বা অনুমানের দিকে তেমন দৃষ্টি না রাখিয়া ঘটনাগুলিই বলিয়া যাইব।

তৎকালীন ইটালীদেশীয় এক কোম্পানীর 'রুবাট্টিনো' নামক জাহাজে চড়িয়া ক্যাল্কিন্স প্রভৃতি অনেকে ভারতে আসিতেছিলেন। তিনি জাহাজ ধরিয়াছিলেন নেপলসে। জাহাজের খাবারের ঘরের মধ্যবর্তী একটি টেবিলের এক প্রান্তে ছিল তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট আসন; তাঁহার ঠিক ডানদিকের আসনে বসিতেন মধ্যপ্রদেশের সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী ড্রেক ব্রকম্যান; ব্রকম্যানের বিপরীত দিকে বসিতেন সিভিল সার্ভিসেরই আর একব্যক্তি। লোহিতসাগরে প্রথমবারে আহারের সময় ব্রকম্যানের দক্ষিণে এক সংভ্রান্ত ভারতবাসীর অভ্যুদয় হইল। তিনি নীরবে বসিয়া কিছু সোডা ওয়াটার ও একখানি জাহাজী বিস্কুট খাইয়া উঠিয়া গেলেন। অমনি সকলের কৌতুক জাগিল, ইনি কে? কিন্তু জানিবার উপায়? ভোজনকারীদের একজন অত আদবকায়দার ধার ধারিতেন না; তিনি বেয়ারাকে ডাকিয়া পানীয়ের আদেশ-কার্ডগুলি আনিতে বলিলেন এবং নিজেরটা দেখিবার অছিলায় সব কার্ডগুলি নাড়িয়া একখানি কার্ড বাহির করিলেন যাহাতে পেন্সিলে লিখিত ছিল 'বিবেকানন্দ'। উহা হইতে সকলে জানিয়া লইলেন এই মর্যাদাবান পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। ক্যাল্কিন্স চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীকে দেখিয়াছিলেন—যদিও স্বীয় খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামি থাকায় তিনি তখন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই; দ্বিতীয়বার এইরূপ সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন। স্বামীজী পরের বারেও টেবিলে কাহারও সহিত তেমন কথা বলিলেন না। এদিকে অপরেরা তাঁহার সহিত কথা পাড়িয়া একটু মজা করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন। ক্যাল্কিন্স ঠিক করিলেন, এভাবে অপরের পেছনে লাগা অন্যায়। অতএব পরবর্তী দশ দিন জাহাজের অপরেরা যদিও স্বামীজীর সহিত বাদ-প্রতিবাদে মাতিয়া গেলেন, ক্যাল্কিন্স নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন। ইহার ফলে স্বামীজী ও তাঁহার মধ্যে একটা হৃদ্যতা জমিয়া উঠিল।

একদিন স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমেরিকান?" "হাঁ।" "মিশনারী?" "হাঁ।" স্বামীজী জানিতে চাহিলেন, "আপনি আমার

দেশে ধর্মপ্রচার করেন কেন?" ক্যাম্বিন্স প্রত্যুত্তর দিলেন, "আপনিই বা আমার দেশে ধর্মপ্রচার করেন কেন?" তারপর স্বামীজীর কৌতুক-ভরা চোখের পাতা একটু নড়িবামাত্র দুই জনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; অমনি বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া গেল।

প্রথম দুই-একদিন টেবিলে বসিয়া স্বামীজীকে কথার প্যাঁচে ফেলিবার মতলবটা তেমন কার্যকর হয় নাই। স্বামীজী স্বল্প কথায় অথচ এমন যথোচিত পালটা জবাব দিয়া যাইতেছিলেন আর তাহা এমনই চমৎকার হইতেছিল যে, আলোচনা জমিবার সুযোগ ঘটিতেছিল না। তাঁহার কথাগুলি সমুচিত উদ্ধৃতি ও সংক্ষিপ্ত অর্থপূর্ণ বাক্যে ঝলমল করিত। কাজেই ব্রকম্যান ছাড়া আর সকলেই স্বামীজীর সহিত বাক্যযুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার দুরাশা ত্যাগ করিলেন। একদিন স্বামীজীর বক্তব্য সর্বাধিক উৎকর্ষলাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হইল। বাধা ও প্রশ্ন সত্ত্বেও তিনি স্বীয় বক্তব্য বলিয়াই চলিলেন এবং কথা শেষ করিয়া সকলকে যথারীতি অভিবাদনান্তে ভোজনকক্ষ হইতে বিদায় লইলেন। অমনি অতি-বুদ্ধিমান সিভিলিয়ানদ্বয় ঠিক করিয়া ফেলিলেন, স্বামীজী তাঁহার মুখস্থ করা বক্তৃতাগুলিরই একটি সেদিন ঝাড়িয়া দিয়া গেলেন। হিংসাপর ও দাম্ভিক সমালোচক বা আহাম্মকের বুদ্ধি এমনি ভাবেই বিভ্রান্ত হয়, সত্যের মুখ এমনি করিয়া তাহাদের নিকট আবৃত থাকিয়া যায়! ক্যাম্বিন্সও এই ভ্রম করিয়াছিলেন। করিবেনই বা না কেন? হাজার হউক মিশনারী তো? আর সাদা-চামড়া! কালো-চামড়ার কেহ নোট-এর সাহায্য না লইয়া বিনা প্রযত্নে এমন সুন্দর ইংরেজী ভাষায় এমন বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ দিতে পারেন—প্রত্যক্ষ দেখিলেও যে একথা অবিশ্বাস্য!

আর একদিন বিদেশীদের সহিত ভাবসংঘর্ষের ফলে স্বামীজী গর্জিয়া উঠিলেন, "শাসন পরিচালনে সুকৌশল ইংরেজরা আমাদের শেখাতে পারে; কারণ ও বিদ্যায় ব্রিটেন সর্বজাতির শীর্ষস্থানে।" তারপর ক্যাম্বিন্সের দিকে ঘুরিয়া বলিলেন, "আমেরিকা আমাদের কৃষিবিদ্যা ও বিজ্ঞান এবং আপনাদের কর্ম-কুশলতা শেখাতে পারে; কারণ ওসব বিষয়ে আমরা আপনাদের শিষ্যস্থানীয়; কিন্তু—" বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর স্বরে একটু তীব্রতা আসিয়া পড়িল—"কোন জাতি যেন ভারতকে ধর্ম শেখাবার স্পর্ধা না রাখে—কারণ এক্ষেত্রে ভারতই সব জাতিকে শেখাবে।"

সে রাত্রে ডেকে বেড়াইতে বেড়াইতে ক্যাম্বিন্স বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বামীজী যে অর্থে মিশনারীদিগকে ভারতে ধর্মপ্রচার হইতে বিরত থাকিতে বলিতেন, সে অর্থে কোন মিশনারীই ধর্মপ্রচার করিতেন না—তাঁহারা শুধু যীশুখৃষ্টের প্রতি ভারতবাসীদের প্রেম আকর্ষণেই উন্মুখ ছিলেন। পরবর্তী দুই দিন ইঁহাদের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পাইলে ক্যাম্বিন্স লক্ষ্য করিয়াছিলেন, উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে স্বামীজী যেন আপনাকে কোন অচেনা লোকে হারাইয়া ফেলিতেন, আর এই ভাবান্তর আসিত স্বাভাবিক রূপে, উহার মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা থাকিত না। বোম্বে পৌঁছাইবার পূর্ববর্তী শেষ রাত্রে জাহাজের সম্মুখস্থ ডেকে দাঁড়াইয়া তাঁহারা কথা বলিতেছিলেন। অকস্মাৎ স্বামীজী ক্যাম্বিন্স-এর স্কন্ধে স্বীয় হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "লোকেরা নিজ নিজ বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খৃষ্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে যে যত কিছু বলিতে চায়, বলুক ; কিন্তু মহাশয়, আমরা—আমরা দুই জনে জানি আমরা সর্ব-স্বরূপের অংশমাত্র।" অবশ্য খৃষ্টান মিশনারী ক্যাম্বিন্স-এর পক্ষে এরূপ মতবাদ স্বীকার করা সম্ভব ছিল না ; কথায়ও তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্বামীজী তখন ভাবস্থ ; তাঁহার চক্ষু স্তিমিত —মন কোন্ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল, তাহার তত্ত্ব ক্যাম্বিন্স জানিতেন না।

পরদিন জাহাজ বোম্বাই বন্দরে ভিড়িল। স্বামীজী না জানাইয়া আসিয়াছিলেন ; অতএব স্বাগত সম্ভাষণের জন্য কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। তিনি নামিলেন এবং তখনই কলিকাতা গমনের জন্য ট্রেন ধরিলেন। দৈবক্রমে ট্রেনে তাঁহার পূর্বপরিচিত বন্ধু শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিদেশী পোশাকে সজ্জিত স্বামীজীকে তিনি প্রথমে চিনিতেই পারেন নাই ; কিন্তু পরে উভয়ে পূর্বেরই ন্যায় অনেকক্ষণ আমোদ-আহ্লাদে কাটাইলেন।

৯ই ডিসেম্বর (১৯০০) সন্ধ্যার বহু পরে স্বামীজী অকস্মাৎ বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা সবেমাত্র আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় বাগানের মালী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘোষণা করিল, এক সাহেব আসিয়াছেন। অমনি তাড়াতাড়ি তাহাকে সম্মুখের ফটকের চাবি দিয়া পাঠানো হইল এবং এত রাত্রে কে সাহেব, কোথা হইতে, কেন আসিলেন, এই বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইল। হঠাৎ সকলে সবিস্ময়ে দেখেন, সাহেব নিজেই দ্রুতপদে তাঁহাদের দিকে আসিতেছেন ; একটু নিকটে আসিতেই চিনিতে বিলম্ব হইল না—এ যে স্বামীজী ! অমনি "স্বামীজী এসেছেন", "স্বামীজী

এসেছেন”—সহর্ষকণ্ঠের এই ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, আর একটা মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। প্রথমে তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই তো; পরে যখন নিঃসন্দিগ্ধভাবে চিনিলেন—ইনি স্বামীজী, তখনও বুঝিতেই পারিলেন না, কি করিয়া তিনি ভিতরে আসিলেন, কারণ ফটকে তো তালা দেওয়া ছিল। স্বামীজী নিজেই বুঝাইয়া দিলেন, “তোদের খাবার ঘণ্টা শুনেই ভাবলুম, এই যাঃ এখনি না গেলে হয়তো সব সাবাড় হয়ে যাবে! তাই আর দেরী করলুম না।” অর্থাৎ তিনি মালীকে দিয়া খবর পাঠাইয়াই আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্বক ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অনতিবিলম্বে তাঁহার জন্য আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দেওয়া হইলে তিনি বসিয়া তৃপ্তি সহকারে খিচুড়িপ্রসাদ চাহিয়া খাইতে লাগিলেন; অনেক দিন উহা খাওয়া হয় নাই, সুতরাং উহার প্রতি স্বভাবতই একটা আকর্ষণ ছিল। খাইতে বসিয়া এবং পরেও নানা গল্পগুজব চলিতে লাগিল। সে রাত্রে কাহারও চক্ষে ঘুম ছিল না বলিলেই চলে। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার দর্শন ঘটিয়াছিল; তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া যেন আশ মিটিতেছিল না, সমস্ত রাত্র ব্যাপিয়া মঠে এক অনাবিল আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়াছিল।

এইবারে প্রত্যাবর্তনের পর পশ্চিম-সম্বন্ধে স্বামীজী যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে একটু ভাবের পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছিল। পূর্ববারে প্রশংসার চক্ষে দেখিয়া তিনি সবই অত্যুত্তম বলিয়া প্রকাশ করিলেও, এবারে সে নিরবচ্ছিন্ন গুণগানের স্থলে একটু সমালোচনাও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মোটামুটি তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন: “প্রথম যেবার ওদেশে যাই, তখন ওদের ক্ষমতা, ওদের একত্র দল বেঁধে কার্য করার রীতি ইত্যাদি দেখে বড় ভাল লেগেছিল, কিন্তু এবার দেখলুম, ওদের ব্যবসাদারীটা বড় বেশী, অর্থলোভ স্বার্থপরতা আর নিজের সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা—এসবেই যেন ভরে রয়েছে। তারপর গরীব লোকদের খাটিয়ে নিয়ে লাভের অংশটি বড়লোকেরা ভোগ করছেন, ছোটখাট কারবারের সুবিধাগুলি বড় বড় একজোট-কারবারে (কম্বিনেশনে) গিলে খাচ্ছে। এসব শোষণপ্রণালী কি ভাল?” এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, স্বামীজী আর একজনকে একবার বলিয়াছিলেন, “দলবাঁধার অভ্যাসটা খুব ভাল বটে, কিন্তু একদল নেকড়ে তা বলে কি আর দেখতে সুন্দর?—ওদেশে যত বেশী বেড়ালুম, যত বেশী দেখলুম শুনলুম তত জ্ঞান হল যে ওটা যেন নরক! চীনেরা

মনুষ্যনীতির আদর্শের যত কাছাকাছি গেছে কোন নূতন জাতই ততদূর যায়নি বা যেতে পারেনি।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৮৬৬-৬৭ পৃঃ)। মনে রাখিতে হইবে, ইহা পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বের কথা, যখন চীন বিদেশীর অত্যাচারে ও অপরের অনুকরণে তাহার দর্শন ও জীবনধারার গতি ও রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে নাই।

চীন সম্বন্ধে ঐরূপ আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন শ্রীযুক্ত মন্মথ গাঙ্গুলি। বিদেশীদের সমসাময়িক শোষণের ফলে নূতন চীন যে অভিনব রূপ ধারণ করিবে, তাহাই যেন স্বামীজী মানসচক্ষে দেখিয়াছিলেন। মন্মথবাবু লিখিয়াছেন : "এই সময়ে চীনদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য শক্তিমান দেশগুলি চীনকে ভাগাভাগি করিয়া শোষণনীতি অবলম্বন করিয়াছিল। জাপানও তাহাদের দলে ভিড়িল। সেই সময় স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত পুরাতন সভ্য একটা দেশ—এইবার কি শেষ হয়ে যাবে?' স্বামীজী অল্প কাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, 'আমি দেখছি—একটা প্রকাণ্ড হাতীর পেটে একটা বাচ্চা হয়েছে। সেই বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হল—কিন্তু সেটা একটা সিংহশাবক। এই বাচ্চাটা বড় হবে। তখন নতুন চীন তোয়ের হবে'।" ('উদ্বোধন', ৬২ বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় 'চীনের ভবিষ্যৎ')।

হিমালয়ে শেষবার

শ্রীযুক্ত সেভিয়ারকে দেখিবার জন্য স্বামীজী যথাসম্ভব দ্রুত ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। বেলুড়ে পৌছিয়াই তিনি জানিলেন, সেভিয়ার পূর্বেই ২৮শে অক্টোবর, ১৯০০ তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সেভিয়ার অবশ্য সবিশেষ লিখিয়া প্যারিসের ঠিকানায় যথাসময়ে পত্র দিয়াছিলেন ; কিন্তু স্বামীজী তখন পূর্ব ইওরোপ ও মিশরে ঘুরিতেছিলেন। পত্রও তাঁহার পশ্চাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে দুই মাস পরে বেলুড়ে উপস্থিত হইয়াছিল। সেভিয়ারের মৃত্যুতে স্বামীজী খুবই দুঃখিত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার একাধিক পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীযুক্তা সেভিয়ারের পত্রপ্রাপ্তির পূর্বে ১১ই ডিসেম্বর তিনি শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, "পরশু রাত্রে আমি এখানে পৌছেছি ; কিন্তু হায় ! এত তাড়াহুড়া করে এসেও কোন লাভ হল না। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বেচারা কয়েক দিন পূর্বেই দেহত্যাগ করেছেন। এভাবে দুজন মহাপ্রাণ ইংরেজ[1] আমাদের জন্য—হিন্দুদের জন্য আত্মদান করলেন। শহীদ কোথাও থাকে তো—এঁরাই।" আর ওলি বুলকে ১৫ই ডিসেম্বরের পত্রে লিখিয়াছিলেন, "মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। এটা সত্যই একটা প্রচণ্ড আঘাত—হিমালয়ের কাজের ভবিষ্যৎ যে কি হবে জানি না। মিসেস সেভিয়ার এখনও সেখানে আছেন এবং আমি রোজই তাঁর কাছ থেকে চিঠি আশা করছি।"

স্বামীজী ঠিক করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীযুক্তা সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে মায়াবতী যাইবেন। এতদ্ব্যতীত হিমালয়ের ক্রোড়ে মায়াবতীতে স্থাপিত অদ্বৈত আশ্রমের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহাও জানা আবশ্যক ছিল। সেভিয়ার-দম্পতির অর্থে ও উৎসাহে এবং স্বামীজীর শিষ্যদের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে যে আশ্রমটি প্রথমে আলমোড়ায় ও পরে মায়াবতীতে সুচারুরূপে দুই বৎসরেরও অধিককাল পরিচালিত হইতেছিল এবং যাহার প্রভাব ক্রমেই দূর দূরান্তরে প্রসারিত হইতেছিল তাহা কি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে, অথবা সেভিয়ার-গৃহিণী স্বামীর আরব্ধ কর্ম সহধর্মিণীরূপই সমুচিতরূপে পূর্ববৎ চালাইয়া যাইবেন—ইহা স্বামীজীর মনে এক সমস্যাকারে দেখা দিয়াছিল। পরে তিনি শ্রীযুক্তা সেভিয়ারের

১। গুডউইন ও সেভিয়ার।

পত্র পাইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্দেহ অলীক—শ্রীযুক্তা সেভিয়ার পতির বিরহ ধর্মপ্রাণা সতীরই ন্যায় সহ্য করিয়াছিলেন এবং মায়াবতীর কার্য বন্ধ করার কথা তিনি মোটেই কল্পনা করেন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্তা সেভিয়ারের ঐরূপ আশ্বাসপ্রদ পত্র হস্তগত হইবার পুর্বে স্বামীজীর দিক হইতে তাঁহার মনোভাব জানার চেষ্টা করা স্বাভাবিক বলিয়াই তিনি তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন (১১ই ডিসেম্বর ও ১৫ই ডিসেম্বরের পত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য)। যথাকালে শ্রীযুক্তা সেভিয়ারের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তিনি ২৬শে ডিসেম্বর শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন: "মিসেস সেভিয়ার অবিচলিত আছেন। প্যারিসের ঠিকানায় তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা এই ডাকে ফিরে এল। আগামীকাল আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পাহাড়ে যাব। ভগবান তাঁহার এই প্রিয় ও সাহসী মহিলাকে আশীর্বাদ করুন।" ঐ পত্রেই আমরা জানি ক্যাপ্টেন সেভিয়ার কতখানি হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে স্থানীয় লোক ও সাধু ব্রহ্মচারীদের কিরূপ হৃদয় জয় করিয়াছিলেন: "আমাদের প্রিয়বন্ধু—মিঃ সেভিয়ার আমি পৌঁছিবার আগেই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাশ দিয়ে যে (পাহাড়ী) নদীটি প্রবাহিত, তারই তীরে হিন্দুরীতিতে তাঁর সংকার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁর পুষ্পমাল্যশোভিত দেহ বহন করে নিয়েছিল এবং ব্রহ্মচারীরা বেদধ্বনি করেছিল।" আর এই নিদারুণ ঘটনায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, "আমি নিজে দৃঢ় এবং শান্ত আছি। আজ পর্যন্ত কোন ঘটনা কখনও আমাকে বিচলিত করতে পারেনি; আজও মহামায়া আমাকে অবসন্ন হ'তে দেবেন না।"

ক্যাপ্টেন সেভিয়ার চলিয়া গিয়াছেন, শ্রীযুক্তা সেভিয়ারের সম্বন্ধে যে ভয় ছিল, তাহা দূরীভূত হইয়াছে। স্বামীজী তথাপি স্থির করিলেন, তাঁহাকে একবার মায়াবতী যাইতেই হইবে। তদনুযায়ী তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্তা সেভিয়ারের পক্ষ হইতে সাদর আহ্বান আসিয়াছিল। আশ্রমবাসীরাও তাঁহাকে পাইবার জন্য অতীব আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু পথ ছিল দুর্গম; কুলি, ডাণ্ডী ইত্যাদির সাহায্য ব্যতীত সে পার্বত্যপথ অতিক্রম করা স্বামীজীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার তখন দারুণ শীত; ঐ কালে অনেক পর্বতবাসী নীচে সমতলভূমিতে নামিয়া যায়। অতএব অকস্মাৎ লোকসংগ্রহ করা সুকঠিন। তাই স্বামীজীকে জানানো হইয়াছিল, তিনি যেন অন্ততঃ আট দিন পুর্বে

সংবাদ দেন। কার্যতঃ তাহা হইল না। স্বামীজী তারবার্তা পাঠাইবার স্বল্প পরেই কাঠগোদাম যাত্রা করিলেন। তখনকার দিনে মায়াবতীতে তার পৌঁছাইতে যথেষ্ট সময় লাগিত; উহা তাঁহারা পাইলেন ২৫শে ডিসেম্বর বৈকালে। অতএব সেখানে এক অসম্ভব পরিস্থিতির উদ্ভব হইল—স্বামীজী তিন দিন পরে কাঠগোদামে পৌঁছাইতেছেন, এত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? অবশেষে অদ্ভুতকর্মা গুরুভক্ত স্বামী বিরজানন্দ (বা কালীকৃষ্ণ) এই দুরূহ ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী আমরা বাঙ্গলা ও ইংরেজী জীবনীদ্বয় ও 'অতীতের স্মৃতি' (১১৮-৩০ পৃঃ) অবলম্বনে উপস্থিত করিতেছি।

২৯শে ডিসেম্বর ভোরে স্বামীজীদের কাঠগোদামে পৌঁছাইবার কথা ছিল; মায়াবতী হইতে উহার দূরত্ব পঁয়ষট্টি মাইল—পায়ে হাঁটিয়া আসিতে অন্ততঃ তিন দিন লাগার কথা। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দের অনুমতিক্রমে স্বামী বিরজানন্দ ২৬শে তারিখ সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, সাধ্য-সাধনা করিয়া ও বকশিশের লোভ দেখাইয়া ডাণ্ডীর ও মালের জন্য কুলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাদের সহিত হাঁটিয়া দুই দিনে ঐ সুদীর্ঘ পার্বত্যপথ অতিক্রমান্তে ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রি বারটায় কাঠগোদামে উপস্থিত হইলেন; স্বামীজীর ট্রেন আসিল রাত্রিশেষে ভোর পাঁচটায়। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন স্বামী শিবানন্দ ও স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য স্বামী সদানন্দ (বা গুপ্ত মহারাজ)। কালীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্বামীজী সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং অল্প সময়ে কিভাবে অসাধ্য সাধিত হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "বাঃ, এই তো ঠিক আমার চেলা!" কালীকৃষ্ণ ও কুলিদিগকে ক্লান্ত দেখিয়া এবং নিজেরও একটু জ্বর-জ্বর ভাব হইয়াছে বুঝিয়া স্বামীজী স্থির করিলেন, একদিন কাঠগোদামে বিশ্রাম করিবেন। স্বামীজীর মনে সন্দেহ ছিল যে, মায়াবতী হইতে এত অল্প সময়ে হয়তো কেহ আসিতে পারিবে না। তাই তিনি আলমোড়াতে লালা বদ্রীশার নামেও তার পাঠাইয়া জানাইয়াছিলেন যে, মায়াবতীর লোক না আসিলে তিনি আলমোড়া যাইবেন। তার পাইয়া বদ্রীশা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র[২] গোবিন্দলাল শাকে কাঠগোদামে পাঠাইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে (৩০শে ডিসেম্বর) যখন মায়াবতী যাত্রা আরম্ভ হইল তখন গোবিন্দলালও সঙ্গে চলিলেন। বিরজানন্দকে ক্লান্ত দেখিয়া স্বামীজী

২। বাঙ্গলা জীবনীতে ভ্রাতা, 'অতীতের স্মৃতিতে' ভ্রাতুষ্পুত্র।

তাঁহার জন্য একটি ঘোড়া লইতে আদেশ করিয়াছিলেন। বিরজানন্দেরই উপর যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থাভার অর্পিত ছিল। আলমোড়ায় না যাইয়া স্বামীজীকে তখনই মায়াবতী লইয়া যাইবার দায়িত্বও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্ত পূর্বে মায়াবতীতেই স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল। আশ্রম-বাসীরা ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, কেহ যদি যথাসময়ে কাঠগোদামে উপস্থিত না থাকেন, তবে স্বামীজী আলমোড়া চলিয়া যাইবেন এবং পরে আবহাওয়া খারাপ হইলে হয়তো মায়াবতী গমনের সঙ্কল্পই পরিত্যক্ত হইবে। এইজন্যই দ্রুত রেল-স্টেশনে উপস্থিত হওয়া ও স্বামীজীকে লইয়া যাওয়ার জন্য বিরজানন্দের আগ্রহের অন্ত ছিল না। এখন স্বামীজী সম্মত হওয়ায় তিনি সানন্দে তাঁহার রন্ধন ও ব্যক্তিগত সেবার ভার স্বহস্তে লইয়া মায়াবতী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ স্বামী সদানন্দ স্বামীজীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও লটবহর প্রভৃতির দায়িত্ব লইলেন।

প্রথম দিনে তাঁহারা ভীমতালে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া ভোজনাদি শেষ করিলেন, অতঃপর পথ চলিয়া সন্ধ্যাকালে ১৭ মাইল দূরবর্তী ঢারী নামক স্থানে ডাকবাঙ্গলোতে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় লইলেন। সেদিনও রাত্রি ভালই কাটিয়া-ছিল। কিন্তু পরদিন ঢারী হইতে দুই মাইল যাইতে না যাইতে কুয়াসায় (বা নিম্নচারী জলভরা মেঘে) চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া জানাইয়া দিল যে, দুর্যোগ আসন্নপ্রায়।[৩] অল্পপরেই প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল, তাহার পরই তুষারপাত। প্রথম প্রথম বরফ খুব বেশী না পড়িলেও বৃষ্টি বেশ চাপিয়া আসিয়াছিল, তাই পথ পিচ্ছিল হইয়া গেল। চলিতে চলিতে বিশেষতঃ উতরাই-এর সময় ডাণ্ডী-বাহকদের. পদস্খলন হইতে লাগিল। বরফের ঠাণ্ডা বা পাহাড়ের দুর্যোগের সহিত স্বামীজী অপরিচিত ছিলেন না, আর অসুবিধার মধ্যেও তিনি মনকে প্রফুল্ল রাখিতে জানিতেন। অতএব আনন্দ করিতে করিতে ও সুইজরল্যাণ্ডের গল্প শুনাইতে শুনাইতে তিনি চলিলেন, মাঝে মাঝে বাহকদের সহিত মশকরাও চালাইলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল বেশ মজার লোক। তাহার বার-কতক বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সব স্ত্রীই তখন গতাসু। চণ্ডী পুস্তকখানি ছিল তাহার মুখস্থ। সে উহা স্বীয় অদ্ভুত সুর ও উচ্চারণসহ অপরকে শুনাইয়া আত্ম-

৩। বাঙ্গলা জীবনীর মতে ভোরেই বৃষ্টি পড়িতে থাকায় যাত্রা দেরীতে আরম্ভ হয়।

প্রসাদ লাভ করিত। স্বামীজীকেও শুনাইতে ছাড়িল না—যদিও মাঝে মাঝে ভুল হইল এবং স্বামীজী সংশোধন করিয়া দিলেন। স্বামীজী তাহাকে পণ্ডিতজী বলিয়া ডাকিতেন। এক অবসরে তিনি পণ্ডিতজীকে শুধাইলেন, সে পুনর্বার বিবাহ করিতে প্রস্তুত কিনা। সে অম্লানবদনে উত্তর দিল, "তা খুব রাজী, কিন্তু যৌতুকের টাকা কোথায়?" স্বামীজী বলিলেন, "ধর যদি আমি দিই।" তখন পণ্ডিতজীর আহ্লাদ দেখে কে? সে বারংবার স্বামীজীকে প্রণাম করিতে লাগিল।

দুর্যোগের মধ্যে ধীরে ধীরে চলিয়া এবং আহারাদির জন্য থামিয়া বেলা তিনটায় ডাণ্ডী মাত্র সাড়ে সাত মাইল দূরবর্তী পহরাপানিতে পৌঁছিল। আরও সমপরিমাণ পথ চলিলে পরবর্তী ডাকবাঙ্গলো পাওয়া যাইত, সুতরাং বাকি রাস্তা একটানা ও দ্রুত চলার প্রয়োজন ছিল। বিরজানন্দ সমস্ত দলটিকে সামলাইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন, আর অগ্রবর্তীদের বলিয়া দিয়াছিলেন, ডাণ্ডী যেন না থামে, কারণ কুলিদের রীতিই এই যে, তাহারা তামাক খাইবার অছিলায় কোথাও বসিয়া পড়ে এবং আর নাড়িতে চায় না। ডাণ্ডীর কুলিরা ঐ সাড়ে সাত মাইল অতিক্রম করার পর একটি দোকান দেখিয়া চা ও তামাক খাইবার জন্য ডাণ্ডী থামাইতে চাহিল। পূর্বের সতর্কতার কথা মনে থাকিলেও এই দুর্যোগের দিনে দয়াপরবশ হইয়া স্বামীজী অনুমতি দিলেন, আর বলিলেন, "তোরা কিছু খাবার খেয়ে নে, আমি পয়সা দেব, আর কোথা যাবি?" বিরজানন্দ সেখানে আসিয়া যখন কাণ্ডটি দেখিলেন, তখন হতাশ হইয়া পড়িলেন। কুলিরা সেখানেই সাড়ে পাঁচটা বাজাইয়া দিল। শীতের বেলা, সন্ধ্যা তখন আগতপ্রায়। আর দোকান তো ভারী! একটা চালা—চৌদ্দ হাত লম্বা ও হাত দশেক চওড়া। অগত্যা বাধ্য হইয়া সে রাত্রি ঐ অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধ জীর্ণ কুটিরেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিতে হইল। রাত্রে আবার রন্ধন ও শীতনিবারণের জন্য অগ্নি প্রজ্বালনের ফলে ঘরখানি ধূমপূর্ণ হইয়া অস্বস্তি চরমে উঠিল। স্বামীজী অতিষ্ঠ হইয়া ছেলেমানুষের মতো অপরের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামী শিবানন্দকে (বা তারকদাকে) প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সবগুলোই আহাম্মক! যদি বরফ পড়বার ভয় ছিল, তবে কি করে আমাকে আসতে দিলে? কালীকৃষ্ণ না হয় ছেলেমানুষ, কিন্তু তারকদা তুমি বুড়ো মানুষ, তুমি কোন আক্কেলে আমায় এ দুর্যোগের মধ্যে আলমোড়ায় না গিয়ে এদিকে নিয়ে এলে?" কালীকৃষ্ণকে বলিলেন, "তুই আমাকে কাঠগোদাম থেকে আলমোড়ায় যেতে না দিয়ে কেন

মায়াবতী যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলি?" বিরজানন্দ নীরবে সব শুনিয়া স্বামীজী একটু থামিলে ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু দোষ তো আপনারই। আপনাকে তো বারণ করেছিলাম, আপনি কুলিদের ডাণ্ডী থামাবার অনুমতি দিয়েই তো এই বিভ্রাট ঘটালেন। এখানে ওরা এত দেরী না করলে আমরা যে করেই হোক ডাকবাঙ্গলোয় পৌঁছে যেতুম।" এই শান্ত অথচ দৃঢ় আত্মপক্ষসমর্থন শুনিয়া স্বামীজী শিশুরই মতো ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যা হবার হয়েছে, বকেছি, কিছু মনে করিসনি। বাপও তো ছেলেকে বকে। আর এখন যতটা পারা যায়, রাত কাটাবার ব্যবস্থা করা যাক।"

লালা গোবিন্দলাল শা ও স্বামী সদানন্দ ছিলেন দলের পুরোভাগে। তাঁহারা এই অভিপ্রায়ে দ্রুত চলিতেছিলেন যাহাতে স্বামীজী পরবর্তী ডাকবাঙ্গলোয় পৌঁছাইবার পূর্বেই তাঁহারা সেখানে থাকার সব সুব্যবস্থা করিয়া ফেলিতে এবং আগুন জ্বালিয়া ঘর গরম রাখিতে পারেন। স্বামীজী দোকানে ইঁহাদিগকে না দেখিয়া মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—এই দুর্যোগে ঠাণ্ডার মধ্যে না জানি তাঁহারা কত বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে সংবাদসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত দেখিয়া অবশেষে দোকানদার প্রস্তাব করিল যে, সে তাহার ভাগিনেয়কে ডাকবাঙ্গলো পর্যন্ত পাঠাইয়া খবর আনাইতে পারে, কিন্তু সেজন্য দুইটাকা বকশিশ চাই। অগত্যা ঐরূপ ব্যবস্থাই হইল এবং ঘণ্টা কয়েক পরে সংবাদ আসিল যে, তাঁহারা দুইজন ডাকবাঙ্গলোতে নিরাপদে আছেন। রাত্রে উক্ত দোকানদারের হাতে প্রস্তুত মোটা রুটি খাইয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইল এবং পরে গুড়িশুড়ি হইয়া রাত্রি কাটাইতে হইল। সমস্ত রাত্রে কেহই তেমন ঘুমাইতে পারিলেন না। বিরজানন্দ সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—সেদিন ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ যামিনী, পরদিবস প্রত্যুষেই বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইবে; তাই এভাবে ঐ রাত্রিযাপন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বামীজী শুনিয়া একটু চিন্তামগ্নভাবে হাসিলেন। এদিকে তাঁহাদের গল্পগুজবে দোকানদার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারা কেহ পাহাড়ী ভাষা জানেন, এইরূপ না ভাবিয়াই সে তাহার আত্মীয়স্বজনকে বলিয়া যাইতে লাগিল, যাত্রীদিগকে জায়গা দিয়া কুকাজ করিয়াছে; রাত্রি প্রভাত হইলেই সর্বপ্রথমে উঁহাদিগকে তাড়াইবে। সে হয়তো ভাবিয়াছিল এই দুর্যোগে আগন্তুকরা পরের দিনটাও ঐ দোকানেই কাটাইবে। যাত্রীরা কিন্তু থাকিলেন না। পরের দিন এক ফুট গভীর বরফের উপর দিয়াই

যাত্রা শুরু হইল। পূর্বদিনের অব্যবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিরজানন্দ এইদিন স্বামীজীর ডাণ্ডীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। চারিদিকে তখন এক অপূর্ব দৃশ্য—গাছ-পালা, পথ, পাহাড় সব তুষারধবল, আর তাহার উপর প্রভাত-সূর্যের আলোক-সম্পাত এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বামীজী দেখিয়া খুব প্রফুল্ল হইলেন। সে রাত্রি কাটিল মৌরনল্লা ডাকবাঙ্গলোতে। স্বামী সদানন্দের যত্নে পূর্বরাত্রেই এখানে সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা হইয়াছিল; অতএব স্বামীজী অনেকটা আরামবোধ করিলেন এবং ফুর্তি করিয়া পূর্বরাত্রের অভিজ্ঞতার কথা শুনাইতে লাগিলেন।

চতুর্থ দিন (২রা জানুয়ারি) বরফ অনেকটা গলিয়া গিয়াছিল। সেদিন তাঁহাদের বিশ্রামস্থল ছিল একুশ মাইল দূরে ধুনাঘাটের ডাকবাঙ্গলোয়। শেষের দিকে স্বামীজী লাঠিতে ভর দিয়া ও বিরজানন্দের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া খানিকটা রাস্তা হাঁটিয়া চলিলেন আর বলিলেন, "দেখ, আগে বিশ-পঁচিশ মাইল হাঁটা আমার কাছে কিছুই ছিল না। এখন কি রকম দুর্বল হয়ে গেছি—একটু হাঁটতেই কত কষ্টবোধ হচ্ছে।" একটু পরে বলিলেন, "দেখ বাবা, এখন তো জীবনের শেষে এসে পৌছেছি।" বিরজানন্দ চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু স্বামীজী যে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন, একথা তো চাক্ষুষ সত্য! পরের দিন ৩রা জানুয়ারি দ্বিপ্রহরে মায়াবতীর অবস্থানস্থলের পাহাড়ের বিপরীতদিকের উচ্চ পাহাড় হইতে আশ্রমের বাড়ীগুলি চারিদিকে দেওদার, সরল, ওক, রডডেণ্ড্রন প্রভৃতি বৃক্ষবেষ্টিত থাকিয়া স্বামীজীর চক্ষে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সেখান হইতে আশ্রমের নীচে খডে যে ঝরণার ধারে সেভিয়ারের শেষকৃত্য সমাপ্ত হইয়াছিল, সেখানে নামিয়া তিনি শুনিলেন অদ্বৈত আশ্রমের ঘণ্টায় বারটা বাজিতেছে। অমনি খাবার সময় উপস্থিত জানিয়া তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য একটি ঘোড়ায় চড়িলেন এবং বেগে উহাকে ছুটাইয়া আশ্রমে উপনীত হইলেন। আশ্রমে পৌছাইয়া দেখিলেন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আশ্রমবাটীকে পত্রপুষ্পে সজ্জিত করিয়া আরও সুন্দর করা হইয়াছে।

মায়াবতীতে স্বামীজী ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত থাকিয়া ১৮ই তারিখে কলিকাতা-ভিমুখে যাত্রা করেন। দীর্ঘ পদচারণ ভালবাসিলেও ঐ সময় আশ্রমের চারি-পার্শ্বের জমি প্রায়ই বরফে ঢাকা থাকায় তাঁহাকে অধিকাংশ সময় গৃহাভ্যন্তরে কাটাইতে হইত। সুযোগ পাইলে তিনি ভ্রমণেও নির্গত হইতেন। অন্য সময়

আশ্রমবাসীদের সহিত গল্পগুজব করিতেন, কিংবা পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি হইতে যাঁহারা তাঁহার দর্শনার্থ উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেন। শরীর তখন খুবই খারাপ ছিল, পরিশ্রম মোটেই সহ্য হইত না, মাঝে মাঝে হাঁপানির টানও চলিত। তবু তিনি মায়াবতীতে বেশ আনন্দে ছিলেন—ইহা তাঁহার ঐ কালের পত্রসকল হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। তাঁহার ৬ই জানুয়ারির পত্রে আছে : "মিসেস সেভিয়ার খুব দৃঢ়চিত্ত মহিলা এবং খুব শান্ত ও সবলভাবে শোক সহ্য করে নিয়েছেন। তিনি এপ্রিল মাসে ইংলণ্ড যাচ্ছেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি। এ স্থানটি অতি সুন্দর এবং তারা (আশ্রমবাসীরা) একে খুব মনোরম করে তুলেছে। কয়েক একর পরিমিত বিশাল স্থানটি সযত্নে রাখা হয়েছে। আশা করি, মিসেস সেভিয়ার ভবিষ্যতে ইহা রক্ষা করতে পারবেন। অবশ্য তিনি বরাবরই এরূপ আশা করেছেন।···হিমালয়ে বেশ ভাল আছি। এখানে খুব বরফ পড়েছে, পথে প্রবল হিমঝঞ্ঝার মধ্যে পড়েছিলাম। কিন্তু ঠাণ্ডা তত বেশী নয়। এখানে আসার পথে দুদিন ঠাণ্ডা লাগায় খুব উপকার হয়েছে বলে মনে হয়। আজ মিসেস সেভিয়ারের জমিগুলি দেখতে দেখতে বরফের উপর দিয়ে মাইল খানেক চড়াই করেছি। সেভিয়ার সব জায়গায় সুন্দর রাস্তা তৈরী করেছেন। প্রচুর বাগান মাঠ ফলগাছ এবং দীর্ঘ বন তাঁর দখলে। থাকবার কুটীরগুলি কি সাদাসিদে পরিচ্ছন্ন সুন্দর এবং সর্বোপরি কাজের উপযোগী!···. চারিদিকে ছ-ইঞ্চি গভীর বরফ পড়ে আছে, সূর্য উজ্জ্বল ও মহীয়ান আর মধ্যাহ্নে বাহিরে বসে আমরা বই পড়ছি। আমাদের চারধারেই বরফ! বরফ থাকা সত্ত্বেও শীতকাল এখানে বেশ মৃদু। বায়ু শুষ্ক ও স্নিগ্ধকর এবং জল প্রশংসার অতীত।"

তাঁহার মায়াবতী অবস্থানকালে যেসকল ব্যক্তি তাঁহার দর্শনার্থ সেখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গলা জীবনীতে এই কয়জনের কথা উল্লিখিত আছে : ৬ই জানুয়ারি আসিয়াছিলেন চম্পাবতের একদল দর্শনার্থী। ৯ই তারিখে আসিয়াছিলেন চীরাপানি নামক স্থান হইতে বাঙ্গলার ভূতপূর্ব ছোটলাটের পুত্র শ্রীযুক্ত বীডন। তিনি ছিলেন এক চা-বাগানের স্বত্বাধিকারী। ১১ই তারিখে আসিয়াছিলেন তহশীলদার ও তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক। ১৩ই জানুয়ারি ছিল স্বামীজীর জন্মতিথি ; সেদিন তিনি আটত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়া উনচল্লিশে পদার্পণ করিলেন। পরদিন ছিল ক্যাপ্টেন

সেভিয়ারের জন্মদিন; বাঁচিয়া থাকিলে তিনি সেদিন ৫৭ বৎসর বয়সে পড়িতেন।

স্বামীজী যে এক পক্ষকাল মায়াবতীতে ছিলেন, তাহার প্রতিটি দিনই ছিল আনন্দে পরিপূর্ণ। বাহিরে যাইতে না পারিলেও ঘরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া উহার সম্মুখে আরামে বসিয়া তিনি সাধুব্রহ্মচারীদের সহিত কত গল্প-গুজবে, কত প্রেরণাময় কথায়ই না সময় কাটাইতেন। প্রথমে তাঁহাকে আশ্রমবাড়ীর দোতলায় একখানি ঘরে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সেখানে ঘর গরম রাখার সুব্যবস্থা না থাকায় পরে তাঁহাকে নীচে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বেই বিছানা করিয়া দেওয়া হয়। সেখানে এবং দিনের বেলায় সূর্য উঠিলে রৌদ্রে বসিয়া কথাবার্তা হইত। আশ্রমবাসীরা সর্বদা তাঁহার সেবা করিতেন কিংবা আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাঁহার কথামৃত পান করিবার জন্য। "যে কথায় তন্দ্রা কাটে, জড়তা ছুটে, মোহ দূরীভূত হয়, হৃদয় নাচিয়া উঠে, ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ বহিতে থাকে, সে কথা শুনিয়া কি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়?" একদিন পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের আনুগত্যের কথা হইতেছিল। কথা বলিতে বলিতে যেন তাঁহার ভাবসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি বক্তৃতাদানের ভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও দীপ্তনয়নের বিমল জ্যোতিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া পরিষ্কার সতেজকণ্ঠে পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের গুরুভক্তির কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সে দেশে কত ভক্ত ছিল যাহারা তাঁহার আদেশে মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত ছিল; তাহারা কিরূপ নীরবে একনিষ্ঠমনে তাঁহার সেবা করিত, অর্থের মায়ামমতা ছাড়িয়া কিরূপে অকাতরে মুক্তহস্তে তাঁহার জন্য ব্যয় করিত, এমন কি তাঁহার একটি কথায় সর্বস্ব বিসর্জন দিত— এই সব কথাই সকলকে শুনাইতে শুনাইতে তিনি বলিলেন, "এই দেখ ক্যাপ্টেন সেভিয়ার কেমন করে আমার কাজের জন্যে মায়াবতীকে প্রাণটা দিয়ে গেল।" আর একদিন আজ্ঞাবহতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "জোর করে কেউ কাউকে দিয়ে ভক্তি বা হুকুম-তামিল করাতে পারে না। খাঁটি প্রেম-ভালবাসা আর মহচ্চরিত্রের কাছে সকলেই নত হয়। সুতরাং যার এ দুটি আছে, তাকে সকলেই মানে।" তাঁহার মতে তিনটি জিনিস মানা জীবনে অত্যাবশ্যক ছিল— যে ব্রত গৃহীত হইয়াছে, যে সম্প্রদায়কে স্বীকার করা হইয়াছে ও যিনি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বা মঠাধীশ।

একদিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দকে আশ্রমপরিচালন সম্বন্ধে তেজঃপূর্ণ ভাষায় উপদেশ দিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল কথার কার্যে পরিণতির জন্য

পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেছিলেন। স্বরূপানন্দ সমস্ত মানিয়া লইয়া বলিলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ঐ ভাবে চলিতে ও স্বামীজীর সমস্ত কথাই অক্ষরে অক্ষরে কার্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত থাকিলেও অপর সকল আশ্রমবাসীর সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও প্রত্যেকের নিকট হইতে মায়াবতীতে অন্ততঃ তিন বৎসর থাকার প্রতিশ্রুতি না পাইলে ফললাভ সুদূরপরাহত। স্বরূপানন্দের উক্তির তাৎপর্য ও যুক্তিযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করিতে স্বামীজীর অধিক সময় লাগিল না ; তাই সকলে সমবেত হইলে তিনি ঐ কথা উত্থাপনপূর্বক তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। সকলেই স্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, শুধু বিরজানন্দ (কালীকৃষ্ণ) জানাইলেন যে, তিনি কিছুদিন নির্জনে অবস্থানপূর্বক মাধুকরী-ভিক্ষাবলম্বনে জীবনযাপন ও ধ্যানধারণায় সময় কাটাইতে চাহেন। মাধুকরীর কথা শুনিয়া স্বামীজী বিরজানন্দকে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য যুক্তি দেখাইলেন ও নিজের অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখ্। অত কষ্ট করে শরীরটাকে মাটি করিসনি। আমরা শরীরটাকে বেজায় কষ্ট দিয়েছি। তার ফলে হয়েছে কি ?—না, জীবনের যেটা সবচেয়ে ভাল সময়, সেখানটায় শরীর গেল ভেঙ্গে। আর আজও পর্যন্ত তার ঠেলা সামলাচ্ছি। তারপর অনেকক্ষণ ধ্যানধারণার কথা কি বলছিস ? যদি পাঁচ মিনিট—পাঁচ মিনিট কেন এক মিনিটও মনটা একটা বিষয়ে একাগ্র করতে পারিস তাহলে যথেষ্ট। আর তা করতে হলে রোজ সকালে বিকালে একটা সময় নির্দিষ্ট করে অভ্যাস করতে হবে। বাকি সময়টা পড়াশুনো, কি সাধারণের হিতকর কোন কাজে লাগিয়ে রাখবি। আমি চাই, আমার শিষ্যেরা শারীরিক কৃচ্ছ্রতার চেয়ে কর্মের দিকে বেশী ঝোঁক দিবে। কর্ম আর কি ?—সাধনা ও তপস্যারই তো একটা অঙ্গ।"

স্বামী বিরজানন্দ সব যুক্তিই মানিয়া লইলেন ; অথচ নিজের উদ্দেশ্যেও অটল রহিলেন—তাঁহার মতে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয়ার্থ প্রথম দিকে একটু তপস্যারও প্রয়োজন। স্বামীজী বিরজানন্দের জিদ দেখিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া ধমকাইতে লাগিলেন ; কিন্তু বিরজানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন—তিনি স্বামীজীর স্বভাব জানিতেন, অতএব কথার মুখে বাধা দিয়া আর বিরক্তিবৃদ্ধি করিতে সাহস পাইলেন না, নীরবে নতমুখে সব গালাগালি সহ্য করিয়া কার্যব্যপদেশে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তখন স্বামীজী শান্ত হইয়া বলিলেন, "মোটের উপর

কিন্তু কালীকৃষ্ণ যা বলেছে, তাই ঠিক। ওর হৃদয়টা আমি বুঝেছি। ধ্যানধারণা আর স্বাধীন জীবন—এইটা যে সন্ন্যাসজীবনের প্রধান গৌরব তা কি আর আমায় বলতে হবে রে! আমারও এক সময়ে অমনি করে দিন কেটেছে—একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর সম্বল নিয়ে ভিক্ষে মেগে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। সেসব কি সুখের দিনই গেছে! যদি সর্বস্ব দিয়েও আবার সেই দিন ফিরে পাওয়া যেত, তাতেও রাজী আছি।" নবভাবের প্রবর্তক যুগনায়ক জীবন-সন্ধ্যায়ও প্রাচীনধারার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। আবার উপযুক্ত শিষ্য বিরজানন্দও শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন—গতানুগতিকের অনুসরণকেই শ্রেয়ঃ মনে করেন নাই।

স্বামীজীকে মাঝে মাঝে অপ্রসন্ন দেখাইলেও এবং সময়ে সময়ে তিনি ভর্ৎসনাদি করিলেও আশ্রমবাসীরা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইতেন না; তাঁহারা বুঝিতেন, এই সব শ্রুতিকটু কথার আড়ালে আছে একখানি আশীর্বাদে ভরা প্রাণ, আর ভাষা সময়বিশেষে তীব্র হইলেও গরলহীন ও শিক্ষাপ্রদ। শ্রীযুক্তা সেভিয়ারের সহিত যখন তিনি বাক্যালাপ করিতেন, মনে হইত যেন একটি সরল-হৃদয় শিশু স্বীয় জননীর সহিত কথা কহিতেছে।

মায়াবতীর নিকটবর্তী পাহাড়গুলির মধ্যে ধরমঘর পাহাড়টি সর্বোচ্চ এবং সেখান হইতে অভ্রভেদী হিমালয়ের তুষার-শৃঙ্গাবলীর দৃশ্য অতীব মনোরম। একদিকে পশ্চিমের কেদার-বদরীর অথবা তদপেক্ষাও পশ্চিমের শৃঙ্গাবলী হইতে অপরদিকে পূর্বে অন্নপূর্ণা ধবলগিরি প্রভৃতি নেপালের বহু প্রসিদ্ধ হিমকূটের দৃশ্য সেখানে যুগপৎ নয়নপথে নিপতিত হইয়া চিত্ত মুগ্ধ করিয়া থাকে। স্বামীজী একদিন প্রাতঃকালে আশ্রমবাসীদের সহিত দেড় মাইল দূরবর্তী ধরমঘর-চূড়ায় বেড়াইতে গেলেন। সেখানকার দৃশ্যটি তাঁহার নিকট এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সেখানে একটি আশ্রমস্থাপনপূর্বক ধ্যানভজনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য জলের অভাব ও অন্যান্য অসুবিধাবশতঃ আজ পর্যন্ত সেখানে ঐরূপ কিছু করা সম্ভব হয় নাই।

আশ্রমের জমির অন্তর্ভুক্ত একটি পাহাড়ের মাথার একাংশে কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণপূর্বক বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখা হইত; অন্য সময় উহা শুকাইয়া যাইত। ঊর্ধ্বে ও নিম্নে দুই ভাগে বিভক্ত জলাশয়টি অবৃহৎ ও অগভীর হইলেও আশ্রম-বাসীরা উহার নাম দিয়াছিলেন লেক বা হ্রদ। হ্রদপার্শ্ববর্তী বাঁধের উপর দিয়া

যে রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে, উহা স্বামীজীর বেশ ভাল লাগিয়াছিল এবং তিনি বলিয়াছিলেন, "জীবনের শেষভাগে সমস্ত জনহিতকর কাজ ছেড়ে এখানে আসব আর গ্রন্থরচনা ও সঙ্গীতালাপ করে দিন কাটাব।" হ্রদে শীতকালে বরফ জমিত। উহা সংগ্রহ করিয়া উহার সাহায্যে বিরজানন্দ একদিন প্রকাণ্ড এক তাল আইসক্রিম তৈরী করিলেন। স্বামীজী উহা পাইয়া খুব আনন্দিত হইলেন।

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম অদ্বৈতসাধনার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেখানে দ্বৈতভাবে পূজানুষ্ঠানাদি অবাঞ্ছিত ছিল। ইহা জানিয়া-শুনিয়াও আশ্রমবাসী কেহ কেহ একখানি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি স্থাপনপূর্বক পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপচারে সাদাসিধাভাবে পূজা শুরু করিয়া দিলেন। বিরজানন্দও এই দলের অগ্রণী ছিলেন। স্বামীজীর পক্ষে ইহা বরদাস্ত করা অসম্ভব ছিল। তথাপি স্বশিষ্য যেসব যুবক ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে প্রত্যক্ষতঃ আঘাত দিবার ভয়ে তিনি ঠাকুরঘর তুলিয়া দিবার আদেশ করিলেন না। এই ব্যাপার তাঁহার জ্ঞানগোচর হওয়ার পর তিনি শুধু আশ্রমের ব্যবস্থাদির জন্য দায়ী শ্রীযুক্তা সেভিয়ার ও স্বামী স্বরূপানন্দকে তিরস্কার করিলেন। ইঁহারা দুইজন অবশ্য নীরবে সব শুনিলেন। প্রত্যক্ষতঃ যাঁহারা দোষী তাঁহারাও শুনিলেন। ফলে ইঁহারা লজ্জিত হইয়া ও স্বামীজীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঠাকুরঘর তুলিয়া দিলেন। তবু একজনের মনে একটু সন্দেহ থাকিয়া গেল—স্বামীজী যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা কি সত্যই সর্বগুরুজনসম্মত? এই সন্দেহনিরাসের জন্য স্বামী বিমলানন্দ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীকে পত্র লিখিলেন। উত্তরে শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১৫ই ভাদ্র তারিখের পত্রে লিখিলেন, "আমাদের গুরু যিনি, তিনি তো অদ্বৈত; তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।" ('অতীতের স্মৃতি'তে উদ্ধৃত স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরী, ৭।৯।১৯০২)। ইহার পর অদ্বৈতাশ্রমে আর কখনও ঠাকুরঘর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বামীজী বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তনান্তে ঐ ঘটনা স্মরণপূর্বক সখেদে বলিয়াছিলেন, "আমি ভেবেছিলুম অন্ততঃ একটি কেন্দ্রেও তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) বাহ্যপূজাদি বন্ধ থাকবে! কিন্তু হায়, হায়, গিয়ে দেখি বুড়ো সেখানেও জেঁকে বসে আছেন।"

স্বামীজীর সরল শিশুস্বভাবের একটি দৃষ্টান্ত স্বামী বিরজানন্দ দিয়াছেন। একদিন যথাসময়ে আহার্য প্রস্তুত না হওয়ায় তিনি সকলকে তিরস্কার

করিতে করিতে একেবারে রন্ধনশালায় গিয়া উপস্থিত হইলেন ও দেখিলেন, ধোঁয়ার অন্ধকারে রন্ধননিরত বিরজানন্দ অনবরত ফুঁ দিতেছেন এবং আগুনকে সতেজ করিয়া দ্রুত রন্ধন সমাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অমনি আর কিছু না বলিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। কিছু পরে খাবার লইয়া বিরজানন্দ তাঁহার নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, "যা নিয়ে যা, আমি খাব না।" বিরজানন্দ বুঝিলেন, ইহা অভিমানের কথা; একটু নীরব থাকিলেই রাগ জল হইয়া যাইবে; তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট, বস—রাগ পড়িয়া গেল এবং স্বামীজী ক্ষুধাতুর বালকের ন্যায় খাইতে আরম্ভ করিলেন; তারপর খাইতে খাইতে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "এখন বুঝছি, কেন এত রেগে গিয়েছিলুম। বড্ড খিদে পেয়েছিল।" স্বামীজী জানিতেন না যে, মায়াবতীতে শীতকালেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া কাঠ ভিজিয়া যায়; আবার রৌদ্রের অভাবে শুকানোও সম্ভব হয় না।

অনলস স্বামীজীর মায়াবতীতেও যথেষ্ট কাজ ছিল। মায়াবতীতে বসিয়া তিনি অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহা আমরা ধরিয়াই লইতে পারি, যদিও তন্মধ্যে মাত্র দুইখানি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের অনুরোধে তিনি এই সময়ে 'নাসদীয় সূক্ত'টির অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত 'প্রবুদ্ধভারত'-এর জন্য তিনটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন—'আর্য ও তামিল জাতি' নামক ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ সারগর্ভ সন্দর্ভ, 'থিয়োসফি সম্বন্ধে দুই-চারিটি মন্তব্য' নামক একটি অকপট সমালোচনা ও 'সমাজ-সমস্যা-বিষয়ক সভার অধিবেশন' এই শিরোনাম অবলম্বনে একটি প্রবন্ধে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারত-বর্ষীয় সমাজ-সমস্যা-বিষয়ক সভার অধিবেশনে বিচারপতি রানাডে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার উত্তর। এই মহারাষ্ট্রদেশীয় জননায়কের স্বদেশপ্রেম ও উদারচিত্তের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিলেও তাঁহার সন্ন্যাসবিদ্বেষের অযৌক্তিকতা দেখাইতে ছাড়েন নাই। স্বামীজী রানাডের প্রতিবাদকল্পে লিখিয়াছিলেন যে, ভারতের সন্ন্যাসীরা একান্ত অলস ও সন্ন্যাসিসম্প্রদায় নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন—এসব কথা ভ্রমাত্মক। ঔপনিষদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু জনহিতকর কার্য তাঁহাদের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছে; এবং যতপ্রকার শক্তিপ্রদ, প্রেরণাপূর্ণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পৃট ভাবস্রোত সমাজশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ উহার আবিলতা, মোহপঙ্কিলতা ও জড়তা দূরীভূত করিয়াছে, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে

সন্ন্যাসীর ত্যাগ ও পরকল্যাণ-কামনা। সন্ন্যাসীরা দিয়াছেন ভারতকে বল, বুদ্ধি, ভরসা; ধর্মের গ্লানির দিনে ও সামাজিক অবনতির দিনে রাজশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ও ক্ষাত্রবীর্যকে অত্যাচারের প্রতিকারকল্পে নিয়োজিত করিয়া তাঁহারা জাতির জীবনে আনিয়াছেন প্রেম, পবিত্রতা ও শান্তি; ভোগবিলাসের স্থলে তাঁহারা মহিমমণ্ডিত করিয়াছেন ত্যাগ ও সেবাকে। ব্রহ্মচর্য ও সংযমের গৈরিক পতাকা উচ্চে উড্ডীন রাখিয়া নির্দেশ দিয়াছেন তাঁহারা অভিযানের পথের। সন্ন্যাসীই যুগে যুগে সমাজের ধাতা, পাতা, নিয়ন্তা। শুধু "সংস্কার" "সংস্কার" বলিয়া উচ্চরব তুলিলেই সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় না—অন্ধধ্বংসকারী বলিয়া সন্ন্যাসীকে গালাগালি দিলেও তাহা সম্পাদিত হয় না। প্রকৃত প্রগতির পথ কঠিন সাধনসাপেক্ষ, আর সে সাধনবহ্নি সন্ন্যাসীরাই যুগে যুগে প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন, ও রাখিতে সমর্থ।

স্বামীজী দীর্ঘকাল মায়াবতীতে থাকিতে আসেন নাই। আবার চারিদিকে বরফে ঢাকা, ভ্রমণাদির সুবিধা তেমন নাই; শীতও বেশ, অথচ শীতপ্রধান পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় বাসস্থানে উষ্ণতাসম্পাদনের সুব্যবস্থা নাই। এইসব ও অন্যান্য কারণে তিনি বেলুড়ে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন; কিন্তু তখন অনেক ভাড়া দিয়াও কুলি যোগাড় করা শক্ত ব্যাপার। তাই একদিন প্রফুল্লমনে আশ্রমবাসীদের সহিত গল্প করিতে করিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কুলি নাই পাওয়া যায়, তবে কি ব্যবস্থা হইবে? বিরজানন্দ সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, "স্বামীজী, কুছ পরোয়া নেই; লোক যদি নাই পাওয়া যায়, আমরাই আপনার ডাণ্ডী বয়ে নিয়ে যাব।" স্বামীজী শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, "ওঁ বুঝেছি! আমাকে বুঝি খদে ফেলবার মতলব আঁটা হচ্ছে?" অবশেষে সিদ্ধান্ত হইল, এবারে কাঠগোদামের পথে না যাইয়া টনকপুরের পথে যাওয়া হইবে এবং পিলিভিতে ট্রেন ধরা হইবে; তখন পর্যন্ত পিলিভিত-টনকপুর শাখা লাইনটি প্রস্তুত হয় নাই। এই দ্বিতীয় পথ কাঠগোদামের পথ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর হইলেও উহার অর্ধেকাংশ সমভূমিতে থাকায় তেমন দুর্গম নহে। গতবারের কষ্টভোগের কথা স্মরণ করিয়া যাত্রার পুর্বে স্বামীজী স্বামী সদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ্, এবার সব ভার বিরজানন্দের ওপর। ওর মাথাটা খুব ঠাণ্ডা, আর বহ্বাড়ম্বর নেই; এবার তুইও কিছু করবিনি, আমিও কিছু করব না, বুঝলি?" এদিকে গ্রামে যিনি কুলি সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন,

তিনি দুই-তিন দিনের মধ্যেও ফিরিলেন না দেখিয়া স্বরূপানন্দ স্বয়ং কুলির সন্ধানে চা-বাগানে গেলেন; ইতিমধ্যে গ্রামের কুলিরা আসিয়া পড়িল ও স্বামীজীকে লইয়া যাত্রা করিল। স্বরূপানন্দও ততক্ষণে লোক লইয়া আশ্রমাভিমুখে আসিতেছিলেন; পথে উভয় দলের সাক্ষাৎ। তখন অগত্যা দ্বিতীয় দলকে মোটা বকশিশ দিয়া বিদায় করিতে হইল।

এবারে গোটা পথটাই স্বামীজীর মন বেশ প্রফুল্ল ছিল। প্রথম রাত্রে চম্পাবতের ডাকবাঙ্গলোতে বসিয়া তিনি সঙ্গীদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনাইলেন, বলিলেন, "তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ, আর লোকচরিত্রজ্ঞানও অসাধারণ ছিল—যার সম্বন্ধে যা বলতেন, সেটা একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলে যেত। তাঁর শিষ্যদের জনকয়েককে তিনি 'ঈশ্বরকোটি' বলে নির্দেশ করতেন, আর সাধারণ জীবদের বলতেন 'জীবকোটি'। ঈশ্বরকোটিদের তুলনায় জীবকোটিদের আসন অনেক নীচে দিতেন। বলতেন, 'ঈশ্বরকোটি আচার্যস্থানীয়, লোকশিক্ষার জন্যই তাঁর দেহধারণ। আমি অনেকবার ও কথাটা পরীক্ষা করে দেখেছি! তাঁর কথা একটুও বেঠিক হয়নি। যাঁদের তিনি ঈশ্বরকোটি বলতেন, সব সময় হয়তো তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না, কি হয়তো অনেক সময় তাদের কড়া কথাও বলতে হয়, কিন্তু তারা যে প্রকৃতই উন্নতশ্রেণীর আত্মা, তার আর সন্দেহ নেই।" এইসব বলিতে বলিতে বক্তৃতার ভাব আসিয়া পড়িল, নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, বদনমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল, আর স্বর দৃঢ়তর ও উচ্চতর হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিলেন, "আর যতই যাই হোক, যতই যাই হোক—আমি তাঁর আদর্শ থেকে একচুল ভ্রষ্ট হইনি, অন্তরের সঙ্গে তাঁকে মেনে চলেছি।" আর একবার স্বামীজী ঈশ্বরকোটিদের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তাদের আমি যত বিশ্বাস করি, আর কাউকে তেমন করি না। আমি জানি, যদি পৃথিবীসুদ্ধও আমায় ছেড়ে পালায়, তবু তারা আমায় কখন ছাড়বে না। যত অসম্ভবই হোক, আমার ভাব ও উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করবার জন্য তারা প্রাণ দেবে।"

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অবলম্বনে 'ঈশ্বরকোটি'দের সম্বন্ধে আর একটু পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করিলে মন্দ হইবে না। তাঁহার মতে ঈশ্বরকোটি—যেমন শ্রীচৈতন্যাদি অবতার পুরুষ কিংবা প্রহ্লাদাদি শুদ্ধসত্ত্বগুণী ভক্ত বা (অবতারের) লীলাসহচর। ঈশ্বরকোটি না হইলে, মহাভাব, প্রেম হয় না। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে মুক্ত হইতে পারেন; ইঁহারা প্রারব্ধের অধীন নহেন; ইঁহাদের বিশ্বাস

স্বতঃসিদ্ধ, যেমন প্রহ্লাদের ; এবং ইহাদের কোন অপরাধ হয় না। ঈশ্বরকোটির প্রেম হইলে জগৎ-মিথ্যা বোধ তো হয়ই, অধিকন্তু শরীর যে এত ভালবাসার জিনিস, তাহাও ভুল হইয়া যায়।[৪] 'লীলাপ্রসঙ্গ গুরুভাব'-এ (পূর্বার্ধ, ৪৪ পৃঃ) ঈশ্বরকোটি সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা আছে, এবং ঐ গ্রন্থের 'দিব্যভাব'-এ (১৭৪ পৃঃ) ঈশ্বরকোটির সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ছয়, যদিও স্বামীজীর বাঙ্গলা জীবনীতে সাতজনের কথা বলা হইয়াছে (৮৮৪ পৃঃ), এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই শ্রেণীর ভক্তদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন। ইংরেজী জীবনী এবং 'লীলাপ্রসঙ্গে'ও এই সর্বোত্তম স্থান স্বীকৃত হইয়াছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'রও মত অনুরূপ, যদিও ঈশ্বরকোটিদের নাম ও সংখ্যা সম্বন্ধে এখানেও ভিন্ন মত পাই (৬০৪ পৃঃ)। 'লীলাপ্রসঙ্গে' স্পষ্টতঃ ছয়জনের নাম লিপিবদ্ধ না থাকিলেও ঐ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থান দৃষ্টে এবং বেলুড় মঠের পরম্পরা হইতে এই কয়জনের নাম পাওয়া যায়—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, যোগীন, নিরঞ্জন ও পূর্ণ।

পরদিন পুনর্বার চম্পাবত হইতে ডিউরী অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ হইল ; স্বরূপানন্দ চম্পাবত পর্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে মায়াবতী ফিরিয়া গেলেন। বেলা ১টায় সকলে ১৫ মাইল দূরবর্তী ডিউরীর ডাকবাঙ্গলোয় পৌছাইয়া দেখিলেন, এক বিভ্রাট—ডাকবাঙ্গলোর চৌকিদার কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান নাই। সৌভাগ্যক্রমে দরজার তালাটি একটু জোরে টানিতেই খুলিয়া গেল ও সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে তখন ছিলেন স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ ও আলমোড়ার লালা গোবিন্দলাল শা। বিরজানন্দ যথাসম্ভব সত্বর রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু হাঁড়ির তুলনায় চালের পরিমাণ এত বেশী ছিল যে, ভাত অর্ধসিদ্ধ অবস্থায়ই উথলাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। এদিকে স্বামীজীর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় তিনি লোকের পর লোক পাঠাইয়া খবর লইতে লাগিলেন, রান্নার কত দেরী। বিরজানন্দ মহা ফাঁপরে পড়িয়া ভাবিলেন, খানিকটা ভাত নামাইয়া লইয়া বাকি ভাতে আরও জল দিয়া ফুটাইবেন। এমন সময় স্বামীজী আসিয়া অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ওরে, ওসব কিছু করতে

৪। 'কথামৃত,' ১।৭।৬, ২।১৭।১, ৩।৭।৩, ৩।১১।৩, ৩।১৪।৭, ৩।১৫।৪, ৩।২৬।২, ৪।১৬।২, ইত্যাদি।

হবে না। আমার কথা শোন—ভাতে খানিকটা ঘি ঢেলে দে, আর হাঁড়ির মুখের সরাখানা উলটে দে, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে, আর খেতেও খুব ভাল হবে।" বিরজানন্দ ঐ উপদেশ যথাযথ পালন করিলেন; ফলে সেদিনের 'ঘি-ভাত' সকলেরই নিকট বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

ইহার পরে আরও পনর মাইল চলিয়া তাঁহারা সমভূমিতে টনকপুরে পৌছাইলেন। সেখানেও আর এক ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল—ডাকবাঙ্গলোতে স্থান ছিল না বলিয়া তাঁহাদিগকে এক মুদীর দোকানের উপরে বাসা লইতে হইল। নীচে আরও যাত্রী ছিল; আর তখন সকলেই রন্ধনে ব্যাপৃত থাকায় নীচের ধোঁয়া কাঠের পাটাতন ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া মহা জ্বালাতন করিতে লাগিল। রাত্রে দোকানী খাতির করিয়া নিজের খাটিয়াখানা স্বামীজীকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু খাটিয়া পাইলেই তো ঘুম হয় না। স্বামীজী যতবার পাশ ফিরিতে লাগিলেন, পুরাতন খাটিয়া ততবার ক্যাঁচ কোঁচ করিয়া নিজের জীর্ণাবস্থার কথা জানাইয়া দিতে লাগিল; মনে হইতে লাগিল—এই বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই অসোয়াস্তির মধ্যেও এই বিষয় লইয়া স্বামীজী ফষ্টিনষ্টি করিতে ছাড়িলেন না।

পরদিন পিলিভিত পর্যন্ত অবশিষ্ট পথের জন্য ঘোড়া যোগাড় করা হইলে[৫] স্বামী সদানন্দ সর্বাপেক্ষা তেজী ঘোড়াটিতে উঠিলেন এবং ঘোড়াও সবেগে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। টনকপুর হইতে মাইলখানেক পথ চলার পরও সদানন্দের কোন খবর না পাইয়া স্বামীজী উদ্বেগ প্রকাশ করিতে থাকিলে পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, ঘোড়া উচ্ছৃঙ্খল গতিতে দৌড়িয়া আরোহীসমেত মাঠের মধ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। সকলে অগত্যা সেখানে থামিলেন এবং কেহ কেহ সদানন্দের সন্ধানে মাঠের মধ্য দিয়া ঐ দিকে অগ্রসর হইলেন। খানিক পরেই দেখা গেল, সদানন্দ স্বামী ঘোড়া হাঁকাইয়া ঐ দিকেই আসিতেছেন। অতঃপর জানা গেল, ঘোড়া একবার সওয়ারকে ভূপাতিতও করিয়াছিল, যদিও সদানন্দ আহত হন নাই এবং পুনর্বার ঘোড়ায় চড়িয়া উহাকে বাগে আনিয়াছেন। এই ঘটনায় খেতড়ীর একটি দিনের কথা স্বামীজীর মনে পড়িয়া গেল এবং তিনি উহা সঙ্গীদিগকে শুনাইলেন। সদানন্দ সেবারেও একটি

৫। 'অতীতের স্মৃতি' পড়িলে মনে হয়, স্বামীজী এই পথও ডাণ্ডীতে গিয়াছিলেন; অপরদের জন্যই ঘোড়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দুষ্ট ঘোড়ায় চড়িয়াছিলেন। রাজবাড়ীর ছাদ হইতে স্বামীজী, খেতড়ী-রাজ ও অপর সকলে তখন রাস্তার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—সেই বজ্জাত ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সদানন্দ তীরবেগে ছুটিয়াছেন। কিন্তু ঘোড়া সওয়ার চিনিতে পারিয়া তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। স্বামীজী সেদিন সদানন্দের অশ্বারোহণ-দক্ষতার তারিফ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সদানন্দ বাবা, তুমিই আমার ঠিক মরদ শিষ্য!"

টনকপুর হইতে তিন মাইল পথ অগ্রসর হওয়ার পর মেজর হেনেসী নিজের বাঙ্গলো হইতে রাস্তায় আসিয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি স্বীয় গৃহ হইতে স্বামীজীকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া সাক্ষাতের আশায় দ্রুত বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ দুইটায় যাত্রীরা খাতিমা নামক স্থানে পৌঁছাইলেন। সেইদিনকার মতো উহাই বিশ্রামস্থলরূপে নির্দিষ্ট ছিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী স্বামী শিবানন্দকে বলিলেন, "মহাপুরুষ, আপনি পিলিভিতে আমাদের ছেড়ে একলা বেলুড় মঠের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে যাবেন।" স্বামীজী তাঁহাকে তারকদা বা মহাপুরুষ বলিয়া ডাকিতেন; পরে তিনি এই দ্বিতীয় নামেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্বোক্ত প্রসঙ্গেই স্বামীজী আরও বলিয়াছিলেন, "বেলুড় মঠের প্রত্যেক সন্ন্যাসী ভারতের চতুর্দিকে ধর্মপ্রচার করে আর লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়াবে। আর শেষকালে অন্ততঃ দুই হাজার টাকা এনে সাধারণ ভাণ্ডারে জমা দেবে।" স্বামীজীর সে অভিপ্রায়ানুসারে স্বামী শিবানন্দ পিলিভিত হইতেই অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছিলেন।

পঞ্চম দিনে অর্থাৎ শেষ দিনে পিলিভিতের কাছাকাছি আসিয়া স্বামীজী বিরজানন্দকে লইয়া একটু মজা করিলেন। বিরজানন্দকে ঘোড়ায় চড়িতে ভীত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি তোকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া নিজে ডাণ্ডী হইতে নামিলেন, কি করিয়া ঘোড়ায় বসিতে হয়, কিরূপে লাগাম ধরিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া বিরজানন্দকে একটি ঘোড়ায় বসাইলেন; তারপর নিজে একটি ঘোড়ায় চড়িয়া উহাকে চাবুক মারিয়া ত্বরিত গতিতে ছুটাইলেন, আর বিরজানন্দকে বলিলেন, "তুইও এই রকম কর।" তাঁহাকে ঐরূপ করিতে হইল না। সাথীকে ছুটিতে দেখিয়া বিরজানন্দের ঘোড়াও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল; নিরুপায় বিরজানন্দ কোন প্রকারে ঘোড়ার ঘাড় ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। এই লইয়া খুব হাসাহাসি হইল। তবে ফল এই হইল

যে, বিরজানন্দের ভয় কাটিয়া গেল এবং বাকি পথ তিনি সকলের সঙ্গে হৃষ্ট-চিত্তেই চলিলেন।[৬]

বেলা চারিটার সময় তাঁহারা পিলিভিতে উপস্থিত হইলেন। পাছে ট্রেন ধরিতে দেরী হইয়া যায়, এই ভয়ে ঐ দিন ভাল আহার করা হয় নাই ; আবার সারা রাত্রি ট্রেনে কাটাইতে হইবে। তাই সকলের আগে শহরে উপনীত হইয়া স্বামী সদানন্দ আহার-সংগ্রহের চেষ্টায় নিরত হইলেন এবং গোবিন্দলাল ঐ জেলার ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত ভবানীদত্ত যোশীকে স্বামীজীর আগমনবার্তা জানাইতে গেলেন। সংবাদ পাইয়া যোশী মহাশয় স্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ সবান্ধবে রেল-স্টেশনে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা বিবিধ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে আমিষ ভক্ষণের কথা উঠিল এবং যোশীজী সবিনয়ে মাংস ভোজনের নিন্দা করিলেন। স্বামীজী কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা বলিতে জানিতেন না বা কাহারও মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন না। তিনি বেদাদি-শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণ করিলেন, মাংসভোজন শাস্ত্রসম্মত। সকলে মাংসাশী হউক বা যাহারা নিরামিষাশী তাহাদের ব্যবহার প্রশংসনীয় নহে, এইরূপ কোনও মত পোষণ না করিলেও তিনি ধর্মের নামে আমিষাহারের নিন্দায় মত্ত হওয়া পছন্দ করিতেন না, কিংবা আমিষাহার করিলেই আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিবে, এইরূপ অবাস্তব কথার সমর্থন করিতেন না। অতএব গোঁড়ামির মূলোচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তিনি বলিতে লাগিলেন, "অত কথায় কাজ কি ? আজকাল হিন্দুরা যে গো-মাংসের নামে শিউরে উঠেন, বৈদিক ঋষিরা সেই গো-মাংস ভোজন করতেন। এমন কি, প্রাচীন যুগে অতিথির সম্মানের জন্যও শুভকর্মে গো-হত্যা একটা রীতি ছিল।[৭] হিন্দুজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নিরামিষ-ভোজনের পাগলামি আরম্ভ হয়েছে—এর প্রধান কারণ দেশাচার ও লোকাচার।" যোশীজী নীরবে শুনিয়া গেলেন। ওদিকে স্বামীজীর কথায় আকৃষ্ট রেলকর্মচারীরাও তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। উত্তর ভারতে আমিষ-নিরামিষের দ্বন্দ্ব বড়ই প্রবল এবং আমিষাহারীদের প্রতি নিরামিষাশীদের ব্যবহার নিন্দা ছাড়াইয়া ঘৃণার পর্যায়েও উঠিয়া থাকে। স্বামীজী ইহা জানিতেন।

৬। পূর্বেও স্বামী বিরজানন্দের প্রসঙ্গে ঘোড়ার কথা পাইয়াছি। মনে হয়, তিনি তখন ঘোড়ায় চড়িয়া থাকিলেও উহা পাহাড়ী মালবাহী ঘোড়া ; উহাতে চড়িতে দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

৭। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৬।৪।১৮ দ্রষ্টব্য। অতিথির প্রতিশব্দ 'গোঘ্ন' (আপ্তের অভিধান)।

স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র সহিত পরিচিত পাঠকবৃন্দও অবগত আছেন যে, তিনি বহু স্থলে মাংসাহারের নিন্দা না করিয়াও অনেকের পক্ষে ধর্মজীবনের সহায়করূপে আমিষাহারের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আজ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও যোশীজীকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া তাঁহার চিরাভ্যস্ত 'বোমা-ফাটানো'র কৌশলাবলম্বনে বৃথা জাত্যভিমানাদির মস্তকে মুষলাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যুক্তিবিচারহীন দেশাচার ও লোকাচারের পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা বিলোপপ্রাপ্ত হইবে, ইহা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন ছিল; নতুবা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবনযাপনে প্রয়াসী কেহ আমিষাহার বর্জন করিলে তাহা তো প্রশংসারই কথা।

স্টেশনে আসিয়া স্বামীজী সদানন্দকে খুঁজিয়া পান নাই, সন্ধ্যা সমাগত হইলেও তিনি ফিরিতেছেন না দেখিয়া স্বামীজী গোবিন্দলাল শাকে তাঁহার সন্ধানে পাঠাইলেন। অবশেষে ট্রেন ছাড়িবার আধঘণ্টা পূর্বে গোবিন্দলাল ও সদানন্দ একটি প্রকাণ্ড ঝুড়ি লইয়া হাজির হইলেন। উহাতে ছিল—গরম গরম পুরী, ভাজাভুজি, তরকারি, চাটনী ও মিষ্টান্নাদি। সদানন্দ নিজের সামনে খাবার তৈরী করাইতেছিলেন বলিয়া ফিরিতে দেরী হইয়াছিল। যোশীজীর সহিত কথাবার্তায় নিমগ্ন স্বামীজী আহারের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে সম্মুখে খাদ্য উপস্থিত দেখিয়া এবং ট্রেন আসারও বিলম্ব নাই জানিয়া তিনি যোশীজীকে বলিলেন যে, তাঁহারা যেখানে কম্বল পাতিয়া বসিয়াছিলেন, সেখানেই আহার করিতে চাহেন, ভদ্র মহোদয়দের অনুমতি পাইলেই তাঁহারা ভোজনে বসিবেন। স্বামীজীর এই সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইলেন এবং ভোজনস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্বামীজী তখন সঙ্গীদিগকে খাইতে অনুমতি দিলেন; নিজেও অল্পস্বল্প খাইলেন, বেশী খাইলেন না, কারণ তখনও মন আলোচ্য বিষয়েই নিবিষ্ট ছিল। বিদায়গ্রহণকালে যোশী মহোদয় ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণ স্বামীজীর দর্শন-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিয়াছেন বলিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। অধিকন্তু ভবানীদত্ত যোশী স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দকে স্বীয় আবাসে কিছুদিন থাকিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইয়া গেলেন।

ট্রেন আসিলে স্বামীজী ও স্বামী সদানন্দ একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়

প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় এক হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। ঐ কক্ষে কর্নেল-পদস্থ এক ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। 'নেটিভ'-দ্বয়কে তথায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার মন বিদ্বেষপূর্ণ হইল, অথচ এতগুলি 'নেটিভ' ভদ্রলোক সন্ন্যাসি-দ্বয়কে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন দেখিয়া সরাসরি বাধা দিতে সাহসে কুলাইল না। অগত্যা এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অপসারণের জন্য তিনি স্টেশন মাস্টারের শরণাগত হইলেন। ইংরেজ-পুঙ্গবের দাপটে হতবুদ্ধি স্টেশন মাস্টার আইন-এর মর্যাদা লঙ্ঘনপূর্বক স্বামীজীর নিকট আসিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে কক্ষত্যাগের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। স্বামীজী কিন্তু এভাবে নতিস্বীকার করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির অপমান বাড়াইতে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি ঐ ব্যক্তির কথা শেষ হইতে না হইতে গর্জিয়া উঠিলেন, "আপনি কি করে একথা আমায় বলতে সাহস করলেন? আপনার লজ্জা হল না?" বেগতিক দেখিয়া স্টেশন মাস্টার সরিয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে স্বাভিপ্রায়ানুরূপ কার্য সমাধা হইয়া গিয়াছে এই বিশ্বাসে কর্নেল স্বস্থানে ফিরিয়া দেখেন, স্বামীজী ও সদানন্দ পূর্ববৎ সেখানেই বসিয়া আছেন। তখন তাঁহার পুনর্বার গাত্রদাহ আরম্ভ হওয়ায় তিনি স্টেশনের একপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্যন্ত উচ্চরবে "স্টেশন মাস্টার", "স্টেশন মাস্টার" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্টেশন মাস্টার গা-ঢাকা দিয়াছেন, আর এদিকে ট্রেন ছাড়িবারও বিলম্ব নাই। অতএব সাহেবের মাথায় সুবুদ্ধি আসিল, তিনি স্বীয় বোঁচকা-বুঁচকি লইয়া অপর এক কামরায় চলিয়া গেলেন—বীরত্ব সেখানেই সমাপ্ত হইল। স্বামীজী তাঁহার পাগলামি দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। এমনি ছিল সমসাময়িক ভারতের অবস্থা—জগদ্বরেণ্য যে ব্যক্তির দুটি কথা শুনিবার জন্য কিংবা একটু স্পর্শলাভে জীবন ধন্য করিবার জন্য আমেরিকার ও ইওরোপের অতি গণ্যমান্য নরনারীর মধ্যেও ঠেলাঠেলি লাগিয়া যাইত, তাঁহাকেও তখন এক নগণ্য ইংরেজ অপমানিত করিতে সাহস পাইত এবং বিনা বাধায় তাহাতে অগ্রসর হইত, যদিও স্বামীজীর বেলায় একাধিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল।

২৪শে জানুয়ারি (১৯০১) স্বামীজী বেলুড় মঠের অপেক্ষমাণ গুরুভ্রাতৃগণ ও শিষ্যবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত হইলে তাঁহারা সবিশেষ আনন্দিত হইলেন। স্বামীজীরও ইহাতে অপরিসীম আনন্দ হইল। তিনি সকলের নিকট সোৎসাহে মায়াবতীর গল্প বলিতে লাগিলেন এবং এই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে,

এমন নয়নমনোভিরাম সাধনানুকূল স্থানে তিনি আরও অধিকদিন থাকিতে পারিলেন না।

এ আনন্দ অবশ্য অবিমিশ্রিত ছিল না। স্বামীজী ভুলিতে পারেন নাই যে, এই ভ্রমণের মূলে ছিল তাঁহার অনুগত শিষ্য ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যু। মায়াবতী হইতে প্রত্যাবর্তনের পরও তাঁহার কথায় ও লেখায় সে বিষাদময় সুরের কম্পন প্রতীত হইত। আরও একটি শোক তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল—তাঁহার শিষ্য ও কার্যসহায়ক খেতড়ী-রাজের দেহত্যাগের সংবাদ তিনি পথিমধ্যেই পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে তাই তিনি ২৬শে জানুয়ারির পত্রে সবিষাদে জানাইয়াছিলেন, "আপনার উৎসাহপূর্ণ কথাগুলির জন্য অশেষ ধন্যবাদ ; এখনই আমার ঐরূপ উৎসাহবাক্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নূতন শতাব্দী এসেছে, কিন্তু অন্ধকার কাটেনি, বরং স্পষ্টই তা ঘন হয়ে উঠেছে। মিসেস সেভিয়ারকে দেখতে মায়াবতী গিয়েছিলাম। পথে খেতড়ী-রাজের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেলাম। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, তিনি নিজ ব্যয়ে আগ্রার কোন পুরাতন স্থাপত্যকীর্তির সংস্কার করছিলেন, কাজ পরিদর্শনের জন্য কোন গম্বুজে উঠেছিলেন, গম্বুজটির অংশবিশেষ ভেঙ্গে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে।" এই বিষাদের রেশ ১৮ই মে-র পত্রেও অনুভূত হয়। সেদিন তিনি মেরীকে লিখিয়াছিলেন, "কয়েক মাস আগে খেতড়ীর রাজা পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছেন। তাহলেই দেখছ, এখন আমার চারিদিকে সব কিছু বিষণ্ণতায় ভরা এবং আমার নিজেরও স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ।" মেরীকে লিখিত ৫ই জুলাই-এর পত্রেও খেতড়ী-রাজের মৃত্যুর উল্লেখ আছে : "সেকেন্দ্রায় সম্রাট আকবরের সমাধির একটি উঁচু চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা গিয়েছেন। আগ্রার এই পুরাতন স্থাপত্যকীর্তিটি তিনি নিজ ব্যয়ে সংস্কার করছিলেন। কাজটা পরিদর্শন করতে গিয়ে একদিন পা পিছলে গিয়ে একেবারে কয়েক-শ ফুট নীচে পড়ে যান।" রাজা অজিত সিংহের মৃত্যু হয় ১৮ই জানুয়ারি, ১৯০১, যেদিন স্বামীজী মায়াবতী ত্যাগ করেন।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম

মায়াবতী হইতে ফিরিয়া স্বামীজী বেলুড়ে প্রায় দুই মাস ছিলেন। শরীর তখন মোটেই ভাল ছিল না; হাঁপানি আরম্ভ হইয়াছিল, অন্যান্য উপসর্গও ছিল। অতএব গুরুত্বপূর্ণ কোন কার্যে নিযুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, আবার চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাই যে কয়দিন তিনি মঠে ছিলেন, সে কয়দিন মৌখিক আলোচনা, কলিকাতায় গমনপূর্বক বন্ধুবান্ধবের সহিত মেলামেশা এবং মঠে নবাগত ব্রহ্মচারী ও পুরাতন শিষ্যবৃন্দকে উপদেশদান বা শাস্ত্রপাঠে সহায়তা ইত্যাদিতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। অবসরকাল গ্রন্থপাঠ বা চিঠিপত্র আদানপ্রদানে ব্যয়িত হইত।

ইহারই মধ্যে একদিন তিনি স্থানীয় মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন[১] ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। উহা যথাকালে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ('উদ্বোধন', বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩ পৃঃ)।

স্বামীজীর স্বাস্থ্যোদ্ধারোদ্দেশ্যে বাহিরে কোথাও যাওয়ার প্রস্তাব উঠিতেছে, এমন সময় পূর্ববঙ্গে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ আহ্বান আসিতে লাগিল। সমকালেই স্বামীজীর জননীর মনে তীর্থদর্শনের ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল। বিভিন্ন কারণপরম্পরার এইরূপ সমাবেশ হইলে স্বামীজী পূর্ববঙ্গভ্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং ২৬শে জানুয়ারি শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লিখিলেন, "বাংলা দেশে, বিশেষতঃ মঠে যে মুহূর্তে পদার্পণ করি, তখনি আমার হাঁপানির কষ্টটা ফিরে আসে, এস্থান ছাড়লেই আবার সুস্থ। আগামী সপ্তাহে আমার মাকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছি। তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করতে কয়েক মাস লাগবে। তীর্থদর্শন হ'ল হিন্দু বিধবার প্রাণের সাধ; সারা জীবন আত্মীয়স্বজনদের কেবল দুঃখ দিয়েছি। তাঁদের এই একটি ইচ্ছা অন্ততঃ পূর্ণ করতে চেষ্টা করছি।" স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, তিনি স্বীয় জননীকে লইয়া দাক্ষিণাত্যের তীর্থদর্শনে যাইবার সঙ্কল্পও করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই; ইহার

১। 'উদ্বোধন'-এ উল্লিখিত সভার তারিখ ২২শে জানুয়ারি সন্দেহজনক: কারণ স্বামীজী মায়াবতী হইতে ফিরিয়াছিলেন ২৪শে তারিখে। (বাঙলা জীবনী, ৮৮৯ পৃঃ; ইংরেজী জীবনী, ৭০৫ পৃঃ)।

প্রধান কারণ ছিল প্রতিকূল দৈহিক অবস্থা। একই কারণে পূর্ববঙ্গে এবং আসামেও তিনি দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন নাই; যদিও ঐরূপ বাসনা লইয়াই বাহির হইয়াছিলেন।

২৬শে জানুয়ারির পত্রে তিনি অবশ্য লিখিয়াছিলেন যে, পরবর্তী সপ্তাহে তীর্থযাত্রা শুরু হইবে, কিন্তু তিনি পূর্ববঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন ১৮ই মার্চ, ১৯০১। তাঁহার প্রথম গন্তব্যস্থল ছিল ঢাকা। ১৯শে মার্চ স্টীমার গোয়ালন্দ ছাড়িল। স্টীমারের একটি ঘটনা শ্রীযুক্ত মন্মথ গাঙ্গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ('উদ্বোধন', ৬৪ তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা): "বিশাল পদ্মাবক্ষে স্টীমার চলিতেছে; স্বামীজী দেখিলেন, জেলেরা নদীতে ইলিশ মাছ ধরিতেছে। হঠাৎ বলিলেন, 'বেশ তাজা ইলিশ, খেতে ইচ্ছা হচ্ছে'।" পার্শ্বেই তাঁহার শিষ্য কানাই মহারাজ (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) ছিলেন, তিনি স্বামীজীর সেবায় নিযুক্ত থাকায় স্বামীজীর মনোভাব ঠিক ঠিক ধরিতে পারিতেন; তিনি বুঝিলেন, ইহা শুধু স্বামীজীর নিজের ভোজনেচ্ছা নহে, তিনি জাহাজের গরীব মুসলমান খালাসীদেরও খাওয়াইতে চান। সারেংকে স্বামীজীর অভিলাষ জানাইলে সে দর করিয়া জানাইল, এক আনায় একটা মাছ পাওয়া যায়, আর তিন-চারিটি হইলেই যথেষ্ট। স্বামীজী অমনি হুকুম করিলেন, "তবে এক টাকার কেন।" অঢেল মাছ হইয়া গেল; পথে স্টীমার থামাইয়া চাল এবং পুঁইশাকও যোগাড় করা হইল এবং সকলকে ভূরিভোজন করাইয়া স্বামীজী পরিতৃপ্ত হইলেন।

মন্মথবাবু এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা লিখিয়াছেন। একবার ট্রেনে যাইতে যাইতে স্বামীজী এক স্টেশনে দেখিলেন, একজন মুসলমান ফেরিওয়ালা চানাসিদ্ধ বিক্রয় করিতেছে; অমনি সেবক ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "ছোলা-সিদ্ধ খেলে বেশ হয়; বেশ স্বাস্থ্যকর জিনিস।" ব্রহ্মচারী এক পয়সার ছোলা লইলেন; কিন্তু স্বামীজীর উদ্দেশ্য ফেরিওয়ালাকে সাহায্য করা, ইহা বুঝিতে পারিয়া মূল্য হিসাবে একটি সিকি দিলেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, কত দিলি?" "চার আনা।" "ওরে, ওতে ওর কি হবে? দে, একটা টাকা দিয়ে দে। ঘরে ওর বউ আছে, ছেলেপিলে আছে।" একটু পরে আবার বলিলেন, "আহা, আজ বোধ হয় বেশি কিছু হয়নি! তাই দেখছিস না, ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের সামনে ফেরি করছে।" ছোলা ক্রয় করা হইল, ঐ পর্যন্ত। তিনি দাঁতেও কাটিলেন না।

ইহাকেই বলে জাতি-বর্ণনির্বিশেষে নারায়ণজ্ঞানে সেবা। ঘটনা দুইটি ক্ষুদ্র হইলেও মহামানবের বেদনানুভবের ও সহানুভূতির দিক হইতে বড়ই মর্মস্পর্শী। গরীবের ব্যথা তাঁহার চিত্তকে যখন ব্যথিত করিত, তখন তিনি নির্বিচারে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি এক পত্রে (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০২) স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "যদি একজনের মনে— এ সংসার-নরককুণ্ডের মধ্যে একদিনও একটু আনন্দ ও শান্তি দেওয়া যায়, সেইটুকুই সত্য, এই তো আজন্ম ভুগে দেখছি।"

স্টীমার ঐ দিনই যথাসময়ে নারায়ণগঞ্জে পৌছাইলে তথায় উপস্থিত ঢাকা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দ স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। সেখান হইতে সকলে ট্রেনে চড়িয়া অপরাহ্নে ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। তখন নগরবাসীর পক্ষ হইতে তথাকার খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় স্বামীজীকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাসের বাটীতে লইয়া চলিলেন। স্টেশনে বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও স্কুলকলেজের ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন। স্বামীজীর গাড়ী চলিতে থাকিলে ছাত্রগণ "জয় রামকৃষ্ণদেব কী জয়" রবে দিগদিগন্ত মুখরিত করিয়া গাড়ীর সহিত ছুটিতে লাগিল। মোহিনীবাবুর বাটীতেই স্বামীজীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং সেখানে বহু ভদ্রলোক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে সকলের কণ্ঠ হইতে সমবেত আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল এবং তাঁহার দর্শনে সকলের নয়নমন পরিতৃপ্ত হইল।

বুধাষ্টমী তখন সমাগতপ্রায়। ঐদিনে অসংখ্য নরনারী লাঙ্গলবন্ধ নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করিয়া থাকেন। ঢাকা হইতে নৌকাযোগে বুড়ীগঙ্গা নদীপথ ধরিয়া নারায়ণগঞ্জে শীতললক্ষা নদীতে পড়িতে হয়। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী শীতললক্ষার দৃশ্য অতীব মনোহর। শীতললক্ষা ধরিয়া ধলেশ্বরীতে ও ধলেশ্বরী হইতে ব্রহ্মপুত্রে যাইতে হয়। প্রবাদ আছে যে, ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত এই পুণ্যতীর্থ লাঙ্গলবন্ধে স্নান করিয়া পরশুরাম মাতৃবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তদবধি এই স্থান ধর্মপ্রাণ হিন্দুনরনারীর নিকট মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে একটি বিরাট মেলাও বসিয়া থাকে। এবারেও প্রচুর লোকসমাগম হইয়াছিল এবং নৌকাগুলি হইতে মুহুর্মুহুঃ যাত্রীদের আনন্দরব, হরিনামসংকীর্তন ও হুলুধ্বনি উঠিতেছিল। স্বামীজী ঐ তীর্থে

পুণ্যস্নানের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া সশিষ্য নৌকাযোগে সেখানে চলিলেন। পূর্বব্যবস্থানুসারে তাঁহার ভাগ্যবতী জননীও কয়েকজন আত্মীয়ার সহিত স্নানোপলক্ষে ২৫শে মার্চ নারায়ণগঞ্জে স্বামীজীর সহিত মিলিত হন এবং স্বামীজীর কতিপয় সন্ন্যাসি-শিষ্যের তত্ত্বাবধানে তাঁহারা একত্রে লাঙ্গলবন্ধ স্নানের জন্য রওনা হইলেন।[২]

স্বামী শুদ্ধানন্দও ঐ দলে ছিলেন। তাঁহার মুখে ঐ কালের একটি মজার ঘটনা শোনা গিয়াছে। লাঙ্গলবন্ধ ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাতের উপর অবস্থিত; নদীতে জল স্বল্প ও ময়লা; বিশেষতঃ মেলার সময়ে কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে। এই সকল কথা ভাবিয়া স্বামীজী সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, কেহ যেন নদীর জল পান না করেন। সাবধান করার প্রয়োজনও ছিল; কারণ তীর্থস্থানের জল পান করিলে দেহ পবিত্র হয়, ভক্তিবৃদ্ধি হয়, ইহাই হিন্দুদের বিশ্বাস। তীর্থস্নানান্তে সকলে যখন ঢাকায় ফিরিতেছেন, তখন স্বামীজী জানিতে চাহিলেন, কেহ জল পান করিয়াছেন কিনা। সকলেই বলিলেন, না। তখন স্বামীজী সহাস্যে বলিলেন, তিনি কিন্তু ডুব দিয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিয়াছেন, কারণ কোথা দিয়া কিভাবে পুণ্যসঞ্চয় হইয়া যায়, তাহা কে বলিতে পারে? শুনিয়া বেশ একটু হাসাহাসি হইল। ইহাতে একদিকে যেমন স্বামীজীর মধ্যে আশ্রিতদের রক্ষার জন্য সাবধানতা লক্ষিত হয়, অপরদিকে তেমনি মহদুদ্দেশ্যে জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠাহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়; অধিকন্তু ইহাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার মধ্যে জ্ঞানের একটা বহিরাবরণ থাকিলেও অন্তরে প্রবল ভক্তিস্রোত সদাপ্রবহমান ছিল।

ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর নিত্য বহু নরনারী স্বামীজীর উপদেশ শ্রবণের জন্য সমবেত হইতেন। বিশেষতঃ অপরাহ্ণে দুই-তিন ঘণ্টা জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, কর্ম ইত্যাদি বিষয়ে সুগভীর ও উদ্দীপনাপূর্ণ আলোচনা চলিত এবং শতাধিক শিক্ষিত ব্যক্তি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার বাক্যসুধা পান করিতেন। জনসাধারণের জন্য তাঁহার দুইটি ইংরেজী বক্তৃতাও হইয়াছিল—প্রথমটি হয় ৩০শে

২। "Swamiji, Nityananda and five others started for Dacca this evening (March 18)." "Swamiji's mother came to the Math and asked me to arrange for Brahmaputra bath. Received a reply telegram from Swamiji in which he says to send his mother (March 23)." "The Swamiji's mother, aunt, sister and party left for Narayanganj (March 24)."—স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি।

মার্চ, জগন্নাথ কলেজে। বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'আমি কি শিখিয়াছি?' সভায় প্রায় দুই সহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা চলিয়াছিল একঘণ্টা যাবৎ। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন স্থানীয় স্বনামধন্য উকিল শ্রীযুক্ত রমাকান্ত নন্দী। পরদিন পগোজ স্কুলের বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম' সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতা হইয়াছিল। উভয় বক্তৃতাই নগরবাসীদের চিত্তে গভীর প্রেরণা জাগাইয়াছিল এবং তাহাদিগকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বার্তা গ্রহণে ও প্রচারে উদ্বোধিত করিয়াছিল। বক্তৃতাদ্বয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গূঢ়ার্থময় হইলেও এবং ঐ সময়ে স্বামীজীর বার্তা পূর্ণতম রূপ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও সাঙ্কেতিক লিপিকারকের অভাবে পূর্ণতঃ সংরক্ষিত হয় নাই। ঢাকার পরে গৌহাটিতে তিন বার এবং শিলং-এ একবার বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া স্বামীজী জনসাধারণের সমক্ষে বক্তৃতাবলম্বনে হিন্দুধর্মের এইরূপ তথ্যপূর্ণ সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা প্রদানের আর সুযোগ পান নাই। ঢাকার বক্তৃতাদ্বয়ের সারাংশ স্বামীজীর জনৈক শিষ্য বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; এখন আমরা উহারই অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ পাইয়া থাকি। শিলং-এর বক্তৃতার কোন কিছুই সংরক্ষিত হয় নাই এবং গৌহাটিতে বক্তৃতা হইয়াছিল, এই তথ্য ছাড়া আর কিছুই জানিবার উপায় নাই।

ঢাকার বক্তৃতাদ্বয়ের যেটুকু সারমর্ম সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণের গোড়াতেই পাই স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি তাঁহার এক সুগভীর প্রেম ও গৌরববোধ। অতঃপর তিনি বৈদেশিক ভাবাপন্ন সংস্কারকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলেন যে, হিন্দুরা পৌত্তলিক নহে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি হাঁচি টিকটিকির পর্যন্ত তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্বামীজী নিজেকে সেই প্রাচীন সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনে কোন প্রকার অসরলতার প্রশ্রয় না দিয়া ঈশ্বরলাভকেই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপূর্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন ও তদনুরূপ যত্নপরায়ণ হন।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি প্রাচীনের গৌরবস্মৃতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শুধু ঐ গৌরবানুভবই যথেষ্ট নহে, স্বয়ং সেই মহত্ত্ব লাভ করিতে হইবে। "বর্তমান কালের অবনত অবস্থা দেখিয়া আমি দুঃখিত নই; ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি আশান্বিত।" হিন্দুদের মধ্যে আচার-বিচার, রীতিনীতিতে

আকাশ-পাতাল তফাত থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে মিল আছে—হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করে না; তাহারা বেদ মানে—বিশেষতঃ উপনিষদের প্রামাণ্য সকলের স্বীকার্য; "স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র—এই সবগুলিরই ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মিলে, না মিলিলে অগ্রাহ্য। বেদের ক্রিয়াকাণ্ড লুপ্ত হইয়াছে, ঐ গুলিকে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব;···ধর্মমতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধসত্ত্বেও কতকগুলি ঐক্য আছে। প্রথমতঃ তিনটি বিষয়—তিনটি সত্তা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন: ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ।" হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত। তারপর মূর্তিপূজার কথা তুলিয়া বলেন, "শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ উপাস্য দেবতা ব্যতীত সকল দেবতাই এক একটি পদের নাম, কিন্তু এই পঞ্চদেবতা সেই এক ভগবানের নামমাত্র।" সর্বশেষে স্বামীজী সকল হিন্দুকে সমবেতভাবে নিজেদের উন্নতিসাধনের আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে, সংস্কারের নামে ভাঙ্গিয়া ফেলা বা গালিবর্ষণ করা অযৌক্তিক। এইরূপে তিনি প্রাচীনের সহিত নবীনের এবং বৈচিত্র্যের সহিত একত্বের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ('বাণী ও রচনা', ৫।৩৫৮-৬৫)।

স্বামীজীর ঢাকায় অবস্থানকালে স্বভাবতই তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, স্বামীজীর ন্যায় সিদ্ধ মহাপুরুষগণ ইচ্ছামাত্র অপরকে রোগমুক্ত করিতে পারেন; আর এইরূপ ব্যক্তিরও অভাব নাই যাহারা আপনাদের মধ্যে এইরূপ শক্তির সম্পূর্ণ অভাব আছে জানিয়াও এই সরল বিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিতে চায় এবং সেই সুযোগে অর্থ ও নামযশ উপার্জন করে। অতএব ইহা কিছুই বিচিত্র নহে যে, একদিন দেখা গেল, একটি রমণী ঐরূপ উদ্দেশ্যে স্বীয় জননীসহ ফিটন-গাড়ীতে চড়িয়া স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তাহার আপাদমস্তক রত্নমণ্ডিত—দেখিলেই মনে হয়, কুবেরও যেন তাহার আজ্ঞাধীন। ঢাকা-নিবাসীদের কিন্তু চিনিতে বিলম্ব হইল না যে, সে বারবনিতা; অতএব গৃহস্বামীর আত্মীয় যতীনবাবু ও স্বামীজীর ভক্তবৃন্দ তাহাকে স্বামীজীর নিকট লইয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজীকে ঐ সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি তাহাদিগকে নিজ সকাশে লইয়া আসিতে অম্লানবদনে অনুমতি দিলেন। ইহার ফলে বারনারী ও তাহার মাতা গৃহাভ্যন্তরে আগমনপূর্বক স্বামীজীকে অভিবাদনান্তে উপবিষ্ট হইল ও কন্যাটি[৩]

৩। বাঙ্গলা ও ইংরেজী জীবনীর মতে কন্যা, সত্যেন্দ্র মজুমদারের মতে মাতা।

নিবেদন করিল যে, সে হাঁপানির পীড়ায় ভুগিতেছে এবং ঐ রোগ হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য স্বামীজীর নিকট ঔষধ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। শুনিয়া স্বামীজী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সহানুভূতিপূর্ণ ও স্নেহার্দ্রকণ্ঠে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "এই দেখ, মা! আমি নিজেই হাঁপানির যন্ত্রণায় অস্থির, কিছুই করিতে পারিতেছি না। যদি ব্যাধি আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আমার থাকিত, তাহা হইলে কি আর এরূপ দশা হয়!" এইরূপ বেদনামাখা সত্য কথা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিলেও ব্যর্থমনোরথ স্ত্রীলোক দুইটি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইল না; তাহারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্বামীজীর আশীর্বাণীমাত্র লইয়া চলিয়া গেল। অলৌকিক শক্তির পশ্চাতে যাহারা স্বার্থোদ্ধারমানসে ধাবিত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যের নিকট তাহারা আর কি পাইতে পারে? কিন্তু ধর্মপ্রাণ ঢাকা-বাসীদের হৃদয়ে স্বামীজীর এই কয়দিনের অবস্থিতি সত্যই এক গভীর অধ্যাত্মানুভূতি আনিয়া দিয়াছিল—ঢাকা ভাববন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল।

ঢাকা হইতে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তনের পর শিষ্য শরৎবাবুর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামীজী ঢাকার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেখানে ধর্মভাবের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম—দেশের লোকগুলো বড় রক্ষণশীল; উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে ধর্মোন্মাদ হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়ীতে একদিন একটি ছেলে একখানা কার ফটো এনে আমায় দেখালে এবং বললে, 'মহাশয়, বলুন ইনি কে, অবতার কিনা?' আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, 'তা বাবা, আমি কি জানি?' তিন-চার বার বললেও সে ছেলেটি দেখলুম কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হ'ল, 'বাবা, এখন থেকে ভাল ক'রে খেয়ো-দেয়ো, তাহ'লে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে। পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।' এ-কথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি ক'রব বাবা, ছেলেদের এরূপ না বললে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।···গুরুকে লোকে অবতার বলতে পারে। যা ইচ্ছা তাই ব'লে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ভগবানের অবতার যখন-তখন, যেখানে-সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলুম, তিন-চারটি অবতার দাঁড়িয়েছে!" ('বাণী ও রচনা', ৯।১৯৪)।

ঢাকা হইতে স্বামীজী দেওভোগে নাগ-মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ে কথা তুলিয়া অতঃপর শরৎবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "শুনিলাম, নাগ-

মহাশয়ের বাড়ী নাকি গিয়াছিলেন?" স্বামীজী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "হাঁ, অমন মহাপুরুষ! এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখব না? নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে খাওয়ালেন! বাড়ীখানি কি মনোরম—যেন শান্তি-আশ্রম! ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নিয়েছিলুম। তারপর, এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা আড়াইটা! আমার জীবনে যে-কয়দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগ-মহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে একদিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী একখানি কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওয়া হলুম। নাগ-মহাশয়ের ফটো পুজা হয় দেখলুম। তাঁর সমাধিস্থানটি বেশ ভাল করে রাখা উচিত। এখনও—যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয়নি।" (ঐ, ৯।১৯৪-৯৫)।

ঢাকায় স্বামীজীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতিশীল একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী, আপনার শরীর এত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে গেল, আগে থেকে যত্ন নেননি কেন?" স্বামীজী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমেরিকায় আমার শরীরবোধই ছিল না!"

ঢাকা ও তাহার পার্শ্ববর্তী লাঙ্গলবন্ধ ও দেওভোগ এই দুইটি পুণ্যস্থান দেখিয়া স্বামীজী অতঃপর চট্টগ্রাম জেলায় অন্তর্বর্তী চন্দ্রনাথতীর্থ দর্শনে চলিলেন। তাঁহার ২৯শে মার্চ, ১৯০১ তারিখে লিখিত একখানি পত্রে তিনি শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লাঙ্গলবন্ধ ও চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন: "আমার মা ও তাঁর সঙ্গিনীরা পাঁচ দিন আগে ঢাকা এসেছেন, ব্রহ্মপুত্রে পবিত্র স্নানের যোগে। যখনই কয়েকটি গ্রহের বিশেষ সংযোগ ঘটে, যা খুবই দুর্লভ, তখনই কোন নির্দিষ্ট স্থানে নদীতীরে বিপুল লোকসমাগম হয়। এ বৎসর এক লক্ষেরও বেশী লোক হয়েছিল; মাইলের পর মাইল নদী নৌকাতে ঢাকা ছিল। যদিও নদী সেখানে এক মাইল চওড়া, তবু কর্দমাক্ত। কিন্তু (নদীগর্ভ) শক্ত থাকায় আমরা স্নান পূজা ইত্যাদি করতে পেরেছি। ঢাকা তো বেশ ভালই লাগছে। আমার মা ও আর সব মেয়েদের নিয়ে চন্দ্রনাথ যাচ্ছি; সেটা পূর্ব বাঙ্গলার শেষ প্রান্তে একটি তীর্থস্থান।" চন্দ্রনাথের পর তিনি কামাখ্যাদর্শনে যান। চন্দ্রনাথ হইতে তিনি কোন পথে গৌহাটি ও কামাখ্যায় গিয়াছিলেন, তাহা কোন জীবনীতে উল্লিখিত নাই। হয় তো তিনি ট্রেনে ও ষ্টীমারে ধুবড়ি হইয়া গৌহাটিতে গিয়াছিলেন; কারণ তখনও আসামের পার্বত্য অংশের রেল লাইন প্রস্তুত হয় নাই। তাঁহার মাতা ও ভগিনী একই সঙ্গে কামাখ্যাদর্শনে গিয়াছিলেন কিনা, ইহারও উল্লেখ জীবনী-

গ্রন্থে না থাকিলেও স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি[৪] হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তাঁহারা স্বামীজীর সঙ্গে কামাখ্যা দর্শন করিয়াছিলেন। মাতাকে তীর্থদর্শন করাইবার কতখানি আগ্রহ স্বামীজীর হৃদয়ে ছিল, তাহার পরিচয় পাই, এই অধ্যায়েরই প্রারম্ভে উদ্ধৃত স্বামীজীর পত্রাংশ হইতে। ('বাণী ও রচনা', ৮।১৭৬ দ্রষ্টব্য)।

চন্দ্রনাথ দর্শনান্তে স্বামীজী গৌহাটিতে উপনীত হইয়া পার্শ্ববর্তী কামাখ্যাতীর্থ দর্শন করেন এবং কামাখ্যাদেবীর দর্শনান্তে কিছুদিন গোয়ালপাড়া ও গৌহাটিতে বিশ্রাম করেন। গৌহাটিতে তিনি তিনটি বক্তৃতাও দিয়াছিলেন; কিন্তু উহার কোনটিই লিপিবদ্ধ হয় নাই। ঢাকা ও গৌহাটিতে স্বামীজীর স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর খারাপ হইতে থাকায় স্থির হইল যে, তিনি দিনকয়েকের জন্য আসামের রাজধানী ও স্বাস্থ্যনিবাস শিলং শহরে যাইবেন। ভারতবন্ধু স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত স্যার হেনরী কটন তখন আসামের চীফ কমিশনার ছিলেন। স্বামীজীর নাম তিনি পূর্বেই শুনিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে শিলং-এ উপস্থিতির সুযোগে স্বামীজীর সহিত তাঁহার মিলনের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইল। তিনি স্বামীজীর আবাসস্থলে আগমনপূর্বক তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী! ইউরোপ-আমেরিকায় বেড়িয়ে এই জঙ্গলী জায়গায় কি দেখতে এসেছেন? আর এখানে আপনার মর্যাদাই বা বুঝবে কে?" শিলং-এ বাসকালে কটন সাহেবের সহিত স্বামীজীর প্রায়ই আলাপ হইত। স্বামীজীকে অসুস্থ জানিয়া এই সদাশয় ব্যক্তি স্থানীয় সিভিল সার্জনকে তাঁহার চিকিৎসার ভার লইতে বলিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং দুই বেলা খবর লইতেন। স্বামীজীও ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং বলিতেন, "এই একটি লোক যিনি ভারতের অভাব-অভিযোগ ঠিক ঠিক বুঝেছেন এবং প্রকৃতই এদেশের কল্যাণ কামনা করেন।" স্বামীজীর শরীর অসুস্থ থাকিলেও তিনি কটন সাহেবের অনুরোধে কুইণ্টন হলে দেশী ও বিদেশী ভদ্রলোকদের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দেন। উহাতে ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের তিনি এমন চমৎকার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হন। এই বক্তৃতাও লিপিবদ্ধ হয় নাই।

৪। "May 12 (Sunday): Swamiji, Gupta, Swamiji's mother, sister, aunt, Ramdada's wife came back in the morning from Shillong. In the night Nityananda and Kanai came from Goalunda."

শিলং স্বাস্থ্যকর স্থান হইলেও এখানে আসিয়া স্বামীজীর রোগের উপশম হইল না। ঢাকাতেই বহুমূত্রের সহিত হাঁপানির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল; গৌহাটিতে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে; শিলং-এ পীড়া হ্রাস না পাইয়া প্রবলতর হইল। যখন হাঁপানির টান বাড়িত তখন কতকগুলি বালিশ একত্র করিয়া বুকের উপর ঠাসিয়া ধরিতেন ও সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। কিন্তু এইরূপ অবস্থাতেও তাঁহার চিন্তা ভগবানেই নিমগ্ন থাকিত। বৈদ্যনাথে যখন হাঁপানির টান অসহ্য হইত তখনও যেমন ঈশ্বরই তাঁহার একমাত্র ধ্যেয় ছিলেন, এখানেও তেমনি অধ্যাত্মানুধ্যান ও বিশ্বের কল্যাণ-চিন্তার তুলনায় স্বীয় দৈহিক যন্ত্রণা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইত। একদিন এইরূপ অবস্থায় শিষ্যগণ শুনিলেন, তিনি অনুচ্চস্বরে যেন আপনারই উদ্দেশে বলিতেছেন, "যাক্, মৃত্যুই যদি হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম, দেড় হাজার বছরের খোরাক।" সত্যই তো, তাঁহার দেহমন অবলম্বনে যে ভাবরাশি জগতে প্রসারিত হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত এবং কার্যে পরিণত করিতে বিশ্ববাসীর এখনও বহুশত বৎসর লাগিবে। এমন কি, এই অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যাইতেছে, তাঁহার প্রতিটি চিন্তা ও কার্য কিরূপ গভীর তাৎপর্যপুর্ণ; যতই অনুধাবন করা যায়, ততই উহার নবীনতর অর্থ ও ভাবী কার্যকরী সম্ভাবনা আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া আমাদিগকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে।

শিলং-এ স্বাস্থ্যোন্নতি না হওয়ায় তাঁহাকে সমতলে নামিয়া আসিতে হইল। মে মাসের মাঝামাঝি বেলুড় মঠে প্রত্যাগমনান্তে মেরীকে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত দিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই গ্রীষ্মে বড় বড় নদী ও পাহাড় এবং ম্যালেরিয়ার দেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছি এবং দু-মাস কঠোর পরিশ্রমের পর আবার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙেছে। এখন আবার কলকাতায় ফিরে এসেছি এবং ধীরে ধীরে এর প্রকোপ কাটিয়ে উঠছি।" ('বাণী ও রচনা', ৮।১৮১)। একমাস পরে ১৬ই জুন তারিখে তিনি আবার লিখিয়াছিলেন, "আসামে একটু অক্ষম হয়ে পড়েছিলাম; মঠের আবহাওয়া এখন আমাকে কিছু চাঙ্গা করে তুলছে। আসামের পার্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস শিলং-এ আমার জ্বর, হাঁপানি ও অ্যালবুমেন বেড়েছিল এবং শরীর দ্বিগুণ ফুলে গিয়েছিল। যা হোক, মঠে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই রোগের লক্ষণগুলি হ্রাস পেয়েছে।" মঠে ফিরিয়া তিনি পূর্ববঙ্গ ও

আসামের বিবিধ অভিজ্ঞতার কথা বলিতেন। 'বাণী ও রচনা'তে (৯।১৯২-৯৮) উহার কিছুটা সংগৃহীত আছে।

মে মাসের শেষভাগে শিষ্য শরৎবাবু যখন জানিতে চাহিলেন, পূর্ববঙ্গ তাঁহার কেমন লাগিয়াছিল, তখন তিনি উত্তর দিলেন, "দেশ কিছু মন্দ নয়; মাঠে দেখলুম খুব শস্য ফলেছে। আবহাওয়াও মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্মঠ। তার কারণ বোধ হয়, মাছ-মাংসটা খুব খায়; যা করে খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল-চর্বি দেয়; ওটা ভাল নয়।" শিলং সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "শিলং পাহাড়টি অতি সুন্দর।" আর আসামের ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল: "তন্ত্রপ্রধান দেশ। এক হঙ্কর দেবের নাম শুনলুম, যিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে পুজিত হন। শুনলুম তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত।" পূর্ববঙ্গ ও আসামের লোকদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "এ অঞ্চলের লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রাজোগুণ প্রবল; কালে সেটা আরও বিকাশ হবে।" "ওদেশে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় গোল করত। বলত— ওটা কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাদি। তাই বলতে হত, আমি তো সন্ন্যাসি-ফকির লোক, আমার আবার আচার কি? তোদের শাস্ত্রেই না বলেছে, 'চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি'; তবে অবশ্য বাইরের আচার ভেতরে ধর্মের অনুভূতির জন্য প্রথম প্রথম চাই; শাস্ত্রজ্ঞানটা নিজের জীবনে কার্যকর করে নেবার জন্য চাই।...আচার-বিচার কেবল মানুষের ভেতরের মহাশক্তিস্ফুরণের উপায় মাত্র।...উদ্দেশ্য হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া করলে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি উপায় নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে। উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এসেছিলেন।...যে যতটা অনুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য শঙ্করও বলেছেন, 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।' অতএব মূলকথা হচ্ছে—অনুভূতি।"

আসাম ও পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি মেরীকে ৫ই জুলাই (১৯০১) তারিখে লিখিয়াছিলেন: "সম্প্রতি আমি পূর্ববাংলা ও আসাম পরিভ্রমণ করছিলাম। কাশ্মীরের পরেই আসাম ভারতের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা, কিন্তু খুবই অস্বাস্থ্যকর। দ্বীপময় বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে এঁকে-

বেঁকে চলে গিয়েছে, এ দৃশ্য দেখবার মতো। তুমি জানো, আমার এই দেশকে বলা হয় জলের দেশ। কিন্তু তার তাৎপর্য পূর্বে কখনও এমনভাবে উপলব্ধি করিনি। পূর্ববাংলার নদীগুলি যেন তরঙ্গসঙ্কুল স্বচ্ছ জলের সমুদ্র। নদী মোটেই নয়, এবং সেগুলি এত দীর্ঘ যে স্টীমার—সপ্তাহের পর সপ্তাহ্‌ তাদের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে।”

বেলুড় মঠে

বলা চলে যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর জনসাধারণের সহিত মেলা-মেশার পর্ব শেষ হইয়া গেল। ইহার পরে প্রকাশ্য সভায় জনতার সম্মুখে মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা প্রদান তাঁহার শরীরের দিক দিয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। শিলং হইতে তিনি যখন ফিরিলেন, তখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা-দর্শনে বেলুড় মঠের সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সকলে পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন যে, আর তাঁহাকে এভাবে ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে না ; একস্থানে রাখিয়া বিশ্রাম, সুপথ্য ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন হইতে কঠিন দৈহিক শ্রম যেমন বন্ধ থাকিবে, গভীর চিন্তা হইতেও তেমনি তাঁহাকে বাঁচাইতে হইবে। গুরুভ্রাতারা ও শিষ্যবৃন্দ তদবধি তাঁহার সর্বপ্রকার সমুচিত ব্যবস্থায় যত্নপর হইলেন এবং গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদিতে তাঁহার স্বাভাবিক ঊর্ধ্বগামী মনকে ধরিয়া রাখিতে সচেষ্ট রহিলেন। এইসব অনুরক্ত হিতাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা স্বামীজীর পক্ষে সহজ ছিল না। তাই ঐকালে একাদিক্রমে তিনি সাত মাস বেলুড় মঠেই বাস করিয়াছিলেন ও সকলের অভিপ্রায়ানুরূপ চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। কিন্তু সকলের সতর্কদৃষ্টি থাকিলেও গুরুতর চিন্তায় নিবিষ্ট হওয়া হইতে তাঁহাকে বিরত রাখা বড় সহজ ছিল না। বরং দেখা যাইত যে, দৈহিক কার্যব্যস্ততা হইতে মুক্তি পাইয়া তাঁহার মন প্রাচীন অভ্যাসবশতঃ গভীর একাগ্রতাভিমুখে ধাবিত হইত। অনেক সময় শিষ্যেরা তাঁহার আদেশমত তামাক সাজিয়া বা পানীয় জল লইয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেও স্বামীজী আদিষ্ট বস্তুর কথা ভুলিয়া অন্তর্লীনাবস্থায় দীর্ঘকাল নিশ্চল বসিয়া থাকিতেন ; এমন কি, 'স্বামীজী, এই নিন, আপনি যা চেয়েছিলেন, তা এনেছি', ইত্যাদি বলিয়া ডাকিলেও সাড়া পাওয়া যাইত না। এইরূপ অন্যমনস্কতার মধ্যেও দেখা যাইত যে, একটি বিষয়ে তিনি কখনও ঔদাসীন্য দেখাইতেন না—শাস্ত্রাদি অধ্যাপন বিষয়ে তিনি সর্বদাই আগ্রহশীল ছিলেন। সময়বিশেষে তিনি সঙ্গীতালাপন করিতেন, শিষ্য-দিগকে শিখাইতেন কিংবা তাহাদিগকে সমবেতকণ্ঠে তাঁহার সহিত গাহিতে আদেশ দিতেন। আর কথা-বার্তা, গল্প-গুজবেও তিনি পূর্বেরই ন্যায় প্রাণ খুলিয়া সকলের সহিত মিশিতেন।

ঐ সময়ে তাঁহার পা ফুলিয়া শোথের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, হাঁটিতে কষ্ট হইত। যাঁহারা সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এত শিথিল ও কোমল হইয়া গিয়াছিল যে, একটু জোরে হাত পা টিপিলে ব্যথা লাগিত। তবু এত কষ্টের মধ্যেও তাঁহার মনের ফুর্তি অব্যাহত ছিল; কেহ দেখা করিতে আসিলে তাহার সহিত সোৎসাহে দীর্ঘকাল আলাপ করিতেন, কোন বারণ মানিতেন না। তবে বেশী জোরে কথা বলার সামর্থ্য ছিল না। একটু নিম্নগলায় তিনি অনর্গল এমনভাবে কথা বলিয়া যাইতেন যে, কেহ বুঝিতেই পারিত না, তিনি অসুস্থ। তিনি গুরুভ্রাতাদের নির্বন্ধাতিশয় এড়াইতে না পারিয়া কঠিন কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে রাজী হইয়াছিলেন। স্বামীজীকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া এবং পীড়াপীড়ি করিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দ একজন বিচক্ষণ কবিরাজকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি বিধান দিয়াছিলেন, স্বামীজীকে একুশদিন শুধু দুধ খাইয়া থাকিতে হইবে, নুন খাওয়া বা জলপান করাও চলিবে না। জুন মাসের যে মঙ্গলবার হইতে এই চিকিৎসা আরম্ভ হইবার কথা ছিল, তাহার পূর্ববর্তী শনিবারে শিষ্য শরচ্চন্দ্র বেলুড় মঠে আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা শুনিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, "মহাশয়, এই দারুণ গ্রীষ্মকাল! তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় চার-পাঁচ বার করিয়া জলপান করেন, এসময়ে জল বন্ধ করিয়া ঔষধ খাওয়া আপনার অসহ্য হইবে।" স্বামীজী কিন্তু উত্তর দিলেন, "তুই কি বলছিস? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে 'আর জলপান করব না' বলে দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রব, তারপর সাধ্যি কি জল আর কণ্ঠের নীচে নাবেন! তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাবতে পারছেন না। শরীরটা তো মনেরই খোলস। মন যা বলবে, সেইমত তো ওকে চলতে হবে, তবে আর কি? নিরঞ্জনের অনুরোধে আমাকে এটা করতে হ'ল,—ওদের অনুরোধ তো আর উপেক্ষা করতে পারিনে।"

ঐদিন তাঁহার পরিকল্পিত স্ত্রী-মঠ সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা হয়: গঙ্গার পূর্বতটে ঐ স্ত্রী-মঠ স্থাপিত হইবে। এই সব ক্ষেত্রে তৎকালে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে ভেদ দৃষ্ট হইত, উহা বেদবিরুদ্ধ; পরবর্তী কালের স্মৃতি প্রভৃতির বিধানানুসারে এই পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব মেয়েদের এখন না তুলিলে এদেশের উপায়ান্তর নাই। মেয়েরা জ্ঞানভক্তির অধিকারিণী নহে,—এমন কথা অশাস্ত্রীয়। যেদেশে, যেজাতে মেয়েদের পুজা নাই, সে-জাতি,

সে-দেশ কোন কালে বড় হইতে পারে নাই, পারিবেও না। মনু বলিয়াছেন :

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩।৫৬

তাহার পর স্ত্রী-শিক্ষার কথা উঠিল এবং শিষ্য বুঝাইতে চাহিলেন যে, তৎকালে শিক্ষার অনেক কুফলে সমাজজীবন বিপন্ন হইতেছিল—শিক্ষিতা নারীরা ভোগ-বিলাসে ও নাটক-নভেল পাঠেই অর্থব্যয় ও কালাতিপাত করিতেছিলেন। তদুত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "প্রথম প্রথম অমনটা হয়ে থাকে। দেশে নূতন ভাবের প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়? কিন্তু যারা অধুনা-প্রচলিত যৎসামান্য স্ত্রী-শিক্ষার জন্যও প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে? তবে কি জানিস, শিক্ষাই বলিস আর দীক্ষাই বলিস, ধর্মহীন হ'লে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে।...ভাল-মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে—ভাল কাজ ক'রে লোকের সামনে দৃষ্টান্ত ধরা।...এই মায়ার জগতে যা করতে যাবি, তাইতেই দোষ থাকবে।...কিন্তু তাই ব'লে কি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকতে হবে? যতটা পারিস ভাল কাজ করে যেতে হবে।"

পরিশেষে কথা উঠিল কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ সম্বন্ধে; উত্তরে স্বামীজী যাহা বলিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য: "আচার্য শঙ্কর...জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্মকে আপেক্ষিক সহকারী ও সত্ত্বশুদ্ধির উপায় ব'লে নির্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশ নেই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছি না। ক্রিয়া-, কর্তা- ও কর্মবোধ যতকাল মানুষের থাকবে, ততকাল সাধ্য কি—সে কাজ না ক'রে বসে থাকে? অতএব কর্মই যখন জীবের স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন যে-সব কর্ম এই আত্মজ্ঞান-বিকাশকল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন ক'রে যা না? কর্মমাত্রই ভ্রমাত্মক—এ-কথা পারমার্থিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারে কর্মের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তুই যখন আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন কর্ম করা বা না করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়াবে। সেই অবস্থায় তুই যা করবি, তাই সৎকর্ম হবে; তাতে জীবের, জগতের কল্যাণ হবে।...তখন আর মতলব এঁটে কর্ম করতে হবে না।" ('বাণী ও রচনা', ৯।১৯৯-২০৭)।

কবিরাজী ঔষধ-সেবনারম্ভের পাঁচ-সাতদিন পরে শরৎবাবু একদিন একটি
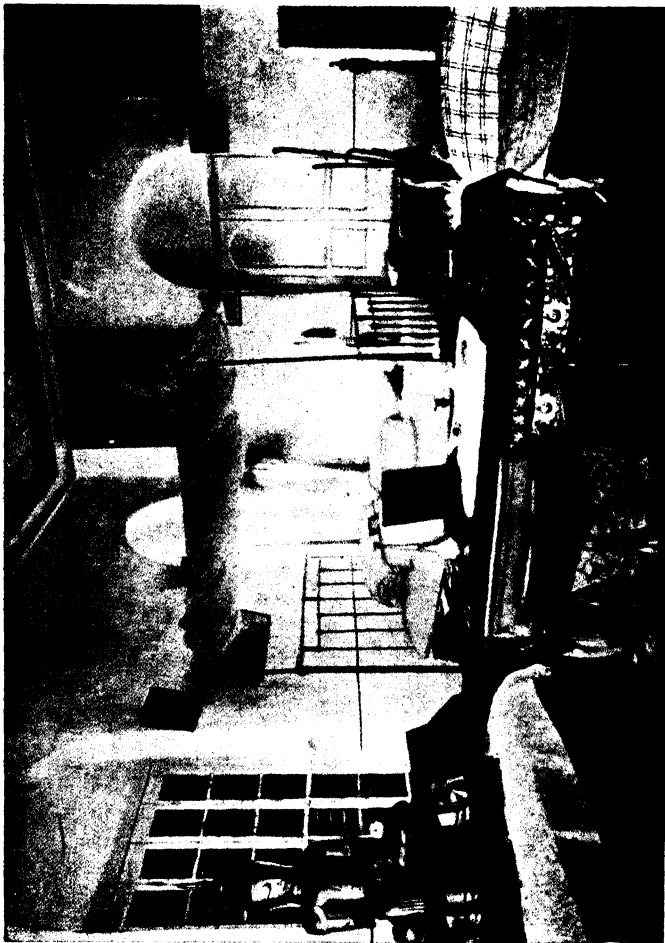
বেলুড় মঠে স্বামীজীর ব্যবহৃত গৃহাভ্যন্তর
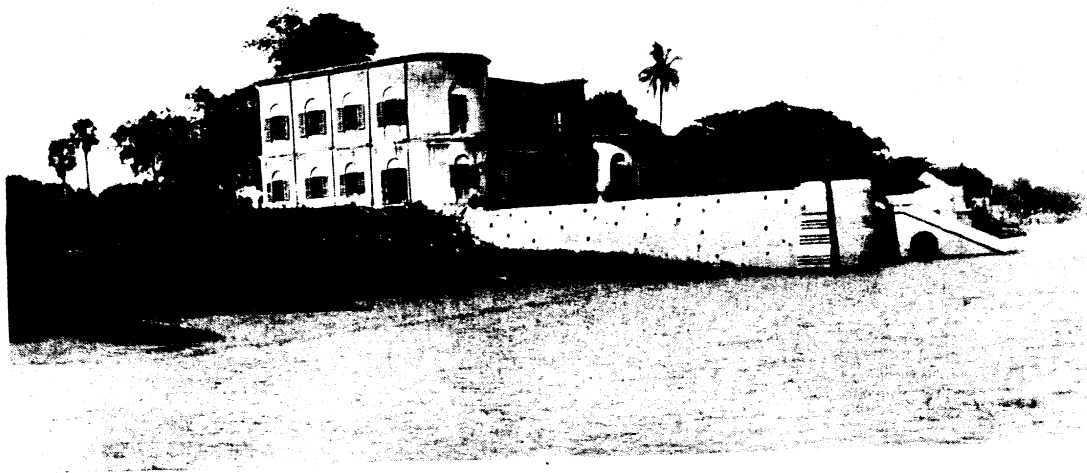
বেলুড় মঠে স্বামীজীর বাসগৃহ

প্রকাণ্ড রুই-মাছ লইয়া মঠে আসিলে স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন যে, রবিবারে মাছ-ভোগ দেওয়া হয় না; আর স্বামীজীও অসুস্থ। স্বামী প্রেমানন্দের মুখে সব শুনিয়া স্বামীজী কিন্তু বলিলেন যে, ভক্তের আনীত দ্রব্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেওয়া উচিত। অধিকন্তু ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রভাগ সরাইয়া লইবার পর স্বামীজী স্বহস্তে বিলাতী কায়দায় দুধ, ভারমিসেলি, দধি প্রভৃতির সাহায্যে চার-পাঁচ প্রকারে মাছ রাঁধিয়া ফেলিলেন। অনেকে অবশ্য আপত্তি করিয়াছিলেন যে, তিনি জলপান বর্জন করিয়া আছেন, এই অবস্থায় আগুনের পাশে দীর্ঘকাল থাকিলে কষ্ট হইবে। কিন্তু তিনি সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। ভোজনকালে তিনি স্বয়ং ঐসব মাছের তরকারির বিন্দুমাত্র চাখিয়া বাকি সবটা অপরদের খাওয়াইলেন।

এইকালে স্বাভাবিক অনিদ্রা ও কবিরাজের বিধানানুসারে আহার চলিতে থাকিলেও তাঁহার মনের বিরাম ছিল না। দিন কয়েক আগে মঠের জন্য এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ক্রয় করা হইয়াছিল। ঝকঝকে বইগুলি দেখিয়া শিষ্য বলিলেন, "এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।" স্বামীজী কিন্তু এই কয়দিনেই উহার দশ খণ্ড শেষ করিয়া একাদশ খণ্ড পড়িতেছিলেন। তাই তিনি বলিলেন, "কি বলছিস? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর্—সব ব'লে দেবো।" সাহস পাইয়া শিষ্য ঐ গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আর স্বামীজীও যথাযথ উত্তর দিতে থাকিলেন। পরাজিত শিষ্য তখন কহিলেন, "ইহা মানুষের শক্তি নয়।" স্বামীজী কিন্তু বলিলেন, "দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্যপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়।" এই গ্রন্থাবলী এখনও বেলুড় মঠের লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

তারপর দর্শনশাস্ত্রের গভীর আলোচনা চলিতে থাকিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আসিয়া শিষ্যকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন যে, গল্পসল্প করিয়া স্বামীজীকে প্রফুল্ল রাখাই উচিত; এভাবে জটিল বিষয়ে চর্চা করা অন্যায়। স্বামীজী তবু বলিলেন, "নে, রেখে দে তোদের কবিরাজী নিয়ম-ফিয়ম। এরা আমার সন্তান, এদের সদুপদেশ দিতে আমার দেহটা যায় তো বয়ে গেল।" দর্শনশাস্ত্রের চর্চা কিন্তু থামিয়া গিয়া সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ হইল। স্বামীজী মত প্রকাশ করিলেন যে, ভারতচন্দ্রের কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীলতাময় কাব্যাদি ছেলেদের হাতে না পড়াই

ভাল। পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া 'মেঘনাদবধ'-কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন ও মঠের লাইব্রেরী হইতে ঐ গ্রন্থখানি আনিতে বলিলেন। শিষ্য বই লইয়া আসিলেন ও স্বামীজীর আদেশে প্রথম সর্গের খানিকটা পড়িলেন; কিন্তু পড়া পছন্দ না হওয়ায় স্বামীজী নিজেই পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যেখানে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াও রাবণ স্বীয় সঙ্কল্পে অটুট রহিয়াছিল ও যুদ্ধে গমনোদ্যত হইয়াছিল, উহাই ঐ কাব্যের শ্রেষ্ঠাংশ। (ঐ, ৯।২০৭-১২)।

ইহার মাসাধিক কাল পরে শরৎবাবু আবার লিখিয়াছেন: "স্বামীজীর অসুখ তখনও একটু আছে। কবিরাজী ঔষধে অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাধিক শুধু দুধ পান করিয়া থাকায় স্বামীজীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতি অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে।" ঐদিন শিষ্য স্বামীজীর সহিত অদ্বৈততত্ত্বের বিচারে অনেকক্ষণ কাটাইবার পর মন্দিরে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। শিষ্য স্বামীজীর ঘরেই রহিয়া গেলেন ও বাহিরের অমাবস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, "আজ কালীপূজার দিন"। স্বামীজীর মনও তখন সেই গভীর তমসাবৃত নিস্তব্ধ প্রকৃতির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইল ও তিনি আস্তে আস্তে গান ধরিলেন:

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।

গীত সাঙ্গ হইলে স্বামীজী গৃহে আসিয়া বসিলেন ও মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "মা, মা, কালী, কালী"। শিষ্যের মনে হইল, স্বামীজীর অন্তরাত্মা যেন তখন কোন সমাধিভূমিতে বিচরণ করিতেছে। অমাবস্যা ও কালীর কথা তুলিয়া স্বামীজীর মনে এই ভাবান্তর উপস্থিত করিয়াছেন ভাবিয়া তিনি অনুতপ্ত হইলেন এবং স্বামাজীকে সাধারণ স্তরে নামাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টাও করিলেন। স্বামীজী শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া আবার গান ধরিলেন:

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী,
—কালী সুধা-তরঙ্গিণী।

গান শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, "এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা 'সাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব'—শুনিসনি?" ঐ কথাপ্রসঙ্গেই স্বামীজী

ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সেবারে তাঁহার ৺দুর্গাপূজার অভিলাষ আছে। (ঐ, ৯।২১৩-১৬)।

আর একদিনের কথা। সেদিন স্বামীজী শিষ্যকে বুঝাইতেছিলেন যে, তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গেলেও তখন পর্যন্ত যথেষ্ট শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণী যুবক পাইলেন না, যাঁহারা তাঁহার উদার ভাব গ্রহণপূর্বক উহা কার্যে পরিণত করিতে এবং তদনুরূপ লোককল্যাণ সম্পাদনে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তাহাদের থাকিবে বল, বীর্য, বৈরাগ্য ও পবিত্রতা—শ্রীরামচন্দ্রের জন্য উৎসর্গিত-জীবন মহাবীরেরই মতো। এইসব কথা বলিতে বলিতে তিনি সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শিষ্যসহ উপর হইতে নীচে নামিলেন এবং মঠের প্রাঙ্গণে আমগাছের তলায় যে ক্যাম্প খাটটি পাতা থাকিত এবং যাহার উপর তিনি অনেক সময় বসিতেন, উহাতে পশ্চিমাস্য হইয়া বসিলেন। সেখানে আরও সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখাইয়া তিনি ভাবগম্ভীরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! একে উপেক্ষা ক'রে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়, ধিক্ তাদের! করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখতে পাচ্ছিস নে?—এই—এই।" শরৎবাবু মন্তব্য করিয়াছেন, "এমন হৃদয়স্পর্শী ভাবে স্বামীজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে'—সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন! কাহারও মুখে কথাটি নাই। স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামীজী 'এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম' বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল, একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় পনর মিনিট গত হইলে স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'যা, এখন ঠাকুরপূজায় যা।' স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতন হয়! ক্রমে সকলের মনই আবার 'আমি-আমার' রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং যে যাহার কার্যে গমন করিল। সেদিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না।" (ঐ, ৯।২২০-২১)।

স্বামীজীর শরীর তখনও অসুস্থ হইলেও তিনি সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াইতে যাইতেন। পূর্বোক্ত ঘটনার পর শিষ্যসহ বেড়াইতে বাহির হইয়া তিনি বলিলেন, "দেখলি, আজ কেমন হ'ল? সবাইকে ধ্যানস্থ হ'তে হ'ল। এরা সব ঠাকুরের

সন্তান কিনা, বলবামাত্র এদের তখন তখনই অনুভূতি হয়ে গেল।" শরৎবাবু কহিলেন, "মহাশয়, আমাদের মতো লোকের মনও যখন নির্বিষয় হইয়া গিয়াছিল, তখন ওঁদের কা কথা! আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল! এখন কিন্তু ঐ ভাবের আর কিছুই মনে নাই—যেন স্বপ্নবৎ হইয়া গিয়াছে।"

ভ্রমণকালে 'সর্বমুক্তি'র কথা উঠিল। স্বামীজী বুঝাইতে চাহিলেন যে, সমস্ত বিশ্বে যখন এক অখণ্ড আত্মা বিদ্যমান, তখন সমষ্টির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যষ্টির মুক্তি অসম্ভব। শিষ্য আপত্তি জানাইলেন: ব্যষ্টিভাবই বন্ধনের কারণ এবং এই ভাব দূরীভূত হইলে জীবজগৎ কিছুই থাকে না; ফলতঃ তখন সর্বমুক্তির চিন্তাই আসিতে পারে না। উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "হাঁ, তুই যা বলছিস তাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত। উহা নির্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু যে মনে করে—আমি আব্রহ্মজগৎটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত হবো, তার মহাপ্রাণতাটা একবার ভেবে দেখ দেখি!" (ঐ, ৯।২২১-২৩)। ইহা যুগনায়কের নবীন দৃষ্টিভঙ্গী—সাধনক্ষেত্রে অদ্বৈতবেদান্তের নবীন অভিযান। বেদান্ত বলিয়াছে, "নেতি নেতি", আবার বেদান্তই বলিয়াছে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। এই দ্বিতীয় বাক্যের বাস্তব প্রয়োগ কি কোথাও হইবে না—শুধু নেতিমূলক সাধন ও সিদ্ধির মধ্যেই মানবের অধ্যাত্মপ্রয়াস সীমাবদ্ধ থাকিবে? অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ তো বেদান্তসাধন ও সিদ্ধি উভয়েরই একটা ইতিমূলক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, "চোখ বুজলেই তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই নাই!" আর প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "চোখ বুজলেই ধ্যান, চোখ খুললে আর কিছু নাই?" ('কথামৃত', ৩।১৬।১)। অন্য সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "অহং-বুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হয়েছেন, এই বোধ হয়।" (ঐ, ১।১৩।৬)।[১] অধিকন্তু কতবারই না তিনি বলিয়াছেন যে; নেতি-মার্গে জ্ঞানলাভের পর বিজ্ঞানী দেখেন সবই ব্রহ্ম।

স্বামীজীর দেহ-মন অবলম্বনে পূর্বে আমরা যেসব দৈবশক্তি প্রকাশের উদাহরণ পাইয়াছি, উহারই অনুরূপ আরও দুইটি ঘটনা জানা যায়, যদিও উহারা শ্রীরামকৃষ্ণের পূতাস্থির সহিত জড়িত এবং তাহারই মহিমার জ্ঞাপক। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী নির্ভয়ানন্দ একবার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন এবং জ্বরের উত্তাপ ১০৭

১। 'কথামৃত', ২।১৫।২ দ্রষ্টব্য।

ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের বিকারও পূর্ণ মাত্রায় দেখা দেয় এবং তিনি প্রলাপ বকিতে থাকেন। আরোগ্যের আশা তিরোহিত হইতেছে দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন এবং অতিমাত্র বিষণ্ণ। স্বামীজীরও চোখেমুখে দুঃখ ও উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এমন সময় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাগৃহে প্রবেশপূর্বক তাঁহার পূজাদি সমাপন করিলেন ও যে কৌটাটিতে তাঁহার ভস্মাবশেষ রক্ষিত ছিল, এবং যাহাকে স্বামীজী 'আত্মারামের কৌটা' আখ্যা দিয়াছিলেন, উহা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া সেই পবিত্র বারি নির্ভয়ানন্দকে পান করিতে দিলেন। তারপর জ্বর আর একটু বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ একেবারে কমিয়া গেল। তখন স্বামীজী উপস্থিত সাধুদের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "দেখ্, ঠাকুরের শক্তি দেখ্। তিনি কী না করতে পারেন?"

'আত্মারামের কৌটা'র প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তাঁহার নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল ঠাকুরঘরে প্রবেশের পর ঠাকুরের চরণামৃত পান, তাঁহার শ্রীপাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ ও ঐ কৌটার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। কিন্তু চিরকালই তাঁহার অভ্যাস ছিল বিচারপূর্বক প্রতিটি জিনিস গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা। অতএব এত শ্রদ্ধাভক্তি সত্ত্বেও একদিন 'আত্মারামের কৌটা'র পরীক্ষায়ও তিনি প্রবৃত্ত হইবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য কি? একদিন যথারীতি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও মস্তকে কৌটা স্পর্শ করাইবার পর ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসার সময় অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল: "সত্যই কি এতে আত্মারাম ঠাকুরের আবেশ রয়েছে? আচ্ছা, দেখি প্রার্থনা করে।" এই বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, তুমি যদি সত্য সত্যই এর মধ্যে থাক, তবে তিন দিনের মধ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজকে মঠে আকর্ষণ করে আন।" মহারাজ তখন কলিকাতায় থাকিলেও স্বামীজী জানিতেন যে, তাঁহার তখন বেলুড় মঠে আগমন একান্তই অসম্ভব। তবু এই অপুরণীয় বাসনাই তাঁহার মনে প্রার্থনাকারে উদিত হইল। অবশ্য এসব কথা তাঁহার নিজ অন্তঃকরণের গোপন কোণেই থাকিয়া গেল, অপর কেহ জানিতে পারিল না। এমন কি কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেও ইহা ভুলিয়া গেলেন। পরদিন তাঁহাকে কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল। অপরাহ্নে মঠে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি জানিতে পারিলেন, গোয়ালিয়রের মহারাজ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া গাড়ীতে যাইতে যাইতে স্বামীজী মঠে আছেন কিনা সংবাদ লইবার জন্য স্বীয় ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীজী

অনুপস্থিত থাকায় বিষণ্ণমনে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কথা শ্রবণমাত্র স্বামীজীর মনে পূর্ব দিনের কথা উদিত হইল এবং তিনি তখনই দ্রুতপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশান্তে 'আত্মারামের কৌটা'তে মাথা ঠেকাইয়া ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি সত্যি", "তুমি সত্যি", "তুমি সত্যি"। স্বামী প্রেমানন্দ সেই সময় ধ্যান করিবার জন্য ঠাকুরঘরে গিয়াছিলেন। তিনি এই কাণ্ড কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চিত্রার্পিতপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে স্বামীজীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। সেই দিন হইতে স্বামীজী ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া মঠের সকলকে বিশেষ সন্তর্পণে উক্ত কৌটার পূজাদি করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

ফলতঃ স্বামীজী প্রতি বস্তুর অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মশক্তির পরিচয় যেমন সহজে পাইতেন, অপরের মধ্যে তেমনি স্বীয় শক্তির সঞ্চারও করিতে পারিতেন। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা এই উভয় সত্যেরই প্রমাণ পাই। আমরা পূর্বেও দেখিয়া আসিয়াছি যে, তিনি আমেরিকা ও লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে বহু ক্ষেত্রে স্বীয় অলৌকিক শক্তির মহিমা দেখাইয়াছিলেন, আর ভারত ও ভারতেতর দেশে ভ্রমণকালে বহু স্থানে বিচিত্ররূপে দৈবশক্তির সাহায্য পাইয়াছিলেন। অবশ্য শক্তি প্রকাশ তিনি সব সময় করিতেন না—উহার দৃষ্টান্ত বিরল।

অপূর্ব ভাবময় স্বামীজীর আর একটি দিকের পরিচয় পাই শরৎবাবুর পরবর্তী বিবরণ হইতে। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য হৃদয়ের আবেগে দেবদেবীর স্তব রচনা করিয়াছিলেন, পূজানুষ্ঠানাদিকেও সমুচিত মর্যাদা দিয়াছিলেন এবং মন্দিরাদির স্থাপন বা সংস্কারেও সর্বদা যত্নপর ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানী বেদান্তবাদী স্বামীজীর জীবনেও ইহার অন্যথা হয় নাই এবং তাঁহারও ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল হৃদয়ের ভাবভক্তির ফলে। আমরা পূর্বেই তাঁহার কালীভক্তি, ক্ষীরভবানী-দর্শন ও অমরনাথ-দর্শনাদির কথা বলিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বেলুড় মঠে ৺দুর্গাপূজার কথা বলিতেছি। শরৎবাবুও লিখিয়াছেন যে, উহা ভাবভক্তির আতিশয্যের ফলেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।[২] অবশ্য বেলুড় মঠের প্রতি লোকের একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল এবং ঐ পূজার পরে উহা বহুধা তিরোহিত হইয়াছিল।

২। 'বাণী ও রচনা', ৮।৪৮ দ্রষ্টব্য: "গত দশ বৎসর বাংলা দেশে দুর্গাপূজা দেখিনি···। আশা করি এবছর পূজা দেখব।" এইরূপ উক্তি পূজার প্রতি আগ্রহেরই প্রমাণ দেয়।

কিন্তু উহা অবান্তর ফল ; স্বামীজীর পূজা ঐ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় নাই। ঐকালের লোকনিন্দার কথা উল্লেখ করিয়া শরৎবাবু লিখিয়াছেন : "বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজী-কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচারনিষ্ঠা সর্বদা প্রতিপালিত হয় না, এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদির বাদবিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী অনেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের কার্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। নৌকায় করিয়া মঠে আসিবার কালে শিষ্য সময়ে সময়ে ঐরূপ সমালোচনা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। তাঁহার মুখে স্বামীজী কখন কখন ঐ-সকল সমালোচনা শুনিয়া বলিতেন—

হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভোঁকে হাজার।
সাধুন্‌কো দুর্ভাব নহী, জব নিন্দে সংসার ॥

কখনও বলিতেন, 'দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার সময় তার বিরুদ্ধ প্রাচীনপন্থীদের আন্দোলন প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্মসংস্থাপক-মাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।' আবার কখনও বলিতেন, 'অন্যায় অত্যাচার না হ'লে জগতের হিতকর ভাবগুলি জগতের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।' সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে স্বামীজী তাঁহার নবভাব-প্রচারের সহায়ক বলিয়া মনে করিতেন, কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না বা তাঁহার আশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন, 'ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ করে যা, একদিন ওর ফল নিশ্চয়ই ফলবে।' স্বামীজীর শ্রীমুখে একথাও সর্বদা শুনা যাইত, 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'।" ('বাণী ও রচনা', ৯৷২২৪-২৫)।

সুতরাং সে বৎসর যখন স্বামীজী সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মঠে প্রতিমায় দুর্গোৎসব হইবে, তখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, তিনি ইহা অভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া করেন নাই। স্বাভাবিক ধর্মভাব, দেবভক্তি ও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণেই এই অভিলাষ তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, যদিও ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনাও অনেকটা নিস্তব্ধ হইয়াছিল। বস্তুতঃ স্বামীজী ঐ বৎসরের মে মাস হইতেই ৺দুর্গাপূজার কথা ভাবিতেছিলেন এবং তখনই ঐ জন্য শরৎবাবুকে রঘুনন্দনপ্রণীত একখানি 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' আনিতে

বলিয়াছিলেন ; শরৎবাবুও উহা আনিয়া দিয়াছিলেন। পূজা যাহাতে যথাশাস্ত্র সম্পাদিত হয়, এই অভিপ্রায়েই স্বামীজী ঐ গ্রন্থখানি আনাইয়া স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখনও একটি অন্তরায় ছিল, উপযুক্ত অর্থের অভাব। যথাকালে অর্থ সংগৃহীত হইয়া ঐ বৎসরেই (১৯০১) বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসবের আয়োজন হইল। স্বামীজী বলিলেন, "আমরা তো কৌপীনধারী—আমাদের নামে (পূজা) হবে না।" অতএব শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত—জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর অনুমতিক্রমে স্থির হইল যে, পূজার সঙ্কল্প তাঁহারই নামে হইবে। পূজার সর্বাঙ্গ প্রতিপালিত হওয়া উচিত মনে করিয়া স্বামীজী পশুবলি-প্রদানের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু শ্রীমায়ের অভিপ্রায়ানুসারে উহা বন্ধ রহিল। কুমারটুলি হইতে প্রতিমা আনা হইল। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল পূজক ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা সাধকাগ্রণী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তন্ত্রধারক হইলেন। যে বিল্ব-বৃক্ষমূলে বসিয়া স্বামীজী একদিন গান গাহিয়াছিলেন,

বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া আসন
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।

সেইখানেই বোধনাধিবাসের সান্ধ্যপূজা সম্পন্ন হইল। পূজার কয়দিন শ্রীমা বেলুড়ে আসিয়া সঙ্গিনীদের সহিত মঠের নিকটবর্তী নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে ১৮ই হইতে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করিলেন এবং প্রতিদিনই পূজামণ্ডপে উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করিলেন। তাঁহারই নামে সঙ্কল্পিত পূজা তাঁহারই সম্মুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইল। গরীব-দুঃখীদিগকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো এই দুর্গোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। বেলুড়, বালি ও উত্তরপাড়ার বহু পরিচিত ও অপরিচিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া সাগ্রহে পূজায় যোগদান করিলেন এবং পূজাদর্শনে তাঁহাদের স্থির ধারণা জন্মিল যে, সন্ন্যাসীরা সনাতনমার্গ-বিরোধী নহেন।

মহাষ্টমীর পূর্বরাত্রে স্বামীজীর জ্বর হওয়ায় তিনি পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই ; কেবল সন্ধিক্ষণে উঠিয়া মহামায়ার চরণে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।. অধিকন্তু তিনি নবমীরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শ্রুত দুই-একখানি গান গাহিয়াছিলেন। পূজাশেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বারা যজ্ঞদক্ষিণান্ত করা হইল ; স্বামীজী তাঁহার হাত দিয়া তন্ত্রধারককে পঁচিশটি টাকা দেওয়াইলেন। ৺দুর্গাপূজার পর মঠে যথারীতি ৺লক্ষ্মীপূজা ও ৺শ্যামাপূজাও হইয়াছিল। (ঐ, ৯।২২৪-২৭)।

শরৎবাবুর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' অবলম্বনে ৺দুর্গাপূজার পূর্বোক্ত বিবরণপ্রদানের পর এই বিষয়ে অন্যান্যসূত্রে আর যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহাও এখানে আবশ্যকবোধে বিবৃত করিতেছি। বাঙ্গলা জীবনীর মতে (৯১১ পৃঃ) পূজার দশ-বার দিন পূর্বে পর্যন্ত ঐ সম্বন্ধে কোন প্রকাশ্য আলোচনা হয় নাই। এরই মধ্যে ('স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থের মতে) স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন মঠের সম্মুখে বসিয়া সহসা দেখিলেন, যেন মা দুর্গা দক্ষিণেশ্বরের দিক হইতে গঙ্গাবক্ষে চলিয়া মঠের বিল্বতলায় গিয়া উঠিলেন। এই সময়ে স্বামীজী কলিকাতা হইতে নৌকা করিয়া মঠে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা (ব্রহ্মানন্দ) কোথায়?" তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এবার প্রতিমা এনে মঠে দুর্গাপূজা করতে হবে, সব আয়োজন কর।" ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "তোমাকে দুদিন পরে কথা দেব; এখন প্রতিমা পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে—সময় একেবারে সংক্ষেপ, দুটো দিন সময় দাও।" স্বামীজী তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি ভাবচক্ষে দেখিয়াছেন, মঠে দুর্গোৎসব হইতেছে ও প্রতিমায় পূজা হইতেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দও তখন স্বীয় দর্শনের কথা বলিলেন। মঠে এইসব শুনিয়া হৈ চৈ লাগিয়া গেল। স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল কলিকাতায় কুমারটুলিতে প্রতিমার সন্ধানে গেলেন—তখন পূজার মাত্র চারি-পাঁচ দিন বাকি। তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একখানি মাত্র প্রতিমা সেখানে দেখা গেল। কৃষ্ণলাল কারিগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই প্রতিমা আমাদের দিতে পার?" কারিগর উত্তরে জানাইল যে, যিনি ফরমায়েস দিয়াছিলেন, তিনি হয়তো কোন কারণে তখনও লইয়া যান নাই; তিনি নিবেন কিনা বুঝিয়া পরদিন পাকা কথা দিতে পারিবে। স্বামীজী কৃষ্ণলালের মুখে সব শুনিয়া বলিলেন, "যেমন করেই হোক, প্রতিমাখানি নিয়ে আসবি।" শেষ পর্যন্ত প্রতিমাখানি পাওয়া গেল এবং উহাতেই মঠের পূজা সম্পন্ন হইল। ('স্বামী ব্রহ্মানন্দ', ১৯০-৯১ পৃঃ)।

৺দুর্গাপূজা ও ৺কালীপূজার পরে অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে স্বামীজী স্বীয় জননীর ইচ্ছা-পরিপূরণার্থ বাল্যকালের এক 'মানত'-পূজা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কালীঘাটে গিয়া গঙ্গাস্নানান্তে ভিজাকাপড়ে মায়ের মন্দিরে প্রবেশপূর্বক মায়ের পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন, সাতবার মন্দিরপ্রদক্ষিণ করেন এবং নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। ঐ সময়ে কালীঘাটের কর্মকর্তাদের উদারভাব দেখিয়া স্বামীজী খুব প্রীত হইয়াছিলেন এবং

পরে শরৎবাবুকে বলিয়াছিলেন, "কালীঘাটে এখনও কেমন উদারভাব দেখলুম ; আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ ব'লে জেনেও মন্দিরের অধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেননি ; বরং পরম সমাদরে মন্দিরমধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজা করতে সাহায্য করেছিলেন।" ('বাণী ও রচনা', ৯।২২৭)।

এইকালে স্বামীজী বেলুড়ে আছেন জানিয়া কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার দর্শনজন্য সেখানে আসিতেন ; দূরদূরান্ত হইতে কলিকাতায় আগত বহু ব্যক্তিও এই সুযোগে তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি একসময়ে স্বামীজীর পূর্বপরিচিত ফরাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জুল বোয়া ভারতভ্রমণে আসিয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু ধর্মপিপাসু ব্যক্তিও সর্বদা যাতায়াত করিতেন। অবশ্য স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি সব সময় নীচে নামিতে পারিতেন না—তখন শয্যাতেই শায়িত থাকিতেন। অসুখ কম থাকিলে তিনি নীচে নামিয়া মঠের সাধু ও আগন্তুকদের সহিত আলোচনাদি করিতেন বা ভ্রমণে বাহির হইতেন। শিষ্যস্থানীয় মঠের সাধুদের সহিত ব্যবহারে সর্বদাই তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত ; অভ্যাগতদিগকেও তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন ও সর্ববিষয়ে তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। "মঠের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্যেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, এমন কি তাহারাও প্রত্যেকেই তাঁহার সেবার অধিকার লাভের জন্য উদ্গ্রীব থাকিত। নৌকায় করিয়া মঠ হইতে কলিকাতা যাতায়াতকালে দাঁড়ি মাঝিরা তাঁহাকে আপন আপন নৌকায় লইবার জন্য কোলাহল করিত। কখনও কখনও তিনি কেবলমাত্র কৌপীন-পরিহিত হইয়া মঠের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেন অথবা একটা সুদীর্ঘ আলখাল্লায় দেহ আবৃত করিয়া পল্লীর নিভৃত পথে একাকী বিচরণ করিতেন। অনেক সময় গঙ্গার ধারে বা মঠের অভ্যন্তরস্থ কোন বৃক্ষের স্নিগ্ধ নিবিড় ছায়ায় বসিয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা নিজের গৃহে বসিয়া পুস্তকের পাতা উলটাইতেন বা ছবি দেখিতেন। অনেক সময় রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধনাদি পর্যবেক্ষণ করিতেন, কিংবা স্বয়ং সখ করিয়া দুই-একটি উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৯০২ পৃঃ)।

মঠ ও মঠের পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। মঠে গঙ্গার ধারে বা বেলুড়গ্রামে তিনি প্রায়ই বেড়াইতেন। তাঁহার বসিবার একটি প্রধান স্থান ছিল মঠের প্রাঙ্গণে অবস্থিত আমগাছের তলায়। সেখানে ক্যাম্প খাটে বসিয়া

তিনি গল্প করিতেন বা বই পড়িতেন, অথবা পত্র ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। আর একটি প্রিয় স্থান ছিল তাঁহার বর্তমান সমাধিমন্দিরের কোণে অবস্থিত বিল্ববৃক্ষ-মূল। তাঁহার শয়নকক্ষ ছিল পুরাতন মঠবাড়ীর দোতলায় গঙ্গার ধারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এখানে তাঁহার দিবসের অনেকখানি সময় ব্যয়িত হইত। একই কক্ষ তাঁহার ভোজনাগার এবং আফিসরূপেও ব্যবহৃত হইত। এই ঘরে তাঁহার বস্ত্রাদি, শয্যা, আসন, চা-দান, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, পাদুকা, লিখিবার উপকরণ, বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য তাঁহার জীবনকালে যেটি যে-রূপ ছিল, এখনও ঠিক সেইভাবেই সংরক্ষিত আছে। ঐ কক্ষ অন্য কেহ ব্যবহার করেন না, শুধু কেহ কেহ সেখানে ধ্যানাদি করেন। গৃহখানি তাঁহার আমেরিকার বন্ধুগণ ও ভক্তবৃন্দের অর্থে সুসজ্জিত হইয়াছিল; কিন্তু স্বামীজী ঐ সব সাজসজ্জাকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহার স্বমুখেই প্রকাশ। তাঁহার কয়েকজন বাল্যবন্ধু একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলতে, 'বে করব না, আমি কি হবো, দেখবি।' তা যা বলেছিলে তাই করলে।" স্বামীজী ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "হাঁ ভাই, করেছি বটে। তোরা তো দেখেছিস—খেতে পাইনি, তার উপর খাটুনি। বাপ, কতই না খেটেছি! আজ আমেরিকানরা ভালবেসে এই দেখ কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে! দুটো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে শুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাঁচি।" ('বাণী ও রচনা', ৯।৪১৮)।

চিরকালের অভ্যাসানুসারে তিনি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং অপর মঠবাসীদিগকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া ধ্যান-জপাদিতে নিরত হইতে বলিতেন। স্বামীজীর শরীর সুস্থ থাকিলে তিনিও ঠাকুরঘরে সকলের সহিত ধ্যানে বসিতেন। সকালের পরবর্তী কর্তব্য ছিল গো-সেবা ও বাগানের তত্ত্বাবধান। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর তরকারী ও ফুলের বাগানের ভার ছিল। তাহারই পার্শ্বে গোচারণভূমি। এই উভয় ভূমির সীমা-বিভাগ লইয়া তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত কতই না বালকোচিত মধুর কলহে প্রবৃত্ত হইতেন, আর তাহাতে মঠবাসীরা কতই না আমোদ উপভোগ করিতেন! শৈশবাবধি পশুপক্ষীদের প্রতি স্বামীজীর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ঐগুলির কোনটি বাগানে ঢুকিলেই ব্রহ্মানন্দ আপত্তি করিতেন এবং স্বামীজীও ঐগুলির পক্ষ লইয়া প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইতেন

যে, পশুগুলির কোনই দোষ হয় নাই। মঠে তিনি কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর, ছাগল, সারস ও হরিণ পুষিয়াছিলেন। একটি মাদী ছাগলের নাম দিয়াছিলেন 'হংসী' এবং তাহারই দুধে তাঁহার সকালের চা প্রস্তুত হইত। একটা ছাগলছানার আদরের নাম ছিল 'মটরু' এবং তাহার গলায় তিনি ঘুঙুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। মটরু দিনরাত তাঁহার পায়ে পায়ে ঘুরিত এবং তিনিও তাহার সহিত ছোট ছেলের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতেন। ইহার উপর ঐকালে তিনি সামাজিক আদব-কায়দার বিশেষ ধার ধারিতেন না। যদৃচ্ছাক্রমে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন—কখনও চটিপায়ে, কখনও খালি-গায়ে, কখনও গেরুয়া পরিয়া, কখনও বা খালি কৌপীন আঁটিয়া। অনেক সময় হাতে থাকিত হুঁকা বা লাঠি। কোট, সার্ট, কলার, জুতা, এ সকলের কোন হাঙ্গামা তখন ছিল না—তিনি থাকিতেন তখন আপন নির্জন মানসভূমিতে—সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ। যেসকল নবাগত ব্যক্তি তাঁহার দর্শনের জন্য শ্রদ্ধাভরে অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ভাবিতেন: "ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!"

জন্তুগুলিকে তিনি এতই ভালবাসিতেন যে, কিছুদিন পরে 'মটরু' মরিয়া গেলে তিনি সখেদে বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য, আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেটাই যায় মরে!" এই জন্তুগুলির আহারাদির তত্ত্বাবধান তিনি নিজে করিতেন এবং স্বামী সদানন্দ হইতেন তাঁহার প্রধান সহায়। তাহাদের সঙ্গে তিনি সাগ্রহে আলাপাদিও করিতেন, যেন তাহারা মানুষেরই মতো সবাক ও বুদ্ধিমান—তাহারা জানোয়ার নয়, মানুষ! একদিন তিনি সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "মটরু নিশ্চয়ই আর জন্মে আমার কেউ হোতো!" মাঝে মাঝে ছাগলী 'হংসী'র নিকট যাইয়া তিনি দুধের জন্য সাধ্যসাধনা করিতেন, যেন দুধ দেওয়া না-দেওয়া 'হংসী'র ইচ্ছাধীন। এই প্রাণীদের প্রতি তাঁহার ভালবাসার ছাপ নিবেদিতাকে লিখিত তাঁহার ৭ই সেপ্টেম্বরের পত্রে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; নিজের স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক দুই-চারিটি কথার পরেই উহাতে আছে: "মঠের জমিতে যে বর্ষার জল দাঁড়ায়, তার নিষ্কাশনের জন্য একটি গভীর নর্দমা কাটা হচ্ছে। সেই কাজে খানিকটা খেটে আমি এইমাত্র ফিরলাম। ...আমার সেই বিশালকায় সারসটি এবং হংস-হংসীগুলি খুব ফূর্তিতেই আছে। আমার পোষা কৃষ্ণসার (হরিণ)-টি মঠ থেকে পালিয়েছিল এবং তাকে খুঁজে

বের করতে আমাদের দিনকয়েক বেশ উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে। আমার একটি হংসী দুর্ভাগ্যক্রমে কাল মারা গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমাদের একজন হাস্যরসিক বৃদ্ধ সাধু তাই বলেছিলেন, 'মশায়, এই কলিযুগে যখন জলবৃষ্টিতে হাঁসেরও সর্দি লাগে, আর ব্যাঙও হাঁচতে শুরু করে তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। একটি রাজহংসীর পালক খসে যাচ্ছিল। আর কোন প্রতিকার জানা না থাকায় একটা টবে খানিকটা জলের সঙ্গে একটু কার্বলিক এসিড মিশিয়ে তাতেই কয়েক মিনিটের জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—উদ্দেশ্য ছিল যে, হয় সেরে উঠবে, না হয় মরে যাবে; তা হংসীটি এখন ভাল আছে।" ১৯০২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কাশী হইতে একখানি পত্রেও সবকথার মাঝে লিখিতে ভুলেন নাই, "ছাগলটাকে একটু দেখো।"

মঠের কুকুরটির নাম ছিল 'বাঘা'। 'বাঘা' অন্য সব প্রাণীগুলির উপর সরদারী করিত এবং ভাবিত, মঠে তাহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। একবার অত্যধিক দুষ্টামির জন্য তাহাকে গঙ্গার পরপারে নির্বাসনে যাইতে হয়। কিন্তু 'বাঘা' এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে সম্মত ছিল না—সে মঠকে ভালবাসিত, বিশেষতঃ স্বামীজীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। সারাদিন অতীব দুঃখে কাটাইয়া সে সন্ধ্যাকালে এক ফন্দী আঁটিল ও খেয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল। নৌকার মাঝি ও আরোহীরা তাহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেও সে নামিল না, বরং দন্ত বাহির করিয়া ও গর্জন করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। অগত্যা তাহাকে নির্বিবাদে পার হইতে দেওয়াই উচিত মনে করিয়া সকলে স্থান ছাড়িয়া দিল। এপারে আসিয়া সে রাত্রিটা এদিক-ওদিকে লুকাইয়া কাটাইল। ভোর চারিটায় স্বামীজী স্নানাগারে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় পায়ে কি একটা ঠেকায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন ও চাহিয়া দেখিলেন, 'বাঘা!' বাঘা তাঁহার পায়ে লুটাইয়া মিনতিপূর্ণকণ্ঠে ক্ষমাভিক্ষা ও পুনঃপ্রবেশাধিকার-যাচ্ঞা করিতে লাগিল। সে ঠিক বুঝিয়াছিল, এই বিপদ হইতে উদ্ধারকর্তা একমাত্র স্বামীজী; তাই অপর সকলের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে ঠিক যেখানে স্বামীজীর শরণ লওয়া চলিবে সেখানেই অপেক্ষা করিতেছিল। স্বামীজী তাহার পিঠ চাপড়াইয়া আদর করিলেন ও আশ্বাস দিলেন, অধিকন্তু সকলকে বলিয়া দিলেন, বাঘা যাহাই করুক, আর তাহাকে তাড়ানো চলিবে না।

বাঘার আর সব কাহিনীও অপূর্ব। গ্রহণের সময় শাঁক-ঘণ্টা বাজিলে সেও নাকি সকলের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে নামিত। স্বামীজীর লীলাসংবরণের অনেক কাল পরে বাঘার মৃত্যু হইলে তাহার দেহ গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হইল। জোয়ারের সময় সে শরীর ভাসিয়া চলিয়া গেলেও ভাটার সময় সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, উহা মঠের সীমানার মধ্যেই গঙ্গার পলিমাটির উপর পড়িয়া আছে। ইহাতে মঠের প্রতি বাঘার প্রাণের টানের পরিচয় পাইয়া মঠবাসী একজন ব্রহ্মচারী অপরদের অনুমতিক্রমে ঐ দেহ ঐ স্থানেই সমাধিস্থ করিলেন।

এইসব মানবসুলভ স্নেহ-প্রীতি ও মহাপুরুষোচিত অধ্যাত্মপ্রচেষ্টার সমকালে স্বামীজীর জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত ছিল এক সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রগতিশীল মনোভাব। মঠে পাঁউরুটি নির্মাণের জন্য তিনি বিবিধ প্রকারের খমির লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ কার্যে পুনঃ পুনঃ বিফল হইলেও ঐ চেষ্টা ছাড়েন নাই। অভাববোধ থাকিবে অথচ বৈফল্যের ভয়ে ঐ অভাব-মোচনের উদ্যম হইতে বিরত থাকিবেন, ইহা যেন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হইত। মঠে স্বাস্থ্য ভাল না থাকার একটা প্রধান কারণ ছিল, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি বিলাতী-প্রণালীতে 'আর্টিজান ওয়েল' বা নলকূপ বসাইবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি আনাইয়াছিলেন; কিন্তু উপযুক্ত মিস্ত্রীর অভাবে ঐ কার্য সম্পাদিত হয় নাই।

জনসাধারণের মধ্যে প্রচারাদি কার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া স্বামীজী এইভাবে ভাগীরথীতীরে নীরব বেলুড় মঠের শান্তপরিবেশমধ্যে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া দিন কাটাইতে থাকিলেও তাঁহার যশ তখনও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল; এতএব বিভিন্ন স্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ আসিতেছিল। শরীরে কুলাইলে তিনি ঐসব গ্রহণে একেবারে অসম্মত ছিলেন না, ইহা তাঁহার পত্রাবলীতেই প্রকাশ। ৩রা জুন (১৯০১) তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "দক্ষিণে একটু বর্ষা আরম্ভ হলেই আমি বোধ হয় বম্বে পুনা হয়ে মান্দ্রাজ যাব।…তুমি কাজকর্ম কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে একদম মঠে চলে এস—এখানে মাসখানেক বিশ্রামের পর তুমি আমি একসঙ্গে বিরাট ভ্রমণে বেরুব—গুজরাট, বম্বে, পুনা, হায়দরাবাদ ও মহীশূর হয়ে মান্দ্রাজ পর্যন্ত।"

ভারতের বাহির হইতেও এইকালে একটি বিশেষ আমন্ত্রণ আসে। শ্রীমতী ম্যাকলাউড যখন (মে-জুন) জাপানে বেড়াইতেছিলেন তখন বিশিষ্ট জাপানী

ভদ্রলোকেরা তাঁহার সাহায্যে স্বামীজীকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। এই অভিপ্রায়টি স্বামীজীরও মনের মতো ছিল ; কেবল দেহের অবস্থা বুঝিয়া তিনি তেমন সাহস পাইতেছিলেন না, পাকা কথাও দিতে পারিতেছিলেন না। ১৬ই জুন (১৯০১) তিনি শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, "ভারত ও জাপানের মধ্যে একটা যোগসূত্র-স্থাপন সত্যই অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।...যদি আমাকে জাপান যেতে হয়, তবে এবার কাজটা চালাবার জন্য সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।...বাকি মা জানেন। এখনও কিছু স্থির নেই।" দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁহার জাপান গমনের জন্য শ্রীযুক্ত ওকাকুরার প্রেরিত অর্থও আসিয়া পড়িল (১৮।৬।১৯০১-এর পত্র)। তখনও তিনি জাপানে যাইবার জন্য "যথাসাধ্য চেষ্টা" করিতেছিলেন, যদিও "দুর্বল স্বাস্থ্য এবং কিছু আইন-ঘটিত ব্যাপার প্রভৃতির জন্য একটু দেরী" হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের স্মৃতিকথা হইতে জানা যায় যে, ইত্যবসরে একদিন বেলা চারিটায় সময় জাপানের কনসাল স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। স্বামীজী এই জাতীয় ভদ্রলোকদের সহিত মঠবাড়ীর নীচে পশ্চিম দিকের বারাণ্ডায় বসিয়া আলাপ করিতেন ; কনসালকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে বলা হইল। অতঃপর স্বামীজীর নীচে নামিয়া বেড়াইবার সময় উপস্থিত হইলে তিনি নামিলেন ও কনসালের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন, একজন দোভাষী অনুবাদকের কাজ করিতে লাগিলেন। কনসাল বলিলেন, "আমাদের মিকাডো আপনাকে জাপানে পাবার জন্য খুব অগ্রহান্বিত। আপনার সুবিধামত যাতে যত শীঘ্র সম্ভব আপনি জাপানে যান, তারই জন্য অনুরোধ করতে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। জাপান আপনার মুখে হিন্দুধর্মের কথা শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "আমার শরীরের বর্তমানে যা অবস্থা তাতে আমার এখন জাপান যাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।" কনসাল তবু বলিলেন, "তাহলে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি কি মিকাডোকে জানাতে পারি যে, ভবিষ্যতে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'লে আপনি কোন এক সময় জাপানে যাবেন?" স্বামীজী কিন্তু তখনও বলিলেন, "এ শরীর কখনও সমর্থ হবে কিনা খুবই সন্দেহের কথা।" ('রেমিনিসেন্সেস', ৩৫৮ পৃঃ)। বস্তুতঃ যাওয়া না-যাওয়া বিষয়ে প্রথমে একটু দ্বিধা থাকিলেও শরীরের অবস্থা-বিবেচনায় তিনি পরে যাওয়ার কথা ছাড়িয়া

দিয়া শ্রীমতী ম্যাকলাউডকেও লিখিয়াছিলেন, "তোমার জাপানী বন্ধু বড়ই সহৃদয়তা দেখিয়েছেন ; কিন্তু আমার স্বাস্থ্য এতই খারাপ যে, আশঙ্কা হয়—আমি হয়তো জাপানের জন্য সময় করতে পারব না।...সুতরাং তোমার জাপানী বন্ধু আমার পাথেয় বাবদ যে টাকা পাঠিয়েছেন, তাঁকে তুমি দিয়ে দিও ; তুমি যখন নভেম্বরে ভারতে আসবে আমি তা শোধ করব।"

তাঁহার এই কালের জীবনের আরও কিছু ঘটনা গাঙ্গুলি মহাশয়ের স্মৃতিলিপিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বর্ণিত প্রথম ঘটনার সময়ে স্বামীজীর স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। মন্মথবাবু পূর্বাহ্ণে মঠে পৌছিয়া খবর পাইলেন, স্বামীজী ঠাকুরঘরে আছেন। তদনুসারে তিনি তথায় যাইয়া দেখেন, স্বামীজী অন্যবিষয়ে ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া বীরদর্পে ঠাকুরঘরের সম্মুখের বারাণ্ডার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভাবাবস্থায় পদচারণ করিতেছেন ও সুস্পষ্টস্বরে আবৃত্তি করিতেছেন : "গর্জন্তং রাম রামেতি, ব্রুবন্তং রাম রামেতি।" তাঁহার বদন তখন আরক্তিম—যেন ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, আর একাগ্রমনে বীর হনুমানের মতো শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারে সতর্ক প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত আছেন।

সেই দিন অপরাহ্ণে দশ-বার জন যুবক—সম্ভবতঃ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, মঠে আসিয়া স্বামীজীর দর্শনার্থ মঠ বাড়ীর দোতলায় গঙ্গার দিকের বারাণ্ডায় সমবেত হইল। একটু পরেই স্বামীজী নিজের ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহাদের সহিত এমনভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন যেন তিনি তাহাদেরই সমবয়সী একজন—সরলমন প্রাণখোলা যুবক! তাঁহার পকেটে একটি সোনার ঘড়ি ছিল এবং গলদেশে উহারই সহিত সংযুক্ত একটি খাঁটি সোনার চেন ছিল। একটি যুবক ঐ চেনটি স্বীয় অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিল, "বেশ সুন্দর তো!" অমনি স্বামীজী ঐ ঘড়ি ও চেন যুবকটির হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এটা যখন তোমার পছন্দ হয়েছে, এটা তোমারই হলো। কিন্তু বাবা, এটা বিক্রী করো না যেন ; স্মৃতিচিহ্নরূপে এটা রেখে দিও।" যুবকটি ইহাতে অতীব আশ্চর্য হইলেও হর্ষান্বিত যে হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। স্বামীজী এত সহজে এমন একটা মূল্যবান বস্তু ত্যাগ করিতে পারেন দেখিয়া তথায় উপস্থিত মন্মথবাবুরও বিস্ময়ের অবধি রহিল না ; আর তিনি চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলেন যে, স্বামীজীর কথা ও কার্যের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। স্বামীজীই তাঁহার সম্মুখে একদিন বলিয়াছিলেন, "ত্যাগ মানে নিজস্ব কিছু ত্যাগ করা। যার সব কিছু আছে,

অথচ সে-সবে উদাসীন, সেই হচ্ছে প্রকৃত বিরাগী। যার কিছু নেই, সে তো ভিখিরি ; সে আবার দেবে কি ?"

বড়দিনের ছুটিতে আগ্রা হইতে জনকয়েক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন ; ইঁহাদের কেহ কেহ ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মঠের আঙ্গিনায় বেঞ্চিতে বসিয়া তাঁহারা স্বামীজীর সহিত দর্শন, সমাজ-বিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদের সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়া উত্তর দিতেছিলেন। সমাগত ভদ্রলোকদের হাবভাব দেখিয়া মন্মথবাবুর মনে হইয়াছিল, তাঁহারা উত্তর শুনিয়া খুশী হইয়াছিলেন।

ইঁহারা আসিয়াছিলেন সকাল নয়টায় ; কথা বলিতে বলিতে প্রায় বারটা বাজিয়া গেল। আলোচনাশেষে স্বামীজী অকস্মাৎ মন্মথবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সাধু অমূল্য এলাহাবাদে থাকে ; তুমি তাকে চেন কি ? সে কেমন আছে ? তার সব কথা আমায় বল।" মন্মথবাবু বলিলেন : সাধু অমূল্যকে এলাহাবাদের লোকেরা সাধুজী বলিয়া ডাকিত, আর চেলারা বলিত গুরুজী। গুরুজী প্রথমে ব্রহ্মচারীদের ন্যায় শ্বেতবস্ত্র পরিতেন ; পরে গেরুয়া ধারণ করিতেন এবং আরও পরে নাগা সাধুদের ন্যায় দিগ্বসনে ভূষিত থাকিতেন। তিনি ও তাঁহার চেলারা গাঞ্জা, চরস, ভাঙ্গ ইত্যাদিতে আসক্ত ছিলেন। সব শুনিয়া স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আহা ! মহাপুরুষ ! মহাপুরুষ !" একটু পরে আবার বলিলেন, "তার এ জীবনটা বৃথা গেল ; কিন্তু পরজীবনে সে মুক্ত হবে। অমূল্য আমার কলেজের সহপাঠী ছিল। সে পড়াশুনায় ভালই ছিল। তার দৃষ্টি ছিল উদার এবং সে ছিল জ্ঞানমার্গী। সাধু অমূল্যের কোন দীক্ষাগুরু ছিল না। শিষ্যদের যখন বেচালে পা পড়ে ও পতনের সম্ভাবনা ঘটে, তখন গুরু তাকে রক্ষা করেন ও শিষ্য তাল সামলে নেয়।" মন্মথবাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, স্বামীজী পূর্ণ নীতিবাদী হইলেও পতিতের প্রতি অশেষ কৃপাময়—তাঁহার কথাগুলি তখন এমনি করুণাসিক্ত ছিল ! একটু পরে স্বামীজী আবার বলিলেন, "মন্মথ, এবার যখন তুমি এলাহাবাদে ফিরবে, তখন অমূল্যের সঙ্গে দেখা করে বলো যে, তার কোন অভাব থাকলে তা মেটাবার জন্য আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি।" মন্মথবাবু স্বামীজীর সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং অমূল্যসাধুও স্বামীজীর কথা শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহা কিছু পরের কথা

আলোচ্যদিনে সাধু অমূল্যের কথা শেষ করিয়া স্বামীজী মন্মথবাবুকে বলিলেন, "তুমি আমার কাছে কি জানতে চাও ; যে কোন প্রশ্ন করতে পার।" মন্মথবাবু উত্তর দিলেন, "আমি আপনার মায়া-বিষয়ক বক্তৃতাগুলি দেখেছি। এগুলি আমার বেশ প্রাণে লেগেছে ; কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি। মায়া জিনিসটা কি, আমায় বুঝিয়ে দিন।" স্বামীজী বলিলেন, "ও থাক। আর কিছু জানবার থাকলে তাই বরং প্রশ্ন কর।" মন্মথবাবু তবু মায়ারই সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। অগত্যা স্বামীজী মায়ার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় যুক্তিবহুল কথাগুলি স্বামীজী দ্রুত উচ্চারণ করিয়া চলিলেন, আর মন্মথবাবু একাগ্রমনে শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অনুভব জাগিল, জীব, জগৎ সমস্ত—এমন কি স্বামীজীও কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন, অবশিষ্ট রহিয়াছে শুধু একটা বিশ্বব্যাপী স্পন্দন। তারপর সবই শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর তিনি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন আর মনে হইল, তিনি মায়ার অর্থ বুঝিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন—বিভেদ-বিচ্ছেদ সমস্তই মায়ার অন্তর্গত এবং সত্যবস্তু একমাত্র অখণ্ড চৈতন্য।

একটু পরেই দ্বিপ্রহরের ভোজনের সময় হওয়ায় স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মন্মথবাবু তাঁহাকে শিবজ্ঞানে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ইহার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার ব্রাহ্মণ্যাভিমান সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। আজ কিন্তু তাঁহার বোধ হইল, স্বামীজীর প্রসাদ পাইলে তিনি ধন্য হইবেন। স্বামীজী তাঁহার সেই অব্যক্ত প্রার্থনা জানিতে পারিয়াই যেন আহারকালে তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন।

মন্মথবাবু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে স্বামীজীর বিশ্রামের অবকাশ ছিল না—তিনি তখন মঠের নিয়মাবলী-রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। মন্মথবাবু সেদিন ও সে-রাত্রি মঠেই কাটাইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি স্বামীজীকে প্রণাম করিতে গেলে স্বামীজী তাঁহাকে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে বলিলেন এবং পরে নিজের ঘরে বসিয়া তাঁহাকে অতীত জীবনের অনেক কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন ও মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। ('রেমিনিসেন্সেস')।

তখনকার দিনে শীতকালে—সাধারণতঃ বড়দিনের ছুটিতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইত। সেবারে ডিসেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ায় এবং স্বামীজী বেলুড় মঠে উপস্থিত থাকায় নেতৃস্থানীয় অনেকেই তাঁহার সহিত

দেখা করিতে আসিতেন, শুধু বিশ্ববরেণ্য সাধু হিসাবে নহে, প্রত্যুত ভারতের নবজাগরণের অন্যতম স্বদেশপ্রেমিক অগ্রদূত হিসাবে নিজের প্রতিকূল স্বাস্থ্যের কথা না ভাবিয়া স্বামীজী এই সকল দেশনায়কদের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। উত্তর-ভারতীয়দের সহিত তিনি ইংরেজীতে কথা না বলিয়া হিন্দীতে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করাই অধিক পছন্দ করিতেন এবং শ্রোতারাও ইহাতে মুগ্ধ হইতেন ও আলোচ্য বিষয়টি তাঁহাদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া যাইত। স্বদেশের বহু সমস্যার কথাই তিনি ভাবিয়াছিলেন এবং তাহার সমাধানও আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যদিও উপযুক্ত কর্মীর অভাবে ঐগুলি ভাবরাজ্য হইতে নামিয়া বহির্জগতে আত্মপ্রকাশের বা রূপধারণের অবকাশ পাইতেছিল না। অতএব আগ্রহবান শ্রোতা পাইলে তিনি সোৎসাহে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐসব কথা বলিতে থাকিতেন। একদিন মঠের বিস্তৃত ময়দানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রবল উৎসাহে ও আবেগভরে কথা কহিয়াছিলেন। এই সকল সাক্ষাতের উল্লেখ করিয়া লক্ষ্ণৌ-এর 'অ্যাডভোকেট'-পত্রিকা লিখিয়াছিল: "গত কংগ্রেসের সময়ে তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল। সেই দেখাই শেষ দেখা। তিনি উৎসাহপ্রদীপ্তবদনে হিন্দীতে অনর্গল আমাদিগের সহিত ভারতের উন্নতিসাধন-বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলেন। সে হিন্দী এরূপ বিশুদ্ধ ও শিষ্টজনসম্মত যে, কোন উত্তর-পশ্চিমবাসীর পক্ষেও তাহা গৌরবের কারণ হইত।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৯২৩)।

ইঁহাদের সহিত আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে স্বামীজীর বেদবিদ্যালয়-স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিল। ঐ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ জ্ঞানরাশি ও আর্যসংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং উক্ত সাধনা ও সিদ্ধির ধারার প্রচার ও প্রসারের জন্য উপযুক্ত আচার্য-সৃজন। আগন্তুকদের অনেকেই স্বামীজীর সহিত সহমত হইয়া এই কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পুনঃপ্রবর্তন সম্বন্ধে স্বামীজী এতই আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, স্বয়ং সাধু ও ব্রহ্মচারীদিগকে উহা তো পড়াইতেনই, সুবিধামত অপরের মধ্যেও এই ভাবসঞ্চালনে যত্নপর থাকিতেন। এমন কি নানা অসুবিধার জন্য যখন "উদ্বোধন"-প্রেস চালানো কঠিন হইয়া পড়ে তখন তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকে বলেন, তিনি যেন উহা বেচিয়া ঐ টাকা

ঐরূপ বিদ্যালয়ের জন্য রাখিয়া দেন; উহার সাহায্যে পণ্ডিত রাখিয়া ছোটখাট রকমের একটা কিছু আরম্ভ করা যাইবে। তবে প্রেস বিক্রীর পর তখনই ঐ কাজে না নামিয়া তিনি স্থির করেন যে, শরীর সুস্থ হইলে তিনি ঐ বিষয় লইয়া জনসাধারণের সমক্ষে অর্থভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইবেন এবং নবসংগৃহীত অর্থ ও প্রেসের টাকার সাহায্যে আরও বড় একটা বিদ্যালয় আরম্ভ করিবেন। এই মহদভিপ্রায়ে প্রেসের টাকা তখনকার মতো জমা রাখিয়া দেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হওয়ায় সে সদুদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হয় নাই।

জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (পরবর্তীকালের মহাত্মা গান্ধী) স্বামীজীর দর্শনার্থ বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন; কিন্তু দর্শন হয় নাই। তিনি স্বীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন: "ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পরে আমার পক্ষে বিবেকানন্দকে না দেখিয়া তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। তাই মহা উৎসাহে প্রায় সমস্ত পথ পায়ে হাঁটিয়া বেলুড় মঠে গিয়াছিলাম। মঠের নিস্তব্ধ পরিবেশ আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। স্বামীজী তখন অসুস্থ হইয়া কলিকাতার বাড়ীতে আছেন; তাই তাঁহার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়, একথা জানিয়া আমি অত্যন্ত নিরাশ ও দুঃখিত হইয়াছিলাম।"

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও স্বামীজীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন, এই কথা আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (৩৫৯ পৃঃ) বলিয়া আসিয়াছি। তিলক মহাশয়ের নিজমুখে বিবৃত উক্ত বিবরণ ছাড়াও আর একটি বিবরণ স্বামীজীর শিষ্য স্বামী নিশ্চয়ানন্দের মুখে শুনিয়া শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান' নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহার যাথার্থ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়াই আমরা পাঠকদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য উহার মর্মার্থ এখানে তুলিয়া দিলাম: স্বামীজীর শরীর তখন অসুস্থ থাকায় সাধারণ আগন্তুককে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইত না। তিলক একদিন আসিয়া মঠের দক্ষিণাংশে বেলতলার কাছে নৌকা হইতে নামিলেন ও নিজের নাম-লেখা একখানি কার্ড একজন বৃদ্ধ সাধুকে দিলেন। কিন্তু সাধু জানাইলেন, স্বামীজী অসুস্থ, দেখা হইবে না। তিলক কার্ড রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর স্বামীজী নীচে নামিলে তাঁহাকে কার্ড দেওয়া মাত্র তিনি তিলকের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন; কিন্তু তিলক তো চলিয়া

গিয়াছেন।[৩] শুনিয়া স্বামীজী অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন যে, বৃদ্ধ সাধুটি অবিবেচনার কাজ করিলেও নিশ্চয়ানন্দের জন্ম মহারাষ্ট্রে; তাঁহার অন্ততঃ তিলকের নাম জানা উচিত ছিল এবং স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করানো উচিত ছিল। যাহা হউক, স্বামীজী পত্র লিখিয়া তিলককে পুনরাগমনের জন্ম অনুরোধ করিলেন এবং দুই-একদিনের মধ্যেই তিলক আসিলেন।

তিলকের সহিত স্বামীজী মঠবাড়ীর দক্ষিণদিকের মাঠে পায়চারি করিতে করিতে কথা বলিয়াছিলেন, কাছে অপর কেহ ছিল না। তবে দূর হইতে দেখা গিয়াছিল, স্বামীজী স্বীয় প্রেরণাবশে মাথা ও হাত নাড়িয়া বলিয়া যাইতেছেন, আর তিলক ধীর ও শান্তভাবে শুনিতেছেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দের মতে তিলকের কার্যপ্রণালী পূর্বে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; স্বামীজীর সংস্পর্শ লাভের পর উহা জনসাধারণে বিস্তৃত হয়। তাঁহার মতে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় আরও কয়েকবার মঠে আসিয়া স্বামীজীর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, এবং একদিন 'মোগলাই চা' প্রস্তুত করিয়া সকলকে খাওয়াইয়াছিলেন। জায়ফল, জয়ত্রী, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, জাফরান ইত্যাদি একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া ঐ সিদ্ধ জলের ক্বাথে চা, দুধ ও চিনি মিশাইয়া এই চা প্রস্তুত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য তিলক মহাশয়ের পূর্বোল্লিখিত বিবরণে একাধিকবার আসা, প্রথম বারে ফিরিয়া যাওয়া এবং এইরূপ ঘনিষ্ঠ মেলামেশার কোন উল্লেখ নাই; তবে ইহাও সত্য যে, ঐ বিবরণটি তাঁহার স্বলেখনীসম্ভূত নহে, তাঁহার মুখে শুনিয়া অপরে লিখিয়াছিলেন।

কংগ্রেস-নেতৃবর্গের সহিত ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্বামীজীর নিশ্চয়ই আলোচনা হইয়াছিল। অবশ্য তাঁহার রাজনীতিক চিন্তা কংগ্রেসসেবীদের অনুরূপ ছিল না। এই বিষয়ে তাঁহার মৌলিক চিন্তার কথা আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে এই একটি কথা বহুকাল প্রচলিত ছিল যে, স্বামীজীর মতে ভারতের স্বাধীনতা এক অভূতপূর্ব উপায়ে আসিবে। কিন্তু এইরূপ কথা পূর্বে কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইদানীং শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গাঙ্গুলি লিখিয়াছেন, "ভারত সম্পর্কে তিনি (বিবেকানন্দ) বলিয়াছিলেন, আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু যেভাবে সাধারণতঃ দেশ

৩। তিলকের বিবৃতিতে এই ঘটনার উল্লেখ নাই; হয়তো তিনি নিজে না আসিয়া অপর কাহাকেও খবর লইতে পাঠাইয়াছিলেন।

স্বাধীন হয়, সেভাবে নয়। কুড়ি বৎসরের মধ্যেই একটা মহাযুদ্ধ হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি যদি materialism (জড়বাদ) না ছাড়ে, তাহলে আবার যুদ্ধ অনিবার্য। স্বাধীন ভারতবর্ষ ক্রমে পাশ্চাত্ত্যের materialism নেবে। প্রাচীন ঐহিক গৌরবকে নতুন ভারত ম্লান করে দেবে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশ উত্তরোত্তর অধ্যাত্মবাদী হবে। তারা জড়বাদের শিখরে পৌঁছে বুঝেছে—জড়ে শান্তি দিতে পারে না।" ('উদ্বোধন', ৬২তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)।

পরিশেষে এই সময়ে মহাপ্রাণ স্বামীজীর স্বহস্তে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার একটি মর্মস্পর্শী নিদর্শন দিয়া আমরা এই অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি করিব।[৪] তখন মঠের জমি সাফ করিতে এবং মাটি কাটিতে প্রতি বছরেই কতকগুলি সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ আসিত। পুরুষদের সহিত স্বামীজী তাহাদের সুখদুঃখের আলোচনা করিতেন আবার রঙ্গরসও করিতেন। তাহাদের একজনের নাম ছিল কেষ্টা, সে ছিল স্বামীজীর প্রিয়পাত্র অথচ কাজে হুঁশিয়ার। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা স্বামীজীকে কখন কখন বলিত, "ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানকে আসিস না; তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, পরে বুড়ো বাবা (অর্থাৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ) এসে বকে।" কথা শুনিয়া স্বামীজীর চোখ ছলছল করিত আর বলিতেন, "না, না বুড়ো বাবা বকবে না; তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল।" এই বলিয়া সাংসারিক সুখদুঃখের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বলিলেন, "ওরে তোরা আমাদের এখানে খাবি?" কেষ্টা উত্তর দিল, "আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না; এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবে রে বাপ।" স্বামীজী তবু বলিলেন, "নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবে। তাহলে তো খাবি?" কেষ্টা ঐ কথায় রাজী হইল। অনন্তর স্বামীজীর আদেশে সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারি, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি যোগাড় করা হইল এবং তিনি সম্মুখে বসিয়া তাহাদিগকে ভূরিভোজন করাইলেন। খাইতে

৪। ঘটনাটির সময়নির্দেশ দুঃসাধ্য। 'বাণী ও রচনা'য় (৯।২৬৩) ঐ ঘটনার শিরোভাগে আছে "কাল—১৯০২", অথচ বর্ণনার প্রারম্ভে আছে, "পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিবার পর স্বামীজী মঠেই থাকিতেন এবং মঠের কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন। অতএব ধরিয়া লইলাম, ইহা ১৯০২ খৃষ্টাব্দের একেবারে গোড়ায়, অর্থাৎ কাশী যাইবার পূর্বের ঘটনা। তিনি কাশীর দিকে যাত্রা করেন জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে।

খাইতে কেষ্টা বলিল, "হাঁরে স্বামী বাপ, তোরা এমন জিনিসটা কোথা পেলি? হামরা এমনটা কখনো খাইনি।" স্বামীজী তাহাদের পরিতোষপূর্বক খাওয়াইয়া বলিলেন, "তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।" স্বামীজী যে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার কথা প্রচার করিতেন, তাহা এইভাবে স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছিলেন।

আহারান্তে সাঁওতালরা চলিয়া গেলে স্বামীজী শিষ্য শরৎবাবুকে বলিলেন, "এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরলচিত্ত, এমন অকপট, অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি।" অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দকে বলিলেন, "দেখ এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখন কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয়—মঠ-ফঠ সব বিক্রী করে দিই, এইসব গরীব-দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না! আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি?…আহা! দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে! এই দেখ না হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চান হয়ে যাচ্ছে।…আমরা দিনরাত তাদের কেবল বলছি—ছুঁসনে ছুঁসনে। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাঠি!…তোরা সব বুদ্ধিমান ছেলে, হেথায় এতদিন আসছিস। কি করলি বল দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পারলিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত-ফেদান্ত পড়বি! এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা, তবে জানবো—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।" (ঐ, ৯।২৩৫-৩৬)

আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, স্বামীজীর জাপানে যাওয়ার কথা উঠিয়াছিল; কিন্তু স্বাস্থ্যানুরোধে তিনি যাইতে অস্বীকৃত হন। তবু তাঁহার যাওয়া না হইলেও জাপানী অনুরাগীদের ভারতে, তথা বেলুড়ে আসিতে বাধা ছিল না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা ও সম্ভব হইলে তাঁহাকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য ঐ দেশ হইতে দুইজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—জাপানের একটি বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ওডা এবং তাঁহার সহচর শিল্পানুরাগী শ্রীযুক্ত ওকাকুরা—আসিয়া জানাইলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে জাপানে একটি ধর্মসভা আহ্বানের সম্ভাবনা আছে এবং ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তাঁহারা স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ জানাইতে চান। ওডা অগ্রণী হইয়া বলিলেন, "আপনার ন্যায় জগৎপূজ্য ব্যক্তি যদি এই মহাসভায় যোগদান করেন, তবেই ইহার সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা হইবে। আপনাকে সেখানে গিয়া আমাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতেই হইবে। এখন জাপানে ধর্মের জাগরণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতেছি না, যিনি সেই প্রয়োজনসিদ্ধি বিষয়ে আমাদিগকে সহায়তা করিতে পারেন।" স্বামীজী তাঁহাদের কথায় সহানুভূতি ও উৎসাহ দেখাইলেন, এমন কি শরীরে কুলাইলে যাইতেও সম্মত হইলেন, যদিও তিনি জানিতেন যে, স্বাস্থ্য তখন তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল না। নিজের সম্বন্ধে ভাবী অনিশ্চয়তার কথা ভুলিয়া গিয়া আপাততঃ নবীন জাগ্রত জাপানের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাইয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম ও জাপান সম্বন্ধে নানা আলোচনায় লিপ্ত হইলেন। ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী, উহার দার্শনিক তত্ত্ব, এবং জগৎকল্যাণার্থ তাঁহার আত্মদান ইত্যাদি বিষয়ে স্বামীজী এরূপ শ্রদ্ধাভক্তি অবলম্বনে ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসহায়ে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন যে, আগন্তুক ভদ্রমহোদয়গণ অতীব মুগ্ধ হইলেন। ওকাকুরা মঠের আতিথ্য স্বীকারপূর্বক কিছুদিন সেখানেই থাকিয়া গেলেন, তাঁহার সহিত আগত বালক ভৃত্য 'হোরি'ও রহিল। ইহাদের উভয়কেই স্বামীজী খুব ভালবাসিতেন। ওকাকুরাকে তিনি বলিতেন খুড়া, আর হোরি[১]

১। 'শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান'-এর মতে ইহার নাম 'হরিনটকী' (১৭ পৃঃ)। ওকাকুরা স্বামীজীকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া মঠের সাধুরা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন অক্রূর খুড়ো; স্বামীজীর নিকট তিনি ছিলেন শুধু 'খুড়ো'।

ছিল তাঁহার হরি। ঐ বালকটি পরে ভারতভ্রমণকালে দেহত্যাগ করে। ইহাতে স্বামীজী খুবই ব্যথিত হইয়াছিলেন।

কিয়দ্দিন মঠবাসের পর ওকাকুরা স্বামীজীকে লইয়া তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। এদিকে ৺দুর্গাপূজার পর হইতে স্বামীজীর শরীর খুবই খারাপ ছিল এবং ঐজন্য বায়ুপরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে তাঁহার কাশীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দের চেষ্টায় সেখানে তাঁহার বাসের জন্য 'গোপাললাল ভিলা' নামক কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের একটি বাড়ীও সংগৃহীত হইয়াছিল। অতএব ওকাকুরার প্রস্তাব মানিয়া লইয়া স্বামীজী বলিলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত প্রথমে বুদ্ধগয়ায় যাইবেন এবং তথা হইতে কাশীধামে গিয়া সেখানে কিছুকাল বাস করিবেন। এই অবকাশে ওকাকুরা স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত প্রাচীন বৌদ্ধযুগের অন্যান্য নিদর্শনগুলি দেখিয়া আসিতে পারেন। এই ব্যবস্থানুযায়ী সকলে জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে কোন একদিন বুদ্ধগয়ায় সদলবলে উপস্থিত হইলে তত্রত্য মহান্ত মহারাজ সাদরে স্বামীজীকে স্বীয় বাসভবনে স্থান দিলেন এবং তাঁহার সর্বপ্রকার সেবার ব্যবস্থা করিলেন। বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার মঠে আতিথ্যগ্রহণ করিতে আসিবেন, ইহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। স্বামীজী এই সুযোগে বুদ্ধগয়া ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ দর্শন করিলেন এবং বোধিদ্রুমতলে শ্রীবুদ্ধের সাধনপীঠে সমাধিমগ্ন হইলেন। কাশীপুর হইতে পনর-ষোল বৎসর পূর্বে তিনি এমনি করিয়া একদিন একই স্থলে ধ্যানে বসিয়াছিলেন। সেদিন আর এদিন! নির্বিকল্প সমাধিলাভে সমুৎসুক আবেগপূর্ণ-হৃদয় নব্যযুবক নরেন্দ্র আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কৃতকর্মা জগদ্বিখ্যাত মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ। তখন বিপুল কার্যের প্রস্তুতি, এখন মহাকর্মচক্র-প্রবর্তনের পর অন্ত্যলীলা অবসানপ্রায়।

বুদ্ধগয়া হইতে তিনি সাঙ্গোপাঙ্গসহ চলিলেন ৺বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার পবিত্রধাম বারাণসীতে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শিবতুল্য স্বামীজী অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসীধামে ট্রেন হইতে অবতরণ করিলে তথায় উপস্থিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধু ও ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার গলদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইল এবং শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হইল। অতঃপর তিনি সকলের সহিত পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের 'গোপাললাল ভিলা' নামক বাটীতে গিয়া উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন ওকাকুরা, স্বামী নির্ভয়ানন্দ,

স্বামী বোধানন্দ এবং গৌর ও নাড়ু নামক দুইটি বালক। স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তখন কাশীধামেই ছিলেন, তাঁহারাও ঐ বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।[২]

কাশীধাম স্বামীজীর নিজের স্থান। ৺বীরেশ্বরের পূজা করাইয়া তাঁহার জননী তাঁহাকে পাইয়াছিলেন, আর তাঁহার "জন্মের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিয়াছিলেন, যেন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আকাশের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে কলিকাতার উত্তরভাগে সিমলা পল্লীর দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'এইবার যে আমার কাজ করবে সে এল' এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কোন শহরের সহিত তাঁহার আগমনের সম্বন্ধ আছে, এইরূপ আভাস দিয়াছিলেন।" (বাঙ্গলা জীবনী, ৯৩২ পৃঃ)। সুতরাং কাশীতে তিনি বেশ আনন্দ পাইলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্ণে নৌকায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতেন এবং শরীর ভাল থাকিলে নদীতে স্নান করিয়া ৺বিশ্বনাথ ও ৺অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইতেন।

এখানেও তাঁহার কার্যের বিরাম ছিল না, তাঁহাকে "যাবতীয় কার্যের সংবাদ রাখিতে হইত। বেলুড় মঠ হইতে চতুর্দিককার চিঠির গাদা প্রত্যহ এখানে প্রেরিত হইত। সেই সকল চিঠির জবাব লিখিতেও বহু সময় লাগিত। অনেক চিঠিতে আবার সমাজ, দর্শন ও ঐতিহাসিক জটিল সমস্যাদির মীমাংসা করিতে হইত।" (ঐ, ৯২৭ পৃঃ)।

ঐ সময় স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত কয়েক জন যুবক আর্তের সেবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলেন। ক্ষুদ্র হইলেও নূতন ভাবধারার নিদর্শন হিসাবে ও যুবকদের ঐকান্তিকতার দিক হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল অমূল্য এবং স্বামীজীও সর্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। দলটির নেতা ছিলেন চারুচন্দ্র দাস (পরবর্তী নাম স্বামী শুভানন্দ) আর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন

২। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের মতে বাড়ীটির নাম ছিল 'গোপালবাস'। গ্রন্থের বিবরণ স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ মহারাজ)-এর দ্বারা প্রদত্ত। উহার ইংরেজী অনুবাদ 'রেমিনিসেন্সেস'-এ আছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই বাঙ্গলা গ্রন্থের সাহায্য লইব। স্বামীজী কোন তারিখে মঠ ছাড়িয়া ঠিক কবে কাশীধামে উপনীত হন তাহা অজ্ঞাত। নিবেদিতার মতে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ জন্মতারিখের প্রাতঃকালে (অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারি) বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হন। ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ৩৭১ পৃঃ)।

কেদারনাথ মৌলিক (স্বামী অচলানন্দ), হরিদাস ওদেদার (স্বামী সদাশিবানন্দ), যামিনীরঞ্জন মজুমদার, বিভূতিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র-নাথ সিংহ ও পণ্ডিত শিবনাথ* ভট্টাচার্য। স্বামীজীর কাশীধামে অবস্থানকালে ইঁহারা সর্বদা তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দের নিকট সেবাব্রতের প্রেরণা পাইয়া ইঁহারা ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে 'পুওর মেনস রিলিফ অ্যাসোসিয়েশন' নামে প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলেন। স্বামীজী উহার জন্য একখানি আবেদনপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, প্রতিষ্ঠানের নাম ভাবের অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক, ভুল পতাকা তুলিয়া চলা ঠিক নহে। তখনও রামকৃষ্ণ মিশন আইনতঃ রেজেস্ট্রীকৃত হয় নাই বলিয়া স্বামীজীর অভিপ্রায়ানুসারে উহার নূতন নাম হয় 'রামকৃষ্ণ হোম অব সার্ভিস'। আরও পরে উহা 'রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সার্ভিস' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

এই যুবসঙ্ঘের প্রতি স্বামীজীর ব্যবহার ছিল বড়ই স্নেহপূর্ণ। একদিন চারুবাবু (শুভানন্দ) ও হরিদাস (সদাশিবানন্দ) স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও ওকাকুরার সহিত তিনি এক উচ্চাসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বামীজীর সম্মুখে উচ্চাসনে উপবেশন নীতিগর্হিত জানিয়া আগন্তুকদ্বয় নিম্নস্থ গালিচা বা আস্তরণের উপর বসিলেন। স্বামীজী কিন্তু ইহাতে প্রীত না হইয়া তাঁহাদের প্রতি স্নেহদৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্বক অতি কোমলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "উঠে বস বাবা, উঠে বস!" শ্রোতৃদ্বয়ের তখন মনে হইল, মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভাব স্বামীজীর নিকট বেদনাদায়ক। সে প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণের আকর্ষণে তাঁহারা তখনই মনে মনে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদনপূর্বক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

রাত্রিকালে পূর্বোক্ত দুইজন ও হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই স্বামীজীর আবাসে থাকিতেন এবং ভোজনের সময় প্রায় সকলে একত্রে বসিতেন। কোন জিনিস খাইতে খাইতে ভাল লাগিলে, স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া যুবকদের পাত্রে দিতেন এবং বস্তুটি তাহাদের সুস্বাদু মনে হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন আর বলিতেন, "কিরে, কেমন লাগলো? তোর ভাল লাগলো কি? খা, খা, বেশ করে খা, জিনিসটা আমার বেশ ভাল লেগেছে, তাই তোকে দিচ্ছি।"

৩* 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে ইঁহাকে শিবানন্দ বলা হইয়াছে।

সেবাস্থল হইতে স্বামীজীর আবাস প্রায় পাঁচ মাইল দূরে হইলেও যুবকদের সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। একদিন স্বামী শিবানন্দ যুবকদিগকে দীক্ষা দিবার জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করিলেন; স্বামীজী ইহাতে সম্মত হইলেও তখনই কোন দিন স্থির করিলেন না। সাথীদের অনুরোধে হরিদাস ওদেদার একদিন স্বামীজীকে পুনর্বার অনুরোধ করিলে স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "কেন? তোরা তো রামানুজী বৈষ্ণবভাবে দীক্ষিত, বিষ্ণুমূর্তি তো ভাল, তোর দীক্ষার তো আমি কোন প্রয়োজন বুঝছি না।" হরিদাস তবু বলিলেন, "আপনার ন্যায় যোগীর নিকট আমার দীক্ষা নিতে ইচ্ছা।" ইহাতে তিনি হাসিয়া সম্মত হইলেন। দীক্ষা লইতে কিন্তু বিলম্ব হইল, কারণ দিন কয়েকের মধ্যে হরিদাসের ভ্রাতৃবিয়োগ হইল। এই সংবাদ শুনিয়া স্বামীজী পূর্ণ সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোর নাকি ভাই মারা গেছে? তোর কিরূপ বোধ হল? মাকে কি বললি?" হরিদাসের মুখে সব প্রশ্নের উত্তর পাইয়া স্বামীজী সখেদে বলিয়া উঠিলেন, "আমার ভায়েদের যদি এমন হত, আমার কিন্তু বড় কষ্ট হত।" এমন সমবেদনাপূর্ণ কাতরোক্তি শুনিয়া হরিদাস বেশ সান্ত্বনা পাইলেন। ইহার পরে একদিন সকলের দীক্ষা হইয়া গেল।

সেবাপ্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেন, অথচ পুষ্টিকর আহার পাইতেন না—ভিক্ষা করিয়া উদরপালন করিতে গিয়া অনেক সময় অর্ধাশনে থাকিতে হইত এবং শরীর কৃশ হইয়া যাইত। স্বামীজীর ইহাতে বড় কষ্ট হইত এবং তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় আবাসে আহার করিতে বলিতেন। ইঁহাদের মধ্যে একটি নবাগত বালক আবার অত্যধিক দুর্বল ও কৃশ ছিল। স্বামীজী তাহার উপর বিশেষ নজর রাখিতেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন, "বাবা, তোমার শরীরটা বড় দুর্বল, তুমি প্রত্যহ দিনের বেলা এখানে এসে খাবে। পেটে না খেলে কাজ করা যায় না; তা তুমি রোজ দুপুরবেলা এসে আমার সঙ্গে খাবে।" সেবাসমিতির কাজ সারিয়া আসিতে বালকটির কখন কখন বিলম্ব হইত; কিন্তু সে না আসিলে স্বামীজী খাইতে বসিতেন না। তাঁহার স্নানাহার যথাসময়ে না হইলে পীড়া বৃদ্ধি পাইবে, এই ভয়ে সেবকদের দুশ্চিন্তার অবধি থাকিত না ও তাঁহারা স্বামীজীকে পুনঃ পুনঃ আহার সারিয়া লইতে অনুরোধ করিতেন। স্বামীজী তবু ছেলেটির জন্য অপেক্ষা করিতেন ও উদ্বিগ্নচিত্তে পাদচারণ করিতে করিতে বারংবার রাস্তার দিকে চাহিতেন আর কাতরকণ্ঠে বলিতেন, "ছেলেটি

কি এসেছে? আজ এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? আহা, ছেলেটি এত বেলা পর্যন্ত কিছু খায়নি, রোগা শরীর, অল্প বয়স, তারপর এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি” ইত্যাদি। অবশেষে ছেলেটি যখন ক্ষিপ্রগতিতে গৃহে প্রবেশ করিত তখন স্বামীজীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত আর তিনি স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলিতেন, “কিরে বাবা, এত দেরী হল কেন? কাজ বড় পড়েছিল নাকি? সকালে কিছু খেয়েছিলি তো? তোর জন্য এখনও আমি কিছু খাইনি। আয়, হাত-পা ধুয়ে নে, শীগগির শীগগির খাইগে চল। আমার শরীর অসুস্থ। সময়মত না খেলে অসুখ বাড়ে। একটু সকাল সকাল আসবার চেষ্টা করবি—তবে কাজের ঠেলা, কি করবি বল!” আহারে বসিয়াও স্বামীজীর সম্পূর্ণ দৃষ্টি বালকটির উপর রহিল এবং নিজের থালা হইতে ভাল ভাল জিনিস তুলিয়া তাহার পাতে দিতে লাগিলেন। এই খাওয়ানোর আনন্দে তিনি নিজের আহার পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। উপস্থিত অপর সকলে স্বামীজীর এই প্রেমময় মূর্তি দর্শনে আনন্দিত হইলেও তাঁহার আহার হইতেছে না, দেখিয়া মাঝে মাঝে স্মরণ করাইতে লাগিলেন, “স্বামীজী, আপনার আহার হচ্ছে না, আপনি একটু আহার করুন।” কিন্তু কাহাকেই বা বলা, আর কেই বা শোনে! স্বামীজী যেন তখন প্রত্যক্ষ বালগোপালকে ভোজন করাইতেই ব্যস্ত, শুধু অভ্যাসবশতঃ নিজে দুই-এক গ্রাস মুখে দিতেছেন মাত্র।

স্বামীজীর চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলিও এই কালে সকলের চক্ষে পড়িত—যেমন তাঁহার স্বভাবসুলভ রসিকতা। একদিন স্বামীজী ও স্বামী শিবানন্দ দুইটি পর্যঙ্কে বসিয়া এইরূপ হাসিঠাট্টা করিতেছিলেন। বহুমূত্ররোগে দীর্ঘকাল ভোগার ফলে স্বামীজীর নেত্রের সূক্ষ্মনাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইয়াছিল। ইহাতে দুঃখিত না হইয়া আনন্দময় পুরুষ স্বামীজী স্বীয় গুরু-ভ্রাতাকে বলিলেন, “কি বলেন মহাপুরুষ (অর্থাৎ স্বামী শিবানন্দ), আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য! এঁ্যা—এঁ্যা—ঠিক না?” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন ও মুখভঙ্গী করিতে থাকিলেন। শুক্রাচার্য ছিলেন দৈত্যগুরু ও তাঁহার একচক্ষু ছিল দৃষ্টিহীন। স্বামীজীও তখন ক্ষীণদৃষ্টি এবং পুরাণের কথা মানিতে গেলে তাঁহার বেদান্ত-প্রচারের ক্ষেত্র ছিল পাতালপুরীতে বিদেশীদের মধ্যে। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, আলোচ্যকালে রসিকতামাত্র চলিতেছিল, বিদেশীদের বেদান্তে অধিকার বা অনধিকারের কোন প্রশ্নের অবকাশই ছিল না।

স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর পাঠকবর্গের নিকট ইহা সুবিদিত যে, স্বামীজী অনেকস্থলে পাশ্চাত্ত্যবাসীদিগকে বর্তমান ভারতবাসীদের অপেক্ষা বেদান্তগ্রহণের উপযুক্ততর পাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, স্থলবিশেষে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের সমপর্যায়ভুক্তও বলিয়াছেন। ('বাণী ও রচনা', ৯।৬, ৯।১৩৩, ৯।৪০৯-১০ ইত্যাদি দ্রঃ)। আলোচ্যকালে চলিতেছিল স্ফূর্তি, আনন্দ, হাস্য, পরিহাস—স্বামী শিবানন্দও জানিতেন, ঐ কালের কোন কথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণীয় নহে; তাই তিনিও আনন্দবৃদ্ধিরই জন্য স্বামীজীর কথায় সায় দিয়া মাঝে মাঝে বলিতেছিলেন, "হাঁ, তাতো বটেই, তাতো বটেই।"

সেদিন স্বামীজীর রসসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল। অন্য দিন হরিদাস তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে আসিলে "থাক বাবা, থাক" বলিয়া নিষেধ করিতেন; কারণ স্বামীজী জানিতেন হরিদাসের পায়ে বাত। সেদিন কিন্তু হরিদাসের প্রথম জীবনের বৈষ্ণবাচার স্মরণ করিয়া কৌতুকে মাতিয়া তিনি বলিলেন, "কিরে, রামানুজী ঢঙে প্রণাম কর।" স্বামী শিবানন্দ মনে করাইয়া দিলেন, "ওর পায়ে বাত যে! ওরূপ প্রণাম করতে ওর কষ্ট হবে।" স্বামীজী তবু বলিলেন, "ও কিছু নয়, ওসব কিছু নয়, ও সেরে যাবে। তুই প্রণাম কর, প্রণাম কর।" অগত্যা হরিদাস হস্তদ্বয় লম্বমান করিয়া মেঝের উপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাহাতে স্বামীজী খুব হাসিলেন।

এরূপ কথোপকথন হইতেছে ও কৌতুক চলিতেছে এমন সময় কেদারনাথের মহান্ত মহারাজ স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শ্রবণমাত্র স্বামীজীর রূপ পরিবর্তিত হইয়া গেল—তখন তিনি ধীর, স্থির গম্ভীর, তাঁহার বদন প্রশান্ত ও নয়নদ্বয় সুপ্রদীপ্ত। তিনি মহান্তজীকে লইয়া আসিয়া অন্য কক্ষে বসাইতে বলিলেন এবং স্বামী শিবানন্দকে সঙ্গে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। অপরেরাও তাঁহাদের পদানুসরণ করিলেন। অতঃপর যথোচিত অভিবাদন-সম্ভাষণাদির পর মহান্তজী স্বীয় মাতৃভাষায় আপনার বক্তব্য নিবেদন করিলেন ও তাঁহার সঙ্গী একজন সিংহলী বৌদ্ধ সাধু ইংরেজীতে স্বামীজীকে বুঝাইয়া দিলেন: "আপনি সাক্ষাৎ শিব, আপনি জীবের মঙ্গলার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। ইওরোপ ও আমেরিকাতে আপনি যেরূপ কার্য করিয়াছেন ও শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অদ্যাপি কোন ব্যক্তি ঐরূপ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্ত্য লোকদিগের সম্মুখে আপনি হিন্দুধর্মের যেরূপ শতগুণ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন,

তাহাতে প্রত্যেক হিন্দু, প্রত্যেক সন্ন্যাসী আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। বৈদিকধর্মের গূঢ় রহস্যগুলি আপনি উপলব্ধি করিয়া যেরূপ সুচারুরূপে এবং সর্বসম্বাদিক্রমে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সন্ন্যাসিমণ্ডলী ও যাবতীয় হিন্দু আপনার নিকট বিশেষ ঋণী আছি।" বৃদ্ধ মহান্তজীর মুখে এইরূপ স্তুতিবাদ শুনিয়া স্বামীজী খুবই লজ্জিত হইলেন ও বলিলেন যে, তিনি নিজে কিছুই করেন নাই, ভগবান নিজেই নিজের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। অধিকন্তু মহান্তজীর ন্যায় পলিতকেশ বৃদ্ধ সাধুদের আশীর্বাদ থাকিলে এরূপ বহু কার্য সুসাধিত হইতে পারে। মহান্তজী আরও বলিলেন, "আপনি যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন আমাদের প্রধান মঠ হইতে আপনাকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য শিবিকা ও লোকজন প্রেরণ করা হইয়াছিল; কিন্তু আপনাকে দেখিবার জন্য জনসংখ্যা বহুল হওয়াতে আপনি শারীরিক ক্লান্ত হইয়াছিলেন এবং আমাদের নিমন্ত্রণ তখন কার্যবশতঃ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমাদিগের মঠের সাধুমহাত্মারা এজন্য বিশেষ দুঃখিত আছেন। তাঁহারা আমার প্রতি তারযোগে এই সংবাদ দিয়াছেন, যেন কাশীর এই মঠেতে আপনাকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা ও অভিবাদন করা হয়। আমাদিগের এই মিনতি, যেন আপনি স্বগোষ্ঠী লইয়া কেদারের মঠে একদিন ভিক্ষাগ্রহণ করেন।" স্বামীজী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, এইজন্য বৃদ্ধ মহান্তজীর নিজের আসার প্রয়োজন ছিল না, লোক পাঠাইয়া আদেশ করিলেই, স্বামীজী স্বয়ং মঠে উপস্থিত হইতেন।

পরদিন এগারটার সময় স্বামীজী সঙ্গিবৃন্দসহ মহান্ত মহারাজের মঠে উপস্থিত হইলেন। ঐ মঠে তখন সিংহলদেশীয় যে বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন, তিনিই পূর্বদিনের ন্যায় আজও দোভাষীর কাজ করিতে থাকিলেন এবং স্বয়ংও স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করিলেন। ভিক্ষাগ্রহণ ও বিশ্রামের পর অপরাহ্নে মহান্তজী স্বামীজীকে একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া তথায় তাঁহার পূর্বতন গুরু পরম্পরার আলেখ্য দর্শন করাইলেন ও প্রত্যেকের গুণকীর্তন করিলেন। অবশেষে একখানি গৈরিক বস্ত্র স্বামীজীর পরিহিত গৈরিক বসনের উপর পরাইয়া এবং আর একখানি গৈরিক উত্তরীয় গায়ে জড়াইয়া দিয়া তিনি অতি হৃষ্টান্তঃকরণে ভাবোচ্ছ্বাসে বলিতে লাগিলেন, "আজ প্রকৃত দণ্ডীজীর ভোজন হইল।" ইহার পর মহান্তজীর অনুরোধে সকলে ৺কেদারের মন্দিরে চলিলেন।

স্বামীজীর আগমন উপলক্ষে তখনই ৺কেদারজীর আরতি হইতে লাগিল। স্বামীজী বাহিরের প্রকোষ্ঠে বা যেখানে নন্দী আছেন, সেই গৃহের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই একেবারে সমাধিস্থ, বাহ্যজ্ঞান রহিত, নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; অগ্রসর হওয়া বা পদবিক্ষেপ করিবার সামর্থ্য আর রহিল না, যেন 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে'। পায়ে মোজা ছিল, জলে ভিজিতেছিল; কিন্তু কাহারও সামর্থ্য হইল না যে, মোজা উন্মোচন করিয়া দেয় বা কোনরূপ শব্দ করে। সকলেই ভাবে তন্ময় ও ধ্যানমগ্ন; কাহারও কিছু লক্ষ্য করিবার সময় বা সামর্থ্য রহিল না। আরতি শেষ হইলে অর্ধবাহ্যদশায় স্বামীজীকে লইয়া সকলে মন্দিরের বাহিরে আসিলেন ও তাঁহাকে সন্তর্পণে গাড়ীতে বসাইয়া আবাসস্থলে চলিলেন। গাড়ীতে বসিয়া স্বামীজী সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন ও সকলের সহিত সহজভাবে হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। ('কাশীধামে বিবেকানন্দ', ৩৪ পৃঃ)।

জনৈক ডাক্তার প্রায়ই স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন। তিনি থিয়োসফির অনুরাগী ছিলেন। একদিন তিনি এ মতবাদের প্রশংসায় অতিমাত্র মুখর হইয়া উঠিলেন। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি দেশের প্রভূত উপকার করিতেছে, শ্রীযুক্তা বেশান্ত ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ যে প্রণালী অবলম্বনে কার্য করিতেছেন, উহাই ভারতের প্রকৃত কল্যাণমার্গ ইত্যাদি কথা তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আবার আপসোস করিয়া বলিলেন, "তাই তো মশায়, বেশান্ত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন না!" স্বামীজী প্রথমতঃ নীরব শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করায় ডাক্তারবাবুর বাক্‌চাতুর্য বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু শেষ কথার ঢঙে ক্রমে তাঁহার রূপ পরিবর্তন হইতে দেখা গেল—তেজোহীন চক্ষু ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইল, মুখের পেশীতে একটা দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। অতঃপর তিনি বলিতে লাগিলেন, "বিদেশীরা এদেশের সব বিষয়ে গুরু হয়েছে, বাকি আছে এক ধর্ম; তাতেও তারা হাত দিতে আসছে, আর তোমরা অবনতমস্তকে বিদেশীকে গুরুর আসনে বসিয়ে গুরু বলে সম্মান করছ! এই পুণ্য ভারতভূমিতে মহাপুরুষগণ কি একেবারে অন্তর্হিত হয়েছেন যে, বিদেশ থেকে গুরু আনিয়ে নিতে হবে? এটা কি গৌরবের না হীনতার কথা? আমি এখানে অভিনন্দন দিতে বা কোন প্রকার গোলমাল করতে সকলকে বারণ করেছি। শরীর অসুস্থ, নিরিবিলি

থাকব; তাই চুপচাপ বসে আছি।" ক্রমে কথায় আরও ওজস্বিতা দেখা দিল; তিনি ডাক্তারের দিকে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্তেই কাশীর সকলের, এমন কি থিয়োসফিস্টদেরও অভিনন্দন লাভ করিতে পারেন।

স্বামীজীর ঐদিনের চেহারা-পরিবর্তনাদি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হরিদাস (স্বামী সদাশিবানন্দ) বলিয়াছিলেন, "তিনি যখন স্বাভাবিকভাবে থাকেন, সাধারণ লোকের চেয়েও নিম্ন ও হীন হইতে পারেন—বালক বা বুদ্ধিহীনের ন্যায় হইতে পারেন; শক্তিমত্তার কোন বিশেষ পরিচয় দেন না; দেখিলে অতি সাধারণ লোক এইটি মাত্র বোঝা যায়; কিন্তু যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে নরম, কোমল, স্নেহপূর্ণ মুখ একেবারেই বিপরীত-ভাবাপন্ন হয় ও দুষ্প্রেক্ষ্যবদন হইয়া উঠিতে পারেন।…তিনি ইচ্ছামত মুখের ও শরীরের গঠন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিতে পারিতেন, এইটিই তাঁহার বিশেষ লক্ষণ ছিল।" (ঐ, ৩৮-৩৯ পৃঃ)।

'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরসিংহ চিন্তামন কেলকার তখন কাশীধামে ছিলেন। একদিন সায়ংকালে তিনি স্বামীজীর দর্শনার্থ আসিলেন। স্বামীজী তখন অসুস্থাবস্থায় পর্যঙ্কে শায়িত ছিলেন। কেলকার সসম্ভ্রমে করযোড়ে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে নিম্নস্থ আস্তরণে বসিলেন। ইংরেজীতে কথাবার্তা হইতেছিল। ভাবরাশি ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী উঠিয়া বসিলেন। শব্দ ক্রমে শ্লথ ও কোমল অবস্থা ত্যাগ করিয়া দ্রুত ও তেজঃপূর্ণ হইল। ভারতেরই রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থিক উন্নতির কথা হইতেছিল। খেদপূর্ণ স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন: "ভারতবাসীদের এরূপ হীন অবস্থায়, এরূপ দীন অবস্থায় বেশী দিন বেঁচে থেকে লাভ কি? পলে পলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে, কেবল জীবনমাত্র সংরক্ষণ করে দিনাতিপাত করছে; অনাহার, লাঞ্ছনা, ক্লেশ দিবারাত্র ভোগ করছে, প্রজ্জলিত নরকানলে দিবারাত্র দগ্ধ হচ্ছে —মৃত্যু এর চেয়েও যে ঢের ভাল ছিল!" প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, শুষ্ক বৈদেশিক রাজনীতিতে কিংবা অনুকরণে কোন ফল হইবে না—বরং স্বতঃ-উৎসারিত পুরাতন ভাব রক্ষা করিলে উপকার হইতে পারে; কারণ ভারতবর্ষের চিরানুসৃত পন্থাই এই যে, ধর্মের ভিতর দিয়া সমাজ-সংস্কার ও বিবিধ উন্নতি সাধন হইয়া থাকে। স্বদেশপ্রেমের

পুনরুজ্জীবনের অন্যতম প্রধান অগ্রদূত হইলেও স্বামীজীর চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব—একেবারে নিজস্ব।

কাশীধামে জনকয়েক যুবকের উদ্যমে যে সেবা-প্রচেষ্টা চলিতেছিল, পণ্ডিত শিবানন্দ তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রাচীন পন্থানুগামী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইলেও পণ্ডিতজী স্বামী বিবেকানন্দের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিও তিনি অশেষ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পণ্ডিতজী ইংরেজী জানিতেন না; কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতাদির বঙ্গানুবাদ সাগ্রহে পড়িতেন এবং এই কালে তাঁহার কাশীতে অবস্থানের সুযোগে পণ্ডিত শিবানন্দ তাঁহার সহিত সুপরিচিত হইলেন। অতঃপর গুণমুগ্ধ পণ্ডিতজী তাঁহার নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রশস্তি রচনা করিয়া কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া আনিলেন। কিন্তু মনের আবেগে স্বামীজীকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে গেলেও উহা সঙ্গে লইতে ভুলিয়া যাইতেন। অবশেষে একদিন উহা লইয়া একখানি গাড়ীতে চড়িয়া স্বামীজীর আবাসস্থলে চলিলেন। চারুবাবু ও হরিদাসও ঐ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। পথে তাঁহাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া পণ্ডিত শিবানন্দ বলিলেন যে, তিনি স্বামীজীকে একজন প্রকৃত যোগী ও মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন; তাঁহার মহত্ত্বের ও শক্তির কূলকিনারা করা অসম্ভব। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ইঁহারা দেখিলেন স্বামীজী, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী গোবিন্দানন্দ নামক জনৈক সাধু একখানি গাড়ী করিয়া ভিঙ্গার রাজার বাগানবাটীর দিকে যাইতেছেন। উভয় যানেরই গতি রুদ্ধ হইলে পণ্ডিতজী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রশস্তি পত্রখানি স্বামীজীর শ্রীহস্তে অর্পণ করিলেন। পড়িয়া স্বামীজী বলিলেন, "পণ্ডিত মশায়, একি করেছেন! আমি সামান্য ব্যক্তি, এরূপ উচ্চ ও বহুল প্রশংসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সবই তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে; তিনি জীবকে যা করান তাই হয়।" পণ্ডিতজী শাস্ত্রে পড়িয়াছিলেন, "প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা"; আজ তাহা চাক্ষুষ দেখিলেন। তিনি স্বামীজীর প্রতি এতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, কাশীর পণ্ডিতসমাজে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্তন করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন ও বলিতেন, এরূপ যোগৈশ্বর্য সাধারণ জীবে সম্ভব নহে; স্বয়ং শঙ্করেই এবম্প্রকার বিভূতি থাকা সম্ভব, স্বামীজী শিবাবতার। স্বামীজীর চিন্তায় নিমগ্ন পণ্ডিত শিবানন্দের ধর্মবিশ্বাসেও পরিবর্তন আসিয়াছিল। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন জগন্মাতার মূর্তির স্থলে পুনঃ পুনঃ স্বামীজী আবির্ভূত

হইতেছেন; পরে স্বপ্নাবস্থায়ই তিনি স্বামীজীর দলে মিশিয়া কীর্তনে মত্ত হইয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি দুইই এক লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

ভিঙ্গার রাজা লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের একজন বিভবশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি তখন বানপ্রস্থাবলম্বনে কাশীর দুর্গাবাড়ীর নিকটে 'ভিঙ্গাভবন' নামক স্বীয় উদ্যানবাটীতে বাস করিতেন। আর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমরণ কাশীধাম ত্যাগ করিবেন না, এমন কি স্বীয় উদ্যান-ভবনেরও বাহিরে যাইবেন না। স্বামীজীর বারাণসীক্ষেত্রে আগমনের সংবাদ পাইয়া রাজা তাঁহার দর্শনের জন্য বিশেষ উৎসুক হইলেন এবং গোবিন্দানন্দ নামক একজন সাধুকে ফলমূলাদি উপহারসহ তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। গোবিন্দানন্দ স্বামীজীকে রাজার অভিলাষ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি যদিও স্বীয় ভবনের বাহিরে না আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তথাপি স্বামীজীর দর্শনের একটা সময় জানিতে পারিলে ঐ ব্রত ভঙ্গ করিয়াও স্বামীজীর বাসস্থলে উপস্থিত হইবেন। স্বামীজী অবশ্য সঙ্কল্প ত্যাগের কথা অনুমোদন করিলেন না, বরং বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং ভিঙ্গাভবনে উপস্থিত হইবেন। তদনুসারে তিনি পরদিবস বা আরও একদিন পরে স্বামী শিবানন্দ ও অপর কয়েকজনের সহিত রাজসমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা সুপণ্ডিত ছিলেন—তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত বেশ জানিতেন। স্বামীজীকে তিনি সাদরে গ্রহণপূর্বক তাঁহার কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং কাশীতে একটা ধর্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলে তিনি অর্থসাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, ইহাও জানাইলেন। আর স্বামীজীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, "বুদ্ধ শঙ্কর যে শ্রেণীর, স্বামীজী, আপনিও সেই শ্রেণীর।" স্বামীজী তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার শরীর অসুস্থ, এইজন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোন পাকা কথা দেওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে; কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনান্তে শরীর সুস্থ হইলে এই বিষয় ভাবিয়া দেখিবেন।

পরদিবস ভিঙ্গাভবন হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া স্বামীজীকে একখানি বন্ধ পত্র দিল। উহা উন্মুক্ত করিলে দেখা গেল, উপঢৌকনস্বরূপ ভিঙ্গারাজ স্বামীজীকে পাঁচশত টাকার একখানি চেক পাঠাইয়াছেন এবং পত্রেও উহাই উল্লিখিত আছে। অমনি স্বামীজী পার্শ্ববর্তী স্বামী শিবানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন; "মহাপুরুষ, আপনি এই টাকা নিয়ে কাশীতে ঠাকুরের মঠ স্থাপন

করুন।” স্বামী শিবানন্দ অবশ্য তখনই সম্মত হন নাই, তিনি সম্মত হইয়াছিলেন আরও প্রায় চারি-পাঁচ মাস পরে। সে কথা আমরা যথাস্থানে বলিব।

স্বামীজীর পূর্বপরিচিত বন্ধু ৺প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের পুত্র কালিদাস মিত্র একদিন অপরাহ্ণ পাঁচটায় স্বামীজীকে দেখিতে আসিলেন। পরিচয় পাইয়া স্বামীজী ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কালিদাসবাবু চিত্র ও চারুকলার চর্চা করিতেন। স্বামীজী তাঁহার সহিত কথা বলিবার জন্য মেঝের উপর গালিচায় বসিলেন। কালিদাসবাবুও বসিলেন; অপরেরা সসম্ভ্রমে অদূরে উপবেশন করিলেন। তখন মাঘ মাস,[৪] তাই স্বামীজীর গায়ে সোয়েটার, পায়ে গরম মোজা, পরিধানে গেরুয়া বহির্বাস। সমঝদার পাইয়া স্বামীজী সেদিন চিত্রবিদ্যা ও চারুকলা সম্বন্ধে এমন তথ্যপূর্ণ ও চমকপ্রদ সব কথা বলিতে লাগিলেন যে, শ্রোতাদের মনে হইল, ঐ বিষয়েই যেন তিনি সারা জীবন সাধনা করিয়াছেন। মিত্র মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া তিনি আলেখ্য, প্রাকৃতিক বিষয়ের চিত্র ইত্যাদি বিষয়ে এমন ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন শিল্পসভায় কোন বিশেষজ্ঞের ভাষণ চলিতেছে। ক্রমে ইটালি, ফ্রান্স, চীন, জাপান, ভারতীয় বৌদ্ধযুগের ও মোগলযুগের এবং পারস্য প্রভৃতি দেশের চারু-শিল্পের আলোচনাও চলিতে লাগিল। সেদিনের সভায় শিল্পানুরাগী ওকাকুরা উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ভারতভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ এই দিনের এই শিল্পচর্চার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী ১০ই ফেব্রুয়ারির এক পত্রে শ্রীযুক্তা ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন:

“ছোটখাটো একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন—আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখার অভিপ্রায় নিয়ে। বারাণসীর এক সুশিক্ষিত ধনী যুবা—যার পিতার সঙ্গে ছিল আমাদের অনেক দিনের বন্ধুত্ব—গতকাল এই শহরে এসেছে। শিল্প সম্বন্ধে তার বিশেষ আগ্রহ; লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্প পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় সে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে প্রচুর অর্থব্যয় করছে। মিঃ ওকাকুরা চলে যাবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাঁকে শিল্পময় ভারত (অর্থাৎ যতটুকু অবশিষ্ট আছে) দেখাবার সে-ই উপযুক্ত লোক এবং শিল্প সম্বন্ধে

৪। ‘কাশীধামে ‘স্বামী বিবেকানন্দ’-এর মতে ফাল্গুন। কিন্তু পরে উদ্ধৃত এই বিষয়ক স্বামীজীর পত্রের তারিখ ১০ই ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ মাঘের শেষ (‘বাণী ও রচনা’, ৮।১৯৬-৯৮)।

ওকাকুরার নির্দেশে সে নিশ্চয়ই বিশেষ উপকৃত হবে। ওকাকুরা এখানে ভৃত্যদের ব্যবহারের একটি সাধারণ টেরাকোটার জলের পাত্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেটির আকৃতি ও ক্ষোদিত কারুকার্য দেখে তিনি একেবারে মুগ্ধ। কিন্তু এটি একটি সাধারণ মৃৎপাত্র এবং পথের ধাক্কা সহ্য করার অনুপযোগী, তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছেন, পিতল দিয়ে অবিকল সেরূপ আর একটি তৈরি করাতে। কি করা যায় ভেবে ভেবে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে আমার যুবক বন্ধুটি আসে, সে সেটা ক'রে দিতে রাজী তো হয়েছেই, আবার বলেছে, ওকাকুরার পছন্দ ঐ জিনিসটির চেয়ে বহুগুণ ভাল ক্ষোদিত কারুকার্যবিশিষ্ট কয়েক-শ টেরাকোটার পাত্র সে দেখাতে পারে। সেই অপূর্ব পুরাতন শৈলীতে আঁকা প্রাচীন চিত্রাবলীও সে দেখাবে বলেছে। প্রাচীন রীতিতে আঁকতে পারে, এরূপ একটিমাত্র পরিবার বারাণসীতে টিকে আছে।···পর্যটন শেষ ক'রে ওকাকুরা আশা করি আবার এই শহরে ফিরে আসবেন, তখন এই ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে অবশিষ্ট দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি কিছু কিছু দেখে যাবেন। মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে নিরঞ্জন গিয়েছে। তিনি জাপানী বলে কোন মন্দিরে তাঁর প্রবেশ করা নিয়ে কেউ আপত্তি করে না।”

স্বামীজীর শিল্পানুভূতির একটি দৃষ্টান্ত 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ' হইতে গ্রহণ করিতেছি। একবার তিনি ফ্রান্সের এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শনে গিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের পটগুলি বিশিষ্ট শিল্পিদ্বারা অঙ্কিত হইলেও যবনিকার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দেখিলেন উহার উপরের আলেখ্যে একটু ভ্রান্তি আছে। অভিনয়শেষে তাই তিনি ঐ বিষয়ে কার্যাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শিল্পীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। অধ্যক্ষ তাঁহাকে ডাকিয়া উহা দেখাইয়া দিলে শিল্পী স্বীকার করিলেন যে, আলেখ্যের ঐ অংশটি সত্যই অপরিস্ফুট।

স্বামীজীর সহিত কালিদাসবাবুর হৃদ্যতা স্থাপিত হওয়ায় তিনি প্রায়ই স্বামীজীর আবাসস্থলে আসিতেন। একদিন আসিয়া তিনি স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কথা তুলিলেন। তারপর জাপানের কথা আরম্ভ হইলে স্বামীজী কহিলেন, “জাপানটি বেশ দেশ; তারা শিল্পবিদ্যা দৈনন্দিন কার্যেও পরিণত করেছে।··· ঘরগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জাতটা খুব উন্নতি করছে।···জাপানীরা

পাশ্চাত্য বিদ্যা খুব অধিকার করেছে,...বেদান্তভাব কিছু তাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে তাদের খুব মঙ্গল হবে।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে নেপোলিয়ন সামান্য একজন সৈনিক হইয়াও আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ের ফলে কিরূপে ক্ষমতার উচ্চস্থানে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, সেই সব কথা উঠিল। ক্রমে স্বামীজী নেপোলিয়নের কথায় এমন তন্ময় হইয়া গেলেন এবং অঙ্গভঙ্গিসহ নেপোলিয়নের বীরত্বকাহিনী এমন উল্লাসপূর্ণ ও তেজোময় ভাষায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, শ্রোতা ও দর্শকদের মনে হইতে লাগিল যেন তিনি নেপোলিয়নের ভাবে ভাবিত ও তদাকারকারিত হইয়া গিয়াছেন। সকলের চক্ষুর সম্মুখে তখন যেন অস্টারলিজের ও জেনার রণক্ষেত্র প্রত্যক্ষ ভাসিতেছিল। স্বামী শিবানন্দ পরে কহিয়াছিলেন, "একেই বলে স্বামীজীর ইন্‌স্পায়ার্ড লেকচার (দৈব প্রেরণাপূর্ণ বক্তৃতা)। ইওরোপ ও আমেরিকায় স্বামীজীর সব লেকচারই এরূপ ইন্‌স্পায়ার্ড অবস্থায় হয়েছিল।"

স্বামী স্বরূপানন্দকে লিখিত স্বামীজীর ৯ই ফেব্রুয়ারির পত্র পড়িয়া মনে হয়, স্বামীজী ঐ সময় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদের ইতিহাস লইয়া গভীর আলোচনা করিতেছিলেন। এরূপ করা তখন খুবই স্বাভাবিক ছিল। ওকাকুরা তখন সঙ্গে ছিলেন; বুদ্ধের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যতম প্রধান স্থান সারনাথ নিকটেই ছিল; আর বৌদ্ধধর্মপ্রধান জাপানে যাইবার পূর্বে একবার ঐ ধর্মের পুনরালোচনাও সমীচীন ছিল। ওকাকুরার অনুরোধে তিনি তখনও জাপানে যাওয়ার কথা পুনর্বার ভাবিয়া দেখিতেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের এই আলোচনার কিঞ্চিৎ ফল তাঁহার উক্ত পত্রে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে দুই-চারিটি কথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: "বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা তো অদ্বৈতপন্থী"; "বৌদ্ধধর্মের শাখাদ্বয়ের মধ্যে মহাযান প্রাচীনতর"; "সম্প্রতি আমি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন আলো পেয়েছি"; "বৌদ্ধধর্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্মের সম্বন্ধবিষয়ে আমার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।" ('বাণী ও রচনা', ৮।১৯৫-৯৬)।

কাশী হইতে শিবতুল্য মহাপুরুষ প্রচুর প্রফুল্লতা লইয়া ফিরিলেন; কিন্তু মন উৎফুল্ল থাকিলেও শরীরের অবস্থা তখন ভয়াবহ। বেলুড়ে ফিরিয়া রোগবৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে স্বগৃহেই আবদ্ধ থাকিতে হইত; ঐ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসব যখন আসিল[১] তখন তিনি প্রায় শয্যাগত। পা খুব ফুলিয়া গিয়াছে এবং সর্বশরীরে জলসঞ্চার হইয়াছে, হাঁটিবার সামর্থ্য মোটেই নাই। সকলেই বুঝিলেন, এবার অবস্থা শঙ্কাজনক; সুতরাং উৎসবের মধ্যেও কাহারও মনে আনন্দ ছিল না—একটা গভীর উদ্বেগ ও নিরানন্দের ভাব যেন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। স্বামীজীর দর্শনলাভ ও বচনসুধাপানের জন্য অনেকেই সেবারে উৎসবে আসিয়াছিলেন; কিন্তু সে শুভ বাসনা অপরিপূর্ণ রহিয়া গেল। ভক্তদের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা তাঁহার খুবই ছিল; কিন্তু ডাক্তার বেশী কথা বলিতে বারণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও দুই-একজনের সঙ্গে কথা বলিয়াই দেখিলেন ক্লান্ত হইয়া পড়েন। অতএব সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া নিজ কক্ষে বসিয়া রহিলেন।

ঐ দিনের কথা শরৎবাবুর লেখনীমুখে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে ('বাণী ও রচনা', ৯।২২৭-৩৩); "শিষ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় একটি স্তব রচনা করিয়া উহা ছাপাইয়া আনিয়াছে। আসিয়াই স্বামিপাদপদ্ম দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। স্বামীজী মেঝেতে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। শিষ্য আসিয়াই শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ও মস্তকে স্পর্শ করিল এবং আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। স্বামীজী শিষ্যরচিত স্তবটি পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহাকে বলিলেন, 'খুব আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দে, পা ভারি টাটিয়েছে।' শিষ্য তদনুরূপ করিতে লাগিল। স্তব-পাঠান্তে স্বামীজী হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, 'বেশ হয়েছে।' স্বামীজীর শারীরিক অসুস্থতা এতদূর বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে দেখিয়া শিষ্যের বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।" শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া স্বামীজী বলিলেন, "কি ভাবছিস? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলির কিছু কিছু যদি ঢুকুতে

১। **Condensed Ephemeris** দেখিয়া মনে হয়, ১৬ই মার্চ, রবিবারে সাধারণ উৎসব হইয়াছিল। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' শুধু আছে, "মার্চ, ১৯০২"। ঐ বৎসর জন্মতিথি পূজা হয় ১১ই মার্চ।

পেয়ে থাকি, তাহলেই জানবো দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে।” তিনি একটু পরেই আবার বলিলেন, “সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হ'লে ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই।” সব শুনিয়াও শিষ্য স্বামীজীর শ্রীচরণে শরণভিক্ষা করিলেন, “মহাশয়, এ দীন দাসকে জন্মে জন্মে পাদপদ্মে আশ্রয় দিন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। আপনার সঙ্গে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও আমার ইচ্ছা হয় না।” শুনিয়া স্বামীজী অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, “লোকের গুলতোন দেখে কী আর হবে? আজ আমার কাছে থাক্। আর নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে বসিয়ে দে, কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে।” আদেশ শুনিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, হাতে লাঠি লইয়া স্বামীজীর ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। ভিতরে শিষ্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন এবং গল্পগুজব করিতে লাগিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব কিভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত তাহার একটা ধারণা দিলেন: “আমার মনে হয়, এভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অন্যভাবে হয় তো বেশ হয়। একদিন নয়, চার-পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে। প্রথম দিন হয়তো শাস্ত্রাদি-পাঠ ও ব্যাখ্যা হ'ল। দ্বিতীয় দিন বেদবেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হ'ল। তৃতীয় দিন প্রশ্নোত্তর হ'ল। তার পর দিন চাই কি বক্তৃতা হ'ল। শেষ দিনে এখন যেমন মহোৎসব হয়, তেমনি হ'ল। দুর্গাপূজা যেমন চারদিন ধ'রে হয়, তেমনি।[২] ঐরূপে উৎসব করলে শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশ্য ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আসতে পারবে না। তা নাই বা এল। বহুলোকের গুলতোন হলেই যে ঠাকুরের ভাব খুব প্রচার হ'ল, তা তো নয়।” শিষ্য সায় দিয়া বলিলেন, “মহাশয়, ইহা আপনার সুন্দর কল্পনা; আগামী বারে তাহাই করা যাইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে সব হইবে।” স্বামীজী কিন্তু কহিলেন, “আর বাবা, ও-সব করতে মন যায় না। এখন থেকে তোরা ও-সব করিস।” একেবারে নিঃসঙ্গ নিরুদ্যম!

এমন সময় শিষ্য বলিলেন, “মহাশয়, এবার কীর্তনের অনেক দল আসিয়াছে।” শুনিয়া স্বামীজী দক্ষিণের জানালার গরাদে ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং

২। বর্তমানে বেলুড়ে দুই দিন উৎসব হয়—জন্মদিবসে ভক্তদের জন্য ও পরবর্তী রবিবারে সর্বসাধারণের জন্য। অনেক শাখা কেন্দ্রে সপ্তাহব্যাপী উৎসবও হয়।

সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন—দাঁড়াইয়া থাকাও তখন তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য।

একটু বাদে শিষ্য সজলনয়নে স্বামীজীর পাদপদ্ম ধরিয়া অনুনয় করিলেন, "এবার আমায় উদ্ধার করিতে হইবেই হইবে।" স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন, "কে কার উদ্ধার করতে পারে বল্? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে পারে। ঐ আবরণগুলো গেলেই আত্মা আপনার গৌরবে আপনি জ্যোতিষ্মান্ হয়ে সূর্যের মতো প্রকাশ পান।" প্রশ্ন হইল, "তবে শাস্ত্রে কৃপার কথা শুনতে পাই কেন?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "কৃপা মানে কি জানিস? যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভেতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে কেন্দ্র করে কিছুদূর পর্যন্ত রেডিয়াস (ব্যাসার্ধ) নিয়ে যে একটা সার্কল (বৃত্ত) হয়, সেই বৃত্তের ভেতর যারা এসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং সাধন-ভজন না করেও তারা অপূর্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কৃপা বলিস তো বল।" "এ ছাড়া আর কোনরূপ কৃপা নাই কি, মহাশয়?" "তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত মুমুক্ষু পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ করে আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে এক জন্মে মুক্ত করে দেওয়া কেবলমাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে কৃপা, বুঝলি?" যাহাদের অবতারের লীলাকালে তাঁহার দর্শনের ভাগ্য হয় না তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "তাদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়, ঠিক এমনি আমাদের মতো শরীর দেখতে পায় এবং তাঁর কৃপা পায়।"

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে আঘাত করিলেন এবং শিষ্য উঠিয়া জানিয়া লইলেন কে আসিতেছে। নিবেদিতা ও অপর দুই-চারি জন ইংরেজ মহিলা আসিতেছেন শুনিয়া স্বামীজী আলখাল্লাটি চাহিয়া লইয়া উহা পরিলেন ও "সভ্য-ভব্য হইয়া বসিলেন"। অতঃপর নিবেদিতা আসিলেন এবং মেঝেতে বসিয়া স্বামীজীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অল্প কথাবার্তার পরেই বিদায় লইলেন। তখন স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "দেখছিস্, এরা কেমন সভ্য! বাঙ্গালী হ'লে আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বকাত।" শিষ্য দরজা বন্ধ করিয়া তামাক সাজিয়া দিলেন।

বেলা আড়াইটার সময় লোকের খুব ভিড় জমিয়াছে; কত কীর্তন ও প্রসাদবিতরণাদি চলিতেছে—তাহার সীমা নাই। শিষ্যের মন বুঝিতে পারিয়া স্বামীজী বলিলেন, "একবার নয় দেখে আয়, খুব শীগগির আসবি কিন্তু।" শিষ্য আনন্দে বাহির হইয়া গেলেন, নিরঞ্জনানন্দ পূর্ববৎ পাহারায় নিযুক্ত রহিলেন। শিষ্য ফিরিলে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত লোক হবে?" "পঞ্চাশ হাজার"—উত্তর দিলেন শিষ্য। শুনিয়া স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জনসঙ্ঘ দেখিয়া বলিলেন, "বড়জোর তিরিশ হাজার"। বেলা চারিটায় ভিড় কমিয়া আসিল ও স্বামীজীর ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর কবিরাজী চিকিৎসা হইয়াছিল, এবং তাহাতে তিনি উপকৃত হইয়াছিলেন। বারাণসী হইতে আগমনের পরও অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইংরেজী জীবনীতে কবিরাজ মহানন্দ সেনগুপ্ত মহাশয়ের ব্যবস্থানুযায়ী জল ও লবণ পরিত্যাগপূর্বক কেবল দুগ্ধপানের কথা উল্লিখিত আছে (৭৩৬ পৃঃ)। 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থেও ইহা সমর্থিত (৩৭৪ পৃঃ)। সত্যসঙ্কল্প স্বামীজী যখন স্থির করিলেন যে, তিনি জলপান করিবেন না, তখন তিনি দেখিলেন যে, "তাঁহার গলদেশের পেশীসমূহ (মুখপ্রক্ষালনকালে) একবিন্দু জল প্রবেশ করিতে গেলেও আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত।" (ঐ, ৩৫৮ পৃঃ)। এইরূপ চিকিৎসায় স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল।

শরীর একটু সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার চিরাভ্যস্ত অধ্যাপন, ধ্যানজপ-পরিচালনা, মঠের কার্যাদি পরিদর্শন ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করিলেন। আমরা অবগত আছি যে, তাঁহার মনে যখন কোন কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা জাগিত তখন শারীরিক অবসাদ, ব্যাধি, বা যন্ত্রণা তুচ্ছ জ্ঞান হইত, সব ভুলিয়া তিনি উহাতেই লাগিয়া যাইতেন। এই ভাবেই তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শাস্ত্রাধ্যাপন ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। একান্ত অসম্ভব না হইলে তিনি প্রত্যহ ঠাকুরঘরে যাইয়া ধ্যানে বসিতেন, অন্য সময়ে ধ্যানের প্রক্রিয়া ও সাধনপ্রণালী ব্যাখ্যা করিতেন। এতদ্ব্যতীত নিজের লেখাপড়া, হিন্দুদর্শন ও ভারতবর্ষের ইতিহাসাদি বিষয়ে কোন প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি টুকিয়া রাখা, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, সাধারণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ করা

ইত্যাদিতেও প্রচুর সময় ব্যয়িত হইত। সময়ে সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য বা অপরকে আনন্দে রাখার জন্য গান গাহিতেন বা হাস্য পরিহাস করিতেন। ইহাতে পারিপার্শ্বিক বিষণ্ণতা অনেকটা কাটিয়া যাইত এবং উপস্থিত সকলে মনে করিতেন স্বামীজী বুঝি ভালই আছেন। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। তাই দেখা যাইত, কথা বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ নীরব হইয়া যাইতেন, অথবা চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ ফুটিয়া উঠিত। অমনি বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করিয়া সকলে তাঁহাকে নিঃসঙ্গ থাকিতে দিতেন। একদিন তাঁহার চারিপার্শ্বে বসিয়া অনেকে তর্ক-বিতর্ক করিতেছিলেন ; স্বামীজী নীরবে বসিয়াছিলেন—আলোচনা ভাল লাগিতেছিল না। হঠাৎ তাঁহার হস্তস্থিত একটি শূন্য গ্লাস ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল এবং সকলকে জানাইয়া দিল, এই অসার তর্কে তাঁহার কত কষ্ট হইতেছে। স্বীয় কষ্টবোধের তিনি এইটুকুই নিদর্শন দিলেন। (ঐ, ৩৫৮ পৃঃ)। বন্ধুবান্ধব সকলে স্বামীজীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে আগ্রহশীল হইলেও তাঁহার নিজের দিক হইতে প্রকৃত আচার্যের কর্তব্য এড়াইয়া চলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছিল না। বরং তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অসুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ অনেক তত্ত্বান্বেষীকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেন না, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আরে দেখ্, এ শরীরে আর কি প্রয়োজন? পরের কল্যাণের জন্যই এ দেহপাত হউক। ঠাকুরকে দেখিস্ নি, শেষ দিন পর্যন্তও লোককল্যাণের জন্য শিক্ষা দিয়ে গেছেন? আমার কি উচিত নয় তাই করা? আর এ দেহ গেলেই বা কি আসে যায়? এ তো অতি তুচ্ছ পদার্থ, যদি দেশের লোকের হৃদয়নিহিত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য শত শত বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তাতেও আমি পশ্চাৎপদ নই।"

ক্ষুদ্র বৃহৎ সব কার্যেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এত ভালবাসিতেন যে, কোথাও এতটুকু ময়লা পড়িয়া থাকার জো ছিল না। কখনও ভৃত্যদের অসুস্থতাবশতঃ ঘর-দ্বারে ঝাঁট না পড়িলে নিজে সম্মার্জনী-হস্তে ঐ কার্যে নামিতেন। ঐরূপ দেখিয়া কেহ যদি তাঁহার হস্ত হইতে ঝাঁটা লইতে আসিত বা বলিত, "আপনি কেন?" তাহা হইলে মার্জনী না ছাড়িয়াই বলিতেন, "তা হলই বা—অপরিষ্কার থাকলে মঠের সকলের যে অসুখ করবে।" অনেক সময় নিজে সকলের বিছানাপত্র তদারক করিতেন, দেখিতেন সময়মত

রৌদ্র-হাওয়ায় দেওয়া হইতেছে কিনা ; গাফিলতি দেখিলে সাবধান করিয়া দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ অবলম্বনে তিনি সকলকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সকাল-সন্ধ্যা যাহাতে ধ্যানজপের সুবিধা হয়, সেইজন্য রাত্রে গুরুভোজন করা অন্যায়—কেবল দ্বিপ্রহরে একবার পূর্ণ আহার করা উচিত, আর সকাল-সন্ধ্যায় শুধু অল্প জলযোগ।

অধ্যয়ন-অধ্যাপনের প্রতি ঝোঁক তাঁহার শেষ পর্যন্ত ছিল। সকলকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে প্রত্যহ নিয়ম করিয়া বেদ ও পুরাণ পঠিত হয়। লীলাসংবরণের দিনেও স্বয়ং ঐ সব পাঠে উপস্থিত থাকিয়া তিনি সকলের আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধন করিয়াছিলেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, বেদের ব্রাহ্মণভাগ হইতেই পুরাণসমূহের উৎপত্তি। একদিন পুস্তকাগার হইতে গো-পথ-ব্রাহ্মণ আনাইয়া স্বামী শুদ্ধানন্দকে উহার খানিকটা ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছিলেন, নিজেও ঐ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। একবার তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, দ্বিপ্রহরে ভোজনের পর কেহ নিদ্রা যাইবে না, প্রত্যুত পুরাণ পাঠের জন্য সমবেত হইবে। পূজাদি বা অন্য কোন বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করা তাঁহার মনঃপূত ছিল না। ঠাকুর-পূজা করিতে গিয়া অত্যধিক ক্ষিপ্রতাপ্রদর্শন যেমন তাঁহার রুচিবিরুদ্ধ ছিল, তেমনি অবাঞ্ছনীয় ছিল অনাবশ্যক আড়ম্বরপূর্ণ ও দীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়াকলাপ। ভক্তির সহিত অকপটহৃদয়ে পূজা করিয়া যাও, সরলপ্রাণে তাঁহার স্মরণ মনন কর, একান্ত নির্ভরের সহিত তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লও—ইহাই ছিল তাঁহার মতে সর্ববিধ উপাসনার মর্মকথা। বেশী খুঁটিনাটির দিকে ঝুঁকিয়া সময়ের অপব্যবহার না করিয়া বরং ঐ সময়টা ধ্যান-ধারণা বা শাস্ত্রপাঠাদিতে কাটাইলে অধিকতর কল্যাণলাভ হয়। শাস্ত্রপাঠের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজিত এবং নিয়ম ছিল যে, ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে আর সমস্ত কাজ ছাড়িয়া পাঠস্থলে উপস্থিত হইতে হইবে। সকলকে তিনি যেমন ভালবাসিতেন, তেমনি কঠোরভাবে শাসনও করিতেন—গুরুভ্রাতারা পর্যন্ত এই শাসন অতিক্রম করিতে পারিতেন না।

ধ্যানধারণার প্রতি তাঁহার আবাল্য যে প্রীতি ছিল, শেষের দিনগুলিতেও উহা অব্যাহত ছিল কিংবা আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল। ঘণ্টা বাজিবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সকলে যখন ঠাকুরঘরে হাজির হইতেন, তখন নেহাৎ অসমর্থ না হইলে তিনি স্বয়ং প্রত্যহ সেখানে যাইতেন। তাঁহার জন্য ঠাকুরঘরে

একখানি আসন নির্দিষ্ট থাকিত। তিনি তদুপরি উত্তরাস্য হইয়া বসিতেন, এবং সকলে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন। তিনি না উঠিলে কাহারও আসন ত্যাগের অধিকার ছিল না। অনেক দিন ধ্যানে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত কাটিয়া যাইত। তারপর তিনি "শিব শিব" বলিয়া গাত্রোত্থান করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া নীচে নামিতেন ও পায়চারি করিতেন; কখনও বা শ্যামাসঙ্গীতাদি করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "আহা! নরেনের সঙ্গে ধ্যান করতে বসলে কি তন্ময়তা আসে! একলা বসলে ঠিক অমনটা হয় না।"

অতঃপর আমরা 'বাণী ও রচনা' হইতে স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত কিছু বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। উহা হইতে ঐ কালের মঠ-জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে। শরৎবাবু লিখিয়াছেন: "আজ শনিবার। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। মঠে এখন সাধন-ভজন জপ-তপস্যার খুব ঘটা। স্বামীজী আদেশ করিয়াছেন—কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী সকলকেই অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ-ধ্যান করিতে হইবে। স্বামীজীর তো নিদ্রা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে, রাত্রি তিনটা হইতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকেন। একটা ঘণ্টা কেনা হইয়াছে; শেষরাত্রে সকলের ঘুম ভাঙ্গাইতে ঐ ঘণ্টা মঠের প্রতি ঘরের নিকট সজোরে বাজানো হয়।" (ঐ, ৯।২৩৭)। শিষ্য আসিলে স্বামীজীর সহিত এইসব প্রসঙ্গ ও মঠের আদিকালে বরাহনগরে কঠিন তপস্যাদির কথা হইতে লাগিল। তারপর স্বামীজী ঐ প্রসঙ্গে বলিলেন, "তবে এখন যে মঠে খাট-বিছানা, খাওয়া-দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবস্ত করেছি তার কারণ—আমরা যতটা সইতে পেরেছি, তত কি আর এখন যারা সন্ন্যাসী হ'তে আসছে তারা পারবে? আমরা ঠাকুরের জীবন দেখেছি, তাই দুঃখ-কষ্ট বড় একটা গ্রাহ্যের ভেতর আনতুম না। এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে পারবে না। তাই একটু থাকবার জায়গা ও একমুঠো অন্নের বন্দোবস্ত করা—মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে ছেলেগুলো সাধন-ভজনে মন দেবে এবং জীবহিতকল্পে জীবনপাত করতে শিখবে।" শিষ্য বলিলেন, "মহাশয়, মঠের এ-সব খাট-বিছানা দেখিয়া বাহিরের লোক কত কি বলে!" স্বামীজী কহিলেন, "বলতে দে না। ঠাট্টা করেও তো এখানকার কথা একবার মনে আনবে! শত্রুভাবে শীগগির মুক্তি হয়।" (ঐ, ৯।২৩৯)।

অপর এক রাত্রে শরৎবাবু স্বামীজীর ঘরেই ঘুমাইয়াছিলেন। রাত্রি চারিটার সময় স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "যা, ঘণ্টা নিয়ে সাধু-ব্রহ্মচারীদের জাগিয়ে তোল্।" শিষ্য ঐরূপ করিলে সাধুরা দ্রুত প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ঠাকুরঘরে জপধ্যানের জন্য গেলেন। ঘণ্টাটি স্বামীজীর নির্দেশমত স্বামী ব্রহ্মানন্দের কানের কাছে খুব জোরে জোরে বাজানো হইয়াছিল; ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালের জ্বালায় মঠে থাকা দায় হল।" শিষ্যমুখে স্বামীজী ঐ কথা শুনিয়া খুব হাসিলেন। যথাসময়ে স্বামীজীও হাতমুখ ধুইয়া শিষ্যসহ ঠাকুরঘরে ঢুকিলেন। স্বামীজী আসনে বসিবার পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। সুমেরুবৎ অচল দেহ হইতে তখন অতি ধীরে ধীরে শ্বাস নির্গত হইতেছিল। শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামীজীর সেই নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবস্থান নির্নিমেষে দেখিতে লাগিলেন।" প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে স্বামীজীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। দেখা গেল, ধ্যানোত্থিত মহাযোগীর চক্ষু অরুণরাগে রঞ্জিত এবং মুখ গম্ভীর, প্রশান্ত ও স্থির। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তিনি নীচে নামিলেন এবং মঠপ্রাঙ্গণে পায়চারি করিতে লাগিলেন। (ঐ, ২৪১-৪২ পৃঃ)।

কোনও দিন অসুস্থাবস্থায় স্বামীজী হয়তো ঠাকুরঘরে যাইতে পারিতেন না; কিন্তু তখনও তিনি খবর রাখিতেন, অপরেরা সেখানে নিয়মিত যাইতেছেন কিনা। একবার কয়েক দিন অনুপস্থিতির পর হঠাৎ একদিন ঠাকুরঘরে গিয়া তিনি দেখিলেন, মাত্র দুইজন ব্যতীত আর কেহ সেখানে নাই। অত্যন্ত অসন্তুষ্টচিত্তে নীচে নামিয়া তিনি সকলকে নিকটে ডাকাইলেন এবং প্রত্যেকের নিকট অনুপস্থিতির জন্য কৈফিয়ত চাহিলেন। দুই-তিন জন শারীরিক অসুস্থতার কথা বলিলেন, আর কেহ কোন সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে স্বামীজীর একজন গুরুভাইও ছিলেন; কিন্তু সেদিন কেহই নিস্তার পাইলেন না; স্বামীজী আদেশ দিলেন, সেদিনকার মতো তাঁহারা মঠে আহার পাইবেন না, বাহিরে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে; এমন কি কলিকাতায় বন্ধুদের বাড়ীতেও যাওয়া চলিবে না। কিন্তু স্বামীজীর চরিত্রে ছিল কোমল-কঠোরের অপূর্ব সমাবেশ। মঠের ভাইরা সেদিন অনাহারে থাকিবে কিংবা কষ্টে অর্জিত ভিক্ষান্নে ক্ষুধার যৎকিঞ্চিৎ প্রশমনে যত্নপর হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া সে দৃশ্য হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য তিনি এক কাজের

অছিলায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। পরদিন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার ভাগ্যে কি জুটিয়াছিল। তখন তাঁহার ব্যবহার অতি সদয় ও স্নেহময়; ভিক্ষাকালীন অভিজ্ঞতা শুনিয়া খুব হাসি-ঠাট্টা চলিতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহার গুরুভ্রাতার সঙ্গ লইয়াছিলেন, তাঁহারা হাওড়ার উত্তরাংশে—মঠ হইতে তিন মাইল দূরে সালকিয়ায় এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর গৃহে প্রচুর উপাদেয় বস্তু পাইয়াছিলেন শুনিয়া স্বামীজী আহ্লাদে আটখানা হইলেন। আবার কাহারও ভাগ্যে উপযুক্তরূপ খাদ্য জুটে নাই শুনিয়াও তিনি আমোদ করিতে লাগিলেন।[৩] নবযুগ প্রবর্তনে নিরত স্বামীজী একদিকে যেমন সেবার আদর্শকে উচ্চ স্থান দিতেন, অপরদিকে তেমনি ত্যাগ ও ধ্যানের উৎকর্ষের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন; আবার মানবীয় সদ্বৃত্তিগুলিকেও পূর্ণ প্রকাশের অবকাশ দিতেন—তিনি ছিলেন সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথিকৃৎ।

তিনি জানিতেন, তাঁহার লীলা সমাপ্তপ্রায়। এখন তাঁহার কাজ পূর্ব-প্রচারিত আদর্শ ও ভাবরাজিকে দৃঢ়মূল করা; চিরকাল খুঁটিনাটি ব্যাপারে লাগিয়া থাকা তাঁহার কর্তব্য নহে, ঐসব এখন হইতে অপরকেই করিতে হইবে। তাঁহার এই অভিপ্রায়টি 'উদ্বোধন'-সংক্রান্ত একটি ঘটনায় পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। 'উদ্বোধন'-পত্রের তৎকালীন পরিচালকের নিকট ঐ পত্রে প্রকাশের জন্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় গীতার দুইটি অনুবাদ পাঠাইলে পরিচালক স্থির করিতে পারিলেন না, কোনটি প্রকাশ করা সমীচীন। এই সমস্যা লইয়া স্বামীজীর নিকট আসিলে তিনি খুশী না হইয়া বরং বলিলেন, "এটা এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে, তার মীমাংসার জন্য তোদের এখানে ছুটে আসার দরকার ছিল। একটু বুদ্ধি-বিবেচনা খরচ যদি না করতে পারিস, তবে তোরা কি করে কাজ চালাবি? এই দেখ্ দিকি, নিবেদিতা কেমন নিজের মাথা খাটিয়ে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যাচ্ছে—আমাকে একবারও

৩। 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থে অনুরূপ একটি ঘটনা আছে (২০৯-১০ পৃঃ), কিন্তু সে বর্ণনায় দ্বিপ্রহরে স্বামীজীর মঠে উপস্থিতি স্বীকৃত হইয়াছে; উপরের বর্ণনায় তাহা অস্বীকৃত (বাঙ্গলা জীবনী, ৯৪২ পৃঃ)। অধিকন্তু প্রথম গ্রন্থের মতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, ভিক্ষা করারই উদ্দেশ্যে, কোন অপরাধের ফলে নহে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপিতে আর একদিনের ঘটনার বিবরণে আছে: **"May 1 (1902): Tarakda, myself, Kanai and Haripada gone to beg Madhukari and returned to the Math at 10-30 a. m."**

বিরক্ত করে না।” অবশ্য ইহার পর তিনি তর্কভূষণ মহাশয়ের অনুবাদই ছাপাইতে বলিয়াছিলেন ; তবে তৎপূর্বে লেখককে স্বামীজীর অভিপ্রায়ানুসারে অনুবাদটি পুনরায় লিখিতে হইয়াছিল। কারণ প্রথমবারে উহা দেখিয়া স্বামীজী মন্তব্য করিয়াছিলেন, “এদেশের পণ্ডিতরা শ্লোকের ঠিক শব্দগত অনুবাদ করতে জানেন না।”

স্বামীজী চাহিতেন, সকলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিখুক ; তৎসহ আবশ্যক ছিল সকল কাজের গুরুত্ব-লঘুত্ব বিচার। অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে স্বায়ত্তাধীন লঘু সমস্যার সমাধান স্বয়ং করিতে হইবে ; কিন্তু গুরুতর বিষয়ের জন্য অপরের পরামর্শও লইতে হইবে। পূর্বোক্ত ঘটনার পরে ‘উদ্বোধন’-পরিচালকগণ ভয়ে অনেকদিন স্বামীজীর নিকট আসেন নাই। কেবল একবার একটি সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মত গ্রহণ করা আবশ্যক হওয়ায় পত্র লিখিয়াছিলেন। বিষয়টি খুবই গুরুতর ছিল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অনেক গোপনীয় আলোচনার প্রয়োজন ছিল। তাই স্বামীজী পত্রোত্তরে তাঁহাদিগকে দেখা করিতে লিখিলেন এবং জানাইলেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে স্বয়ং না আসায় অবিবেচনার কাজ হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের মুখপত্রে যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা সঠিক প্রকাশ পায়—এই বিষয়ে স্বামীজী সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। একবার ‘উদ্বোধনে’ এক ধার্মিক ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতের পরিপোষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে স্বামীজী বিশেষ রুষ্ট হইয়াছিলেন। আর একবার এক গণ্যমান্য ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে “দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল ও শোক-প্রকাশের অন্যান্য উপকরণের কিছু আধিক্য” দেখিয়া স্বামীজী মহা অসন্তুষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ সম্পাদককে ডাকাইয়া ওরূপ অসারোক্তির দ্বারা কাগজ বোঝাই করার জন্য বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। অন্য এক সময়ে উক্ত সম্পাদক সমাজ-সংস্কার বিষয়ে লেখনী পরিচালনা করিলে স্বামীজী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন যে, পত্রিকাখানিকে সংস্কারকারীদের প্রচারকার্যের যন্ত্রে পরিণত করিলে চলিবে না। (বাঙ্গলা জীবনী, ৯৩৯ পৃঃ)।

অতঃপর শরৎবাবু ‘স্বামি-শিষ্য-সংবাদ’-এ আরও যে দুই-একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। (‘বাণী ও রচনা’, ৯।২৪৩ ইত্যাদি)। শরৎবাবুর লেখনীমুখে প্রশ্নোত্তর-ক্লাস বা স্বামীজীর ভাষায় ‘চর্চা’র

কথা সুন্দর লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই চর্চাকালে গীতা, ভাগবত, উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র আলোচিত হইত। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ ও স্বরূপানন্দ ছিলেন প্রধান জিজ্ঞাসু। স্বামীজী প্রায় নিত্যই উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া দিতেন। অন্য সময়ে অপর কেহ মীমাংসাকারীর আসন গ্রহণ করিতেন।

একদিন অপরাহ্নে স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দের সহিত ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার গায়ে আলখাল্লা, মস্তকে গৈরিক কান-ঢাকা টুপি এবং হাতে একগাছা মোটা লাঠি। তিনি শরৎবাবুকেও সঙ্গে ডাকিয়া লইলেন, কিন্তু রাস্তায় বাহির হইয়া কথা না বলিয়া আপন মনে হাঁটিয়া চলিলেন—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পড়িয়াও ঐ ভাবেই অগ্রসর হইতে থাকিলেন। অগত্যা শরৎবাবু স্বামী প্রেমানন্দের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন সময়ে স্বামীজীর সম্বন্ধে যেসব উক্তি করিতেন তাহারই কথা হইল: "নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে"; "ও আমার শ্বশুর ঘর"; "এমনটি জগতে কখনও আসেনি—আসবে না"; "মহামায়া ওর কাছে যেতে ভয় পায়"। স্বামীজী কোন ঠাকুর-দেবতার কাছে মাথা নোয়াইতেন না; একদিন ঠাকুর সন্দেশের ভিতর পুরিয়া জগন্নাথদেবের প্রসাদ খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। ফিরিবার পথেও স্বামীজীর সহিত কোন কথা হইল না—তিনি আপন মনে নীরবে চলিতে থাকিলেন এবং ঐ ভাবেই মঠে ফিরিলেন।

আর একদিন বিকালে শিষ্য শরৎবাবু কলিকাতায় গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী আহিরিটোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। নিকটস্থ হইয়া তিনি দেখিলেন, সাধু অপর কেহ নহেন, তাঁহারই গুরু স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর বামহস্তে শালপাতার ঠোঙায় চানাচুর ভাজা; বালকের মতো উহা খাইতে খাইতে ঘাটের দিকে চলিয়াছেন। শিষ্য তাঁহাকে কলিকাতায় আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "একটা দরকারে এসেছিলুম। চল্, তুই মঠে যাবি? চারটা চানাচুর ভাজা খা না? বেশ নুন-ঝাল আছে।" শিষ্য সহাস্যে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন ও মঠে যাইতে সম্মত হইয়া নৌকার খোঁজে গেলেন। তিনি এক মাঝির সহিত দর-দস্তুরে ব্যস্ত আছেন—মাঝি আট আনা চায়, আর শিষ্য বলেন দুই আনা—এমন সময় স্বামীজী সেখানে আসিয়া পড়িলেন ও বলিলেন, "ওদের সঙ্গে আবার কি

দর দস্তুর করছিস ? যা, আট আনাই দেবো।” নৌকা চলিতে থাকিলে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগুণকীর্তন আরম্ভ হইল। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন, ঠাকুর কিরূপে ভক্তদের শ্রেণীবিভাগ করিতেন—কেহ ভক্ত, কেহ অন্তরঙ্গ, কেহ ঈশ্বরকোটি। “কাম-কাঞ্চনের সেবাও করবে, আর ঠাকুরকেও বুঝবে—একি কখনও হয়েছে ?—না হতে পারে ?···ঠাকুরের ভক্তদের ভেতর অনেকে এখন ‘ঈশ্বরকোটি’, ‘অন্তরঙ্গ’ ইত্যাদি বলে আপনাদের প্রচার করছে। তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য কিছুই নিতে পারলে না, অথচ বলে কিনা তারা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত।···যিনি ত্যাগীর ‘বাদশা’, তাঁর কৃপা পেয়ে কি কেউ কখন কাম-কাঞ্চনের সেবায় জীবনযাপন করতে পারে ?···তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন-বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার টেস্ট (পরীক্ষা) কিন্তু হচ্ছে কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি।” (ঐ, ৯।২৫০-৫৩)।

অতঃপর অন্য প্রসঙ্গের অবতারণক্রমে শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, “মহাশয়, আপনি যে দেশ-বিদেশে এত পরিশ্রম করিয়া গেলেন, ইহার ফল কি হইল ?” উত্তর আসিল, “কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখতে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে, তার সূচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্যামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে।” (ঐ)।

শিষ্য তারপর জানিতে চাহিলেন, স্বামীজীর নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর কি কি বলিতেন। স্বামীজী কতকটা এড়াইয়া গিয়া বলিলেন, “আমার কথা আর কি বলব ? দেখছিস তো, আমি তাঁর দৈত্যদানার ভেতরকার একটা কেউ হবো। তাঁর সামনেই তাঁকে কখন কখন গালমন্দ করতুম। তিনি শুনে হাসতেন।” বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। তারপর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আপন মনে গুনগুন করিয়া গান ধরিলেন—

“(কেবল) আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র সার হ’ল।
এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।” ইত্যাদি

ততক্ষণ নৌকা মঠে পৌছিয়া গিয়াছে। ভাড়া চুকাইয়া স্বামীজী নৌকা হইতে নামিলেন ও জামা খুলিয়া মঠের পশ্চিমের বারাণ্ডায় বসিলেন।

১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন) শুক্রবার, ১৯০২, তারিখে শিষ্য আফিসের পোশাকেই স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, “তুই কোট-প্যাণ্ট পরিস, কলার পরিসনি কেন ?” স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,

"আমার যে-সব কলায় আছে, তা থেকে দুটো কলার কাল একে দিস্ তো।" কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী উপরে চলিয়া গেলেন। তাহারও কিছু পরে শিষ্য স্বামীজীর কক্ষে গিয়া দেখিলেন তিনি ধ্যানস্থ—মুখ অপূর্ব ভাবে পূর্ণ, যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়াও স্বামীজীর বাহ্য চেতনার লক্ষণ না দেখিয়া শিষ্য সেখানেই বসিয়া পড়িলেন। আরও অর্ধঘণ্টা পরে দেখা গেল স্বামীজীর বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত হইতেছে; উহার পাঁচ-সাত মিনিট বাদেই তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এখানে এলি?" "এই কতক্ষণ আসিয়াছি।" "তা বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।" জল পানের পর সাধনাদি সম্বন্ধে একটু কথাবার্তা হইল। অতঃপর স্বামীজী শিষ্যকে আশীর্বাদ করিলেন, "শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবনপাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।" শিষ্য তথাপি পদপ্রান্তে পড়িয়া কৃপাভিক্ষা করিতে থাকিলে তিনি আবার বলিলেন, "আমার আশীর্বাদে যদি তোর কোন উপকার হয় তো বলছি—ভগবান রামকৃষ্ণ তোকে কৃপা করুন। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমি জানি না।" শিষ্য নীচে নামিয়া স্বামী শিবানন্দকে ঐ আশীর্বাদের কথা শুনাইলে, তিনি বলিলেন, "যাঃ বাঙ্গাল, তোর সব হয়ে গেল। এর পর স্বামীজীর আশীর্বাদের ফল জানতে পারবি।"

পরদিন প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া শিষ্য স্বামীজীর নিকট বিদায় লইতে গেলে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনি যাবি?" "আজ্ঞে হাঁ।" "আগামী রবিবারে আসবি তো?" "নিশ্চয়।" "তবে আয়; ঐ একখানি চলতি নৌকাও আসছে।" শিষ্যের ইহাই শেষ দর্শন।

স্বামীজীর একটি কাজ তখনও অবশিষ্ট ছিল—ভিঙ্গার রাজার প্রদত্ত অর্থে (পাঁচ শত টাকায়) কাশীধামে একটি আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। তিনি প্রথমতঃ স্বামী সারদানন্দকে এই কার্যভার দিতে চাহিলেন; কিন্তু সারদানন্দজী সম্মত হইলেন না। তখন তিনি স্বামী শিবানন্দকে ঐ কর্তব্য বরণ করিতে বলিলেন। স্বামী শিবানন্দ তখন স্বামীজীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বেচ্ছাবৃত এই অত্যাবশ্যক কর্তব্য ছাড়িয়া তাঁহার অন্যত্র যাওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিল না; সুতরাং তিনিও অস্বীকৃত হইলেন। স্বামীজী তবু হাল ছাড়িলেন না, বেশ বিরক্তি দেখাইয়া অনুযোগ ও ভৎর্সনা-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "টাকা নিয়ে কাজ না করায় আপনার জন্য আমাকে কি শেষে জোচ্চোর বনতে হবে?"

শিবানন্দজী অগত্যা রাজী হইলেন এবং জুনের একেবারে শেষে[৪] কাশী যাত্রা করিলেন। কি আশ্চর্য, স্বামীজীর শেষ কীর্তি—কাশীধামে স্বামী শিবানন্দ কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম' স্থাপন—হইল সেই অবিস্মরণীয় দিনে—৪ঠা জুলাই!

৪। 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গ্রন্থে (১৪০ পৃষ্ঠা) ২৫শে বা ২৬শে জুন তাঁহার কাশী যাত্রার কথা আছে। কিন্তু 'বাণী ও রচনা'র মতে (৯।২৫৭) ১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন) স্বামী শিবানন্দ বেলুড়ে উপস্থিত ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপিতে আছে: **"June 23 (1902): Tarakda with Kedar gone to Benaras by this evening mail from Math."**

মহাসমাধি

কিছুকাল যাবৎ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা এবং অস্পষ্ট ইঙ্গিত বা স্পষ্ট ঘোষণা সকলকে জানাইয়া দিতেছিল যে, স্বামীজীর মর্ত্যলীলা সমাপ্তপ্রায়, আর অল্প দিনই বাকি ; কিন্তু এমন নিদারুণ সত্য কে স্বীকার করিয়া লইতে চায় ? সকলেই তখন ভাবিতেন—না, স্বামীজী এত শীঘ্র তাঁহার প্রিয়জনদের ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। তখন ঐসব উক্তি বা আভাসকে গ্রাহ্য না করিলেও তাঁহার লীলাসংবরণের পরে ঐগুলি সকলেরই নিকট ব্যঞ্জনাময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ (৮ই মার্চ) কাশী হইতে ফিরিবার পরে ইহা স্ফুটতর হইয়াছিল। তিনি ক্রমেই আপনাকে সর্বপ্রকার দায়িত্ব হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন। তিনি তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দকে দেখিবার অভিলাষে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে দুই-একদিনের জন্যও তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইতে লিখিয়াছিলেন। অনেকে আহ্বান পাইবামাত্র আসিয়াছিলেন, কেহ কেহ কার্যানুরোধে আসিতে পারেন নাই—পরে যখন শুনিলেন তিনি আর ইহলোকে নাই, তখন দর্শনের এই শেষ সুযোগ হারাইয়া তাঁহাদের আক্ষেপের সীমা ছিল না।

কাজ হইতে তিনি সরিয়া দাঁড়াইতেছিলেন শারীরিক অসামর্থ্যের জন্য এবং শিষ্যদিগকে কাজের দায়িত্ব দিয়া উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য। স্বামী শিবানন্দের ২রা জুন, ১৯০২-এর পত্রে জানা যায় যে, স্বামীজীর "চক্ষুর অসুখের জন্য নিজে অনেক সময় পড়িতে অথবা লিখিতে" পারিতেন না। আর শিষ্যদের হস্তে কার্যভার অর্পণ করার কথা নিজেই বলিয়াছিলেন, "কত দেখা যায় যে, মানুষ দিনরাত তার শিষ্যগণের কাছে থেকে তাদের মাটি করে ফেলে! একবার লোকগুলি তৈরী হয়ে যাবার পর এটা বিশেষ প্রয়োজন যে, তাদের নেতা তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন, কারণ তাঁর অনুপস্থিতি ছাড়া তারা নিজেদের বিকাশসাধন করতে পারবে না।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ৩৭২ পৃঃ)। কথাগুলি শুনিয়া শিষ্যগণ বিষাদগ্রস্ত হইতেন আর ভাবিতেন, তিনি এত শীঘ্র সরিয়া গেলে যে সমূহ ক্ষতি হইবে! তিনি কিন্তু পার্থিব বন্ধনগুলিকে ক্রমেই ছিন্ন করিতেছিলেন। তিনি সর্বদা ধ্যানতন্ময় থাকিতেন, আর শ্রীশ্রীঠাকুর ও ৺জগন্মাতার চরণে মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন। সকলেই লক্ষ্য করিতেন—সব বিষয়েই তাঁহার যেন এক উদাস ভাব, আর শঙ্কিতচিত্তে

স্মরণ করিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী—"ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, তখন আর দেহ রাখবে না।" একদিন পুরান বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে একজন গুরুভ্রাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, এখন কি আপনি বুঝতে পেরেছেন, আপনি কে?" স্বামীজী নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, "হাঁ পেরেছি বই কি?" সে উত্তরে সকলে স্তব্ধ হইলেন, আর কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন, আশাদীপ নির্বাপিত হইবার আর বেশী দেরী নাই; যে-কোন দিন তিনি চলিয়া যাইতে পারেন।

মহাপ্রয়াণের এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দকে একখানি পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন। উহা আনীত হইলে সেই দিনের তারিখ হইতে পর পর খানকয়েক পাতা উলটাইয়া পঞ্জিকাখানি নিজেরই ঘরে রাখিয়া দিলেন। তদবধি তাঁহাকে মাঝে মাঝে উহার পাতা উলটাইতে দেখা যাইত, যেন কোন কিছুর অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহার মহাসমাধির পরে সকলের বুঝিতে বাকি রহিল না, তিনি কি উদ্দেশ্যে নিবিষ্টচিত্তে পঞ্জিকা দেখিতেন; আর তাঁহাদের মনে পড়িল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও দেহত্যাগের পূর্বে ঐরূপ করিয়াছিলেন; শেষ রোগশয্যায় শায়িতাবস্থায় তিনি জনৈক শিষ্যকে পঞ্জিকা পড়িয়া শুনাইতে বলিয়াছিলেন এবং দুই-চারিটি দিনের কথা পড়া হইলেই বলিয়াছিলেন, "হয়েছে, আর দরকার নেই।"

দেহত্যাগের তিন দিবস পূর্বে একদিন অপরাহ্নে মঠের তৃণাচ্ছাদিত ময়দানে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামীজী দক্ষিণদিকে বিল্ববৃক্ষসমীপবর্তী গঙ্গাতীরের একটি স্থানে অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "আমার দেহ গেলে ঐখানে সৎকার করবি।" তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং ঐ ভূমিখণ্ডেরই উপর তাঁহার সমাধিমন্দির নির্মিত হইয়াছে।

লীলাসমাপনের আরও কত ইঙ্গিত গত কয়েক বৎসর যাবৎই আসিতেছিল! ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট তিনি স্বামী অচ্যুতানন্দকে বলিয়াছিলেন, "আর পাঁচ-ছয় বৎসর মাত্র জীবিত থাকব।" এতদপেক্ষাও স্পষ্টতর আভাস দিয়াছিলেন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে। ঢাকার জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা দিবার পর একদিন তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমি আর বড় জোর এক বছর আছি। এখন শুধু মাকে গোটাকতক তীর্থ দর্শন করিয়ে আনতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ হয়। তাই চন্দ্রনাথ আর কামাখ্যা যাচ্ছি। তোরা কে কে আমার সঙ্গে

যাবি বল? স্ত্রীলোকের উপর যাদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে, শুধু তারাই যেতে পাবে।"

শ্রীমতী ম্যাকলাউড তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ২৪৮-৪৯ পৃঃ): (১৯০২ খৃষ্টাব্দের) "এপ্রিল মাসের একদিন তিনি (আমাকে) বলিলেন, 'জগতে আমার কিছুই নেই; নিজের বলতে আমার এক কানাকড়িও (পেনি) নেই। আমাকে যখন যা কেউ দিয়েছে তা সবই আমি বিলিয়ে দিয়েছি।' আমি বলিলাম, 'স্বামীজী, যতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন আমি আপনাকে প্রতিমাসে পঞ্চাশ ডলার করে দেব।' তিনি মিনিট খানেক ভাবিয়া বলিলেন, 'তাতে কুলিয়ে নিতে পারব তো?' 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবেন।' 'অবশ্য তাতে হয়তো আপনার ক্রীম-এর ব্যবস্থা হবে না',—আমি উত্তর দিলাম। আমি তখনই তাঁহাকে দুই শত ডলার দিয়াছিলাম; কিন্তু চারিমাস যাইতে না যাইতেই তিনি ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন।[১]

"একদিন বেলুড় মঠে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় (২৮শে মার্চ, ১৯০২) ভগিনী নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করিতেছিলেন। আমি স্বামীজীর শয়ন-ঘরের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। সেই সময় তিনি আমাকে বলিলেন, 'আমি কক্ষন চল্লিশ পেরুবো না।' তাঁহার বয়স যে তখন উনচল্লিশ বৎসর তাহা আমি জানিতাম; তাই বলিলাম, 'কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধের জীবনের বড় কাজ তো তাঁর চল্লিশ থেকে আশী বছর বয়সের মধ্যে হয়েছিল, তার আগে হয় নি?' তিনি তবু বলিলেন, 'আমার যা দেবার ছিল তা দিয়ে ফেলেছি, এখন আমাকে যেতেই হবে।' 'যাবেন কেন?'—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, 'বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বাড়তে দেয় না; তাদের যায়গা করে দেবার জন্য আমাকে যেতেই হবে।'... মহাপ্রস্থানের দুই দিন আগে তিনি বলিয়া গেলেন, 'এই বেলুড়ে যে আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা দেড় হাজার বছর ধরে চলবে—তা একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেবে। মনে কোরো না, এটা আমার কল্পনা, এ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি'।"

১। ম্যাকলাউড পরেও টাকা পাঠাইয়াছিলেন। উহা হইতে এবং অপরদের দান হইতে স্বামীজী স্বীয় জননীকে মাসে ১০০৲ ও ভগিনীকে ৫০৲ দিতেন; তখন সম্ভবতঃ খেতড়ীর দান বন্ধ ছিল। ('স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি')।

অন্য বিষয়ের ফাঁকে ফাঁকে এমনি করিয়া তিনি এই নিদারুণ বার্তা শুনাইয়া যাইতেন। অনেকে উহা বুঝিয়াও বুঝিতেন না; যাঁহারা বুঝিতেন, চমকিত হইতেন। না বুঝার জন্য কাহারও তেমন দোষও ছিল না। ৺অমরনাথ হইতে ফিরিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, মহাদেব তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন; কাজেই অনেকেই আশা পোষণ করিতেন যে, শেষ বিদায়ের প্রাক্কালে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট সূচনা পাওয়া যাইবে। প্রত্যাশিত আভাস অবশ্য আসিয়াছিল; কিন্তু মানববুদ্ধিতে তাহা প্রতিভাত হয় নাই। আবার সব জানিয়া-শুনিয়াও স্বামীজী এমন একটা দৃঢ় মনোবল লইয়া চলিতেন, যাহা আশু বিদায়ের সম্ভাবনাকে আবৃত করিয়া রাখিত। কাশ্মীরে একদিন এক অসুখের পর তিনি দুই খণ্ড প্রস্তর হস্তে লইয়া নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, "যখনই মৃত্যু আমার কাছে আসে, আমার সব দুর্বলতা চলে যায়। তখন আমার ভয় বা সন্দেহ বা বাহ্যজগতের চিন্তা, এ-সব কিছুই থাকে না। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য তৈরী করতে থাকি। তখন আমি এই রকম শক্ত হয়ে যাই"—এই বলিয়া তিনি দুই হাতে পাথর দুইখানিকে ঠুকিলেন, আর বলিলেন, "কারণ, আমি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করেছি।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি,' ৩৭৫ পৃঃ)। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে যেন ভবিষ্যদ্বাণীরই মতো তিনি একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেনঃ "আমার চোখে এ সংসার খেলা মাত্র···।" "তবে আমি চিরকাল বীরের মতো চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মতো শীঘ্র, আর বজ্রের মতো অটল চাই। আমি ঐ রকম মরব।" "আমি শাক্ত-মায়ের ছেলে।···মা জগদম্বে! হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, 'এ বীর!'—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়!" ('বাণী ও রচনা,' ৮।৯-১০)।

কিন্তু এই দৃঢ়মনোবল মহামানবের চরিত্রেও নিবেদিতা একটি যায়গায় একটু দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন; যুগ-প্রবর্তনের দিনগুলি ফুরাইয়া আসার কালে যখন তাঁহার মনে হঠাৎ অকারণে সন্দেহ জাগিত, হয়তো বা সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, তখন তাঁহার চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়িত। "দেহান্তের অব্যবহিত পূর্ব রবিবারে তিনি জনৈক শিষ্যকে (শিষ্যাকে?) বলিলেন, 'দেখ, এ-সব কাজই চিরকাল আমার দুর্বলতার স্থল! যখন আমি ভাবি যে, ও-সব নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়ি'।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ৩৭৬ পৃঃ)। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের নিজের জন্য কোন চিন্তা ছিল না, কিন্তু

বিশ্বপ্রেমিক স্বামীজীর উপর শ্রীগুরুর অর্পিত যে কর্মভার ছিল, তাহাতে তো অবহেলা দেখানো চলে না।

এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল—জানা-অজানা, আলো-আঁধারের খেলা লইয়া। নিবেদিতা লিখিয়াছেন: "জুন মাস শেষ হইলে কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্তী হইয়াছে। দেহত্যাগের পূর্ব বুধবারে তিনি সমীপস্থ একজনকে বলিয়াছিলেন, 'আমি মৃত্যুর জন্য তৈরী হচ্ছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জেগেছে, এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।'

"আর আমরা যদিও স্বপ্নে ভাবি নাই যে, তিনি অন্ততঃ তিন-চারি বৎসরের পূর্বে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তথাপি জানিলাম যে, তাঁহার কথাগুলি সত্য। এই সময়ে জগতের খবরাখবর শুনিয়া তিনি নামমাত্র উত্তর প্রদান করিতেন। সাময়িক কোন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা এখন অনর্থক হইয়া পড়িল। তিনি শান্তভাবে বলিতেন, 'তোমার কথা ঠিক হতে পারে, কিন্তু আমি আর এ-সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে পারি না। আমি মৃত্যুর দিকে চলেছি।'…

"ঐ সপ্তাহেরই বুধবারে—সেদিন একাদশী—তিনি নিরম্বু উপবাস করিলেন এবং পূর্বোক্ত শিষ্যকে[২] নিজহাতে প্রাতঃকালীন আহারীয় দ্রব্যসকল পরিবেশন করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক জিনিসটি—কাঁঠালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, সাদা ভাত এবং বরফ দিয়া ঠাণ্ডা করা দুধ দিবার সময় তৎসম্বন্ধে কৌতুক সহকারে গল্প করিতে লাগিলেন। সর্বশেষে ভোজন সমাপ্ত হইলে তিনি নিজ হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং তোয়ালে দিয়া হাত মুছাইয়া দিলেন। স্বভাবতই শিষ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'স্বামীজী, এ-সব আমারই আপনার জন্য করা উচিত। আপনার আমার জন্য নয়।' কিন্তু তাঁহার উত্তর অতি বিস্ময়জনক গাম্ভীর্যপূর্ণ হইল—'ঈশা তাঁর শিষ্যগণের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।' তদুত্তরে শিষ্যের মুখে আসিতেছিল, 'কিন্তু সে তো শেষ সময়ে!' কিসে যেন কথাগুলিকে আটকাইয়া দিল—তাহা আর বলা হইল না। ভালই হইয়াছিল। কারণ এখানে শেষ সময় সমাগত হইয়াছিল।

২। ইংরেজীতে উভয়-লিঙ্গাত্মক Disciple শব্দ ও বঙ্গানুবাদে শিষ্য শব্দ ব্যবহৃত হইলেও ম্যাকলাউড-এর মতে ইনি স্বয়ং নিবেদিতা ('রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ,' ২৪৯ পৃঃ)।

"এই কয়দিন স্বামীজীর কথা ও চালচলনে কোন বিষাদগম্ভীর ভাব ছিল না। পাছে তিনি অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করেন, তজ্জন্য আমরা বিশেষ চিন্তান্বিত থাকিতাম এবং কথাবার্তা ইচ্ছাপূর্বক অতি লঘু বিষয়সকলেই নিবদ্ধ রাখা হইত। তাঁহার পালিত পশুগণ, তাঁহার বাগান, নানাবিধ পরীক্ষা, পুস্তক এবং দূরস্থিত বন্ধুবর্গ এই সকলেরই প্রসঙ্গ হইত। কিন্তু এ-সকল সত্ত্বেও আমরা ঐ সময়ে একটি জ্যোতির্ময় সত্তা অনুভব করিতাম—তাঁহার স্থূল দেহ যেন উহারই ছায়া বা প্রতীকমাত্র বলিয়া বোধ হইত। তথাপি কেহই অত শীঘ্র সব শেষ হইয়া যাইবে, এ কথা বুঝিতে পারেন নাই—বিশেষতঃ সেই ৪ঠা জুলাই শুক্রবারে—কারণ সেদিন তাঁহাকে, বহু বৎসর যাবৎ তিনি যেমন ছিলেন, তদপেক্ষা অধিক সুস্থ ও সবল দেখা গিয়াছিল এবং তজ্জন্য ঐ দিনটিকে বড় শুভ দিন বলিয়া মনে হইয়াছিল।" (ঐ, ৩৭৪-৭৭ পৃঃ)।

২রা জুলাই, বুধবারে নিবেদিতার সহিত আলাপপ্রসঙ্গে স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যা ও বন্ধু-বান্ধবদের কথাও তুলিয়াছিলেন। শ্রীমতী ম্যাকলাউড সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ও পবিত্রতার মতোই পবিত্র এবং মমতারই মতো মমতাময়ী।" নিবেদিতার নিকট ঐ কথা শুনিয়া ম্যাকলাউডের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল,—তাঁহার প্রতি স্বামীজীর উহাই শেষ উপদেশ।

এইরূপ স্নেহপ্রীতিমাখা ব্যবহার চলিতেছিল কিছুদিন ধরিয়া। মহাসমাধির দিনেও আশু বিপদ অজ্ঞাতই রহিয়া গেল, যদিও পরে বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করিয়া সকলেই সেদিনকার ব্যবহারের মধ্যে একটা অদৃষ্টপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য, দৃঢ়তা, কর্মোদ্যম, প্রীতিপূর্ণ আলোচনা ইত্যাদির কথা স্মরণ করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই ছিল একটা গভীর ভাবের দ্যোতক—যেন দীপ নির্বাপণের পূর্বে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিচ্ছটা! সেদিন প্রাতে চা খাইতে খাইতে তিনি গুরুভ্রাতাদিগের সহিত অতীতদিনের অনেক আলোচনা ও গল্প করিলেন এবং তৎপরদিবস শনিবার ও অমাবস্যা থাকায় ঐ দিন রাত্রে ৺কালীপূজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা ৺কালীমাতার পরম ভক্ত ও সাধকাগ্রণী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় স্বামীজী সানন্দে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ভট্টাচার্য মহাশয়ও এসেছেন।" তৎক্ষণাৎ তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দকে পূজার সমস্ত আয়োজন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে বলিলেন। তাঁহারাও ঐ কার্যে ব্যাপৃত হইলেন।

ইহার পরে স্বামীজী প্রায় সাড়ে আটটায় ঠাকুরের পূজাগৃহে গিয়া ধ্যানে বসিলেন ; পরে সাড়ে নয়টায় স্বামী প্রেমানন্দ পূজা করিতে আসিলে তাঁহাকে ধ্যানের আসনখানি ঠাকুরের শয়নঘরে পাতিয়া ঐ ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন এবং সেখানেই ধ্যানে বসিলেন। অন্যদিন তিনি পূজার ঘরে বসিয়াই ধ্যান করিতেন। আনুমানিক এগারটা পর্যন্ত ধ্যানের পর তিনি "মা কি আমার কালো ? কালরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো"—ইত্যাদি গানটি[৩] গাহিতে গাহিতে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে অস্ফুটস্বরে বলিতে শুনিলেন, "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকতো তবে বুঝতে পারত, বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে[৪]।" খুব উচ্চাবস্থায় অধিরূঢ় না হইলে স্বামীজী নিজের সম্বন্ধে এইরূপ কিছু বলিতেন না ; অতএব কথাগুলি স্বামী প্রেমানন্দকে খুবই বিচলিত করিল।

তাহার পরই শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ হইল। স্বামীজীর আদেশে স্বামী শুদ্ধানন্দ পুস্তকাগার হইতে শুক্লযজুর্বেদ গ্রন্থখানি আনিয়া ভাষ্যসমেত এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে লাগিলেন :

সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমাগন্ধর্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম।
স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা ॥

—বাজসনেয়-সংহিতা, মাধ্যন্দিন-শাখা ১৮।৪০

উহার মহীধরকৃত ভাষ্য সম্বন্ধে স্বামীজী বলিলেন, "এ ব্যাখ্যা আমার মনে লাগছে না। ভাষ্যকার সুষুম্না পদের যে ব্যাখ্যাই করুন, পরবর্তীকালে তন্ত্রাদিতে দেহাভ্যন্তরস্থ সুষুম্না-নাড়ী বলে যা উক্ত হয়েছে, তারই বীজ এই বৈদিক মন্ত্রে নিহিত রয়েছে। তোরা এই সব শ্লোকের প্রকৃত মর্ম প্রণিধান করবার চেষ্টা করবি। শাস্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে নিজে নিজে চেষ্টা করবি ; তাহলেই মৌলিক ব্যাখ্যা বার করতে পারবি।" ঐ মন্ত্রের ঐরূপ ব্যাখ্যা ও পরদিন কালীপূজার অভিলাষ হইতে পরে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে, ঐ দিন

৩। পরে উদ্ধৃত স্বামী প্রেমানন্দের পত্র দ্রষ্টব্য। বাঙ্গলা জীবনীতে "কে বলে তারিণী তোমায় তিমির বরণী" এই গানের উল্লেখ আছে।

৪। বাঙ্গলা জীবনী, ৯৪৯ পৃঃ। ইংরেজী জীবনীতে আছে, "how many Vivekanandas shall be born"—কতই না বিবেকানন্দ জন্মাবে (৭৪৯ পৃঃ)।

স্বামীজীর মন ষট্‌চক্রভেদ ও তৎসাধন-প্রক্রিয়ার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছিল।

আবার কে বলিবে, পরদিবস অমাবস্যায় ৺কালীপূজার বাসনার অন্তরালেও কোন ভাবী ইঙ্গিত লুক্কায়িত ছিল কিনা? সেদিন একদিকে মহাপ্রয়াণ, শ্মশান, শোক, ভীতি, আবার অপরদিকে চিরমুক্তি, অমঙ্গলের মধ্যেও জগন্মাতার সত্তার উপলব্ধি, বিপদেও সাহস অবলম্বন, সসীম জীবনেও অসীম অমৃতের সন্ধান, নিরাশার মধ্যেও উদ্যম, শোকবিহ্বলতার মধ্যেও আদর্শের অনুসরণের উদ্দীপনা—ইত্যাদি বিরুদ্ধ ভাবরাশির সম্মেলনে যে পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কি স্বামীজীর লেখনীমুখে চিত্রিত কালীমূর্তি ও তাঁহার মানসনেত্রে দৃষ্ট কালীপূজারই অনুরূপ নহে?[৫]

তিনি সাধারণতঃ স্বগৃহে পৃথক্ আহার করিলেও ৪ঠা জুলাই দ্বিপ্রহরে সকলের সহিত নীচে বসিয়া বেশ তৃপ্তি ও রুচির সহিত ভোজন করিলেন। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটার সময়, অর্থাৎ অন্যদিন অপেক্ষা একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা আগে স্বয়ং ব্রহ্মচারীদের গৃহে গিয়া তাহাদিগকে সংস্কৃত ক্লাসে যোগ দিতে ডাকিলেন। তারপর তিন ঘণ্টা ধরিয়া ব্যাকরণের চর্চা চলিল। স্বামীজী বরদরাজের লঘুকৌমুদীর সূত্রগুলি ধরিয়া নানা হাস্যোদ্দীপক গল্পের সহিত ঐ গুলিকে জুড়িয়া দিয়া এবং সূত্রের ভাষা-বিষয়ে বিবিধ রসিকতার অবতারণা করিয়া শুষ্ক ব্যাকরণ শাস্ত্রকে হাসির হুল্লোড়ে পরিণত করিলেন। ফলে ঐ শাস্ত্রের কথাগুলি ব্রহ্মচারীদের মনে চিরকালের মতো গাঁথিয়া গেল। মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি এমনি করিয়া একরাত্রে সহপাঠী দাশরথি সান্ন্যাল মহাশয়কে সমগ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস আয়ত্ত করাইয়াছিলেন। আলোচ্য দিনে পাঠশেষে স্বামীজীকে একটু ক্লান্ত দেখাইতেছিল; কিন্তু মনের ফুর্তি তখনও বেশ!

ঐ দিন বৈকালে তিনি স্বামী প্রেমানন্দের সহিত বেলুড় বাজার পর্যন্ত বেড়াইয়া আসিলেন। শরীর খারাপ হওয়া অবধি স্বামীজী প্রায়ই অতদূর যাইতেন না। সেদিন তিনি কোন কষ্ট অনুভব করিলেন না, বরং বলিলেন, শরীর খুব হাল্কা বোধ হইতেছে। প্রেমানন্দজীর সহিত আলোচিত অনেক কথার মধ্যে একটি প্রধান বিষয় ছিল বেদবিদ্যালয়-স্থাপনের পরিকল্পনা। প্রেমানন্দজী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বেদপাঠে কি উপকার হবে?" আর

৫। 'বাণী ও রচনা'—'মৃত্যুরূপা মাতা', (৭।৪১২) এবং 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' (৬।২৬৯-৭১)।

বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দির
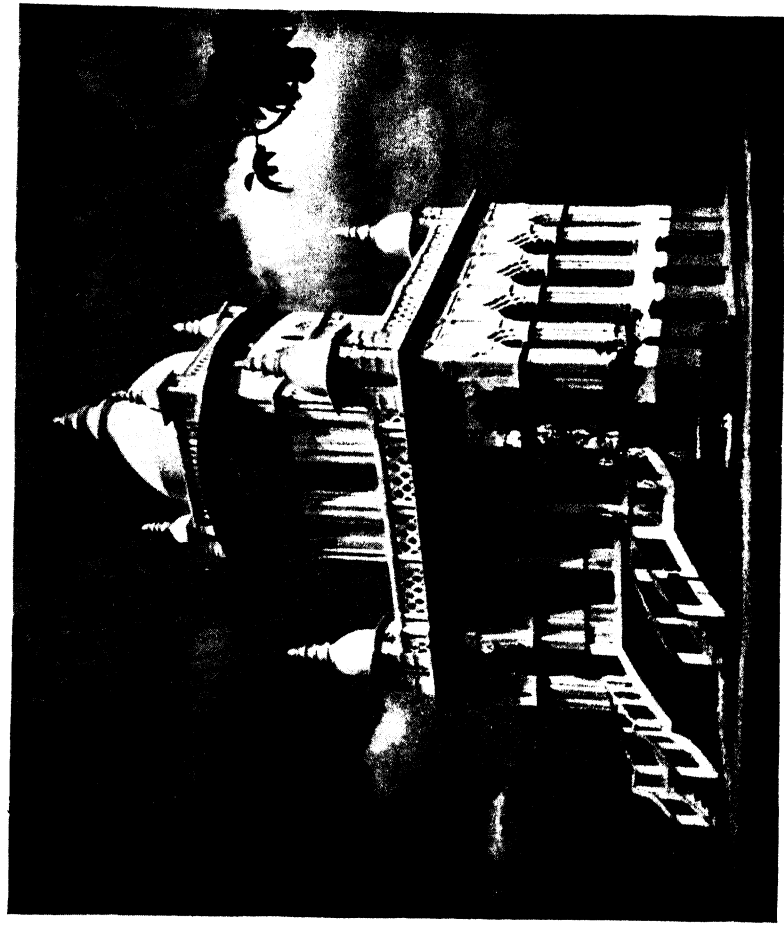
স্বামীজীর সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল, "আর কিছু না হোক, কুসংস্কারগুলো তো দূর হবে।"

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে মঠে ফিরিয়া স্বামীজী মঠবাসীদের সহিত আলাপ ও সকলের কুশলপ্রশ্নাদি করিলেন। তারপর সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজিলে নিজ কক্ষে প্রবেশপূর্বক গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা। ব্রজেন্দ্র নামক একজন ব্রহ্মচারী নিকটেই ছিলেন, ধ্যানে বসিবার পূর্বে স্বামীজী জপের মালা হাতে লইলেন এবং ব্রহ্মচারীকে বাহিরে বসিয়া ধ্যান করিতে আদেশ দিলেন। প্রায় একঘণ্টা পরে তিনি ব্রহ্মচারীকে ভিতরে ডাকিয়া মাথায় বাতাস করিতে বলিলেন এবং গরম বোধ হওয়ায় সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিতে বলিয়া শয়ন করিলেন। মালা তখনও হাতে আছে। একটু পরে তিনি শিষ্যকে পা টিপিয়া দিতে বলিলেন। এইভাবে আরও একঘণ্টা কাটিয়া গেলে স্বামীজী পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলেন এবং ক্ষুদ্র বালকের ক্রন্দনের ন্যায় অস্ফুট ধ্বনি করিলেন। তখন রাত্রি নয়টা। ডান হাতখানি একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর নিঃশ্বাস নির্গত হইল এবং মস্তকটি উপাধান হইতে গড়াইয়া পড়িল। আর দুই-এক মিনিট পরে তিনি পূর্ববৎ আর একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলিলেন—তারপর সব স্থির হইয়া গেল, যেন ক্লান্ত একটি শিশু মাতৃক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিল। চক্ষু দুইটি তখন ভ্রূযুগলমধ্যে স্থির নিবদ্ধ, প্রশান্ত আননে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ—ঠিক যেন মহাযোগী মহাধ্যানে নিমগ্ন। তখন নয়টা বাজিয়া মিনিট দশেক মাত্র হইয়াছে।

অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারীটি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি একজন বয়স্ক সাধুকে (সম্ভবতঃ স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে[৬]) ডাকিয়া আনিলেন। তখন সবে নৈশভোজনের ঘণ্টা বাজিয়াছে। সাধু আসিয়া নাড়ী দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাই আর একজন সাধুকে (সম্ভবতঃ স্বামী প্রেমানন্দকে) ডাকিলেন। দুইজনেই দেখিলেন নাড়ী নাই। এমন দুঃসহ বাস্তবতাকে তো কেহ সহজে মানিয়া লয় না; তাই সমাধি অবস্থা মনে করিয়া উপস্থিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনাইতে লাগিলেন; কিন্তু সমাধিভঙ্গ হইল না। হায়! হায়! একি তবে মহাসমাধি? মুহূর্তমধ্যে অন্যান্য সাধুরাও আসিয়া

৬। ইহা বাঙ্গলা জীবনীর মত। পরে উদ্ধৃত প্রত্যক্ষদ্রষ্টা স্বামী প্রেমানন্দের মতে ইনি স্বামী অদ্বৈতানন্দ।

পড়িলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দের পরামর্শে স্বামী বোধানন্দ ভাল করিয়া নাড়ী দেখিলেন; তিনি অনেকক্ষণ কোন সাড়া না পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন অদ্বৈতানন্দ নির্ভয়ানন্দকে বলিলেন, "হায়! হায়! আর কি দেখছ? শীঘ্র মহেন্দ্র ডাক্তারকে (বরাহনগরের মহেন্দ্রনাথ মজুমদারকে) ডেকে আন।" একজন তখনই ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন, আর একজন কলিকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে সংবাদ দিতে গেলেন।[৭] রাত্রি সাড়ে দশটায় তাঁহারা দুইজন মঠে আসিয়া পৌছিলেন। বাল্যসখা, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর, সঙ্ঘনেতা স্বামীজীর অকস্মাৎ অন্তর্ধানের দুঃখ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট অসহ্য ছিল—তিনি তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে অতিকষ্টে উঠাইয়া আনিলে তিনি বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল।" যথাকালে ডাক্তারও আসিয়া পরীক্ষা করিলেন, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া পুনরারম্ভের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি বারটায় তিনি বলিলেন, প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে।

দেহ প্রাণহীন হইলেও উহাতে কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না, কোন পীড়া হইয়াছিল এবং তাহারই পরিণতিস্বরূপ জীবনান্ত ঘটিয়াছে এইরূপ কোন লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হইল না—এমনই সুস্থ সবল ও জীবন্ত মনে হইতেছিল! মৃত্যুতেও সে পূতদেহ সমাধিলীন মহাদেবের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। তাঁহার পদ্মচক্ষু দুইটি ঊর্ধ্বগামী হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের শ্বেতাংশ হইতে তখনও জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। রাত্রি এই ভাবেই কাটিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার (বাঙ্গলা ২০শে আষাঢ়, ১৩০৯ সাল)—আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের উৎসব মধ্যেই স্বামীজী দেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

প্রাতে দেখা গেল, তাঁহার লোচনদ্বয় জবাকুসুম-সদৃশ লোহিতাভ হইয়াছে এবং নাসিকাদ্বারে ও মুখপ্রান্তে রক্তচিহ্ন রহিয়াছে। ক্রমে সুবিজ্ঞ ডাক্তার বিপিনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আসিলেন। তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ও পরীক্ষা

৭। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি হইতে জানা যায়, কবিরাজী চিকিৎসার পরে ২৭শে জুন ডাঃ মজুমদারের চিকিৎসা আরম্ভ হয়। ৪ঠা জুলাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলরাম-ভবনে ছিলেন। রাত্রি আন্দাজ দশটায় কানাই মহারাজ সংবাদ লইয়া আসেন যে, স্বামীজীর দেহত্যাগ আসন্ন।

করিয়া অভিমত জানাইলেন—সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ হইয়াছে ; মহেন্দ্রবাবু বলিয়া গিয়াছিলেন, হৃৎক্রিয়া বন্ধ হওয়াই মহাপ্রয়াণের কারণ। তারপর আরও ডাক্তার আসিয়া স্ব স্ব বিচিত্র মত প্রকাশ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, মাথার শির ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সাধুরা এবং ভক্তেরা কিন্তু বুঝিলেন, জপ ও ধ্যান করিতে করিতে স্বামীজীর ঊর্ধ্বগামী প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে ; শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা বলিতেন তাহাই ঘটিয়াছে—স্বামীজী যোগাবলম্বনে সমাধিমার্গে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ক্রমে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। বন্ধুবান্ধব অনেকেই শেষ দর্শনের জন্য বেলুড় মঠে সমবেত হইলেন। ভগিনী নিবেদিতা প্রাতেই আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর পার্শ্বে বসিয়া বেলা দুইটা পর্যন্ত ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে থাকিলেন। তারপর সেই পবিত্র দেহকে গঙ্গাজলে অভিষিক্ত, নূতন গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া অলক্তকরঞ্জিত চরণযুগলের চিহ্ন গ্রহণ করা হইল ; পরে ঐ বরবপুকে প্রদক্ষিণপূর্বক শঙ্খঘণ্টানিনাদ সহকারে ধূপদীপের দ্বারা আরতি করা হইল। অতঃপর সকলে শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ করাইলেন, কেহ বা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীচরণরেণু গ্রহণ করিলেন। সর্বশেষে "জয় শ্রীগুরুমহারাজজীকী জয়," "জয় শ্রীস্বামীজী মহারাজজীকী জয়" ধ্বনিতে দিক-বিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহার দেহ পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে গঙ্গাতীরে বিল্ববৃক্ষসমীপে লইয়া যাওয়া হইল এবং ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, ধূপ, অগুরু ইত্যাদি দ্বারা উঁহার সৎকার করা হইল।

শেষ দিনে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ঊনচল্লিশ বৎসর পাঁচ মাস চব্বিশ দিন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "আমি চল্লিশ পেরুচ্ছি না", সে বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল।

অবশেষে অন্ত্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমরা দুইখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি ; উহাতে কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি থাকিলেও সমসাময়িক বিবৃতি হিসাবে খুবই প্রামাণিক ; কিছু নূতন তথ্যও উহাতে আছে। পত্রদ্বয়ের লেখক স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ; এবং তাঁহারা লিখিয়াছিলেন গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দকে। ইনি তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। পত্রদ্বয়ের জন্য আমরা কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে প্রকাশিত 'পত্রসংকলন' নামক পুস্তকের নিকট ঋণী।

স্বামী সারদানন্দের পত্র

বেলুড় মঠ, হাওড়া
৭ই আগস্ট, ১৯০২

ভাই কালী,

গত ৪ঠা জুলাই রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটের সময় আমাদের পূজনীয় স্বামীজী সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ৬ই জুলাই তোমাকে জানাইবার নিমিত্ত তার করিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন খবর না পাওয়াতে সকলে বিশেষ ভাবিত আছি। তার আফিসে সন্ধান লইতে যাওয়ায় তাহারা বলিল, তুমি নিশ্চিত তার পাইয়াছ। নতুবা খবর আসিত। এই ঠিকানায় তার পাঠাই ঃ অভেদানন্দ, বেদান্ত সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক। এতদিন সকলের মনের অবস্থা যে কি হইয়াছিল, বুঝিতেই পার, সেজন্য চিঠি লিখিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবে।

স্বামীজীর মৃত্যু বড়ই অদ্ভুত! প্রায় দুই মাস পূর্বে তিনি কাশীধামে যান, সেখান হইতে শরীর খুব খারাপ হইয়া আসেন। মঠে ফিরিয়া আসিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করান। তাহাতে বেশ সারিয়া উঠেন। একমাস ঔষধ ব্যবহারে হাত-পা ফোলা সারিয়া গেল; পেটেও (উদরী হইয়াছিল) জল রহিল না। শরীরে লাবণ্য আসিল এবং জোরও বেশ হইল। কলিকাতায় যাওয়া-আসা করিতে লাগিলেন—এক মাইল, দুই মাইল পথ হাঁটিতে কোন কষ্ট বোধ হইত না। এমন কি এক সপ্তাহের জন্য কলিকাতা হইতে কিছু দূরে জাগুলে নামক পল্লীগ্রামে এক বন্ধুবাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইলেন[৮] এবং তাহাতেও কোন অসুখ হইল না। মঠের সমস্ত দেখাশুনা তিনিই করিতেন এবং ছেলেদের পড়াশুনার ভারও তিনিই লইয়াছিলেন। ইদানীং পূর্বের ন্যায় বৈরাগ্য ভাবটা খুব প্রবল হইয়াছিল। রাত্রি ৪টার সময় সকলকে লইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া জপ-ধ্যান করিতেন এবং সর্বদাই বলিতেন, 'আমার কার্য হইয়া গিয়াছে, এখন তোরা সব ছ্যাখ শোন, আমায় ছুটি দে।' কখনও বলিতেন, 'আমার মৃত্যু শিয়রে, কাজ-কর্ম ও খেলা ঢের করা গিয়াছে, যা কাজ করিয়া দিয়াছি তাই এখন জগৎ নিক, তাই বুঝতে এখন ঢের দিন লাগবে। ও খেলা কি চিরকাল করতে হবে? ও করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি!'

৮। ৬ই জুন, ১৯০২ সেখানে যান; ১২ই জুন মঠে ফিরেন। সঙ্গে ছিলেন কানাই মহারাজ ও নাড়ু মহারাজ।

৪ঠা জুলাই তারিখে সকালে ঠাকুরঘরে যাইয়া তিন ঘণ্টা ধ্যান করেন, দু'চার দিন আগে রাখালকে বলিয়াছিলেন, 'এবার যা হয় একটা এস্পার ওস্পার করিব, হয় শরীরটা ধ্যান-জপ করিয়া সারিয়া কাজে ভাল করিয়া লাগিব, না হয় তো এ ভগ্ন শরীর ছাড়িয়া দিব।' অন্যদিন সকলের সহিত বসিয়া জপ-ধ্যান করিতেন। সেদিন ঠাকুরের শয়নঘরে একলা বসিয়া ধ্যান করিলেন। তারপর ঠাকুরের বিছানা স্বহস্তে ঝাড়িয়া দিলেন ও নীচে নামিয়া সকলের সহিত বসিয়া বেশ ক্ষুধার সহিত ইলিশ মাছের ঝোল, ভাজা ইত্যাদি দিয়া ভাত খাইলেন। খাবার পর একঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া সকলকে ডাকিয়া ব্যাকরণ ও যোগ সম্বন্ধে ২ ঘণ্টা কাল শিক্ষা দেন। যজুর্বেদের 'সুষুম্নঃ সূর্যবর্চসঃ'[৯] এই পদের টীকা ঠিক করা হয় নাই বলিয়া ঐ পদের নিজের ব্যাখ্যা সকলকে শুনাইলেন। পরে ৪টা হইতে ৫টা পর্যন্ত বাবুরামের সঙ্গে মঠের বাহিরে দুই মাইল বেড়াইয়া আসিলেন, বেড়াইতে বেড়াইতে পৃথিবীর সকল জাতির সভ্যতা কেমন করিয়া হইল এ সম্বন্ধে যত ইতিহাস গল্পচ্ছলে তাঁহাকে বলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'আজ শরীর যেমন সুস্থ, এমন অনেক দিন বোধ করি নাই।...'

সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে যাইয়া মালা লইয়া জপ করিতে বসিলেন এবং বলিলেন, 'যতক্ষণ না ডাকি, অন্য ঘরে গিয়া জপ-ধ্যান কর।' একঘণ্টা পরে ডাকিয়া শয়ন করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। একজন ব্রহ্মচারী কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টা এইরূপ স্থির হইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবার পর ডান হাতখানি ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে লাগিল। মিনিট দুই ঐরূপ হইবার পর মুখ দিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন। পরে মিনিট দুই আবার স্থির থাকিয়া মুখ দিয়া আর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং সেই সঙ্গে মাথাটি নড়িয়া উঠিল এবং চক্ষু ভ্রূমধ্যে স্থির হইয়া রহিল, আর মুখে অপূর্ব জ্যোতি ও হাসি দেখা গেল। এইরূপ দেখিয়া মঠের সকলকে ডাকা হইল, সকলে দেখিল, হাত-পা ঠাণ্ডা, নাড়ী নাই। ডাক্তার ডাকা হইল, ডাক্তার মজুমদার আসিয়া বলিল—শরীর ত্যাগ করিয়াছেন।

পরদিন অপরাহ্ণে বেলা ৪টার সময় শরীর অগ্নিসাৎ করা হইল। মুখের সে অপূর্ব ভাব শেষ পর্যন্ত যে দেখিয়াছিল, সেই মোহিত হইয়াছিল!

৯। সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা—ইত্যাদি শুক্লযজুর্বেদ, ১৮।৪০

তাঁহার সমাধিস্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিবার কথা হইয়াছে। যদি তাঁহার বন্ধুরা এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করেন তো পাঠাইও।

গঙ্গার পশ্চিম পারে মঠের ভিতরেই তাঁহার শরীর অগ্নিসাৎ করা হয়। ইহার ঠিক অপর পারেই গুরু মহারাজের শরীর অগ্নিসাৎ করা হইয়াছিল।

তাঁহার কার্য তিনি করিয়া চলিয়া গেলেন। এখন যে সকল কাজকর্ম আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন তাহা তুমি, রাখাল প্রভৃতি সকলে মিলিয়া যাহাতে বজায় থাকে তাহার উপায় করিও।

হরিভাই স্বামীজীর শরীর ত্যাগের ১৫ দিন[১০] পরে এখানে পৌছিয়াছেন। তাঁহার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছে বুঝিতেই পারিতেছ। তিনি তো একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

আমার এবং মঠের সকলের ভালবাসা ও নমস্কার জানিও ও পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও। ইতি

দাস

শরৎ

দ্রষ্টব্য এই যে, স্বামী সারদানন্দ মঠে আসেন রাত্রি সাড়ে দশটায়। অপরের নিকট সদ্যঃশ্রুত কথাগুলিই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তী পত্রখানি স্বামী প্রেমানন্দের দ্বারা লিখিত। তিনি সে রাত্রে মঠেই ছিলেন।

বেলুড় মঠ,
২০ আগষ্ট, ১৯০২

ভাই কালী,

আমরা এখন যেন জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি। সে শক্তি, সে উৎসাহপূর্ণ আদেশ, সে উদার ভাবের আলোচনা আর নাই! কবিরাজী চিকিৎসায় তাঁর শরীর বেশ সেরে উঠেছিল। বিশেষ কোন অসুখই ছিল না। ঠিক ইচ্ছা করে শরীর ছেড়ে দিলেন!

প্রায় দুই মাস হতে ছেলেদের নিয়মমত ধ্যানভজন করাতেন এবং নিজেও উহাতে যোগ দিতেন। কিছুদিন হতে বৈরাগ্যের ভাব খুব প্রবল দেখতুম। 'কিমর্থং কস্য কামায় শরীরং অনুসঞ্জরেৎ' প্রায় এই শ্লোক আওড়াইতেন।

১০। প্রকৃতপক্ষে দশদিন পরে, অর্থাৎ ১৪ই জুলাই বেলুড় মঠে পৌছান।

আর জিজ্ঞাসা করতেন—'হাঁরে, ঠাকুর কোন দুটি গান শেষে শুনতে ভালবাসতেন ?'—বলে 'ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী' ও 'কবে সমাধি হব শ্যামাচরণে' এই গানগুলি গাহিতেন। তুমি জান কাজকর্মের ভার তাঁতে কোনদিন কম ছিল না। ১০।১৫ দিন পূর্বেই কাশীতে একটা আশ্রম খুলিবার জন্য তারকদাদাকে পাঠাইয়াছিলেন। মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিবেন—এই ইচ্ছা ক'দিন হতে খুব প্রবল হয়েছিল। শেষের দিনেও বেদসংক্রান্ত পুস্তক আনাইবার জন্য পুনা ও বোম্বাই নগরে তিনখানা চিঠি লেখা হয়। আমার সঙ্গে ঐ দিন বেদবিদ্যালয় সম্বন্ধে কত কথাই হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বেদ পড়িয়া কি হবে ? 'কুসংস্কারগুলো যাবে বেদ পড়িলে' কহিলেন।

কার্যগতিকে শরৎ, রাখাল দু-চার দিন কলিকাতায় ছিল। পুরাতন লোকের মধ্যে গোপালদাদা ও আমি সেদিন মঠে ছিলাম। কোন অসুখই ছিল না, বুঝতে পাচ্ছ ? ঐ দিন প্রাতঃকালে উঠে যেমন স্ফূর্তি কত্তেন সেইরূপ স্ফূর্তি হাসি বিদ্রূপ আমার সঙ্গে কত হল। যেমন গরম দুধ ও ফলাদি খান সেইরূপ খেলেন ও আমায় খাওয়াইবার জন্য কত আগ্রহ কল্লেন। তারপর গঙ্গার একটা ইলিশ মাছ এ বৎসরে এই প্রথম কেনা হল, তার দাম নিয়ে আমার সঙ্গে কত রহস্য হতে লাগল। একজন বাঙ্গাল ছেলে ছিল তাকে বল্লেন—'তোরা নূতন ইলিশ পেলে নাকি পূজা করিস্, কি দিয়ে পূজা কত্তে হয় কর।' তারপর বেড়াতে বেড়াতে আমায় বললেন—'আমার কেন নকল করবি, ঠাকুর নকল কত্তে বারণ কত্তেন। আমার মত উড়ন চড়ে হবি নে।' ঐ বেদবিদ্যালয় নিয়ে আবার কত কথা হবার পর সুষুম্না সম্বন্ধে বেদে কি লিখেছে দেখিয়া বলিলেন—'টীকা ঠিক নহে, তোরা মূল থেকে মানে করবার চেষ্টা করিবি।'

আন্দাজ সাড়ে আটটা বেলার সময় তিনি ঠাকুরঘরে ধ্যান করিবার জন্য উঠিলেন। আমি প্রায় সাড়ে নয়টায় পূজার জন্য ঠাকুরঘরে উঠিলাম। আমায় দেখে কহিলেন—'আমার আসন ঠাকুরের শয়নঘরে করে চারিদিকের দরজা[১১]

১১। ইংরেজী ও বাঙ্গলা জীবনীতে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঠাকুরঘরে (পূজাগৃহে) ধ্যানের কথা আছে। বর্তমান বিবরণে ধ্যানের স্থান পার্শ্ববর্তী ঠাকুরের শয়নঘর—উহার তিন দিকে দরজা—কেবল উত্তরে জানালা ; পূজাঘর ও শয়নঘরের মধ্যেও একাধিক দরজা আছে।

বন্ধ করে দে।' অন্যদিন আমি পূজা করিলেও ঐ পূজাঘরের এককোণে স্বামীজী বসিয়া ধ্যান করিতেন। আজ অন্য মত করিলেন। আন্দাজ ১১টার পর ধ্যান থেকে উঠিয়া—'মা কি আমার কাল, কালরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো' গুনগুন রবে এই গান গাহিলেন। আহারের সময় অতি তৃপ্তির সহিত সেই ইলিশ মাছের ঝোল অম্বল ভাজা দিয়া ভোজন করিলেন। কহিলেন—'একাদশী করে খিদেটা খুব বেড়েছে, ঘটি-বাটিগুলো ছেড়েছি কষ্টে।' আহারের পর নানা কথা কয়ে কিছু বিশ্রাম করলেন।

বেলা একটার পর আমায় তুলে বলিলেন—'চল পড়িগে, সন্ন্যাসী হয়ে দিবানিদ্রা খারাপ। আমার আজ ঘুম হলো না। একটু ধ্যান করে মাথাটা কিছু ধরেছে, brain weak হয়েছে, দেখছি।' তারপর Library-র ঘরে বসে তিন ঘণ্টা পাণিনি ব্যাকরণ পড়াইলেন। চারিটার পর আমায় সঙ্গে নিয়ে বাগানের বাহিরে প্রায় এক মাইল রাস্তা গেলেন। একটা বাগান দেখিয়া তোমাদের Leggett সাহেবের বাগানের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সে দেশে অল্প লোকে machine-এর সাহায্যে বড় বড় বাগান কেমন সাফাই রাখে। সাড়ে পাঁচটার পর মঠে ফিরিয়া আমায় European civilisation-এর History তন্ন তন্ন করে বুঝাইলেন, তারপর History of Colonies-এর কথা বলিলেন।

সন্ধ্যার সময় আমি ঠাকুরঘরে গেলে আমাদের শশীর বাবার সহিত অনেকক্ষণ কথা কয়ে স্বামীজী উপরে গেলেন। ব্রজেন্দ্র বলে একটা বাঙ্গাল ছেলে তাঁর সঙ্গে সে সময় ছিল ··· —(তাকে) বলেন যে—'আজ আমার শরীর বড় হাল্কা বোধ হচ্ছে। আজ বেশ আছি।'

নিজের ঘরে বসে ঐ ব্রজেন্দ্রকে 'আমার মালা দু'ছড়া দে' কহিলেন, আর উহাকে অন্য ঘরে যাইতে আদেশ করিলেন, বলিলেন 'ডাকিলে আসিস'। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে উহাকে ডাকিয়া বাতাস করিতে ও পা টিপিয়া দিতে বলিলেন। পা টিপিয়া দিতে দিতে তাঁর নিদ্রাবেশ হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা নিদ্রাবেশের পর তাঁর হাত ঈষৎ কাঁপিল—দু-চার সেকেণ্ডের জন্য। ইহার পর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস মুখ দিয়া ত্যাগ করিলেন। তার দু-এক মিনিট পর আর এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর একেবারে সমাধি। তখন ব্রজেন্দ্র ভয় পেয়ে গোপালদাকে ডাকিয়া বলে—কি হইল দেখুন। ইহার দু-এক মিনিট

পরে আমি গিয়া মহাসমাধিস্থ দেখিয়া শশীর বাবাকে ডাকিয়া স্বামীজীর কানে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নাম করিতে লাগিলাম—যদি সমাধি ভঙ্গ হয়। কি সে জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল! কি সে স্বর্গীয় তেজঃপূর্ণ বিস্ফারিত নেত্র! কেবল কৌপীন-পরিহিত সে সুন্দর শরীরে এক অপূর্ব কান্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল!

তার পর দিবসেও সে মুখমণ্ডল দর্শন করে অনেকের দুঃখ-শোক দূর হয়েছিল। ঠিক যেন শিব শুয়ে আছেন! কোন অঙ্গের কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই! ইচ্ছা করে যেন শরীর ত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রেই মজুমদার ডাক্তারকে আনান হইল। শরৎ, রাখাল ও সাণ্ডেল রাত্রে আসিল। ডাক্তারেও ঠিক করে বলিতে পারিল না যে, কোন রোগে এরূপ হইল।

ঠাকুর যে বলিতেন—'তুই যেদিন স্ব-স্বরূপ জানতে পারবি সেদিন তুই শরীর ছেড়ে দিবি।' তাই হইল! যে স্থানে দাহ হয় সে স্থানে একটি শিবমন্দির ও তাহার সম্মুখে নাট-মন্দির স্থাপন করিবার ইচ্ছা, চেষ্টা কিছু কিছু হইতেছে।

কলিকাতার লোকেও একটা memorial meeting করবার চেষ্টা করছে। মাদ্রাজে এরূপ একটি হয়ে গেছে, টাকাও উঠছে।

রাখালভায়া তোমায় চিঠি লিখিতেন, কিন্তু কদিন হতে তাঁর সর্দি ও জ্বর হয়েছে। শরৎ কলিকাতায় গিয়াছে। এখানে এসেই হরিভায়ার জ্বর হয়েছিল। আজকাল ভাল আছেন।

সারদা শীঘ্রই আমেরিকা যাচ্ছে হরিভায়ার স্থানে, স্বামীজী পূর্বেই ইহা বন্দোবস্ত করেছিলেন।

আমাদের যার যতটুকু সাধ্য সে ততটুকু স্বামীজীর কার্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। এই আমাদের সঙ্কল্প। তুমি কেমন আছ লিখিবে। আমাদের ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবে।...

দাস

বাবুরাম

আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে ৪ঠা জুলাই তাঁহার মহাপ্রয়াণ; কিন্তু ইহা কি সত্যই চলিয়া যাওয়া, চিরনির্বাণ—পৃথিবীর মানুষের সহিত চিরবিচ্ছেদ? তাঁহার জীবন ও বাণী হইতে তো তাহা মনে হয় না। ৪ঠা জুলাই সম্বন্ধে তিনি নিজেই না লিখিয়া গিয়াছেন?

তারপর এল দিন—সফলিয়া উঠিল যখন
সকল সাধনা কর্ম পূজা প্রেম আত্মবলিদান—
গ্রহণ করিলে আসি—সব হল—সম্পূর্ণ সার্থক !
তখন উঠিলে তুমি—হে প্রসন্ন ছড়াবার তরে
মুক্তির আলোক শুভ্র—সারা বিশ্ব-মানবের 'পরে।
চল প্রভু চল তব বাধাহীন পথে ততদিন—
যতদিন ঐ তব মাধ্যন্দিন প্রখর প্রভায়
প্লাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর প্রতি দেশে দেশে
সেই আলো না হয় ফলিত, যতদিন নরনারী—
তুলি উচ্চ শির—নাহি দেখে টুটেছে শৃঙ্খলভার—
না জানে শিহরানন্দে তাহাদের জীবন নূতন।[১২]

বিচার করিয়াছিলেন ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা স্বামীজীর স্বরূপ সম্বন্ধে। ম্যাকলাউড বলিলেন, তিনি ছিলেন 'মূর্তিমান শক্তি', আর নিবেদিতা বলিলেন, তিনি ছিলেন 'মূর্তিমান স্নেহ'। ভগবৎ-পথসঞ্চারী ইতিমূলক সক্রিয় প্রীতি ও শক্তির মূর্তবিগ্রহ যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর হৃদয়দ্বারে নববার্তা লইয়া সমুপস্থিত—কে তাঁহাকে বরণ করিয়া নবযুগের রূপায়ণ ত্বরান্বিত করিবে ?

॥ ওঁ শ্রীবিবেকানন্দার্পণমস্তু ॥

১২। 'বাণী ও রচনা', ৭।৪৩০ ; অনুবাদক ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য।

নির্দেশিকা

গ্রন্থপঞ্জী

(বর্তমান গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রধান পুস্তকাবলী)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : শ্রীম কথিত

প্রকাশক : অরুণকুমার গুপ্ত, ১৩-৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা। প্রথম ভাগ—১৫শ সংস্করণ ; দ্বিতীয় ভাগ—৯ম সংস্করণ ; তৃতীয় ভাগ—৮ম সংস্করণ ; চতুর্থ ভাগ—৬ষ্ঠ সংস্করণ ; পঞ্চম ভাগ—৫ম সংস্করণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : স্বামী সারদানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। প্রথম খণ্ড—৯ম সংস্করণ ; দ্বিতীয় খণ্ড—৯ম সংস্করণ ; তৃতীয় খণ্ড—৯ম সংস্করণ ; চতুর্থ খণ্ড—৮ম সংস্করণ ; পঞ্চম খণ্ড—৭ম সংস্করণ।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রথম সংস্করণ :-

স্বামী বিবেকানন্দ : শ্রীপ্রমথনাথ বসু

প্রথম ভাগ—৩য় সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ—২য় সংস্করণ :

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি : ভগিনী নিবেদিতা, চতুর্থ সংস্করণ :

উদ্বোধন : উদ্বোধন কার্যালয়—শতবার্ষিকী সংখ্যা ও যথাস্থানে উল্লিখিত অন্যান্য সংখ্যা

স্বামী অখণ্ডানন্দ : স্বামী অন্নদানন্দ, প্রথম সংস্করণ : উদ্বোধন

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে : ভগিনী নিবেদিতা, পঞ্চম সংস্করণ : উদ্বোধন

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ :

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা : শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ :

ভারতে বিবেকানন্দ, ১৩শ সংস্করণ :

শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দ মহারাজের অনুধ্যান : শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

১৩৪১-১৮ই কার্তিক : মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ৩ গৌর মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা

স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী : মহেন্দ্রনাথ দত্ত, আশ্বিন ১৩৪২ :

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ : শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রথম খণ্ড—১ম সংস্করণ ; দ্বিতীয় খণ্ড—২য় সংস্করণ :

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী : মহেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রথম খণ্ড—২য় সংস্করণ ; দ্বিতীয় খণ্ড—২য় সংস্করণ ; তৃতীয় খণ্ড—২য় সংস্করণ :

কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ : মহেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ ;

সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত-কল্পতরু : দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

ভগিনী নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা
দ্বিতীয় সংস্করণ ; সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা

অতীতের স্মৃতি : স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, প্রথম সংস্করণ : বেলুড়মঠ, হাওড়া

আমার জীবনকথা : স্বামী অভেদানন্দ
প্রথম সংস্করণ : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্ববিবেক : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শঙ্কর ;
বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

পত্র-সঙ্কলন : স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা

Life of Swami Vivekananda : By His Eastern & Western Disciples : Sixth Edition : Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta-14.

Reminiscences of Swami Vivekananda : By His Eastern & Western Admirers : Second Edition,

Swami Vivekananda in America : New Discoveries : By Marie Louise Burke : First Edition,

Life of Vivekananda and the Universal Gospel : By Romain Rolland : Fifth Edition,

Life of Ramakrishna : By Romain Rolland ; Fourth Impression :

Swami Vivekananda : A Forgotten Chapter of His Life, 1963 : By Benishankar Sarma.
Oxford Books & Stationery Co., 17 Park Street, Calcutta-16.

Swami Vivekananda Patriot-Prophet : By Bhupendranath Dutta ; 1954. Nababharat Publishers, 153/1, Radha Bazar St., Calcutta.